পন্থা—সূচীপত্র।

১৩২৩ সাল।

---

* এই চিহ্নিত পত্রাঙ্কগুলি দুইবার মুদ্রিত হইয়াছে। পং সং।

বিষয়		লেখকগণ	পত্রাঙ্ক।
উত্থান	,,	নলিনীনাথ দাস গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্,	৩৬৫
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত	,,	হৃদয়নাথ মিশ্র	১৪৫
কেন চাই ?		... ...	৪৮১
কাঞ্চীপুরী	,,	পান্নালাল সিংহ	৪৮৩
কৃষক		ভূপেন্দ্র	৫০৮
গাঁজার দম		কস্যচিৎ নিউরোটিকস্য	.৩৫
গোপন প্রেম		. ...	১৭৭
গঙ্গাতটে		দিশেহারা	১৫৫
গোপন		শ্রীনরেশ	৫৬
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম	শ্রীযুক্ত	সুরেন্দ্রনাথ দাস	১৪৭, ২৬৪, ৪৬৬
চলা	,,	সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,	৩১৭
চূড়ালার উপাখ্যান	,,	রামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী কাব্যতীর্থ	৯৫*
চপটপঞ্জরিকা স্তোত্রম্	,,	হৃদয়নাথ মিশ্র	৩৫৩
জীবনসর্ব্বস্ব	,,	নরেশভূষণ দত্ত	৪৯
শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী	,,	কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯৭
তাহারই তাহারই	,,	প্রসন্নকুমার দাস ভক্তিবিনোদ বি, এ,	৩০৫
তীর্থভ্রমণ	,,	পান্নালাল সিংহ	৭৫
তৃপ্তি ও অতৃপ্তি	,,	প্রকাশচন্দ্র প্রধান	৮৪*
দাসত্ব কি প্রভুত্ব	,,	রজনীকান্ত ঘটক চৌধুরী	৪১৭
দিনান্তে	,,	নলিনীনাথ দাস গুপ্ত, এম্, এ, বি, এল্	৪১৭
দূরে ও নিকটে	,,	শশধর মৈত্র বি, এ,	৩৪৬
দৃশ্য		শ্রী—ন—	১৯৭
দুঃখের আত্মকাহিনী	,,	সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩৬৬
দিগম্বরী	,,	কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫২
নমস্কার		শান্তি	১৫৫
নিরাশ	,,	হৃদয়নাথ মিশ্র	৩১
নবমী	,,	সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৫৩
নিবেদন	,,	ভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল	৩৭৬

এই চিহ্নিত পত্রাঙ্কগুলি দুইবার মুদ্রিত হইয়াছে। পং সং।

বিষয়		লেখকগণ	পত্রাঙ্ক।

এই চিহ্নিত পত্রাঙ্কগুলি দুইবার ছাপা হইয়াছে। পং সং।

* এই চিহ্নিত পত্রাঙ্কগুলি দুইবার মুদ্রিত হইয়াছে।

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৫ম ভাগ।] বৈশাখ; ১৩২৩। [১ম সংখ্যা

আমাদের বিংশ বর্ষ।

আমরা পন্থার এই বিংশ বর্ষে পদার্পণের প্রারম্ভে সমস্ত প্রভাবটীকে শ্রীভগবানের প্রীতি কামনায় তাঁহার ঋষিগণসেবিত পাদপদ্মে অর্পণ করিতে ব্যাকুল হইয়াছি। তবে জানি না এ ক্ষুদ্র উপহার তাঁহাতে পৌঁছিতে পারিবে কি না। হরিঃ ওঁ তৎসৎ॥

প্রথমেই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে এবার গতবৎসরের কর্ম্মফল কেন ভগবচ্চরণে অর্পিত হইল না? কর্ম্মফল অর্পণ করিতে যাইয়া বড় জ্বালায় পড়িয়াছি। যাহার সাত সাতটা কারক যাহাতে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ ও অধিকরণ জ্ঞানের এত প্রাবল্য তাহাকে কি করিয়া যে শ্রীভগবানে অর্পণ করিতে পারা যায় তাহা বোধগম্য করাও দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয়। ভক্ত, কর্ত্তৃকরণাদি ত্যাগ করিতে পারিলেও সম্বন্ধ টুকু ত্যাগ করিতে চাহেন না। সত্য বটে, প্রত্যেক কারকেই শ্রীভগবানের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব অনুভূত হইলেই তাহাতে কর্ম্ম অর্পণ করা যাইতে পারে, কিন্তু কলির জীব আমাদের পক্ষে, পথটা কত সুগম তাহা জানি না। কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি কর্ম্মবুদ্ধি প্রভৃতিকে স্থির অচঞ্চল চিদানন্দঘন ভগবানে বিসর্জ্জন করা ত' বড় সহজ নহে;

দারাপুত্রাদি সকলে তাঁহারই লীলা দেখিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু উহা ইচ্ছামাত্রই রহিয়া গেল আপনার পুত্রটীকে কেন অন্যান্য জীব হইতে বিশেষ করিয়া দেখিয়া ফেলি? এবং তাহার উপর একটু কর্ত্তৃত্বের খেলা রাখিতে ইচ্ছা করে।

না বাপু, জ্ঞানী ট্যানী, তোমরা হয়ত একার্য্য পারিলেও পারিতে পার, আমার মনে হয় সমুদ্রের ঢেউ গণা, আর প্রত্যেক কণের ভিতরে যাইয়া তাহার সাত সাতটা কারককে ভগবানে মিশাইবার চেষ্টা একই প্রকার। আমাদের যে সে বুদ্ধিই জন্মায় নাই! তারপর যদিও বুদ্ধিটা একটু নির্ম্মল হইল কিন্তু অর্পণ করিতে গেলেই অমনি একটা ক্রিয়ার কর্ত্তারূপে মস্ত একটা অহঙ্কার জেগে উঠে, কর্ম্ম করিতে গেলেই বস্তু, জ্ঞান প্রভৃতি সংস্কারগুলি আসিয়া বুদ্ধিকে কবলিত করে, বেচারা বুদ্ধি বেগতিক দেখিয়া বিমাতৃ-সন্তান অবুদ্ধিতে পরিণত হইয়া যায়। তাই, অনেক দুঃখে বলি যে আমাদের মত লোকের দ্বারা বুঝি অর্পণ হইল না। মাতৃশ্রাদ্ধের সময় ভগবৎপ্রেমে ভাবিত হইয়া কোনও রকমে শ্রাদ্ধ কর্ম্মটা করা গেল কিন্তু যেই একজন বন্ধু বলিলেন "ওহে শ্রাদ্ধ বেশ সুসম্পন্ন হইয়াছে, তোমার সাধ্যাতিরিক্ত ভাবেই কার্য্য করিয়াছ।" "তা' ভাই ও—ও ভগবানেরই ইচ্ছা। বলিলাম বটে কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই "তা তিনি পুণ্যবতী ছিলেন এরূপ ত' হইবেই' তখন আর ভাবিতে পারিলাম না যে পুণ্যাত্মা হইলেই ঐ কার্য্যটী সাধিত হইবার ভাবটীতে ভগবানের অদ্বিতীয়ত্বে হানি হয় ও উহা ভগবানে অর্পিত হইতে পারে না। তার পর আরো বিপদ্। বন্ধুবরের কথাটী বড়ই স্বাদু, রুচিকর বলিয়া মনে হইল। একটু আত্মপ্রীতিও যেন জন্মাইল এবং বন্ধুবরকেও একটু বেশী ভালবাসিয়া ফেলিলাম, তারপর বাহিরে আসিয়া দেখি যে ভাটেরা মহা গালাগালি দিতেছে, তখন একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া পুলিশ ডাকিতে লোক প্রেরণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর একটা কথায়ও বোধ হয় এই ব্যাপারটী পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। পন্থার অনিয়মিত প্রকাশে ম্যানেজার মহাশয় ত' নিতান্ত দুঃখিত আছেনই—সত্য, এবং যুক্তিযুক্ত কৈফিয়ত প্রদানেও বোধ হয় সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু কৈফিয়ত দেই কেন? যদি ভগবানের ইচ্ছায়ই সব হয় তাহা বুঝি না কেন? ধর্ম্মপ্রাণ পাঠকগণই বা বুঝেন না কেন? আসল কথাটা ভাই, বলি শোন—নিজের জীবনে ও পন্থাজীবনে আর কারকগুলির দিকে পৃথক্ দৃষ্টি

রাখিতে প্রাণটা চাহে না। 'পন্থা' ভায়া হয়ত লাল হয়ে বলিবেন "তা হলে কি ব্যবসায় চলে!" আবার মনে হয়, যে সকল পাঠক-হৃদয়ে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির প্রকাশ হইয়াছে, যাঁহারা ক্ষুদ্র বস্তুগুলির রং-ঢং লইয়া আর দেখিতে চাহেন না, যাঁহাদের প্রাণে এই পিপাসা জাগিয়াছে যে কিসে শ্রীভগবানে এই বৃত্তিনিচয়ের অবসান হয়,—বোধ হয় তাঁহারা অন্য ভাবে বুঝিবেন।

বিংশতিবৎসরে পন্থা যে কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইয়াছে তাহার পরিনিরীক্ষণ করিলে হৃদয় কাঁপিতে থাকে ও মানবের কর্তৃত্বের উপর সন্দিহান হইতে হয়। রামপ্রসাদ গাহিয়া ছিলেন—

ছিলেম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি করিবি কেলে সর্ব্বনাশি!
(না হয়) দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মেগে খাব
মা মলে কি ছেলে বাঁচে না?—

আমরাও গৃহবাসী ছিলাম, হিন্দুর ভাবে, হিন্দুর প্রাণে, হিন্দুর কর্ম্মে, হিন্দু হইতে চাহিতাম। ব্রহ্মণ্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের এতদিনের সভ্যতা ও শিক্ষা চলিয়া আসিতেছিল। সত্য করিয়া বলিতে পারি যে আমরা বাস্তবিকই ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্ম ও জাতীয়জীবন গঠন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। অহঙ্কার ও ভেদবুদ্ধির কুহকে পড়িয়া না জানি কি প্রকারে এই সনাতন চিরন্তন ও স্বাভাবিক ধর্ম্মের ক্ষেত্রে ভ্রান্তি আসিল; ভগবানকে তদীয় শরীরীভূত জীবকুল হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিয়া ফেলিলাম। সকলই আত্মা, সর্ব্বজীবই তাঁহার বিকাশক্ষেত্র, এই কথাটীর মর্ম্ম ভুলিয়া যাইয়া ভগবানকেও ভেদভাবে গড়িয়া ফেলিলাম। কাজেই অন্তরে ধ্যান ধারণার ভেদাত্মক আমির প্রভাব ও বাহিরে কর্ম্মবহুলতা আসিয়া পড়িল। ভক্তও চিনি খাইতে চাহিলেন, জ্ঞানী অহংব্রহ্মাস্মি বলিয়া ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের মহিমা পরিস্থাপনে ব্যাপৃত হইলেন, অখণ্ডচিদৈকরস ভগবানও সাম্প্রদায়িকগণের প্রেমে পড়িয়া যেন ক্ষুদ্র ও পৃথক্ ভাবে আপনাকে ব্যবস্থিত করিয়াদিলেন। ভাব ছিন্ন হইল। কর্ম্ম ও তাহার অঙ্গনিচয়ই প্রধানরূপে পরিগণিত হইল। মনে হইল বুঝি শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও ক্রম একটু চ্যুত হইলেই সব পণ্ড হইয়া যাইবে।

একটা দৃষ্টান্ত হইলে বোধ হয় কথাটা পাঠকগণের আরও হৃদয়ঙ্গম হইবে। সেদিন জনৈক ভক্তগৃহে শ্রীশ্রীকালীপূজা-উপলক্ষে উপস্থিত ছিলাম। ভূতশুদ্ধি, প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি তত্ত্বের অনুশীলনে পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম যে কি আশ্চর্য্য কৌশলে সনাতন ধর্ম্ম ভগবানকে বাঁধিয়া আনিয়া যেন মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করত অর্চ্চনা করিতে পারে। স্থূল ভাবে তাঁহাকে না আনিলে আত্মজ্ঞানবিমুখ স্থূলাভিমানী জীবগণের সবিশেষ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না বলিয়াই শাস্ত্রের এই কৌশল।

কালের প্রবাহে অহঙ্কারের বিশেষ ভাবের অভ্যুদয়ে শাস্ত্রোক্ত কৌশল সমূহ কেবল কৌশলেই পরিণত হইল। শাস্ত্রোক্ত কৌশলনিচয়ের স্বরূপ কি, ও উহার ভিতরে অহঙ্কারের কতটুকু স্থান আছে তাহা দেখা যাউক। শাস্ত্র বলিলেন—"সাধক যথারীতি আসনে উপবেশন করিয়া আপনার হৃদয়-পুণ্ডরীকে দীপশিখাকার জীবকে চিন্তা করিবেন, এবং সহস্রারস্থ অধোমুখাবস্থিত শিবতত্ত্বে জীবের সংযোগ করত পুনরায় শরীরে নামিয়া তত্ত্ব সমুদয়কে একে একে বিলীন করিতে হইবে।" শাস্ত্রোপদেশের ভিতরে তিনটী স্তর দৃষ্ট হইতেছে। সে বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিবার সময় আজ নহে; তবে বোধের আশ্রয়ের জন্য মূল কথাগুলি জানা আবশ্যক। প্রথম উপদেশ এই যে দেহের ভিতরে দেহ মন প্রভৃতিকে ইন্ধন করিয়া একটী স্বয়ং জ্যোতি ও পর চৈতন্য আছে, তাহাই আমাদের "আমি"। দীপ-শিখার ন্যায় সদা ঊর্দ্ধগামী, স্বপ্রকাশ অথচ আমাদের হৃদয়স্থিত ক্ষুদ্র আমি-ও-আমার বুদ্ধিকে ভস্ম করিয়া যে তত্ত্ব প্রকাশিত তাহাই 'আমি"। দেহ প্রভৃতি ভস্ম হইয়া এই "আমিকে" প্রকাশ করিতেই নিরত; সুখ দুঃখ আশা কামনা প্রভৃতিকেও এইরূপ ইন্ধন বুঝিতে হইবে, ইহাই গীতার স্থিতপ্রজ্ঞতত্ত্ব; তারপর এই আমিটীকে আর একটী মহত্তর অথচ বিশ্বতোমুখ এবং সর্ব্বাত্মক তত্ত্বের সহিত মিশাইতে হইবে। আত্মাকে সর্ব্বার্থতার সহিত সমরসে মিলাইতে হইবে; তবেই সেই অদ্বয় একত্বে এই দুই মহাভাবের সম্মিলনে তত্ত্বনিচয় লীন করিতে পারা যায়। সুতরাং বুঝা গেল যে, শাস্ত্রোপদেশের মূল ভাবটী ছোট আমিটীকে ভগবানের ও তাঁহার সর্ব্বাত্মক ভাবের সহিত মিশাইয়া দেওয়া। কৌশলটীতে ভেদাত্মক আমির কোনও স্থান নাই; ভেদাত্মক আমিটীকে পরাভাবে উন্নয়ন করাই ইহার উদ্দেশ্য।

কিন্তু কালক্রমে ভূতশুদ্ধির মধ্যেও অহঙ্কারের স্থাপনা হইয়া গেল। সাধক ভাবিল কার্য্যটী বুঝি কেবল আমার আমির জন্যই। উহা যে সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বজীবে স্ফুরিত হইতে পারে,—উহাতে যে আমাদের আমির কোনও কৃতিত্ব নাই তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। ফলে ছোট সাম্প্রদায়িক ভাব ও সাধনার কর্ম্মবহুল বুদ্ধিরই উন্মেষ হয়। সাধক ভুলিয়া গেল যে ছোট আমিটিকে লইয়া আমরা যতক্ষণ থাকিব ততক্ষণ যে পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ হইতে পারে না। দুইটী আমিকে মিশাইতে হইলে ছোটটা বড়র মধ্যে নিঃশেষে ডুবিয়া যাইবে, চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে না। অপর পক্ষে যদি সেই বড় আমির প্রকাশ হয় তাহা হইলে এই অমূল্য কৌশলানুষ্ঠানেরও আর আবশ্যক থাকে না। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত পূজা-দিবসে এই তত্ত্বটী বুঝিতে পারা গেল। আগে মনে হইত যে ভগবান্ সর্ব্বাত্মক হইলেও তাঁহার প্রকাশের জন্য জীবের পক্ষে ক্রিয়ার প্রয়োজন ও অবসর আছে; মনে হইত যে শ্রেষ্ঠ ভগবৎপ্রেমিক সাধকগণের উপস্থিতি সংঘটিত হইলেই বুঝি উপাস্য দেবের আবির্ভাব হইবে। এই সাধনাজ্ঞান, এই শাস্ত্রমার্গবুদ্ধিও যে কিরূপে আমাদিগের মলিন ক্ষেত্রে পতিত হইয়া ভগবানের স্বাতন্ত্র্য ও সর্ব্বাত্মতার হানি করে তাহা আগে জানিতাম না। কিন্তু সেদিন যখন সেই মূর্খ অপরিষ্কৃত-চিত্ত পুরোহিতকে ভূতশুদ্ধির মন্ত্রমালা কেবলমাত্র উচ্চারণ করিতে দেখিলাম, সেদিন মনে ভয় হইল, বুঝিবা ভূতশুদ্ধির অভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে না ও জগন্মাতার আবির্ভাব হইবে না। কিন্তু ফল অন্য প্রকার হইল। দেখিলাম ভূতশুদ্ধি-মন্ত্র শেষ হইবার পূর্ব্বেই, প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রের অপেক্ষা না করিয়াও, জননী অবতীর্ণ হইলেন।

মনে হয় জগন্নাথ-চক্রের আবির্ভাবে এই তত্ত্বই জীবকে শিক্ষা দেওয়া হইবে। হিন্দুকেও বুঝিতে হইবে যে শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি জীবের মঙ্গলের জন্য, উহাতে শ্রীভগবানের স্বাতন্ত্র্যের ও প্রকাশের কোনও প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। নিয়ম, শৃঙ্খলা, ধর্ম্ম বা অব্যয়ীভাব পর্য্যন্ত সকলই আমাদের ছোট আমির জন্য। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ইহাদের কোনও প্রভাব নাই বা থাকিতে পারে না। শাস্ত্রের কৌশল সমূহও বোধ হয় সেই জন্যই উপদিষ্ট। ক্ষুদ্র সাধক ক্ষুদ্র আত্মজ্ঞান লইয়া স্থূল শরীরে অঙ্গুলী বিন্যাসাদি দ্বারা ন্যাস করিলেন, কতকগুলি

বিশিষ্ট মন্ত্রের প্রয়োগ করিলেন, বিশিষ্ট বলিলাম কেন? 'রং ইতি বহ্নি বীজং' না বলিয়া যদি ভুলে তুমি 'অং' বলিতে তাহা হইলে অমনি মনে হইত বুঝি সর্ব্ব-কর্ম্ম পণ্ড হইল, বুঝি যাঁহার পূজা তিনিও এই ভুলটুকু শোধরাইয়া প্রকাশিত হইতে পারিবেন না। অথচ শাস্ত্র একথা উপদেশ দেন না, তাহা হইলে "যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ পূর্ণস্তবতু তৎসর্ব্বং তৎপ্রসাদাৎ জনার্দ্দন"। পাঠান্তরে "যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং জানতা বাপ্যজানতা" কথা আছে, একথা বলিলেন কেন? তাই বলি যে, পরিপূর্ণতা ত' সেই পরম তত্ত্বেরই হাতে! তিনিই যে এক মাত্র ফলপ্রদাতা! তাঁহার একতা ভুলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াই দেখ সনাতনধর্ম্মের জীবন্ত স্রোতটী সাম্প্রদায়িকতার চড়াভূমি সমূহের উৎপাদনপূর্ব্বক ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ইহাকেই যুগধর্ম্ম বলে। ভাগবতে রাজা পরীক্ষিত কলিকে নিগ্রহ করিয়াছিলেন মাত্র তাহাতে ত' কলির প্রতাপ অবসান হয় নাই! জগতের সর্ব্বত্রই এই ভেদাত্মক কলির প্রতাপ বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

এস, একবার ইউরোপখণ্ডের দিকে কলির প্রতাপ বিষয়ে দৃষ্টি করা যাউক। ইয়োরোপীয় চিত্তে ভগবৎপ্রেমের বিকাশ ততটা স্বাভাবিক নহে। কারণ ইয়োরোপীয় প্রাণ এখনও মনস্তত্ত্বে পর্য্যবসিত, তাই ইউরোপের ও জগতের মঙ্গলের জন্য ভগবান্ জড় বিজ্ঞানের স্রোত ইয়োরোপের ভিতর দিয়া প্রবাহিত করিলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সার্ব্বজনীন ভাবে পরিস্থাপিত। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি যে, সকল জীবের পক্ষেই প্রযুজ্য ও তুল্য ফলপ্রদ। বিজ্ঞানের জন্মদাতা শ্রেষ্ঠ ও ঋষিতুল্য ধীমানগণ সর্ব্বজীবের মঙ্গলের জন্য এই পথের আবিষ্কার করিলেন। উহাতে হিন্দু মুসলমান নাই, সাদা কালো নাই, সর্ব্বজীবের কল্যাণই একমাত্র আদর্শ। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই বিজ্ঞানে ভগবান্ নাই বটে কিন্তু এই বিজ্ঞান দ্বারা ভগবানের সর্ব্বাত্মতা প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র গঠিত হইতে পারে। এই বৈজ্ঞানিক ভাবে ভাবিত হইলে ক্ষুদ্র ভেদজ্ঞান পড়িয়া যায়, তাই হাউয়ার্ড (Howerd) উইলবার ফোর্স (Wilberforce) প্রভৃতি মহাজনগণ ক্রীতদাস-প্রথা অপনোদন প্রভৃতি কার্য্যে সার্ব্বজনীনত্ব বুদ্ধির নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কলির প্রতাপে আজ দেখ সেই বিজ্ঞানের সার্ব্বজনীন ভাব কি প্রকারে মানবের

ধ্বংসে প্রয়োজিত হইতেছে। জর্ম্মণ জাতির চিত্তের গুহ্য ইতিহাস যখন জগতে প্রকাশিত হইবে, তখন মানব দেখিতে পাইবে যে সার্ব্বজনীনত্ব আর জয়ণীর আদর্শ নহে। যেই জর্ম্মণ জাতি দার্শনিক ক্যাণ্ট, ফিক্টে ও হেগেলের ভিতর দিয়া জগতের সমগ্র মানবের একত্ব ও উন্নতি ঘোষণা করিয়াছিল, তাহাদেরই সন্তানগণ বৈজ্ঞানিক শক্তিসমূহকে আন্তর্জাতিক সমরে মানবধ্বংসে প্রযুক্ত করিবার জন্য প্রায় বিগত অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ প্রস্তুত হইতেছে। ইউরোপের সমরানলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ক্ষুদ্রতা পরীক্ষিত হইতেছে, যে বিজ্ঞানে সাক্ষাৎ ভগবানের স্থান নাই তাহা সার্ব্বজনীন হইলেও যে আসুরিক হইতে পারে ইহাই আমাদের পক্ষে এই মহাসমরের একমাত্র শিক্ষা। এত নিয়ম ও শৃঙ্খলার আবিষ্ক্রিয়া স্বত্ত্বে নানাভাবে নানারূপে একত্বের নিদর্শন পাইয়াও সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য জগৎ কি নিমিত্ত ক্ষুদ্র ভেদবুদ্ধির মোহে সমগ্র জগতের অহিত সাধনে তৎপর হইল, বলিতে পার? এখনই দেখ যুদ্ধের অবসান হইতে না হইতেই (German Methods) জর্ম্মণভাবে বিজ্ঞান শাস্ত্রের ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিয়োগ কত শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপক্ষ জাতিগণের মধ্যেও গৃহীত হইতেছে। তাই ভয় হয় যে, যে জাতি জগতের ইতিহাসে দাসপ্রথা প্রভৃতি মানবজাতির অহিতকর শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক অকাতরে অজস্র অর্থ ত্যাগ করত একত্বের শক্তি স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও পাছে আসুরিকভাবে দুষ্ট হইয়া পড়েন! তাই বলিতেছি, আমরা ধর্ম্ম ও বাহ্য জগতের এমন এক সন্ধিস্থলে উপনীত হইয়াছি যে সংযতচিত্ত ও প্রকৃত লক্ষ্যের প্রতি নিনিমেষ না হইতে পারিলে প্রকৃত ভগবদ্ধর্ম্মের বীজ রক্ষণ বড়ই কঠিন হইয়া উঠিবে বলিয়া বোধ হয়।

আমাদিগের দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় বুঝি বা সনাতন ধর্ম্মের একত্ব আমাদিগের হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে। হিন্দু সমাজে আর পূর্ব্বের মত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতি আস্থা নাই; অবয়বের মধ্যে যেরূপ সত্ত্বগুণাত্মক মস্তিষ্ক হইতে কেশ নখরেরও স্থান ও কার্য্য থাকে সেইরূপ সনাতন ধর্ম্মের অবয়বী ভাবেও চাতুর্ব্বর্ণের স্থান ও কার্য্য আছে। মস্তিষ্ক শ্রেষ্ঠ হইলেও যেমন অপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাদ দিলে চলিতে পারে না, সেইরূপ প্রকৃত ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষ জাত্যভিমানের প্রাপ্য নহে, সমগ্র জাতীয় অবয়বের

কার্য্যসিদ্ধির জন্যই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব। ক্ষত্রিয় ক্রিয়াগুণের অভিব্যক্তি বলিয়া তাহার স্বক্ষেত্রে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব আছে; সে না থাকিলে ভাবসমূহ সার্ব্বজনীন ক্রিয়ারূপে ফুটিতে পারে না। শূদ্রের ধর্ম্ম সেবা—দাসত্ব নহে। আচার্য্য সেবা শব্দের অর্থে বলিয়াছেন "স ইব সমস্তাৎ" সেই ভগবানই যে সব এই জ্ঞানটী হৃদয়ঙ্গম করার নামই সেবা. সুতরাং শূদ্রের সেবাধর্ম্ম যথার্থরূপে ফুটিলে আজ বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণও আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন। কেহই ছোট কেহই বড় নহে। সকলেরই কার্য্য সনাতন ধর্ম্মের অবয়বের পরিপুষ্টি। এই ভাবটী হৃদয়ঙ্গম করিলেই স্থান ও মর্য্যাদার জন্য আর জাতিনিচয়ের মধ্যে কোনও বিবাদ বিসম্বাদ থাকে না। কিন্তু দেখ, একদিকে কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্বের জন্য প্রয়াস ও বৈশ্যগণকে নিম্নতর বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রবৃত্তি, অপরদিকে যুগীগণের 'যোগী' ভাবের জন্য প্রয়াস; নমঃশূদ্রগণের চেষ্টা। ছোট ছোট বর্ণনিচয় বিভাগগুলি অবয়বী ভাবের একত্ব ভুলিয়া গিয়া সনাতন ধর্ম্মের হানি করিয়া স্ব স্ব মর্য্যাদার নিমিত্ত কিরূপে বিবাদরত তাহা দেখিলে বাস্তবিকই মনে হয় বুঝি সনাতন ধর্ম্মের শক্তি ক্ষীণপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। চারিদিকে পাশ্চাত্যে ও প্রতীচ্যে সর্ব্বত্রই ভেদ বুদ্ধির অভ্যুদয় হইতেছে। ভগবানের অবয়বীভাব বা ধর্ম্মকে পদদলিত করিয়া জাতি, শাখা ও ব্যক্তিগণ স্বাতন্ত্র্য স্থাপনের প্রয়াস পাইতেছে। পাশ্চাত্য জগতে বিজ্ঞানের সার্ব্বজনীন বুদ্ধি নষ্টপ্রায়, আমাদের দেশে ধর্ম্মবুদ্ধি বা 'এই সবই যে একই ভগবানের অভিব্যক্তি ক্ষেত্র' এই জ্ঞানটী লোকের হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে; শাস্ত্রে ও শাস্ত্রব্যবসায়িগণমধ্যে একত্ববুদ্ধি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান ও ছিন্ন ভাবের মোহে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে যোগিগণ আর ততটা দ্রষ্টৃত্বের একত্ব ভাবে অবস্থিত না হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রক্রিয়া লইয়াই ব্যস্ত, 'নাম জপ' অর্থে এখন কেবল স্থূল শব্দের উচ্চারণ। মানব সর্ব্বত্রই ভগবানকে বে-মালুম হজম করিয়া কেমন সুন্দর ভাবে আপন মত ক্রিয়া ও সম্প্রদায় স্থাপনে ব্যাপৃত।

অঙ্ক কষিতে গেলে বিভিন্ন স্তরের (Steps) প্রয়োজন থাকিতে পারে, ভগবৎ ভাব জীব হৃদয়ে ফুটিতে গেলে অধিকারী ভেদে নানা প্রকার সার্ব্বজনীন নিয়মের আবশ্যকতা থাকিতে পারে; কিন্তু বালক অঙ্ক কষিতে যাইয়া যদি একটী মাত্র স্তরেই মজিয়া যায়, যদি শেষ সমাধান ব্যাপার ভুলিয়া যাইয়া বিশিষ্ট

কশরৎ লইয়াই ব্যাপৃত থাকে, আমরা তাহাকে ভ্রান্ত বলি। কিন্তু হে মানব! আজ দেখ তুমি সেইরূপ শিশুর ভাবে স্ব স্ব জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মগত বিশেষ স্থান ও মর্য্যাদার মোহে কি প্রকারে ডুবিয়া যাইতেছ? পৃথগ্দর্শী হইয়া ক্ষুদ্র অংশের মোহে ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, যোগ প্রভৃতির ক্ষেত্রে কি প্রকারে সেই মহান্ একত্বের অপলাপ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ?

এই ছিন্ন প্রবৃত্তির খেলা কি প্রকারে বন্ধ হইবে? সমগ্র মানব জাতি যেন এতদিন ধরিয়া একে একে বিশিষ্ট উপায়সমূহকে পরীক্ষিত করিয়া লইতেছিল, আমরা ধর্ম্ম বা অবয়বী ভাবে ব্যবহৃত হইয়াও আজ দেখিতে পাইতেছি যে, ভগবৎ ধর্ম্ম ব্যতিরেকে অন্য কোনও ধর্ম্মে শ্রেয়ঃ নাই। গ্রীসের সভ্যতা, রূপময়ের সৌন্দর্য্য ভাবে আকৃষ্ট হইয়াও ভেদবুদ্ধি ও বিশিষ্টতার মোহে কতকগুলি সুন্দর মানব মূর্ত্তি গঠন করত ধ্বংসের কবলে কবলিত হইয়াছে; রোমের সভ্যতা সার্ব্বজনীন নিয়মবুদ্ধিতে স্থাপিত হইয়া অবশেষে শ্রীভগবানের পরাভাববিমুখ হইয়া বুদ্বুদের মত কালসাগরে লীন হইয়া গিয়াছে; আজ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সার্ব্বজনীন মহাভাবটীও সর্ব্বাত্মিকতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না বলিয়া প্রচণ্ড সমরানলে পরীক্ষিত হইতেছে।

পুরুষোত্তম বা শ্রীজগন্নাথ-চক্রের মূল ভাবটি কি? আবার ধর্ম্ম, বিজ্ঞা ও যোগ এই সকলগুলিই মানবকে কালবিশেষে এক একটী স্তরে উন্নীত করিতে পারে। ভগবত্তত্ত্ববর্জ্জিত হইয়াও ইহাদের দ্বারা মানবের ঐহিক মঙ্গল সাময়িক সাধিত হইতে পারে বটে কিন্তু সেই উন্নতির প্রতিষ্ঠা নাই। প্রকৃতির ক্ষেত্রে নিয়তই বিশেষ হইতে অবিশেষ ও অবিশেষ হইতে বিশেষের খেলা চলিয়া আসিতেছে। পুরুষ ভাববর্জ্জিত হইয়া ত্রিবর্গের বিশেষ ভাব বা ফল আবার অবিশেষ বা সামান্য রূপে মিশিয়া যাইবে। ব্যক্তি ও জাতিগণও একবার বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আবার সামান্য ভাবে মিশিয়া যাইবে। সেই জন্যই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক বিশেষ ভাব লইয়া যাইতে পারা যায় না। তাই আজও শ্রীজগন্নাথ দেবের ক্ষেত্রে আচার ও নিষ্ঠার দ্বারা পরিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও হিন্দু বিধবাগণকে বিশিষ্ট অথচ ভেদাত্মক সংস্কারসমূহ পরিত্যাগ করিতে হয়। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের নিয়ম এই যে পুরুষভাব বর্জ্জিত প্রাকৃতিক শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর ভাবগুলিও হেয়বুদ্ধিতে অকাতরে তাঁহার জন্য ত্যাগ করিতে হইবে। ধর্ম্ম, নিয়ম,

বিজ্ঞান, অনুষ্ঠান, আচার যতই মঙ্গলজনক হউক না কেন, যদি তাহা দ্বারা ভেদ বিশিষ্ট বুদ্ধি পুরুষোত্তমে অবসান না হয়, যদি তাহা দ্বারা সেই নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টা স্বরূপ—সারথী স্বরূপ ভগবানে অবস্থিতি না ঘটে তাহা হইলে উহাতে "শ্রম এব হি কেবলম্"। মুগ্ধজীবকে এই পরাভাবে আনিতে হইলে তাহার বাহ্য সর্ব্বের নাশ করিতে হয়, তাই বুঝি আজ জগদ্ব্যাপী ক্ষুদ্রভাবসমূহের নাশ সংঘটিত হইতেছে? পুরাতন ভাব ও আদর্শনিচয় ভগবদ্ভাব বর্জ্জিত হওয়াতে জীবনহীন দেহের ন্যায় পরিত্যাগযোগ্য ইহা বুঝাইবার নিমিত্তই যেন চতুর্দ্দিকে এই সকল ঘটনার প্রারম্ভ হইয়াছে। কলির প্রতাপে ভেদবুদ্ধি ঘনীভূত হইবার উপক্রম; তাই করুণাময় সর্ব্বগুহাশয় কলিকল্পবিহারী স্বীয় অংশসমূহকে পুরাতন ভাববিপর্য্যায়রূপ কষাঘাতে একবার জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদিগকে যে আরো বিশেষ ভাবে নামিতে হইবে ইহাইত কলির যুগধর্ম্ম। কিন্তু যদি আজ আমরা শ্রীভগবানের ইঙ্গিতটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি তবেইত সেই ঘোরান্ধকারে, জীবাকাশে প্রজ্বলিত আকাশপ্রদীপের দ্বারা, পথভ্রান্ত পথিক ছোট ভ্রাতাদিগকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতে পারিব। বিশেষ ভাবের খেলার দিন নাই, বিশেষ অবতারের প্রয়োজন নাই,—কারণ আমাদের মোহ ত এই বিশেষের প্রতিষ্ঠার মধ্যেই অবস্থিত! সর্ব্বজীবে সমভাবে তাঁহাকে দেখা বা "জীবে দয়া" সর্ব্বপ্রকার ব্যক্ত প্রকাশভাব বা নামের মধ্যে তাঁহারই স্বাদাভিলাষ বা "নামে রুচি", আর সর্ব্বভাবের খেলা হইতে বিরত, সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানে অবস্থিত মহাজন ও ব্যাপ্তি বা বিষ্ণুভাবে অবস্থিত বৈষ্ণবগণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের ক্ষুদ্রভাবগুলিকে প্রয়োগ বা "সেবাই" কলির ধর্ম্ম। মহাজনগণ ইঙ্গিত মাত্র;—ভগবানের আড় নয়নের অভিব্যক্তি। তাঁহাদের ভিতরে ব্যক্ত মানবভাব ও ভগবদ্ভাবের ঘন সম্মিলন হইয়া আছে। তাঁহারা পুণ্ডরীকের মত ক্ষুদ্র জীব ভাবের পঙ্কে উদ্ভূত হইয়া নরের আশ্রয়রূপ জলের ভিতর দিয়া তাহাদের আমির মৃণালবৃন্তটী প্রকৃতির পরপারে যাইয়া আর আমি নাই, ঐ দেখ আকাশস্থ, নির্ম্মল, নিষ্কল, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ভগবানের পাদপদ্মের উপহার স্বরূপ পদ্মরূপে প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। তাহাদিগের একদিকে মুগ্ধ জীবের ক্ষুদ্র অহং ও অপর দিকে জীবতত্ত্বের প্রশস্ত পরিণতি সোঽহং পদ্ম। তাঁহারা একবাক্যে, এক দিকে ক্ষুদ্র জীবের ভগবৎ পদ প্রাপ্তি অপর দিকে ভগবানের সহিত পঙ্কিল জীবকুলের সম্বন্ধ ও একত্ব

পরিজ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহাদিগের আদর্শ বিস্মৃত হইলে হে জীব তুমি আপনার পরাভাবের কথাটী ভুলিয়া যাইলেও, তোমার ধর্ম্ম, কর্ম্ম সু-অনুষ্ঠিত হইলেও তুমি প্রাকৃতিক মোহ অতিক্রম করিতে পারিবে না, অতএব—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

মা, বৈকুণ্ঠস্বরূপিণী বিগতকুণ্ঠা বিমলে, মা তুমি আমাদের চৈতন্যস্বরূপিণী হইয়া যে শুদ্ধা অপ্রাকৃত শ্রীভগবানের হৃদয়রঙ্গিণী চৈতন্যস্বরূপা! তাই বুঝি অবিদ্যার ক্ষেত্রের সিদ্ধি ও অলঙ্কারাদি তোমার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে পায় না! তুমি কৃপা না করিলে সর্ব্বাত্মিকা হইয়া না খেলিলে কিরূপে, ক্ষুদ্রজীব আমরা পুরুষোত্তমের ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া সকলই বৃথা বলিয়া বুঝিতে পারিব? ও বুঝিব যে—পুরুষায় পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ—

তাই আজ কাতর প্রাণে তোমাকে ডাকিতেছি মা, মানব জীবনের এই মহান্ সন্ধিস্থান উদ্ভাষিত হইয়া শ্রীভগবদ্ধর্ম্মের বীজটী রক্ষা কর; আমরা না বলিলেও তুমি তা করিবে জানি, তবে ব্যক্ত মাত্রেরই ভাষা আছে, ব্যক্ত ভাবে আছি বলিয়া না বলিয়া থাকিতে পারি না। শ্রীভগবানই সব জানিয়াও ভয় হয় পাছে তাঁহার লীলাক্ষেত্র জীবকুল তাহা হইতে দূরে সরিয়া ভেদ ভাবের আবরণে আবৃত হইয়া পড়ে! এটাও মা ভ্রান্তি, তাও বুঝি; যাক অত গোলমালের আবশ্যক নাই, আমি না জানিলেও তুমিত জান মা কেন আজ এ কথা বল্‌ছি? "তন্নোধিয়ো প্রচোদয়াৎ"—ওঁ তৎসৎ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

—

সঙ্গীত।

(১)

কর তাঁর নাম গান।
পেমে প্রেমে আজি ভরিয়া লহ প্রাণ॥
নয়নে নয়নে দীপ্তি ঝলকে
হৃদয় ভরিয়া উঠিছে পুলকে
কে তুমি দাঁড়ায়ে আঁধারে আলোকে
নয়নে অমৃত সঙ্গীত তান॥

যা ছিল সকলি বাহিরে বাহিরে
হেরি তা নিভৃত অন্তর মাঝারে
আজ কেহ নাহি পর সবই আপনার
সবার প্রাণের সাথে মম মিলিছে প্রাণ।
রবি আলো করে, চন্দ্রে সুধা ক্ষরে,
সব প্রাণে প্রাণে অমৃত উগারে,
এ কি অক্ষয় প্রাণময় শাশ্বত সুধাম
বহিছে সব হৃদে একি প্রেমের বাণ।

(২)

আজ তোমায় চিনে যে ফেলেছি,
আঁধারে আলোকে সুখে দুঃখে শোকে
তোমায় ধরিয়া ফেলেছি॥
নয়নে ছিল যে আবরণ খানি
তুমি নিজ করে লয়েছ তা টানি
আজ আবরণহীন নয়নে এখনি
তোমায় দেখিয়া ফেলেছি।
কত দিন হতে সাধিয়াছি কত
তবু দেখি নাই চাহিয়াছি যত
আজ অভয় এ চিত ভক্তি প্রণত
তার মাঝে তোমায় দেখেছি॥
কথা কহ নাহ দাওনিক' সারা
তবু কতবার দিয়ে গেলে ধরা
প্রাণের মাঝে পশি—একি প্রাণভরা
চাহনি তোমার দেখিছি॥
ভ'রে গ্যাছে মন ভ'রে গ্যাছে প্রাণ
যা দেখি তা'তেই একি মহাধ্যান
সব বিভিন্নতা লভে একতান
তব মাঝে তা' যে বুঝেছি॥

রংমহাল।

বানিয়েছে পাঁচ ভূতে এই বাড়ী খান।
চারিদিকেতে জাফ্‌রি বেড়া, চৌদ্দ পোয়া পরিমাণ।
গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে বাড়ীর বানাই
গোল কামরা, খিলনো ছাদ, মাঝে হাওয়ার ঘাই,
(ভিতর) কোমল মখমলে মোড়া মনরে—
ছোটে সুধার ফোঁয়ারা অবিরাম॥
তিন তালাতে বাড়ীর পাতন ছয় কুঠরি তায়
নয় দুয়ারে আগম নিগম, আগুন হাওয়া যায়;
ঘরে) জলের কলের ময়লাব নলের মনরে—
কি সুন্দর সুসংস্থান!
ভিতর বাইরে তাড়িৎ তারের এমনি নিয়োজন,
ভবের। ভাবনা ভাবের ছাপ পরে যায় বিনা আয়োজন,
বাড়ী গ্রহ তারা ধরে টানে মনরে—
ষড় ঋতু বয় উজান॥
উপরে খিলানো গম্বুজ সাতটি ফোকর তার,
একাধারে সুধা গরল ফোঁয়ারা খেলায়,
গম্বুজ হেলে দুলে ঘোরে ফিরে মনরে—
(মাথায়) শ্যামা লতিকা বিতান।
অপূর্ব্ব অম্বুজ ভরা গম্বুজ ভিতর
(তার) মাঝে চতুর্ভুজ-মঞ্চ চিদানন্দ ঘর,
মেঝেয় রাজে রম্য আসন মনরে—
(ঘারে) ভোম্‌রা ভোমরি করে গান॥
দেবা বলে রংমহলে অঘটনের ঘটা,
বীজের ভিতর নদীর খেলা মণিকোঠায় আঁটা,
সঙ্গমে শেষের শয্যা মনরে—
(তাতে) ঘরের কর্ত্তা রয় শয়ান

দেবা।

শ্রীভাগবতের উপদেশ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কথা দুটী সহজ বলিয়া বোধ হইলেও উহার যথার্থ মর্ম্ম উপলব্ধি করা বড়ই দুরূহ। পরমাত্মা ভাবে এই পুরুষতত্ত্বও লক্ষিত হয়েন; তবে ঐ পুরুষ ঘন চিচ্ছক্তিকে আধার করিয়া প্রকাশিত হয়েন। পুরুষোত্তম ভগবানের আমিটী এত আশ্চর্য্যজনক যে স্বরূপাংশে সকল জীবে পুরুষরূপে তিনিই প্রকাশিত হইলেন,—একটী দীপ হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দীপমালা প্রকট হইল—অথচ দীপটী যেমন তেমনিই রহিল।

কেবল রশ্মি-শক্তি লইয়াই ছোট দীপসমূহের প্রকাশ। উহারা প্রতিবিম্ব বটে কিন্তু মূলের এমনি আশ্চয্য অলৌকিক ভাব যে দর্পণে প্রতিবিম্বিত দীপের ন্যায় কতকটা আলো দিতে পারে। প্রত্যেক জীবের ভিতর এই প্রতিবিম্বিত 'আমি' রহিয়াছে, আমিগুলি আপন আপন ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছে, বিশিষ্টভাবে স্ব স্ব আমির অভিব্যক্তি করিতেছে—অথচ ঐ দেখ প্রত্যেকের ভিতর এই অভি-ব্যক্তি যজ্ঞ-ফলটুকুর ভোক্তারূপে, নিয়ন্তারূপে শ্রীভগবানের আমটী স্পষ্ট বিরাজ-মান। যেমন আমাদের দেহে বিভিন্ন ভাবের অণুগুলি, ইন্দ্রিয়গুলি, আপন আপন ক্ষেত্রস্থ আমি জ্ঞান লইয়া কার্য্য করে এবং বাহির হইতে দেখিলে যেন মনে হয় ঐ সকল কার্য্যের ফল বুঝি তাহাদের আপন আপন আমিগুলিই ভোগ করিয়া লয়; কিন্তু সেই সকল ছোট আমিগুলির খেলা যেমন আমার আমিতেই লীন থাকে ও সেই খেলার ভিতর যে চিনিতে পারে, আবার আমিটীকেই দেখিতে পায়—সেই প্রকার ছোট ছোট আমি, দেব, পিতৃ মনুষ্যাদি জীবকুলকে তিনি ধারণ করিয়া আছেন বলিয়া মনে হয়; তাঁহারই কৃপায় জীবগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে ও মর্য্যাদায় রক্ষিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়। ইহার কারণ আমরা বিশেষ ভাবে আমিটীকে দেখিতে চাহি। আমরা মনে করি যে ঐ বিশিষ্ট জীবকুলের আমিরূপে প্রকাশিত হইয়া ভগবানের আমিটী বুঝি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, অন্ততঃ যেন তাঁহার আমিটীকে এই ছোট আমিসমূহ ধরিয়া ফেলিয়াছে।

তস্মা বিলসিতেষ্বেষু গুণেষু গুণবানিব।
অন্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজৃম্ভিতঃ॥ ভাগ ১।২।৩১।

অণুসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় আছে, উন্নতিও আছে, তেমনই মায়ার ক্ষেত্রে জীবকুলও যেন সৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে নিজ নিজ আমিটীকে সংরক্ষণ করিয়া উন্নতির পথে চলিতেছে বলিয়া মনে হয়। এত খেলা, এত উন্নতি, এত ক্রমোন্নতিবাদ, কতক্ষণ জান? যতক্ষণ তোমার চক্ষু এই ছোট আমিগুলির দিকে আছে।

যথাহ্যবহিতে বহ্নির্দাকিম্বেকঃ স্বযো'নষু।
নানেব ভাতি বিশ্বাত্মা ভূতেষু চ তথা পুমান্॥ ভাগ ১।২।৩২

চক্ষুর আমিটী রূপতত্ত্বের শরীরভাব লইয়া, কর্ণের আমিটী শব্দতত্ত্বের আধার-ভাব লইয়া বিশেষিত হইতেছে। এই আধারগুলি আমির ব্যঞ্জক। এই আধারের নানাত্বের দিকে দৃষ্টি থাকিলে ভগবানকেও নানা বলিয়া ভ্রম হয়। একই অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদি আধারের পার্থক্যবশতঃ বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েন, ইহাও তদ্রূপ। কিন্তু যখন ধর্ম্ম বা অবয়বী বুদ্ধির প্রকাশে এই ক্ষুদ্র অণুগুলিকে একটী বিশাল অবয়বের অনুগত বলিয়া বুঝিতে পারা যায় এবং সেই দেহের অবয়বীকে একটু জানিতে পারা যায়, তখন দেখা যায় যে সেই বড় জীবের আমিজ্ঞানে অবয়বী বুদ্ধিটী বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত অবয়বটাই এক বলিয়া জানা যায়। এবং তাহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র আমি-অণুগুলি এই বড় আমিতে পরিসমাপ্ত বলিয়া দেখা যায়। সেই অবয়বের যে অঙ্গ স্পর্শ কর না কেন, বড় আমির জ্ঞানটীই ফুটিবে। এত তপস্যা করিয়া ত্বকের অণুসমূহ যে আমিত্ববোধটী নির্ব্বিঘ্ন করিয়াছিল তাহা আর রাখিতে পারিল না; সমস্ত যজ্ঞফলটী বড় আমি খাইয়া ফেলিল। ভূতের মধ্যে মহেশ্বরের, যজ্ঞফলভোক্তী ভগবানের, এই 'মাখনচোরা' মূর্ত্তিটী লক্ষ্য করিয়াই গীতা বলিলেন—"ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্" ছোট ছোট আমিগুলি দেখ নিঃশেষে মিশিয়া যাইতেছে। শরীরে কোনও গ্লানি হইলে এই বড় আমি হইতে শক্তি আসিয়া সাম্যভাবের পুনঃ প্রতিষ্ঠা সাধিত হইতেছে। 'সমন্বেত্বেষ' শব্দে যখন সম্যক্ অন্বিতভাব বুঝ, তখন দেখিতে পাও যে কিরূপে অণুরূপী জীবগণ আপন আপন স্থানে, আপন আপন ভাবে বিন্যস্ত থাকিয়া সমস্বরে সেই সাম্য ঘোষণা

করিতেছে। আর যখন "সমং অন্বেতি" এইভাবে বুঝ, তখন দেখিতে পাও কি এক মহান্ আমির অনুগ্রহে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশিষ্ট-প্রায় আমিগুলি, একই সুরে একই ভাবে, শরীরের অবয়বীকে দেখাইয়া দিতেছে।

তারপর দে'খবে যে সেই আমিটি বাস্তবিক অবয়বে নাই—তিনি খেলার বস্তু নহে, প্রকাশের বস্তু নহে,—খেলা ও প্রকাশের অবসান স্থান "পুরুষ।" শরীরের এত আন্দোলন, এত তরঙ্গায়িত খেলাগুলির ভিতর তিনি অবসানামৃত রূপে স্থির ঘন হইয়া বসিয়া আছেন ; এ কথাটা আমরা সহজে বু'ঝিতে পারি না ; দেবতারাও বুঝিতে পারেন নাই। তাই যখন রাবণ আসিয়া এই বিরাট অবয়বে বিপর্য্যয় সংঘটন করিয়াছিল তখন দেবতাগণ, বিশ্বের মনস্তত্ত্ব ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া ভগবদ্ভক্তিতে একাগ্র হইয়া ক্ষীর বা ঘন অমৃতসাগরে উপশয়ান ভগবানের নিকট উপনীত হই'লেন। তখন তাঁহারাও আমাদের মত ভাবিয়াছিলেন বুঝি ভগবানও তাঁহার প্রকট অবয়বের আসন্ন বিপদাশঙ্কায় না জানি কতই উদ্বিগ্নভাবে জাগিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু যাইয়া দেখিলেন সেই পুরুষোত্তম স্বরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত সুতরাং জগদ্ভাবে সুষুপ্ত।

আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেও এইরূপে কখনও কখনও আমাদিগকে চমকাইতে হয়। সাংসারিক বিপৎপাতে যখন ভগবানকে ডাকিতে ইচ্ছা হয়, তখন আমরা মানিয়া লই যে ভগবানও যেন কত সক্রিয় ও জাগ্রতভাবে আমাদের বিপৎপাত দেখিতেছেন, কিন্তু যখন ধ্যান সিদ্ধ হয় ও ভগবৎপ্রসাদে তদীয় আলেখ্য দর্শন ঘটে, তখন আমির ভিতরে চাহিয়া দেখি যে এত বিক্ষোভ, এত অশান্তি, বৃত্তিসমূহের এত ছট্‌ফটানি সকলই প্রত্যয়ের একতানতায় 'সম' হইয়া গিয়াছে, তখন আর বর চাহিতেও ইচ্ছা হয় না। সেই ঘন একত্বে আমাদের ক্ষুদ্র জাতি, মান প্রভৃতি সমুদয় লীন হইয়া হতভম্ব হইয়া পরি। ইহাই শ্রীভগবানের পুরুষোত্তম ভাব। এই ভাবে তিনি ক্ষুদ্র 'অণু ভূত' অহং-কণাসমূহের খেলাগুলি লইয়া কি আশ্চর্য্য কৌশলে, পরিপূর্ণতায় ভরপুর করিয়া দিতেছেন!! বিদুরের ক্ষুদকণা, ভগদত্তের নারায়ণাস্ত্র, ক্রিয়ার বাচক হইলেও তাহাতে মিশিয়া পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এত গতি, এত চাঞ্চল্য, এত কর্ম্ম ও সাধনার প্রবৃত্তি তাঁহার দর্শনে তৎপদপ্রান্তে নিঃশেষে মিশিয়া যায়। ষোড়শী পীনোন্নত পয়োধরা গোপীগণ ছু'টানের মাঝে পড়িয়া কখনও তাঁহার স্বরূপে,

কথনও তাঁহার ব্যক্ত, মনোরম রূপটীতে স্ত্রীবুদ্ধিতে আকৃষ্ট হইয়া বিরহ-সন্তপ্ত কুচ-গিরি তাঁহার ব্যক্ত দেহের বক্ষস্থলে যা'ই অর্পণ করিল, অমনি সেই আকুল পিয়াসা ও কাম আপনা আপনি রূপান্তরিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পরিল। ভোক্তা-ভোগ্য জ্ঞান পড়িয়া গেল, রহিল কেবল এক সচ্চিদানন্দ ঘন বোধ মাত্র। তাই বলি, ভাই সকল, তিনি যে পুরুষ, তাঁহাতে সর্ব্ববৃত্তিরই অবসান হইবে। তুমি রজোগুণ-প্রধান মানব; ক্রিয়া তোমার স্বভাব; বেশ, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সেই রজঃ প্রয়োগ কর; অত বিচার বিবেচনা, ভাবাভাবির দরকার নাই; যে, যে ভাবে পার সে সেইভাবে প্রয়োগ কর। ক্রিয়া ও ভাবের গুণাগুণ লইয়া মাথা ঘামাইও না, তোমার ক্ষুদ্রতা ও বিশিষ্টতাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না; তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেই খেলার অবসান হইবে, পরিপূর্ণতার আভায় ক্ষুদ্রতা ও বিশিষ্টতা নিঃশেষে মিলিয়া যাইবে। বস্তু-ধর্ম্ম, ক্রিয়া ধর্ম্ম, সাধনা-ধর্ম্ম, অহংএর ধর্ম্ম, তত্ত্বের ধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মই তাঁহাকে পাইয়া পরিসমাপ্ত হইবে। এই তাঁহার পুরুষভাবের মহিমা। ক্রিয়া, ধর্ম্ম, স্বভাব প্রভৃতিকে ধারণ করিয়াও তিনি তাহাদের অতিগ অবশেষামৃত। কোটী কোটী ক্ষুদ্র জীবের মালা পরিয়াও প্রত্যেক ক্ষুদ্রের ভিতর কি এক পরি-পূর্ণতার, কি এক আকুল পিয়াসার রূপে জাগিয়া থাকেন যে এই পুরে আবদ্ধ, এতগুলি ইন্দ্রিয়ের দাস, মানবকে বাহ্যিক কোনও ভাবেই আর ডুবাইয়া রাখিতে পারা যায় না। বিল্বমঙ্গলও Mary Magdalen তাঁহারই অঙ্গপ্রভায় আকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া কাম তাহাদিগকে ডুবাইতে পারিল না; তাহারা ভাসিয়া উঠিল। দ্রব্যগুণের কথা কি বলিব? প্রত্যেকের জীবনেই দেখ তাঁহার প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে; পূর্ব্বকৃত পাপ-হলাহল প্রেমামৃতের বীজে পরিণত হইতেছে, পুণ্যকার্য্য সর্ব্বাত্মিক জ্ঞানে ডুবিয়া যাইতেছে, সাধনার ক্রিয়া ধ্যানের পথে সমাধিতে লীন হইয়া যাইতেছে, পরমাত্মার নিষ্ক্রীয় ভাব পূর্ণই রহিয়াছে। অথচ ক্রিয়ার অনন্তত্ব ও গতি সেই স্রোতে পড়িয়া বিনা আয়াসে তাঁহাতে মিশিতেছে। ক্ষেত্রশরীর প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া তোমাকে পরমাত্মাভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। কিন্তু তাঁহার পুরুষোত্তম ভাবের এমনি মহিমা যে, সকল ভাবের ভিতর দিয়া একই স্রোত উচ্ছ্বাস বহিয়া মর্ত্ত্যে অমৃত, ক্ষরে অক্ষর, গতিতে অগতির গতি বোধ ফুটিয়া উঠিতেছে। পুরুষের এই পরাগতিকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষদ্ বলিলেন—

"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ"—

সুতরাং শাস্ত্র যখন এই পুরুষের কথা কহেন তখন কোন্ ভাবটীর প্রাধান্য উপলক্ষিত হয়? ভগবান্ কি নিরোধাত্মক পরমাত্মা? হাঁ; তাহাও বটে। তিনি পরমাত্মা বটেন অথচ নিরোধ নাই। তোমার নিজ দেহের অণুসমূহ যদি তোমাকে বুঝিতে চাহে, কি ভাবে বুঝিবে? প্রথম ভাবটী এই যে যিনি এই সকল অণুনিচয়ের আমিকে সৃজন করত স্ব স্ব স্থান ও মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া সৃষ্টি ও স্থিতির মধ্যে প্রকাশিত হয়েন, তিনিই প্রকৃত 'আমি'। ইহাই প্রথম উপলব্ধির স্তর ও এই ভাবটীকে অবলম্বন করিয়াই "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই সূত্র শ্রীব্যাসদেব রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এত বড় ভাবটীও তাঁহার স্বরূপ জ্ঞানে আমাদিগকে উপনীত করিতে ক্ষমবান্ নহে। কুম্ভকার যে কি, তদ্রচিত ঘট তাহার কতটুকু অনুমান করিতে পারে? সৃষ্টিনৈপুণ্য ও কৌশলমাত্রই সৃষ্ট পদার্থ হইতে বুঝা যায় কিন্তু স্বরূপ বোধ হয় না। সেইজন্য দ্বিতীয় সূত্রে বলিতে হইল—

"অন্বয়াদি ইতরতঃ"—

সুধু সৃষ্টি হইতে তাঁহার কৌশল দেখিলেই চলিবে না, তিনি যে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের সমষ্টি বা একত্বভাবে ও ব্যষ্টি বা বিশেষ অণুভাবে সৃষ্ট পদার্থের ভিতর অন্বিত হইয়া আছেন এবং তাহাদিগকে ফেলিয়া দিয়াও সমান ভাবে থাকিতে পারেন ইহাই তাঁহার প্রকাশভাবের মহিমা।

দেখ তোমার শরীরের ছোট অণুসমূহ স্ব স্ব আমির ভাবে খেলিতেছে! অথচ এত বিভিন্ন অণুসকলের আমিভাবের মধ্যে তোমার স্বীয় অবয়বী ভাবের আমিটী নির্ব্বিবাদে ফুটিয়া উঠিতেছে। দশ ব্যক্তি একত্রিত হইয়া আলাপ করিলে একটা মহা কলরব উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে কাহারও কথা বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু শরীরস্থ এই অসংখ্য আমিসমুদয় নিজ নিজ ভাবে 'আমি' 'আমি' বলিবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ এই আমি ভাবগুলি তোমার অবয়বী আমিজ্ঞানে ঘন হইয়া ডুবিয়া যায়। পরন্তু প্রত্যেক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমিকণার স্থান ও মর্য্যাদা সুরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নাই। কতকগুলি পাত্রে নানা বর্ণে রঞ্জিত জল আছে। পাত্র সমুদয় এমন কৌশলে সন্নিবিষ্ট যে তাহা হইতে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের আভাস একই স্থানে আসিয়া সন্নিবেশিত হইতেছে। আর একটু মজা এই যে, যে ব্যক্তি নীচের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই পাত্রসমূহ অবলোকন করে, সে দেখিতে পায় যে

প্রত্যেকের ভিতরেই সূর্য্য-বিম্ব রহিয়াছে। ঐ বিম্বসমূহ জলের রঙ্গে কথঞ্চিৎ আভাবিশিষ্ট পরিলক্ষিত হয় বটে কিন্তু তাহার সাধারণ রঙ্গের আভাস, নিরীক্ষণ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ প্রতিবিম্বটীকে মিথ্যাভূত বা (virtual image) বলে। কিন্তু জলের উপর হইতে উপরের দিকে আর একটী আভাস প্রতিবিম্বিত হয় ঐ (reflected), আভাস-বিম্বটী জলের রঙ্গে অনুরঞ্জিত হয় না। এই প্রকার সকল অণু হইতে যে আভাস-বিম্ব ফুটিয়া উঠে উহা সর্ব্বদাই 'পর' ও উর্দ্ধগ। তবে প্রভেদ এই যে সূর্য্যরশ্মি জলের উপরে যে কোণ-রেখানুপাতে (angle) পাতিত আভাসবিম্বটীও সেই অনুপাতে, সমভাবে অথচ বিপরীত দিকে নিহিত আছে। the angle of incidence is equal, though opposite in direction, to the angle of refraction. তারপর যদি পূর্ব্বোক্ত পাত্র-নিচয় এমন কৌশল করিয়া সন্নিবেশিত করিতে পার যে, তাহাদের প্রত্যেকের আভাস-বিম্বই একস্থানে সমানুপাতিত হইবে তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে তাহাদের ভিতরে স্বরূপগত কোনও পার্থক্য নাই।

উদাহরণসাহায্যে আমরা এইটুকু বুঝি যে ক্ষুদ্র বিশেষভাবের অনুসন্ধানে আমাদিগের পিণ্ডস্থ বা ব্রহ্মাণ্ডস্থ ছোট আমিগুলিকে যদিচ বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এই বিশেষ ও ক্ষুদ্র 'আমি' ভাবের ভিতর দিয়া আর একটী সমষ্টিবাচক বড় আমির ভাষা উপলব্ধি হয় ইহাকে অবয়বী ভাবের আমি (organic I) বলে। এই আমিটি পরাভাবের প্রথম বিকাশ বা গর্ব্ভোদকশায়ী ভগদ্ভাব। এই আমিটী সামান্য বা সর্ব্বাত্মিকা ভাবে খেলে। প্রত্যেক অণুর আমির সহিত মিশিয়া তাহার আমিটী সংরক্ষণ করত অথচ সেই আমিগুলিকে একত্রে মিশাইয়া আর একটি বড় জাতীয় আমিভাব ফুটাইয়া তুলে। ইহাই কলনরূপী বা কাল-অভিধেয় ভগবানের খেলা।

এই ভাব ও পুরুষ ভাবে অনুগত ভাবটীর মধ্যে কি পার্থক্য আছে ? অণু-সমূহের আমি ছিন্ন ও বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত সকলেই আমি বটে কিন্তু স্বভাব ও ধর্ম্ম, স্থান ও মর্য্যাদার জন্য তাহারা বিশেষ ভাবাপন্ন। দ্বিতীয়টি অবয়বী বা ধর্ম্মী ভাব, "এই ধর্ম্মী আমি"কে লক্ষ্য করিয়া ব্যাসদেব পাতঞ্জল-ভাষ্যে বলিলেন— "স চ সংস্থানবিশেষো ভূত-সূক্ষ্মাণাং সাধারণো ধর্ম্ম আত্মভূতঃ ফলেন ব্যক্তেনানুমিতঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ প্রাদুর্ভবতি; ধর্ম্মান্তরোদয়ে চ তিরোভবতি স এষ ধর্ম্মোঽবয়বীত্যুচ্যতে।" ১।৪৩। পাতঞ্জল।

বিতর্কের বা বিশেষ ভাবের বিপরীত বুদ্ধি দ্বারা নির্ব্বিতর্কসমাধি সাধিত হয়। উহাতে একত্ববুদ্ধি জাগিয়া উঠে। সেই অবয়বী একত্ব (organic unity of the self) পদার্থটী কি? তাহাই ব্যাসদেব বলিলেন যে সেই অবয়বী আমিটী "সংস্থান বিশেষ" অর্থাৎ এক হইলেও অণুসমূহের সংস্থান (Series) দ্বারা বিশেষিত বা রঞ্জিত। অণুসমূহের বিশেষ ভাব সেখানে যায় না, কেন না উহা সেই ভূতসূক্ষ্ম অণুগণের সাধারণ ধর্ম্ম বা সমানুগত ব্যক্ত ভাব। অণুগুলির 'আমি' তাহার আমিতে নিঃশেষে লীন হইয়া যায়। চক্ষুর কার্য্য কর্ণের কার্য্য সকলই ঘন হইয়া সেই অবয়বীতে নিমজ্জিত হইয়া যায়। অথচ বিভিন্ন অণুসমূহ এই মহাভাবে গৃহীত ও বিধৃত হইয়া আছে। এই ধর্ম্মী অণুসমূহের দ্বারা বিশেষিত হয় না বটে কিন্তু তাহাদের সংস্থানের দ্বারা তাহার কার্য্য বা প্রকাশভাবটী একটু বিশেষিত হয়। মনুষ্য শরীরে যেরূপ খেলা আবশ্যক মানব-দেহে সেই প্রকারে ও দেবশরীরে দেবভাবে খেলেন। তিনি প্রত্যেক ভূত-সূক্ষ্ম বা অণুতে আছেন; তাহা না হইলে, সমস্ত অবয়বের উপলব্ধি হইত না। সেই জন্য ব্যাসদেব বলিলেন এই ধর্ম্মী অণুনিচয়ের আত্মভূত বা তাহাদের ভিতর অভিন্ন। তাহাদিগের ছোট আমির ভিতর দিয়া অভিন্ন ভাবে এই আমির প্রকাশ হয়—এই জন্য পরাভাবে অভিন্ন। এই অবয়বীকে অবয়বের মধ্যে অনুভব ব্যবহার জ্ঞানের (function) দ্বারা ব্যক্ত ভাবের মধ্যেও অনুমান করা যায়। অথবা তাঁহাকে ফলের মধ্য দিয়া অনুমান করা যায়। "ব্যক্তেন ফলেন অনুমিতঃ।" এই অবয়বী আছেন বলিয়াই লালাবাবুর চিত্তে বিষয়ভোগও বৈরাগ্য-ফল প্রদান করিল, আমাদিগের ফুল-বিল্বপত্র দিয়া ছেলেখেলার পূজাও তাঁহার ইঙ্গিত দেয়। তাই শাস্ত্র তাঁহাকে ফলদাতা বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি স্বীয় ব্যঞ্জক বা প্রকাশ ভাবের একই মাত্র অঞ্জন বা ইঙ্গিত। যতক্ষণ ধর্ম্ম বা অবয়বী ভাব থাকে ততক্ষণই তাঁহারও খেলা থাকে, ধর্ম্মভাব লীন হইয়া গেলে তাহার খেলাও পরাভাবে মিশিয়া যায়। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' বাক্যের ইহাই ভাষ্য। এই অবয়বী ভাবেই ভগবানকে অবতারের মূল কারণ প্রদ্যুম্নতত্ত্বরূপে অভিহিত করা হয়। ধর্ম্ম বা অবয়বী ভাবের গ্লানি হইলেই তাঁহার আবির্ভাব হয় একথা সকলেই স্বীকার করেন। সেই জন্য

বাসুদেবভাব হইতে যুগধর্ম্মের ও আবেসাদি অবতারগণের আবির্ভাব হয় না। এই জন্যই বৈষ্ণবগণ কুরুক্ষেত্রের ভগবানকে অবয়বী ভাবের অবতার ও নন্দালয়ের ভগবানকে পরব্রহ্মের প্রকাশ বলিয়া বর্ণিত করেন। এই অবয়বীর কারণাত্মা "আমি"টী ভগবানের বিলাস হইলেও প্রকৃত ভগবান্ বা পুরুষোত্তম নহেন।

অবয়বী ভাবের খেলায় 'পরাভাব' আছে বটে কিন্তু সেই পরাভাবটী "অনুপ্রচয়ো বিশেষ আত্মা" বলিয়া পুষ্ট্যাদি ভাবের দ্বারা একটু রঞ্জিত। ইঁহা হইতেই মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার, পৃথু আদি রাজর্ষি ও দেবর্ষি অবতার সংপ্রসারিত হয়। ইনি খেলায় মগ্ন না হইলেও খেলার ভাবের দ্বারা একটু বিশেষিত; সেই জন্যই বিশেষ ভাবে আহরণমার্গে ব্যবহার ভাবে স্থিত জীবগণ তাঁহার আভাস প্রাপ্ত হয়।

সমাধিতে যখন তোমার ভিতরে প্রকৃত পুরুষ ভাবের স্ফুরণ হয়, তখন এই অবয়বী কলনশীল ব্যক্ত মহাকাল ভাবটীও ডুবিয়া যায়; তাই বুঝি শাক্ত চিদেকরসাঃ আনন্দময়ি ভগবচ্চৈতন্যকে সুষুপ্ত মহাকালের হৃদয় হইতে উত্থিতা বলিয়া ও সেই মহাকালের সঙ্গে বিপরীত ভাবে রতাতুরা বলিয়া ভাবনা করেন। তাই বৈষ্ণব কুরুক্ষেত্রের কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ মূর্ত্তিকেও ইহো বাহ্য বলিয়া আনন্দঘন গোপীগণের স্ত্রীবুদ্ধি, ঋত্বিকগণের যজ্ঞবুদ্ধি, কংসের অসুরবৎ প্রাণ বা বাহ্যভাবাকৃষ্ট-চিত্ত-বুদ্ধি, সকল বুদ্ধিই একরূপে—সমরূপে—একই অবসানমূর্ত্তি প্রাণবাত্মক সুতরাং ত্রিভঙ্গবঙ্কিম, ভৃগু আদি ঋষিগণের তৎপদে স্থাপনকারী সুতরাং ভৃগুপদচিহ্নধারী, শুদ্ধ জ্ঞানএকমূর্ত্তি বলিয়া রবিকরভূষণঃ বা "বৃষে বহন্তি কেতবঃ" বলিয়া ঘন, মিষ্ট, অথচ ঘোর কাল অবশেষ অমৃত বা পুরুষকে জীবের লক্ষ্য ভগবান্ বলিয়া বর্ণনা করেন। পরিপূর্ণ সমস্ত 'ভগ' বা ঐশ্বর্য্য শব্দে কি অশেষ শক্তিমানত্ব বুঝায়? না সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভাব যেখানে যাইয়া পরিপূর্ণ হইয়া (পরিতঃ পূর্ণ হইয়া) মিশিয়া যায়, সেই স্বার্থেস্বভিজ্ঞ স্বরাট পুরুষোত্তমকে বুঝায়? পুরুষ বা অবসানরূপের আমি আছে বলিয়াই পরমাত্মা ভাবটীও তাঁহার একাংশ। সর্ব্ব ভাবের ঘন অবসান বলিয়া তিনি ব্রহ্ম ভাবের প্রতিষ্ঠা বা ব্যক্ত প্রতিকৃতি। তাঁহাতে এই দুইটী ভাবেরই কেমন ঘন ও একরসাত্মক সম্মিলন!

আমাদিগের অবয়বী ভাবের ভিতর দিয়া এই মিলন-তত্ত্বটী একবার বুঝিতে চেষ্টা করিব। এই অবয়ব (formal aspect) ভাবে অনেকগুলি শরীর ও লোক আছে। এই লোক অবয়ব ও অবয়বীর সহিত নিত্য সম্বন্ধ। বাহ্যভাবে এই লোকগুলিকে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। যোগী মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান প্রভৃতি চক্রের ভিতর দিয়া এই লোকসমুদয়কে প্রকৃত ভাবে দেখিতে পা'ন। এক একটী দেহ অনন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু দ্বারা গঠিত। এক একটী দেহে যে ছোট ছোট অহং বুদ্ধি জন্মায় উপনিষৎ তাহাকে 'ইন্দ্রিয়াত্মা,' 'প্রাণাত্মা' প্রভৃতি নামে অভিহিত করেন। আকাশের তারা বরং গণনা করা যাইতে পারে, সমুদ্রের উর্ম্মিমালারও বরং সংখ্যা হইতে পারে, কিন্তু এই অনন্ত 'আমি'-কণাগুলির ও তাহার মধ্যে আমাদের "অহং" এর বিকাশগুলির অনন্ত ঘাতপ্রতিঘাত ভাবিতে গেলে স্তম্ভিত হইয়া পরিতে হয়। অথচ এই সমস্তগুলিকেই উদাসীনবদাসীনবৎ ধারণ করিয়া প্রত্যেককে আপন আপন ভাবে যিনি পরিপূর্ণ করিতেছেন তিনিই ভগবান্। পরমাত্মাভাবে একটি ছোট আমি তাহার অতিগ বড় ভাবটি বুঝিতে পারে। সেই পরিপূর্ণতার ভাবে দেহ, মন, আদি তত্ত্বগুলি একেবারে ডুবিয়া যায়, বাহিরের খেলা আর থাকে না। কিন্তু ভগবৎভাবে আর একটু মজা আছে। তাঁহাতে শুদ্ধ পরমাত্মা ভাব'ত আছেই অথচ সেই ভাবে থাকিয়া, একটুও নীচে না নামিয়া, ছোট আমিগুলির মোহ, জ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত ভাবেই যিনি সমানভাবে খেলেন, আবার বাহ্য বা জগতের সহিত ধর্ম্মার্থকাম এই তিন ভাবে জীবকে অপূর্ব্বরূপে নিয়মিত করিয়া পরিপূর্ণতার অধিকারী করিতেছেন, তিনিই আমাদের ভগবান্। আমার আমি তাহার ছোট অভিমান লইয়াই ব্যস্ত, সে কর্ম্ম করিতে পারে বটে কিন্তু ফল ত তাহার হাতে নাই! ফল যদি তাহাব হাতে থাকিত তাহা হইলে তাহার ক্ষুদ্র 'আমি'জ্ঞানটী চিরদিনই এক ভাবে থাকিত। জীবের উন্নতি হয় ইহা সত্য, সুতরাং ভগবানের ফলদাতা ভাবটীও সত্য। তিনি না থাকিলে ফলের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য থাকিত না ও তদ্দ্বারা ছোট আমিটীরও উন্নতি হইতে পারিত না। মোহদ্বারা জীবকে বস্তুতে আকর্ষণ করত বস্তুর ভিতর হইতে তাহার আমির অংশটুকু এমনভাবে জীবের সহিত মিশাইয়া দেন, যে জীব তাহার নিজ আমিটীকে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বড় বলিয়া চিনিতে পারে। ঐ বড় ভাবটুকু তাহার আমিতেও নাই, বস্তুতেও নাই,

সংযোগেও নাই!! উহা আমাদের ক্ষুদ্র 'ভাব' পদার্থ নহে। তাহা হইলে কি করিয়া বৃহত্তর ভাবটি ফুটিত? পুরাতন আমিটী ঠিক থাকিয়া যাইত। একটা বিশিষ্ট মন্ত্র, বিশিষ্ট ভাবে জপ করিতে করিতে মহত্ত্বর ভাবটী কোথা হইতে ফুটে? উহা অভাব পদার্থ নহে। তাহা হইলে মৃত্যু, দুঃখ, নিদ্রা প্রভৃতি অভাব প্রত্যয়ের ভিতর দিয়া মহত্তর বোধটী কি প্রকারে ফুটিয়া উঠে? হে জীব! যিনি বিশ্ব ও নর এই উভয় ভাবে অবস্থিত থাকিয়া নিরন্তর বস্তু ও ক্রিয়ার ভিতর দিয়া তোমাকে. যেন তোমার ক্ষুদ্র আমিটীতেই বসিয়া তোমার ভিতরে বিশ্বাতিগ প্রবৃত্তি জাগাইতেছেন, যাঁহার কৃপায় স্থূলভাবে থাকিয়াও তুমি আজ বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মের কথা কহিতেছ, সেই পুরুষোত্তম ভগবানকে জানিতে, বুঝিতে ও পাইতে তোমার প্রবৃত্তি হয় না কেন ইহাই আশ্চর্য্য! যাঁহার সর্ব্বাত্মিকা চৈতন্য, অবিদ্যার ভাবে বিল্বমঙ্গলকে আকর্ষণ করিয়া আবার বিদ্যারূপের খেলায় ভগবানের দিকে লইয়া গেলেন, তাঁহাকে বাদ দিলে তোমার কোন্ ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে? সুতরাং পরমাত্মা ভাবও যে ভগবদ্ভাবে পরিসমাপ্ত তাহারও কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। যে সার্ব্বজনীন ভাবে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত এবং যাহার মোহে থিয়সফিকেল সোসাইটীর বর্ত্তমান সভ্যগণ ভাবেন যে চৈতন্যের রহস্য সবটাই বুঝি বুঝিতে পারিয়াছেন; উহাও সার্ব্বজনীন নহে। জন্মমৃত্যুশীল জন ও বাহ্য 'সর্ব্ব' তাহাতে নাই। উহা ভগবানের বৈশ্বানর ভাব বা তত্ত্ব। "বিশ্বেশাং নরাণাং অনেকধা সুখাদি আনয়নাৎ বিশ্বানব এব বৈশ্বানরঃ।" যিনি বিশ্ব ও নর এই উভয় বিভাবকে এইরূপে একসঙ্গে মিলন করেন যে জীব তাহাতে কখনও সুখ, কখনও কাম, কখনও ধর্ম্ম, কখনও জ্ঞান এবং কচিৎ সেই আনয়ন কর্ত্তার স্বরূপ-বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহাকে বিশ্বানর বলে। 'বিশ্বানর' 'বৈশ্বানর' নহে। 'ই'কার শক্তিবাচক তাই বিশ্বানরের 'ই'কার দেখিয়া অনেকেই তাঁহার শক্তিমান ভাবটী দেখিয়া ক্ষান্ত হন। তাহাকে দিব্যি ব্যবহার করিয়া আশার চাদর গায় দিয়া ঘুমাইয়া থাকেন, কিছুতেই তাহার ঘুম ভাঙ্গে না। 'ঐ'কারটী পরাভাবের ব্যঞ্জক। তাই দেখ 'এ'কার নির্দ্দেশার্থে প্রয়োগ হইলেও সেই বিশিষ্টার্থক ভাবের মধ্য হইতে হাতের মত উর্দ্ধগতিশীল ভাবের কি একটা বাহির হইল যে, তাহাতে বিশিষ্ট নির্দ্দেশটী পড়িয়া গিয়া পরাভাবের বোধটী জাগিয়া উঠিল। তাই বুঝি শাস্ত্রে 'ঐ'কে বিদ্যা বা গুরু ভাবের বীজ

বলে। বিদ্যা দেখান যে সর্ব্বাত্মিক শব্দের অর্থ 'সব' ও 'আমির' মিলন নহে। সবটাই আত্মা ইহাই উহার প্রকৃত ভাষা। আর গুরু দেখান 'তৎপদ', তিনি বিস্তারও পরিসমাপ্তি। আচার্য্য মাণ্ডূক্যভাষ্যে তাই বলিলেন "বিশ্বানর এব ইতি বৈশ্বানরঃ।" বিশ্বানরের মতন বটে ; কিন্তু ধরতে গেলেই দেখিবে! ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ জ্ঞানস্মৃতি অপোহনঞ্চ।

হা' ভগবান্, এতদিনে বুঝিতেছি আমরা যথার্থই কামাত্মা! প্রত্যেক ব্যাপারেই তোমার চৈতন্যের স্পর্শ হয় ; কিন্তু এমনই কামের ঘোর যে সামান্য ক্ষুদ্র ফলটি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না। তাই বুঝি গোপবালিকাও বলিয়াছিল—

নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়—

তাই বলি প্রেমময় এই ছোট আমিতে অনন্ত ফল আর ফোটাইও না ; এ যে ধরিতে পারিবে না!! সে যে বড়ই বিশিষ্টের অভিলাষী! তাই ঠাকুর, তোমার বিশিষ্ট করস্পর্শটী যেন বিস্মৃত না হই!

তারপর তাঁহার ব্রহ্মভাব এ ভাবটী যে তাঁরই দোকানে কিনিতে পাওয়া যায় এটা অনেকে বুঝেন না। ব্রহ্ম ভাবের ভিতরে দুইটী ভাব আছে। সেই ভাবে দেখিলে,—যে ভাবে আজ কালের বৈদান্তিক মহাশয়েরা দেখেন—উহা একটা বৃহৎ, বৃংহণশীল, নির্ব্বিশেষ সত্ত্বামাত্র। ছোট আমিটী লইয়া যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার কাছে যাইতে চেষ্টা করিয়াছে (আমরা এখানে গল্পের যাওয়া বা বক্তৃতায় যাওয়া বলিতেছি না ; গল্পের গরু'ত নিত্যই গাছে উঠে,) তাঁহারা দেখেন যে সেই নির্ব্বিশেষ ভাবের সূক্ষ্মতম ক্ষেত্রে (rarified atmosphere) আমাদের ছোট আমিটা গল্পের ব্যাঙের মত ফাটিয়া যাইতে চাহে। এই জন্যই ব্রজগোপীও সেই বিশিষ্ট অহংভাবের বিস্মৃতিরূপ মহা সন্ধি স্থলে উপনীত হইয়া একদিন বলিয়াছিল "শ্যাম তুহুঁ মম মরণ সমান"। 'বৃহত্তর সত্ত্বামাত্র' বোধ লইয়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ অন্বেষণ করিলেন ; কিন্তু ভাই বৈদান্তিক তাহার লাভ হইল Matter and motion. তুমিও স্বাধ্যায়, তপঃ, ও উপাসনাদি বর্জ্জিত বিচারে বিচরণ করিয়া এখনও ত সেই মহান্ একত্বের

উপলব্ধি করিতে পার নাই। পারিলে কি সেই বেদের অন্ত, বোধের পরিসমাপ্তি, বেদান্তশাস্ত্রের দ্বারা সাংখ্য, যোগাদিশাস্ত্রের সর্ব্বনাশ করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইত? যাহাতে মিথ্যাভূত মায়া ও মোহ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে তাহাতে কি সাংখ্যের স্থান নাই? সমাধির ভাষা বিস্মৃত হইয়া বিচার লইয়া তুমি ব্যস্ত, কিন্তু উপাসনা ও জপাদির সাহায্যে যে ব্যক্তি সমাধির দ্বারে উপনীত ও কখনও কখনও সেই শ্বেতধবল, বিমল চৈতন্যক্ষেত্রে পুরুষোত্তমের মন্দিরদ্বারে উপনীত হইয়া এত সাধের আমিটীকেও বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত, সেই ভক্তকেও একটু কটাক্ষ-নয়নে দেখ কেন? পরমহংস রাজহংস প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিলেই কি প্রত্যয়ের অববোধ হয়? 'সোহহং জ্ঞানে'ত আমি থাকে না; উহা ত দ্বৈতের বাচক নহে! অহংএর 'স'-ত্ব অর্থাৎ অহংটীই যে 'স' পদার্থের প্রকাশ ভাব মাত্র ও সর্ব্বদাই 'স' হইতে চাহে ইহাই সোহহংএর একটী ভাষা। কিন্তু সোহহংএর যে আর একটী ভাষা আছে! এবং তাহা না থাকিলে যে পূর্ব্বোক্ত ভাষা সিদ্ধ হয় না, তাহা ভোল কেন? 'স'এর, অহং-ত্ব। 'স'কেই 'অহমিতি প্রবদন্তি জীবাঃ' অর্থাৎ যাহাকে অহং বলি সে যে বাস্তবিকই তাই এইটী বুঝিয়া ভক্তগণ যে তাঁহাকেই পরম অহংরূপে বুঝিতে চাহে, তাহার বিরোধী হও কেন?

ব্রহ্মে যে এই পরাভাব আছে, তিনি যে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক-তত্ত্ব মাত্র নহেন, তিনি যে অহংভাবের প্রকৃত পরিসমাপ্তি, তাহা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। তিনি প্রাকৃতিক অবিশেষ সত্ত্ব নহেন। প্রকৃতির অবিশেষভাবসমূহ সর্ব্বদাই পরিণতিশীল, সর্ব্বদা বিশেষভাবে—অলিঙ্গভাব হইতে লিঙ্গভাবে—আসিতে চেষ্টা করে এবং পুনরায় বিশেষ হইতে অবিশেষে মিশিয়া যায়, সুতরাং ব্রহ্মভাবের স্থৈর্য্য ও ঘন সমরসত্ব প্রাকৃতিক কোনও ভাবেই সিদ্ধ হয় না। তাই ভক্তগণ তাঁহাকে অপ্রাকৃত 'মদনমোহন' বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাই তাঁহার ব্যাপ্তিতে গতি নাই। যখন যোগী তাহার আমিকে সর্ব্বজীবে দেখিতে পারেন, তখন কি গভীর ভাষা ফুটে, না স্বতঃসিদ্ধ স্বপ্রতিষ্ঠ-জ্ঞানের ভাষা জাগিয়া উঠে? সুতরাং অহংবর্জ্জিত সামান্য ভাবে জ্ঞান বা তত্ত্বের অনুশীলনে সেই সত্ত্বার উপলব্ধি হইতে পারে না। সেই সামান্য জ্ঞানের ভিতরেও ছোট আমিটী দিব্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়া থাকে। সুতরাং অহংটিকে সেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বলিয়া

না বুঝিলে আর দ্বিতীয় পথ নাই। কিন্তু স্থূলভাবে বলিতে গেলে এই পথেও যে বিপদ্! ক্ষুদ্র বিশিষ্টতাজ্ঞানেই আমাদিগের অহং আবৃত; অহং ছাড়িলে সাধনা ও জ্ঞান প্রাকৃতিক হইয়া যায়। এ কথাটি অনেকেই বুঝেন না। যথা সময়ে এই কথাটির রহস্য বিবৃত করা যাইবে। 'অহংটিকে ধরিলে ক্ষুদ্র বিশিষ্টতা ছাড়ে না', এই বিষম সমস্যা এই পথে আছে বলিয়াই এই পথটিকে ক্ষুরধার-শাণিত বলিয়া বর্ণিত হয়। কেহ হয়ত বলিবেন যোগ বা উচ্চতর ভাবের চিন্তা দ্বারাই ত' এ কার্য্য হইতে পারে তাঁহারা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে যোগ ও চিন্তাদ্বারা অহংএর দৃষ্টির ক্ষেত্র (field of vissicn) উচ্চতর ও সূক্ষ্মতর হইতে পারে কিন্তু দ্রষ্টা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানটি যেমন তেমনই থাকিয়া যায়। সেই জন্যই পাতঞ্জলে 'সর্ব্ববৃত্তির নিরোধ' পথ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বৃত্তি নিরোধ করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাই যে তাহার সহিত ক্রিয়াভাব থাকিলে বৃত্তির নিরোধ হয় না। তবে উপায় কি? চিন্তা বা জ্ঞান অর্থে যদি ক্রিয়া বুঝ, তাহা হইলে পথ পাইবে না; দুর্গম প্রাকার ও পরিখা দ্বারা আত্মজ্ঞানের দুর্গটি বাস্তবিকই সংরক্ষিত হইতেছে। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞান-গম্য তিনটী ভাবই যদি 'আমি'তে মিশিয়া যায় তাহা হইলে সেই ব্রহ্মের স্বরূপ ফুটিতে পারে কিন্তু ইহার সাধনা করিতে গেলে এক ঘোরতম অন্ধকারের ভিতরে 'আমি'টীকে হারাইয়া ফেলিতে হইবে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ।

ঈশোপনিষৎ ১২।

অতএব বুঝা গেল যে যতক্ষণ চিত্তে বিশেষভাবের লেশমাত্র থাকিবে, ততক্ষণ ক্রিয়া জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি মার্গে উন্নততর বিশেষের জ্ঞান বা প্রাপ্তি ঘটিতে পারে, কিন্তু তাদৃশ চিত্তে মায়ার পরপারে স্থিত বিমল স্বরূপ-সত্তার প্রকাশ হইতে পারে না। অনেকে বলিতে পারেন যে ভক্তির পথে এ বিপদ্ নাই। অতএব এ কথাটিও ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ভক্তিতে চিত্তের গতি সহজেই একাগ্র হয়, কাজেই সাধনার বিশেষ স্তরগুলির ভেদভাবের প্রাধান্য থাকে না। প্রাণের টানে বিল্বমঙ্গল যখন নদীতে ঝাঁপ

দিয়াছিলেন, তখন তাঁহার গঙ্গার জ্ঞান, শবজ্ঞান প্রভৃতি ছিল না; প্রাণের একতানতায় এই ছোট জ্ঞানগুলি মিশিয়া গিয়াছিল; কিন্তু চিন্তামণি সম্বন্ধে স্ত্রীবুদ্ধি ও নিজের পুরুষবুদ্ধি পড়ে নাই। এইটীই ভক্তি বা প্রেমের বিশেষত্ব। কিন্তু ভক্তিতেও জ্ঞানের খেলা থাকে। তুমি ভক্তিভরে ভগবানকে ডাকিলে ভক্তির ভিতরে নিহিত শক্তির সাহায্যে তোমার ঊর্দ্ধগতি হইবে, কিন্তু তা' বলিয়া তোমার আমি জ্ঞানটীকেত' সঙ্গে লইয়া যাইতেই হইবে। আর ভগবৎ সম্বন্ধে জ্ঞানটীও ত' স্বরূপ-জ্ঞান নহে, উহা সবিতর্ক জ্ঞান। উহাতে বস্তু, তোমার সংস্কার প্রভৃতি জ্ঞানগুলি মিশিয়া থাকে। সেইজন্য ভাগবত ভগবানকে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্বরূপে লক্ষিত করিয়া বলিলেন—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥

ভাগ।১।২।১২।

শ্রদ্ধা থাকা চাই; শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ কি? সমস্ত ব্যক্তভাবের অবসান যে লক্ষ্য বস্তুতে হইতে পারে এই বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। মুনি হওয়া চাই, অর্থাৎ বাহিরের খেলার পিপাসা নিবৃত্ত হইয়া মনের সাহায্যে ভিতরে সত্যের অনুসন্ধান-পর জ্ঞান বা আত্মাতে অভেদ বুদ্ধি ও বৈরাগ্য বা গুণপ্রবাহে বিতৃষ্ণ হওয়া চাই। তাহার পর ভগবান্ বা আত্মাকে তোমার আমিরূপ আত্মার ভিতরে দেখা চাই। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে বাহিরে দেখিলে স্বরূপ-তত্ত্ব ফুটিবে না। তোমার ধ্যেয় ভগবানই বটেন কিন্তু তোমার হৃদয় পূত নহে বলিয়া তোমার ছিন্ন সংস্কারের জীর্ণবসন পরিয়া তিনি প্রকাশিত হয়েন। যাহা তোমার সংস্কার বা প্রবর্ত্তক তাহা তাঁহার বস্ত্রাদিভূষণ। শক্তি সম্বন্ধে যদি ভ্রান্তজ্ঞান থাকে তাহা হইলে সেই শক্তিসমূহ ধ্যেয় পদার্থের অস্ত্রশস্ত্রাদিরূপে পকটিত হয়। এইজন্যই জ্ঞান-বৈরাগ্যের আবশ্যকতা। তোমার হৃদয়েব ভাবে ধ্যেয়ের ভিতরে ভাবের স্ফূর্ত্তি হয়। সুতরাং মন বুদ্ধি প্রভৃতি তত্ত্ব-সমূহকে যদি 'আমি'তে লীন করিতে না পার তাহা হইলে তোমার ধ্যেয়ের স্বরূপও ঐসকল ক্ষুদ্রজ্ঞানে আবৃত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

তারপর শুধু দেখিতে ইচ্ছা থাকিলে বা নিরর্থক জ্ঞানপ্রণোদিত হইলে ভগবানের প্রকাশও তোমার আমির ভিতরে না হইয়া বাহিরেই হইবে।

ভিতরে আনিবার জন্য বিশুদ্ধ প্রেমের আবশ্যক। আর্ত্তভক্ত বিপদে না পড়িলে ভগবানকে ডাকে না। কাজেই ভগবানও ইচ্ছামত প্রকাশিত হয়েন না। বিপৎরূপ ভাবকে অবলম্বন করিয়া না আসিলে তুমি' ত তাঁহাকে চিনিবে না! কিন্তু যখন অহঙ্কারবিরহিত, বিশুদ্ধ আমিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, সুতরাং বাহিরের ভাষায় যাঁহার চিত্তের আকর্ষণ নাই এইরূপ নির্গ্রন্থ মুনিগণ যখন বিশেষ আমিতে আসিয়া স্থির হয়েন, তখন দেখিতে পায়েন যে এতদিন যাঁহাকে স্থির, কেন্দ্র ও লক্ষ্য বলিয়া মনে হইত, সেই 'আমি' জ্ঞানটী কেন্দ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সদাই এক পরা-ভাবে উত্থিত হইয়া যাইতে চাহে। তখন মুনি দেখিতে পায়েন যে আমিটী বাস্তবিক কেন্দ্ররূপ নহে, উহার নিয়তর প্রকাশ ভাবটী কেন্দ্রের মত, কিন্তু 'মোচার' অগ্রভাগের মত উহার একটী 'উৎ' বা 'পর' ও কেন্দ্র দুটীভাবই ঘন একরসে একই পদার্থে মিশিয়াছে। এই পরা ভাবটীকে শাস্ত্রে 'স' ও কেন্দ্র-ভাবটীকে 'অহং' শব্দে অভিহিত করে, তখন মুনি দেখিতে পান যে প্রকৃত ভগবৎস্বরূপ তাঁহার বাহিরে নহে, উহা শুদ্ধ আমিরূপ কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত হইয়া বীজ যেমন বৃক্ষরূপে আপনাকে পরিসমাপ্ত করে, তদ্রূপ এই শান্ত, আত্মতৃপ্ত, বিদ্বান্ স্থিতপ্রজ্ঞ আমিটীর 'পর'-পরিসমাপ্তিরূপে নিত্য বিরাজিত আছেন। তাই ভাগবত বলিলেন—

আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূতগুণাঃ হরেঃ—

সেইজন্য শ্রুতিপরিশুদ্ধ ভক্তির আবশ্যকতা। ইহাই "ভক্ত্যা শ্রুতিগৃহীতয়া"। শ্রুতভাব থাকে না, কারণ আমরা যাহা কিছু শুনি সে'ত আমির বাহিরের কথা। আমিকে'ত শ্রুত করা যায় না! সে যে নিত্য অনুভবসিদ্ধ। কিন্তু শ্রুতির সাহায্যে আমরা বিশ্বে ও ভিতরে ওঙ্কাররূপ পরাগতি চিনিতে পারি। ওঙ্কারটীও মোচার খোসার মত বিশিষ্ট পদার্থ হইতে অপরিশেষ অভিমুখে গতিরূপে লীন বলিয়া সেই পরম পদার্থের একমাত্র প্রতীক। এই ওঙ্কারের ভাবটী ফুটাইবার জন্যই বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের অস্তিত্ব। উহা সংস্কারের অতিগ। যে ভক্তি এই অতিগ ভাবকে অবলম্বন করে, যে ভক্তিতে একটী জীবের বিপন্মুক্তিতে সমগ্র জগতের উদ্ধারভাব জাগিয়া উঠে, এবং পরে সেই জগদ্বুদ্ধিও লীন হইয়া যায়, সেই ভক্তিই প্রকৃত পরাভিসারিণী ভক্তি।

যবনকে হরিদাস করিয়া, হে বৈষ্ণব, তুমি যে পরাগতি দেখিতে পাও, সেই পরাগতিটিকেই বেদান্তে, শাক্তের সাধনায় দেখিতে পাও না কেন? 'আমি' সংস্কারগুলি পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত না হইলে এ ভক্তি জাগে না।

অতএব দেখা গেল যে লৌকিক জ্ঞান, কর্ম্ম, ও ভক্তি ভেদভাবে অনুষ্ঠিত হইলে আমাদিগকে ভেদের ক্ষেত্র হইতে পুরুষোত্তমের ক্ষেত্রে লইয়া যাইতে পারে না। শিশুমানব যখন চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত (সংসারের) দুর্গ প্রাচীরের সম্মুখীন হইয়া পড়ে তখন পন্থান্তর না পাইয়া তাহাকে উপরদিকে চাহিতে হয়। তখন সে দেখে যে পরাভিসারিণী প্রবৃত্তি বা পরাগতি ব্যতীত এই দুর্গ হইতে বাহির হওয়া যায় না। মন বুদ্ধির ভাব বিসর্জ্জন করিয়া সে তখন সমাধির ভাষায় আসিয়া পরে—জাতি, কুল, শীল, মান ত্যাগ করিয়া সে কেবল আমির ভিতর দিয়া তত্ত্বপদার্থের অনুসন্ধানপরায়ণ হয়। তখন এক আশ্চর্য্য অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হয়। সেই অভেদ্য প্রাচীরের উপর হইতে একখানি হস্ত প্রকাশিত হয়। অনেকে এই হস্তটী দেখিয়া মনে করে বুঝি ইহাও একখানি প্রাকৃত হস্ত।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ গীতা। ৯।১১।

সেই হস্তের সুললিত অঙ্গুলি স্পর্শে জীব যখন পতির কথা ভুলিয়া যাইয়া, তদাকৃষ্ট হইয়া সজোরে সর্ব্বপ্রাণমনে সেই অঙ্গুলি অবলম্বন করে, তখন সেই অঙ্গুলি সমেত করবৃন্ত কেমন উঠিয়া যাইয়া আপনার স্বরূপে আপনি প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ ঈদৃশ করপ্রসারণ ব্যাপারও মায়ার ভিতরের খেলা।

এই উদ্ধার করণ ব্যাপারও ত মায়ার খেলা। কিন্তু যে সকল ভক্ত পরাভাবে সেই অপরিচ্ছেন্ন পদার্থের দিকে প্রাণ মন গুটাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা সেই করকিসলয়ের অঙ্গুলি স্পর্শে এক অতি আশ্চর্য্য অনুভূতি লাভ করেন। তাঁহারা দেখেন যে যাহার হস্ত সে কতকটা আমার আমি জাতীয়। কারণ সেই কর-স্পর্শে প্রাকৃতিক সমস্তভাব মূর্চ্ছিত হইলেও শুদ্ধ আমি ভাবটী থাকে। সে দেখে যে তিনি পরভাবে আছেন। তাই তাহার চিত্তসিন্ধু সেই পরম সুধাকরের সঙ্গমের জন্য উদ্বেলিত হইয়া বেলাভূমি অতিক্রমপূর্ব্বক কি এক আকুল পিপাসায় ঘন হইয়া সেই অতিগের দিকে ধাবমান হয়। ক্ষুদ্র আমি জ্ঞানের অতিগ বলিয়া

তাহাকে বলে "শ্যাম তুহু মম মরণ সমান।" একি! তোমার স্পর্শে আমার এত সাধের এতকালের সাধনা দ্বারা পরিস্থাপিত, বেদের সারভূত সংস্কারগুলিও দ্রব হইয়া মিশিয়া যায় ও তাহার সঙ্গে এই সংস্কারোপগত সংস্কারাভিমানী এই আমিটি যেন মৃত্যুর অঙ্ক আশ্রয় করে। কিন্তু এ'ত মৃত্যু নয়। সব গেল! প্রকৃতি পর্য্যন্ত দ্রবীভূত হইয়া গেল! কিন্তু কি এক আনন্দঘন মহান্ সত্তা আমি জ্ঞানটীকে তাহার জাতি-কুল-শীলের গণ্ডী হইতে বাহির করিয়া দ্রব করিয়া সেই আমির পরিসমাপ্তিরূপে থাকিয়া গেল। অহো। এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি তুমিইত আমার সেই ভগবান্! তুমিইত তোমার হস্তে সমস্ত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ভাবটি প্রকট করিয়া সেই ঐশ্বর্য্যের বহ্নিতে আমার ভিতর বাহির দ্রব করিয়া দিতেছ, কিন্তু ইহাও যে তোমার বাহ্যভাব! তুমি ঐ ঐশ্বর্য্যের ভিতর দিয়া কি এক নিত্য, ঘন, অবশেষামৃতরূপ আকুল পিপাসার ভাব জাগাইয়া আমিটিকে তোমারই মতন করিয়া লইতেছ! একি! আর হস্তাদি কিছুই প্রত্যক্ষ হইতেছে না, কোথা গেলে হৃদয়েশ। .. . ... এ কি? বাহিরের অন্ধকারে সবই যে লীন হইয়া গেল। আমার দুর্গ প্রাচীরবেষ্টিত কারাগারও যে ছিল ভাল। সে ঘরে বসিয়া তোমার নাম করিতে গেলে প্রাণটি উৎক্রান্ত হইত বটে তবু একটু গতি একটু স্পন্দন ছিল এখন যে কিছুই নাই। দেখি, আমির দিকে যাইয়া দেখি; ওমা এ কি! এ তুমি না আমি!! এই যে এ তুমিইত বটে! আমিতে ত এত পরাভাব ও পারিসমাপ্তি নাই। না, এ যে আমিই বটে, কারণ স্বরূপপ্রতিষ্ঠচৈতন্য ত এখনও আমির সাক্ষ্য দিতেছে। ওঃ বুঝিয়াছি, তুমি আমি এ দুটাও কথার কথা। আমিতে যে নিরন্তরই তোমার সত্তা ছিল, তুমিতেও যে সর্ব্বদাই আমি রহিয়াছি। এ কি আমার পোষাকে তুমি, না তোমার পোষাকে আমি? থাক, আমিত বড় মূর্খ! এখনও নির্দ্দেশ করিতে যাই কেন? মাথা নাই তার মাথা ব্যথা! দেশ নাই তার নির্দ্দেশ কি? ভাষা একটা আছে বটে। ভাষাটাত দেখি একটা ঘন সৎ, চিৎ আনন্দময়।

তুমি কে? আমি কে? তুমিই আমি, না আমিই তুমি? তোমাতে আমাতে যে ছেদ নাই! ভেদ নাই। আমিইত অঘাসুর, পূতনা, প্রলম্বাসুর নিধন করিয়াছি; আমারই বংশীরবে আমি কস্তুরিকা মৃগের ন্যায় কানন-

পথে ভ্রমণ করিয়াছি; আমিই সেই! আমিই এই; আমি বই সে আর কে?—

না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি॥

* * *

না খোজলুঁ দূতী না খোজলুঁ আন।
দুহুঁকে মিলনে মধত পাঁচ বাণ॥

আমিই যে আমির—আমি। আমি যে তোমারই! আমি যে তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত! তুমিই যে আমিতে অধিষ্ঠিত! আমিই অমৃত, অব্যয়, সনাতন, ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা!—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

(গীতা ১৪।২৭)

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

নিরাশা।

ব্যর্থ এ জীবন ভার, কেমনে বহিয়া যাই!
সুগভীর অন্ধকার, যে দিকে ফিরিয়া চাই!
নিরাশার উষ্ণশ্বাসে পুড়িয়া গেল এ হিয়া,
অন্ধ হ'ল আঁখি দুটি, তব পথ নিরখিয়া।
দিন গেল ফিরে ফিরে ব্যর্থ করি মনোরথ,
অনিমিষে চেয়ে আছি, দিবা নিশি আশাপথ।
তোমার মঙ্গল গীতি, শ্রবণে পশে না কেন?
তোমার বিমল জ্যোতি, হৃদয়ে ভাতে না কেন?
তোমার বীণার তান, পশিয়া মরমে মোর
কেন গো ভাঙ্গে না এই, একটানা ঘুমঘোর?

তুমি কেন দূরে দূরে, কত দূরে কোথা রও!
আশায় আকুল করে, শুধু বুকে ব্যথা দাও!
তুমি কেন কাছে কাছে, এসেও এস না সখা?
কি ঘোর নয়নে মোর না মিলিল তব দেখা!
চিদাকাশে কতরূপে, কর তুমি কত খেলা
নিমিষে মিশিয়া যাও এ কেমন তব ছলা?
আশার মোহন ডোরে বাঁধি মোরে বার বার
বিশ্বনাট্য-রঙ্গমাঝে কত বা খেলাবে আর?
কতবার কত সাজে কতই না মিছা কাজে,
সাজালে পুতুল পারা, আব কেন—মরি লাজে?
দিয়েছিলে দারাসুত—দু'দিনের খেলাসাথী,
খেলিনু সারাটী দিন, কত না আমোদে মাতি'।
শূন্য এবে খেলাঘর নীরব সে হাসি গান
এখনও ওঠেগো শুধু বুকফেটে দুঃখ তান।
একাকী ফেলিয়া মোরে, আঁধার সে খেলা ঘরে,
চলে গেছে সাথী সব কেহত' চাহে না ফিরে!
সুখ, শান্তি, সঙ্গী হীন আশা-বৈতরণী-তীরে,
ব'সে আছি সারা' সন্ধ্যা তোমার প্রতীক্ষা তরে!
কোথা তুমি নিত্যশুদ্ধ, জ্যোতির্ম্ময় মনোহর?
দয়া করি এস হৃদে, সর্ব্বদুঃখ-শোক-হর।
এস ওগো বনমালী, প'রে তব বনমালা!
নিরাশার তপ্ত হিয়া, হোক তব নাট্যশালা।
কত ডাকি কত কাঁদি; এলে নাকো একবার
তবে কি অন্তর মম, রবে চির অন্ধকার?
তাই যদি ইচ্ছা তব, পূর্ণ হোক ইচ্ছাময়!
এতই সয়েছি যদি, দেখি আরো কত সয়?
ঢাকিয়া আমারে প্রভো, গভীর আঁধার ঢালো,
(ওগো) ধাঁধা দিতে মাঝে মাঝে জ্বেলোনা আশার আলো!

শ্রীহৃদনাথ মিশ্র।

আর্য্য-ললনা।

লোপামুদ্রা।

মধ্যাহ্নের কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই বিদর্ভরাজ সভাভঙ্গ করত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। নৃপতির বদনমণ্ডল কি এক অজ্ঞাত সন্দেহের কালিমা-ছায়ায় আচ্ছন্ন। তাঁহার স্থির প্রশান্ত বদন অধিকতর প্রশান্ত ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, তাঁহার হাস্যপ্রসন্ন নয়নযুগল স্থির ও লক্ষ্যহীন প্রতীয়মান হইতেছে। শরাসন গর্ব্ব-খর্ব্বকারী ভ্রূযুগল নাসামূলসমীপে ঈষৎ কুঞ্চিত ও প্রফুল্ল বন্ধুজীবোপম বিম্বাধরপুট ঈষৎ অবনমিত হইয়া তদীয় হৃদয়নিহিত চিন্তার জটিলতা ব্যঞ্জন করিতেছে।

অসময়ে নৃপতির অন্তঃপুরে আগমনসংবাদ শ্রবণে মহিষী কথঞ্চিৎ চিন্তান্বিতা হইলেন। অনিষ্টাশঙ্কিত প্রিয়জন-চিত্ত অভিনব কিঞ্চিন্মাত্রেই বিচলিত হইয়া থাকে। তাই প্রতিহারি-প্রমুখাৎ রাজাগমনসংবাদ শ্রবণপূর্ব্বক মহিষী দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আগমন করিয়া বিদর্ভনাথের অভিনন্দন করিলেন; এবং অনুগামিনী ছায়ার ন্যায় নৃপতির সহিত অন্তঃপুরকক্ষে প্রবেশ করিলেন। পরিচর্য্যাপরায়ণা কিঙ্করীগণ-পরিবেষ্টিতা রাজমহিষী স্বয়ং সিংহাসনাসীন নৃপতির অঙ্গে ব্যজন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে মহারাজকে সুখাসীন বিবেচনা করিয়া বিনয়নম্রবচনে তাঁহার ঈদৃশ চিন্তাকুলতার কারণ জিজ্ঞাসা করত কহিলেন,— আর্য্যপুত্র, আপনাকে চিন্তিত দর্শন করিয়া আমার প্রাণ অতিশয় কাতর হইতেছে; আপত্তির কারণ না থাকিলে তাহা প্রকাশ করত আমাকে আশ্বস্ত করুন।

দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক নৃপতি কহিলেন—রাণি, তোমাকে তাহা বলিবার জন্যই আমার অন্তঃপুরে আগমন। আমি তোমাকে যে সংবাদ দিতে আসিয়াছি তাহা যেমন হর্ষের, তেমন তাহার সঙ্গে একটু আশঙ্কার কারণ জড়িত থাকিয়া আমাকে এতদূর চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। রাণি, আমাদিগের দীর্ঘতপস্যার ফলস্বরূপ লোপামুদ্রা, কুলদেবতার ন্যায় এই রাজপুরী উজ্জ্বল করিয়া আছে; তাহার রূপ, গুণ, চরিত্র ও ব্যবহারে পুরবাসিগণ এবং আমরা যে কত প্রীত তাহা আমি আর তোমাকে কি বলিব? মা আমার বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়াছে। এখন উঁহাকে যথোপযুক্ত সৎপাত্রে সম্প্রদানের সময় উপস্থিত। সাবিত্রীমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী

দেবীর ন্যায় অলৌকিক রূপ দর্শনে কোনও রাজপুত্রই উহার পাণিপ্রার্থী হইতে সাহসী হইতেছেন না। অসাধারণ তপঃপরায়ণ মহর্ষি অগস্ত্য আজ তাহার পাণিপ্রার্থী হইয়া আমাদিগের এই রাজপুরে আগমন করিয়াছেন। রাণি, এখন কি করি? মহর্ষির ন্যায় রূপ ও গুণালঙ্কৃত পুরুষের মত কন্যাদানের উপযুক্ত পাত্র অতি বিরল হইলেও তিনি বনবাসী তাপস। চিরকাল রাজভোগলালিতা কুমারীর পক্ষে বনবাসক্লেশ সহ্য করা অতীব কষ্টকর। পরন্তু ঋষিপ্রবরের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিতেও আমার অতিশয় কষ্ট বোধ হয়। বিশেষতঃ আমাদিগের ন্যায় লোকপালগণ কর্তৃক ন্যায়ানুমোদিত বিষয়ে ঋষিগণ প্রত্যাখ্যাত হইলে লোকধর্ম্মের গ্লানি নিবন্ধন নানাবিধ রাষ্ট্রবিপর্য্যয় ও উৎপাত প্রযুক্ত জনসাধারণের অতিশয় ক্লেশ হইয়া থাকে। আমাদিগের দেহ, প্রাণ, মন সকলই লোক-রঞ্জন ব্যাপারে বিক্রীত। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজসম্মান লাভ করিয়াও আমরা একান্ত পরাধীন; সিংহাসনের মহার্ঘ্য আস্তরণ অজিনাবৃত না হইলে শোভাসম্পন্ন হইতে পারে না।

যদিচ আমি মহর্ষির যথোচিত আতিথ্যের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছি, তথাপি আমাদিগের সে স্থানে উপস্থিত থাকা ও স্বহস্তে তাঁহার পরিচর্য্যা করাই কর্ত্তব্য; এবং ইহাই সংসারীর ধর্ম্ম। তোমার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয়ের উত্তর প্রদান করিব বলিয়াই আমি এসময়ে এখানে আগমন করিয়াছি।

রাণী। মহারাজ, আপনি সর্ব্বশাস্ত্রার্থদর্শী লোকপাল, আমি আপনার সামান্য সেবিকা। এবিষয়ে মাদৃশ ব্যক্তির নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য কেবল অন্তঃপুরচারিণী রমণীর প্রতি সম্মান ও সামাজিক বিধির অনুগমন বলিয়াই বোধ হইতেছে। যাহা হউক, আমি রমণী; নারীচরিত্র সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতানুসারে আমার যাহা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে তাহাতে আমি ইহাই বলিতে পারি যে, যুবতীগণ সকলেই পতির রূপের প্রয়াসী; তবে ধর্ম্মহীনা বিলাসিনী কামিনীরাই কেবল মাত্র রূপের পূজা করিয়া থাকে। সত্ত্বতী কুলকামিনীগণ পতির রূপ, গুণ, বীর্য্য, শ্রী, সম্পদাদি সকলেরই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ভাগ্যবশে আকাঙ্ক্ষানুরূপ সমুদয় সংঘটিত না হইলেও তন্নিবন্ধন বিশেষ ক্ষুণ্ণ না হইয়া পতিকে পতিদেবতা জ্ঞানেই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সর্ব্বাবস্থাতে পতির সেবাতেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত, পতির সুখে তাঁহাদের সুখ এবং পতির দুঃখে তাঁহাদের দুঃখের পরিসীমা থাকে না। দৈববশতঃ পতি যে কোনও ভোগে বঞ্চিত থাকেন আর্য্য নারীগণ কখনও তাদৃশ ভোগের

ইচ্ছা পোষণ করেন না। পতিপরিত্যক্তা কুলরমণী জীবিতা থাকিতে ইচ্ছা করেন না। সেই প্রকার জীবন ধারণ তাঁহার পক্ষে তিলে তিলে অফুরন্ত মৃত্যুযন্ত্রণার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। রমণীগণ বাল্যে পিতার, চিরজীবন পতির ও বার্দ্ধক্যে পুত্রবশ হইয়া থাকাই শ্লাঘনীয় মনে করেন। পিতা মাতা যোগ্যপাত্র বোধে যাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন তিনিই পতি। পতি দৈববশতঃ অভিমত না হইলেও সতী রমণী কখনও তাঁহাকে অবজ্ঞা বা অনাদর করেন না, বরং নিজে পতির অনুগতা হইতে না পারিলে ক্ষুণ্ণ হয় ও কায়-মন-প্রাণে পতির অনুগতা ও মনোবৃত্যনুসারিণী হইতে যত্নবতী হন। স্বয়ম্বরা বা বীর্য্য-শুল্কা কামিনীগণও পিতৃদত্তা হইতে না পারিলে আপনাকে ততদূর গৌরবান্বিতা মনে করেন না।

মহারাজ, চরিত্র ও ব্যবহারে সর্ব্বজনপ্রিয় লোপামুদ্রা ধর্ম্মজ্ঞা ও বুদ্ধিমতী, বিশেষতঃ মহর্ষিকে কন্যাদান করা যদি আপনার অভিপ্রেত হইয়া থাকে তবে ইহাতে আপনার সঙ্কুচিত হইবার কারণ কি?

রাজা। অগস্ত্য ঋষি যে কন্যাদানের উপযুক্তপাত্র তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। রূপ, গুণ, কুল বিদ্যা ও তপস্যায় পৃথিবীতে তিনি অদ্বিতীয় বলিলেও তাহা অত্যুক্তি হয় না। একটু মাত্র আপত্তির কারণ যে তিনি বনবাসী তাপস! তাঁহার সহধর্ম্মিণীকেও যৌবনাবধিই ভোগ-বিরহিত হইয়া থাকিতে হইবে; রাজ্ঞি, যুবতীগণের পক্ষে ইহা অতিশয় কষ্টের কারণ নহে কি?

রাণী। মহারাজ, ভোগবিলাসপরায়ণা ইতর রমণীগণের পক্ষে ভোগবাসনা ত্যাগ অতিশয় ক্লেশজনক হইলেও আর্য্যরমণীর পক্ষে উহা অতীব অকিঞ্চিৎকর। যে আর্য্য-রমণী শৈশবাবধি নানাবিধ কষ্টসাধ্য ব্রতে দীক্ষিত হইয়া প্রভূত আনন্দানুভব করেন, সতী গৌরী ও অরুন্ধতী প্রভৃতি লোক-মাতাগণ যাঁহাদের জীবনের আদর্শ, যাঁহারা সানন্দচিত্তে পতিপদ হৃদয়ে ধারণ করত মৃত পতির সহিত জলন্তচিতায় প্রবেশ করিতে অণুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পতিলাভের নিমিত্ত সামান্য ভোগ বাসনা ত্যাগ কি বড় কষ্টকর বিষয়!

রাজা। তবে তুমি এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন কর? আমার মতে একবার লোপামুদ্রার অভিপ্রায় কি, তাহা জানিতে পারিলে ভাল হইত।

রাণী। আপনার মত অবশ্য পালনীয়। আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছি যে ইহা লোপার অনভিপ্রেত হইবে না। বরং এই সম্বন্ধ তাহার অধিকতর

বরণীয় হইবে। মহারাজ, আপনি অবগত নহেন যে এই রাজপুরীর সর্ব্বপ্রকার অনায়াস-লভ্য ভোগোপকরণসমূহে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও বাছা আমার নিরন্তর প্রফুল্লহৃদয়া, উদাসিনী, সন্ন্যাসিনীর ন্যায় বাস করিতেছে; তাহার সকল ভোগই কেবল লোকদেখান। এই বলিয়া রাজ্ঞী সন্নিহিত পরিচারিকার প্রতি মালিনীকে আহ্বান করিতে আদেশ করিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই মালিনী তথায় আগমন করিলে তাহাকে নৃপতির অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। মালিনী লোপামুদ্রার প্রিয়তমা সহচরী।

রাজা কহিলেন, প্রিয়ে! চল আমরা যাইয়া তৎক্ষণ ঋষিপ্রবরের শুশ্রূষা করি। এই বলিয়া রাজা ও রাণী সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

রক্তকৌষেয়-বসনপরিহিতা লোপামুদ্রা তখন শিবপূজা সমাপনপূর্ব্বক স্বীয় উপবেসন-কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, এমন সময়ে তাহার প্রিয় সহচরী মালিনী অলিন্দের অপর প্রান্ত হইতে তাহার সমীপবর্ত্তিনী হইল। মালিনীর নিরন্তরহাস্য-প্রফুল্ল বদনমণ্ডল আজ কিছু গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছে; তাহার নৃত্যপরায়ণ খঞ্জন-মিথুনের ন্যায় চপল নয়নযুগলে কিছু স্থৈর্য্যের আবির্ভাব দর্শন করত লোপামুদ্রা ঈষৎ হাস্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ প্রভাতগগনে সন্ধ্যার ছায়া কে মাখায়ে দিল মালি ?"

মালিনী। ঠাট্টা রাখ সই; তোমার ও সন্ন্যাসিনী-সাজ আমার ভাল লাগে না। রাজকুমারী, কোথায় রাজকুমারীর মত বেশভূষা করবেন, না ত' তপস্বিনী সেজে বসে আছেন।

লোপা। কেন মালি, আমি যে তপস্বিনী হতেই ভালবাসি। শুন মালি; আমি প্রত্যহ দেবাদিদেবের নিকট তাঁহারই মত আপন-ভোলা সর্ব্বভূতহিতরত, তাপস-পতি প্রার্থনা করি। আজ যখন আমি একমনে শিবের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলাম, তখন আমার বোধ হইল দয়াময় আশুতোষ রজতগিরিসন্নিভ কর্পূরকুন্দ-ধবল, চন্দ্রচূড় মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন— 'রাজনন্দিনি, তোমার আশালতা প্রায় ফলবতী হইয়াছে। ঋষিসত্তম অগস্ত্য তোমার পাণি-প্রার্থী হইয়া রাজসভায় আগমন করিয়াছেন; কিন্তু তোমার পিতা তাঁহাকে কন্যাদান করিতে একটুকু ইতস্ততঃ করিতেছেন। তোমার অভিপ্রায় জানিতে পারিলেই রাজা তোমাকে ঋষিপ্রবরের হস্তে সমর্পণ করিতে পারেন।" ভাই মালি, একবার যেয়ে রাজসভার সংবাদটা নিয়ে আয় না, ভাই! আমার মন বড়ই চঞ্চল

হয়েছে।" এই বলিয়া যুক্তকরে গদ্‌গদ বচনে কহিলেন "ভগবন্, ইহা আমার স্বকপোলকল্পিত স্বপ্নই হউক, কি সত্যই হউক, মূলে ত' তোমার ইঙ্গিত রহিয়াছে প্রভো! তোমার ইঙ্গিতে যেন মিথ্যা না হয় দেব!" এই বলিতে বলিতে রাজকুমারীর গণ্ডদ্বয়ে দুইটী গলিত হীরকধারা বহিয়া চলিল। বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে মালিনী রাজকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণকাল পরে মালিনী কহিল—"সখি, ভগবান্ শশাঙ্কশেখর তোমাকে যথার্থ ইঙ্গিতই করিয়াছেন। তোমার মনোভিলাষ জানিবার নিমিত্ত রাণী মা আমাকে ডাকিয়াছিলেন; আমি এইমাত্র তাঁহার নিকট হইতেই আসিতেছি। সত্য সত্যই অগস্ত্য ঋষি তোমার পাণিপ্রার্থী হইয়া রাজদ্বারে সমাগত হইয়াছেন। তুমি কি সত্য সত্যই ঋষিপত্নী হইবে সখি।"

লোপামুদ্রা আর কথা কহিতে পারিলেন না. আনন্দপুলক ও অশ্রুপ্রবাহ তাঁহার হৃদয়ের গুপ্ত অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া দিল।

অনেকে পতিকামনা-বৃত্তিকে কামসংজ্ঞায় অভিহিত করেন, ইহা কাম হইলেও, যে কাম কেবল আপনার ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয়ের চরিতার্থতার সীমাবদ্ধ ইহা সেই কাম নহে। যেই কামে সমুদয় চিত্তবৃত্তিসমূহ নিরুদ্ধ হইয়া যায় ইহা সেই কাম, এই কামই অনিরুদ্ধ—এই কাম অবলম্বন করিয়াই ভগবানের লীলাময়ী ইচ্ছাশক্তি "একোঽহং বহু স্যাম" ভাবাবলম্বনে জগৎ ও জীব বিতরিত এবং জীব ও জগৎ ভগবানের মোহন বংশীরবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সর্ব্বাতীত, পর, রাসমণ্ডলে উপনীত হইতে পারে। বিষয়াভিমুখী হইলে এই বৃত্তিই 'কাম' নামে ও ভগবদভিমুখী হইয়া 'প্রেম' নামে অভিহিত হয়। একে বিচ্ছেদ ও জ্বালা অপরে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলীলা।

মালিনী ও রাজকুমারী উভয়েই নীরব। মালিনী ভাবিতে লাগিল, রাজকুমারীর কি ইহাই যথার্থ ইচ্ছা না সাময়িক উত্তেজনা মাত্র। তাহার ভাবগতিক দেখিয়া ত ইহা সাময়িক উত্তেজনা বলিয়া বোধ হয় না। দীনহীন তাপসবৃত্তি, বৈরাগ্যের অবিচল স্থিরমাধুর্য্য সর্ব্বপ্রকার ভোগের প্রাচুর্য্যপূর্ণ রাজপ্রাসাদের নিরবচ্ছিন্ন বিলাসবাহুল্যের মধ্যে থাকিয়া ক্ষণকালের জন্য উপাদেয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু যখন সেই বৈরাগ্য ও তাপসবৃত্তি জীবনের একমাত্র সহচর হয় তখনও কি তাহার মাধুর্য্য সেই প্রকারই থাকে? কিন্তু তাই কি? না। তাপসবৃত্তি বা বিষয় ত্যাগ ত রাজকুমারীর লক্ষ্য নহে; ইহা ত কেবল বাহিরের সাজমাত্র! তাঁহার প্রধান লক্ষ ত' পতিদেবতা। যে অপরিসীম জ্ঞানগরিমা-মণ্ডিত

ভগবদ্ভাবের মূর্ত্তিমান্ অবতারস্বরূপ ঋষি-সত্তম ইঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণাভিলাষী, তাঁহার পরিচর্য্যা ও সেবাইত ইঁহার সকল সুখের আস্পদ! তাঁহার সেবাই ইঁহার প্রধান অবলম্বন। সেই ঋষিসত্তম ইঁহার উপদেশের—গুরু, সংসারের—সঙ্গী, ভোগের—বিলাস, সুখের—আধার, পরমসুহৃৎ, প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের দেবতা! নিরন্তর রাজভোগ ভোজনে ক্ষুধার যে তৃপ্তি, বনফল ভোজনেও ত' সেই তৃপ্তি; দুগ্ধফেনসন্নিভ সুকোমল শয্যাতে নিদ্রার যে সুখ, কুশ-বিনির্ম্মিত শয্যায় শয়নেও ত' নিদ্রার সুখ সেইই: মহার্ঘ্য দুকুল বসনে যে শীতাতপ ও লজ্জা নিবারিত হয়, সামান্য বল্কলবাসেও ত' তাহাই হয়। তবে রাজভোগে ও সন্ন্যাসে প্রভেদ কি? মহার্ঘ্য ভোগ-সম্ভারে যে মদগর্ব্বের সাময়িক তৃপ্তি, সন্ন্যাসে তাহার বিনাশ। যেই মোহান্ধতা মানবসন্তানকে পদদলিত করিয়া বিশ্বনিয়ন্তার উপরেও নিয়ন্তা হইবার আশায় প্ররোচিত করে, তাহার বিনাশইত' বাঞ্ছনীয়। যাহারা পৌরুষাভিমানী মদগর্ব্বী তাহাদের সন্ন্যাসই উপযুক্ত পন্থা। পৌরুষাভিমানগর্ব্বীর পক্ষে সকল ভুবন জয় অপেক্ষা স্বকীয় ইন্দ্রিয় জয়ে অধিকতর পৌরুষলাভ হয় হউক—কিন্তু রমণীর কি তাহাই ব্রত? যে রমণী আপনার দেহ, মন, প্রাণ—যথাসর্ব্বস্ব আনন্দভরে পতিপদে উৎসর্গ করিয়া আত্মতৃপ্তির পরমানন্দময় সুখ ভোগের অধিকারিণী হয় তাহার আবার সন্ন্যাস কি? তাহার সকলইত পতিদেবতার পরমপদে উৎসর্গিত! তাহার আর স্বতন্ত্র ভোগ কোথায়! সতী রমণীর ন্যায় সন্ন্যাসিনী কে? ধন্য রাজকুমারী! রমণী যে সন্ন্যাস লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার আবার তপস্বিনী হওয়া কি? দুখানা ভাল কাপড়, দুটা ভাল খাবার, একটা নরম বিছানা ত্যাগ কি ত্যাগ! যে রমণী অমন গুণবান্ পতির সহিত দুখানা কাপড়-চোপরের তুলনা করে সেই অধমা, কুলরমণী নামের অযোগ্যা! তাহাকে ধিক্!! রাজনন্দিনী তুমিই ঠিক বুঝিয়াছ! বসন ভূষণ আহার-বিহারাদি ত কেবল দেহের জন্য!—মনে সুখ না থাকিলে দেহকে সহস্র সুখোপাদানে ভূষিত করিলেও সুখী হওয়া যায় না; আবার মনে সুখ থাকিলে দেহকে শত বৃশ্চিক-দংশন যাতনায় রাখিয়াও সুখী হইতে দেখা যায়; তবে যাহাতে চিত্তের প্রসাদ সেই পরম জ্ঞানী মহাপুরুষকে পতিত্বে বরণ না করিয়া আর কাহাকে করিবে? দেবি, তুমি দয়া করিয়া আমার মত অধমকে সখীসম্বোধন কর, সতি আমি যে তোমার দাসী হইতে পারিয়াছি আমার সেই সৌভাগ্য-গর্ব্ব রাখিবার স্থান এ জগতে নাই। এই প্রকার ভাবনার আবেগে

মালিনী আনন্দবাষ্পাকুল-লোচনে যাই লোপামুদ্রার পদধারণ করিতে যাইতেছিল লোপমুদ্রা তাহাকে হৃদয়ে ধারণ করত আনন্দাশ্রু সিঞ্চিত করিয়া কহিলেন, 'এ কি মালি, কি করিস বোন, তুই যে আমার প্রাণের ধন, বুকের কাছে আয়, পায়ের কাছে কেন ?'

নীরবে দুইটী সখী পরস্পরে পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া আনন্দপ্রবাহে আপ্লুত হইতে লাগিল।

রাজা ও রাণী মালিনীর বিলম্ব দেখিয়া লোপামুদ্রার কক্ষায় আগমন করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহারা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। রাজদম্পতি কুমারীযুগলের শির আঘ্রাণ ও বদনচুম্বনপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। লোপামুদ্রার অভিলাষ বুঝিতে আর তাঁহাদের বিলম্ব হইল না।

যথাসময়ে অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার উদ্বাহকার্য্য সুসমাপ্ত হইয়া গেল। ঋষি-সত্তম অগস্ত্য জগৎপাবনী গঙ্গার কূলভূমিতে, মহেশ্বরের আনন্দকান বারাণসী-ধামে আশ্রমকুটীর নির্ম্মাণ করত ভার্য্যার সহিত তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেন। আর্য্য-রমণী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, কেবল মাত্র সংসারসঙ্গিনী নহেন। স্বামিসেবা ব্যতিরেকে রমণীর অপর কোনও তপস্যা, ব্রত, নিয়ম সনাতন শাস্ত্রকর্ত্তাগণও ব্যবস্থিত করেন নাই। তাহার আবশ্যকও নাই। কারণ আর্য্য-নরনারীর ইহাই চিরন্তন সুদৃঢ় ধারণা যে পতিপত্নী উভয়েই 'এক' বা একেরই দুইটা দিক্। দাম্পত্য তাহাদের বন্ধনগ্রন্থী, অগাধ প্রেম তাহাদের মিলনোপাদান, নিষ্কল নির্ম্মল আত্মা তাহাদের মিলনক্ষেত্র, ভগবান্ তাহাদের লক্ষ্য। তাই হিন্দুর সংসারই তাহার তপস্যার প্রধান ক্ষেত্র ইহা কেবল তাহার ভোগস্থান মাত্র নহে। সংসারের সহিত ব্যক্তির যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধে বিপরীত ভাবে দৃষ্টিপাত করিলেই যে তাহা তাহার পরম ও চরম লক্ষ্য ভগবানে যাইয়া পঁহুছে; সে তাহা জানে বলিয়াই আর্য্যগণ ইহাকে 'পর'পদ-প্রতিবিম্বক দর্পণের ন্যায় ব্যবহার করিয়া সংসারের যাহা ধর্ম্ম, যাহাতে জীবের প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভাব, ক্রিয়া ও দ্রব্যানু-ভূতির মধ্যেও সেই পরম ভগবানের পদচিহ্ন বা প্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত করিয়া দেয়—তাহারই অনুসরণে ক্ষণস্থায়ী ব্যক্ত জীবনের মধ্যে সংসারের সাম্যের (সং বা সম্‌এর) ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া সারটুকু তুলিয়া লয়। ইহাই হিন্দুর সংসার; ইহাই হিন্দুধর্ম্ম।

লোপামুদ্রা—যে লোপামুদ্রা কৈশোরে যোগিনী সাজিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের ক্রীড়াভিনয় করিত, বননিবাসী তাপস জীবনের নিরাবিল মাধুর্য্য যাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সর্ব্বত্যাগী অনাসক্ত সন্ন্যাসী যাহার হৃদয়ের একমাত্র অধীশ্বর—সেই লোপামুদ্রা যখন সংসার-সন্ন্যাসে প্রকৃত দীক্ষালাভ করিল, যখন অগস্ত্য ঋষির পরিণীতা-পত্নী হইয়া একমাত্র কুশবলয়াভরণা, বল্কলবাসপরিহিতা লোপামুদ্রা স্বীয় বস্ত্রাভরণ ও ভোগোপকরণরাশি দাস, দাসী, সহচরী, সখী ও ব্রাহ্মণপত্নীদিগকে যথাযোগ্যরূপে বিতরণ করিয়া, পিতামাতার চরণবন্দনপূর্ব্বক তাহার অভিজাত্যের শেষ নিদর্শনগুলি একেবারে বিলুপ্ত করিয়া বিদর্ভরাজ-ভবন পরিত্যাগ করত পদব্রজে পতির অনুগমন করিতে লাগিলেন, তাহার তাৎকালিক ঔজ্জ্বল্যবিমণ্ডিত পরম রমণীয় পতিব্রতা শ্রীদর্শন আনন্দানুভবের বিষয়, বর্ণনার নহে।

জগতের স্থূলদর্শী জীবগণ কেবল বাহ্যবস্তু ও ক্রিয়ার বিকাশ দর্শনেই পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু যাঁহারা সকল বস্তু ক্রিয়া ও ভাবরাশির অভ্যন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অভ্যস্ত, যাঁহারা রসিক, তাঁহারা এই সকল বাহ্যবিকাশের অন্তরালে একটা কিছু উচ্চতর ও মহত্তর সত্তার অনুসন্ধান করেন ও তাহার দর্শনে পরিতৃপ্ত হন।

পাঠক, চল আমরা একবার সেই আভ্যন্তর দৃষ্টির সাহায্যে লোপামুদ্রার নূতন গৃহস্থালী দেখিয়া আসি। ঐ দেখ লোপামুদ্রার উটজদ্বারশোভি আলবাল-বদ্ধমূল, স্নিগ্ধচ্ছায়াসমন্বিত, তরুতলসমন্ধ নিপানকূলে ক্রীড়াপরায়ণ আরণ্য পশুপক্ষিসকল ও অদূরবর্ত্তী পুষ্পফলান্বিত গুল্মলতাসমূহ সহাস্যবদনে সেই সন্ন্যাসিনী রাজতনয়ার সর্ব্বপ্লাবিনী অগাধ প্রীতির মহিমা তাহাদের নীরবভাষায় কেমন কীর্ত্তন করিতেছে। গোময়মৃত্তিকানুলেপিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র পর্ণকুটিরখানি তাহার অধিশ্বরীর সুমধুর গার্হস্থ্যধর্ম্মানুশীলন ও পাতিব্রত্যমাহাত্ম্য দর্শন করিবার নিমিত্ত অতিথি অভ্যাগতদিগকে কেমন প্রসন্নবদনে আহ্বান করিতেছে। ইতস্ততঃ বিচরণশীল মৃগকুল ও শ্বাপদগণের একত্র সমাহার ও প্রীতিপূর্ণ মিলনের ভিতর দিয়া কি কেবল আশ্রমবাসী তাপস-দম্পতীর অহিংসা প্রতিষ্ঠাই দর্শন করিতে পাইতেছ, না তাহাদের সর্ব্বাত্মক উদার প্রীতির অভিসিঞ্চনে কায়-প্রাণ-মন সিক্ত হইয়া উঠিতেছে? ঐ দেখ নীপ-তরুমূলশায়িত কৃষ্ণসারের প্রতি মৃগবধূ কি অকৃত্রিম কারুণ্যপূর্ণনয়নে সেবাপ্রার্থী দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছে; ঐ মূষিক যুবক জড়াতুর শশকের জন্য কেমন সুকোমল তৃণগুচ্ছ আহরণ করিয়া

লইয়া যাইতেছে, ঐ গলিতদশনা বৃদ্ধা সিংহীকে পান করাইবার জন্ম স্তন্য-ভারাক্রান্তা চমরী করুণমন্থর গতিতে শ্লথ পাদক্ষেপপূর্ব্বক তাহার শিরঃসন্নিহিত হইয়া স্বকীয় স্তনবৃন্ত উহার বদনসংলগ্ন করিয়া দিতেছে।' এই সমুদয় বাহ্য ক্রিয়াসমূহ দর্শনে এই আশ্রমনিবাসী ঋষিদম্পতির গৃহস্থালীকে যাহা বলিতে হয় বলিও, যাহা ভাবিতে হয় ভাবিও।

আমাদিগের তপস্যাসম্বন্ধীয় ধারণা কতকগুলি কষ্টসাধ্য আসন, মুদ্রা ও শ্বাসপ্রশ্বাসরোধক ক্রিয়াকুশলতার মধ্যে এতদূর সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে যে, তাহার প্রভাবে যাহা সহজ ও আমাদিগের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে তাহার প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি পতিত হয় না। ফলতঃ সনাতনধৰ্ম্মসেবী আৰ্য্যগণের দৈনিক জীবনের কাৰ্য্যাবলী—প্রাতরুত্থান ও শৌচাচমনাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় নিদ্রাভঙ্গ পর্য্যন্ত আহার-বিহারাদি যজ্ঞাবতীর্ণ কাৰ্য্যই—একটী মহান্ তপস্যা। ভেদভাবাপন্ন স্থূল দৃষ্টিতে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য সামান্য বলিয়া অনুমিত হইলেও এই সমুদয়েই যে একটী জীবন গ্রথিত বা এই সকলেই যে একটী জীবনের বিকাশ তাহা কাহারই অস্বীকার করিবার ক্ষমতা নাই। আর্য্য জীবনের ইহাই বিশেষত্ব যে তাহার প্রত্যেক কার্য্যের অন্তরালেই ত্রিকালদর্শী ঋষিগণের ত্রিলোকদর্শী সৎবুদ্ধি-পরিস্রুত এক একটী কল্যাণময় বিধি নিহিত রহিয়াছে। সেই সদাশয় নিয়মের মূলে, কেবলমাত্র ব্যক্তির নহে, বিশ্বের কল্যাণ বীজ উপ্ত রহিয়াছে। সেই পরম কল্যাণময়ী নীতির উল্লঙ্ঘন না করিয়া যথাবিহিত রূপে জীবনের কার্য্যাবলী সংসাধিত হইলেই জীবন-যজ্ঞের সম্যক্ উদ্‌যাপন হয় ও অনুষ্ঠাতার তপস্যা পূর্ণ হয়। অন্যথা অষ্টপ্রহর দিবসের মধ্যে চারি দণ্ডকাল কুস্তি কসরৎ করিয়া সারা দিন রাত্রি উচ্ছৃঙ্খল ভাবে যাপন করিলে কোনও লাভ হয় না, তবে উহা মন্দের ভাল সন্দেহ নাই। এই জগন্মঙ্গল নীতির অনুগমনই পুণ্য ও তাহার উল্লঙ্ঘনই পাপ। এই সর্ব্বমঙ্গলময় ধৰ্ম্মের যথার্থতা হৃদয়ঙ্গম করত যাহাই আচরিত হউক না কেন তাহাতেই ধর্ম্মের অঙ্গ অক্ষুন্ন থাকে, অন্যথা আসন, মুদ্রা, প্রাণায়ামাদি দ্বারা কেবল কুস্তি, কসরৎ ও ধৰ্ম্মের গ্লানিই সার হয়।

জীবনযজ্ঞের যথাবিহিত অনুষ্ঠানই অগস্ত্য ঋষির তপস্যা। এই তপস্যা অতীব কঠোর। যে বহুবিধ জীব-মানব-সঙ্কুল সংসারে মুহুর্মুহু অসংখ্য ভাবতরঙ্গনিচয় মানব-মনকে আন্দোলিত করিবার নিমিত্ত নিরন্তর জাগ্রত,

যেখানে অপরিসীম ভোগরাশি সুমধুর মূর্ত্তিতে আত্মতৃপ্তির বাসনাকে আলিঙ্গন করিয়াই রহিয়াছে, যেখানে রূপ-রসাদির মাধুর্য্য সম্পদে সুসজ্জিতা প্রকৃতি অযাচিত ভাবে স্বকীয় সম্পদ্‌সম্ভার দ্বারা জীবহৃদয়কে নিরন্তর অভিনন্দিত করিতেছে, সেই ক্ষেত্রে অব্যাহতচিত্তে মূলভাবে স্থির থাকিয়া নিজের ভোগাকাঙ্ক্ষাসমূহকে বিন্যস্ত করত অবিচলিত চিত্তে ধর্ম্ম প্রতিপালনের ন্যায় কঠোর কার্য্য আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ সংসার তপস্যারই ক্ষেত্র, ইহা ভোগের ক্ষেত্র নহে। যে ব্যক্তি কেবল মাত্র ভোগ-লালসার বশবর্ত্তী হইয়া সংসারধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিতে চাহে, ভোগজনিত সুখ তাহা হইতে অনেক দূরে পড়িয়া থাকে; আর যিনি আপূর্য্যমান অচলপ্রতিষ্ঠ মহার্ণবের ন্যায় ভোগের খেলার অতীত হইয়া, উদাসীনবৎ সংসারের কেন্দ্রে সমাসীন থাকেন, সংসার তাঁহার চরণে তদীয় সমগ্র ভোগসম্ভার উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসে। কারণ সেই আত্মভূত মহাপুরুষের ভোগের জন্যই যে এই সংসার রচিত। ইহা যে সেই পরমাত্মা পরম পুরুষেরই অপরা-প্রকৃতির লীলাঙ্গন! তাঁহাকে বিনোদিত করিবার জন্যই প্রকৃতির যত লীলাখেলা! সেই প্রকৃতি-রূপিণী আর্য্যরমণী তাই পতিদেবতার পদে আত্মবিক্রীতা। পতিদেবতার সেবা ব্যতিরেকে তাহার অপর ব্রত বা যজ্ঞ কিছুই নাই।

পতিকুলে প্রবেশ করিয়াই লোপামুদ্রা তাঁহার সর্ব্বপ্রকার ভোগ সংযত করিলেন। জীবন ধারণের জন্য যে তাহার নিদ্রাদি একান্ত আবশ্যক তাহাও সুসংযত করিতে বিরত রহিলেন না। অগস্ত্য ঋষি প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করেন, সুতরাং লোপামুদ্রা তাহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করত পতির প্রাতঃকৃত্যের আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহ যথাস্থানে সুসজ্জিত করিয়া রাখিতেন। ঋষিপ্রবর শৌচাদিব্যপদেশে গৃহত্যাগ করিলে সেই সময়ের মধ্যে গৃহ ও অঙ্গনাদি মার্জ্জন করত নিজে শুচিস্নাতা হইয়া আসিতেন। যতক্ষণ ঋষিপ্রবর হোমগৃহে থাকিয়া তদীয় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিতেন দেবী ততক্ষণ গৃহস্থিত পশু পক্ষী ও উদ্যানস্থ বৃক্ষাদির সেবা, সমিৎচয়ন, পুষ্পদূর্ব্বাদি আহরণ ও রন্ধন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করত অবশিষ্ট সময় কখনও বা নিভৃতে বসিয়া পতিদেবতার ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন; কিসে তাঁহার পতির সুখ ও আনন্দ লাভ হইবে, সকল প্রকার মননের মূলে তাহাই তাঁহার প্রধান চিন্তা ছিল। তাহার পরে পতির অভিমত হোমোপচার সংগ্রহ ও আদেশানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করত প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত যাবতীয় কার্য্য নিরলসভাবে ও উৎসাহিত

চিত্তে সম্পাদনপূর্ব্বক পতির নিদ্রাকর্ষণ পর্য্যন্ত তদীয় অঙ্গ শুশ্রূষা তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। এতদ্ব্যতীত স্বামী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে যখন যেই নৈমিত্তিক কার্য্যের আদেশ প্রদান করিতেন, তৎসমুদয় যথোক্ত বিধানে উদ্‌যাপনের নিমিত্ত নিয়ত তৎপর থাকিতেন ও প্রাণপণে তাঁহার উপদেশ প্রতিপালন করিতেন। বস্তুতঃ তিনি তাঁহার দাসী, শিষ্যা, সখী ও মাতার ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে তাঁহারই সেবায় নিরত থাকিতেন। কোনও দিন যখন স্বামী জপ-তপস্যাতে নিযুক্ত থাকিতেন, তিনিও অবিচলচিত্তে তাঁহার নিকটে উপবেশন-পূর্ব্বক, সমাহিত অবস্থায় যাহাতে তাঁহার দেহের কোনও বিঘ্ন না হয় তাহারই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এইরূপে তাঁহার বহুদিবস যামিনী অনাহার অনিদ্রায় কাটিয়া যাইত, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও ছিল না। ঈদৃশ ভোগ-সঙ্কোচের মধ্যেও লোপামুদ্রা, পতির মঙ্গলোদ্দেশে স্ত্রীজনোচিত কেশপ্রসাধন, সিন্দুর কজ্জল ও অলঙ্কারাদি মাঙ্গল্য দ্রব্যের ব্যবহারে কখনও বিরত থাকিতেন না। মূল কথা, তাঁহার দেহ, প্রাণ, মন বুদ্ধি সমুদয়ই পতিময় হইয়াছিল, তিনি তাঁহার পতির ছায়ার ন্যায় অবস্থিত থাকিতেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক চৌধুরী।

প্রকৃত পূজা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

রজনী প্রভাত হইল,—সেই কাল রজনী প্রভাত হইল। রজনীও কাল নহে; কালও রজনী নহে। কাল কালই। আমরা ক্ষুদ্র তাই সেই মহা-কালের অনন্ত, নিত্য-বিদ্যমান সত্তাকে আমাদিগের মানদণ্ড,—দিন, মাস, বর্ষাদি দ্বারা পরিমাণ করিতে যাইয়া আমরাই আমাদের মানদণ্ডের মোহটুকু বুকে লইয়া সুখ দুঃখের সৃজন করত হাসি, কান্নার কোলাহল তুলি। কিন্তু কাল!—সর্ব্বকলয়িতা কাল!—সেত নির্ব্বিকার!! এই যুগ্মাতনয় কালের কোলে সুখে নিদ্রা যাইতে ছিল—এখন আর নাই; কোথায় গেল? কালের মহান্ অঙ্ক ছাড়িয়া কোথাও গেল কি? না। কালের কোলে যেখানে ছিল সে-খানেই রহিল; প্রভেদ কেবল ব্যক্ত আর অব্যক্তে; তখন সর্ব্ব জীবের প্রাকৃত

দৃষ্টি সমীপে ব্যক্ত ভাবে ছিল, তখনও সে কালের কবলে থাকিয়াই তিলে তিলে-পরিমিত আমাদের লৌকিক মানদণ্ডের তথাকথিত বিংশতিবর্ষ আমাদের স্থূল নয়নের গোচরীভূত ছিল; এখন আর তাহা নাই! নাই কেন? ঐ যে "সে ছিল এখন নাই—" এই একটী স্মৃতির বিষয় হইয়া'ত সেই আছে! ইহাও ত এক প্রকার থাকাই। তবে তার কি নাই? কে বলিবে কি নাই! দেহ! দেহত পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেরটা পর মুহূর্ত্তেই থাকে না? তার' আবার থাকাথাকি কি? তবে বোধ হয় যে ছিল সে আছে, তাহার যাহা যথার্থ সত্ত্বা তাহা বুঝি যায় নাই. সেই মহাকালের অঙ্কে বুঝি তবে সকলেরই যাহা সারাৎসার—যাহাকে লইয়া আমি আমি হইয়াছি—তাহা থাকে! মহাকালই বোধ হয় আমাদের ব্যক্ত জীবের পরম আশ্রয়!! কালকে যথার্থ ভাবে পরম আশ্রয় বলিয়া বুঝিতে পারিলেই বুঝি জীবের সকল শোক, দুঃখ, যন্ত্রণাদির অবসান হয়। আমরা আমাদেরই মানদণ্ডের ভিতর দিয়া কালকে দেখি বলিয়াই, সেই মহান অনন্ত সত্বাকে, সেই বিশ্বনিয়ন্তাকে আমাদিগের সামান্য সুখ দুঃখের নিয়ন্তা রূপে দর্শন করিয়া থাকি। তাই আজ সুধন্মার গৃহে বজনী কাল-রজনী রূপে প্রভাত হইল। ত্রিযামার অবসানে সকলেই ইষ্টদেবতা ও গুরুদেবকে স্মরণ করত শয্যাত্যাগ করিলেন। ভূতাধিষ্ঠাত্রী বসুমাতাকে বন্দনা করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। সেই নিদ্রিত জগতের জাগরণ-কোলাহল যখন অব্যক্ত নিনাদের ভঙ্কার ঝঙ্কারে ধরাতলে গমগমায়িত হইতেছিল, সুধন্মা-স্নুষা তখন নবজাগরণের আবিল স্মৃতি ও সংস্কার বশতঃ পতিপদাভিমুখে প্রসারিত-কর-পল্লবে কি-জানি-কি স্পর্শ করিয়া সহসা চমকিয়া উঠিল। তখন তাহার নিদ্রাভিভূততা বিদূরিত হইয়া গেল; কি এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব বিভীষিকায় তাহার সমস্ত দেহ-মন, কাঁপিয়া উঠিল; সেই শঙ্কা, সেই ভীতিবিহ্বলতা, বিধুরা: বালিকাকণ্ঠে চিৎকাররোলাভিনয় করিয়া সমস্ত পুরবাসাদিগকে সেই স্থানে সমবেত করিয়া আনিল। সকলে আসিয়া যাহা দেখিল তাহাতে সকলেরই চক্ষু স্থির। সুদেহা—সেই পুত্রহন্ত্রী, সুদেহা—মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। ইহা কি যথার্থই মূর্চ্ছা না মূর্চ্ছার অভিনয়! মূর্চ্ছা হইলে ইহা বোধ হয় শোকজনিত মূর্চ্ছা নহে; স্বকৃতদুষ্কৃতির প্রকাশ-ভয়-জনিত মূর্চ্ছাই হইবে।

মহাকবি বাল্মীকি, শ্রীরামচন্দ্রের বনগমন-বর প্রার্থনার প্রাক্কালে কৈকেয়ীর কণ্ঠে অবিদ্যার আশ্রয় দেখাইয়া পরে ভরতসন্নিধানে তাঁহার আজন্মসহচরী শ্রীরামবাৎসল্য প্রদর্শন করত মানব প্রকৃতিকে কি এক অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যের

আভায় সুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। পাঠক আমরাও আজ সুদেহার চিত্র-পট খানিকে তাদৃশ অলৌকিক আলোকসম্পাতে মনোহর করিয়া দেখি না কেন? সুদেহার চিত্র প্রকৃত প্রস্তাবে নাহয় তাদৃশ নাই হইল; আমাদিগের কল্পনার আলোকে না হয় তাহাকে একটু উজ্জ্বল, একটু সুন্দর করিয়াই দেখিলাম। সেওত মানব! আমরাও মানব! স্বজাতির প্রতি একটা বিসদৃশ ভাব কেন পোষণ করি। সুদেহাত মহামায়ার অবিদ্যালীলার অতীত হয় নাই! সংসারের কেহইত সেই মহাদেবীর কবল হইতে দূরে থাকিতে পারেন নাই! জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা, বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি! সুদেহাত সামান্য স্থূল দেহাভিমানিনী মূঢ়া রমণী।

মূর্চ্ছিতা সুদেহার পদতলে ছিন্ন-মূলা ব্রততীর ন্যায় পতিতা সুধর্ম্মা-সুষার মৃতবৎ দেহখানি মথিত করিয়া মাঝে মাঝে এক একটী মর্ম্মভেদী ও—ম্‌—ম্‌ ম্‌—মা—ধ্বনি বহির্গত হইয়া তাঁহার স্তিমিতপ্রায় জীবন-দীপ-কলিকার অস্তিত্বের আভাস প্রদান করিতেছে। শিষ্যগণপরিবৃত সুধর্ম্মা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান। সুধর্ম্মার শিষ্যগণ শঙ্কিত, চকিত ও ত্রস্ত।

এ দিকে ঘুশ্মা—শিবার্চ্চন-পরায়ণা ঘশ্মা শিবধ্যানে বাহ্যজগৎ বিস্মৃতা; বাহিরের কোনও শব্দকোলাহল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। তাঁহার হৃদয়-সরসিজ পরদেবতার পরাজ্যোতিঃপ্রভায় পরিপূর্ণ ও উদ্ভাসিত। তাহাতে অপার আনন্দ-সুধা-সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়া ঘুশ্মার ক্ষুদ্র আত্মজ্ঞানকে নিমজ্জিত করিয়া রহিয়াছে। সেই সুধাব্ধিমধ্যবর্ত্তী রত্নদ্বীপ অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করত স্বীয় শুভ্র জ্যোতিতে দীপ্যমান, সেই রত্নদ্বীপের উজ্জ্বল জ্যোতিতে সুসংশ্লিষ্টমূল শাখাপ্রশাখাদি শোভিত কল্পতরু! আহা মরি, মরি, ভক্তিমতী ঘুশ্মার যাবতীয় চিত্ত-বৃত্তি সেই কল্পবৃক্ষের শাখা প্রশাখায় প্রবিষ্ট হইয়া নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান। সেই বৃক্ষের মূলদেশে ঘুশ্মার দেবতা—প্রাণের দেবতা—হৃদয়ের দেবতা—দেবাদিদেব মহাদেব উপবিষ্ট। সেরূপ—সে অপরূপ রূপ কে বর্ণনা করিবে? যে সেই রূপ দেখিয়াছে সে কি আর সে আছে? "নুণের পুতুল সাগর মাপিয়া উঠিয়া আসিলে ত' সাগরের গাম্ভীর্য্য সমাচার জানাইবে? শাস্ত্রও তাহার ইঙ্গিত মাত্র করেন; তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে এমন মহামান্য শাস্ত্রও হারি মানিয়াছেন—তাই সর্ব্বদর্শী শাস্ত্র সেই পরম উদার আত্ম-স্বরূপ মহেশ্বরকে ধ্যানযোগে দেখিতে পাইলে যাহা অনুভূত হয় সেই পরম সূক্ষ্মতমের একটী স্থূলতর আভাস দিয়া বলিয়াছেন—

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজত-গিরি-নিভং
চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং
পরশু-মৃগ বরাভীতি-হস্তং প্রসন্নং।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিবসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥

কুলকুণ্ডলিনীবিগলিত সুধাধারা সেই পরম দেবতার পাদ্যরূপে অর্পিত হইল; এইরূপে যুশ্মার মন অর্ঘ্যরূপে; সহস্রারবিগলিত অমৃতধারা আচমনীয় রূপে, ক্ষিতি ইত্যাদি তত্ত্ব সমূহ গন্ধরূপে, দয়াদি কমনীয় কোমল ভাবসমূহ পুষ্পরূপে, প্রাণ ধূপরূপে, তেজ দীপরূপে, ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেক নৈবেদ্য রূপে, সুধাসমুদ্রসলিল পানীয়রূপে আর হৃদপুরমুখরিত অনাহত ধ্বনি বাদ্যরূপে সেই দেবতার পদে অর্পিত হইল। যুশ্মার যাহা কিছু সেই পরদেব-পদাম্বুজে অর্পিত হইয়া তাঁহার হইয়া গিয়াছে, তাহা আর যুশ্মার নাই। যুশ্মা তন্ময়! যুশ্মার এই তন্ময়তা এই একতানতা কে ভঙ্গ করিবে? সদাবিরহিতকান্তা, অজ্ঞাত-বিরহ বেদনা সুষার মর্ম্মমথিনী সংবাদ যুশ্মাকে কে দিবে? বিশ্বের মনোময়ী প্রকৃতি নিজাঙ্গজ মনোভবকে সঙ্গে লইয়া যুশ্মার পূজায় ফুলে সরস চন্দনানুলেপন সহযোগে সুষায় পাংশুধবল বদনমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া মনোভবের তরল উষ্ণ নিশ্বাসে তাহার মন্মবাণী লেপিয়া দিলেন যুশ্মার স্থূল দেহের কর্ণকুহরে সুষার সেই এক-মাত্র প্রণব ধ্বনির ন্যায় মর্ম্ম বিগলিত ওঁ—ম্ঁ—ম্ঁ—মা—ধ্বনি পাবিষ্ট হইল কিন্তু উহা তাহার হৃদয়রাজিত পরদেবতার পদে বম্ বম্ ধ্বনিতে পর্য্যবসিত হইয়া যুশ্মার যুশ্মাকে পরানন্দ মধ্যে ঘনীভূত করিয়া তন্ময় করিয়া তুলিল। ধন্য হর-তপ-ভঞ্জন স্মর শিবের তপস্যা ভঙ্গ করিয়া তুমি যে পৌরুষ অর্জ্জন করিয়াছিলে শিবভক্তের নিকট পরাজয়ে আজ তোমার সেই বিজয়শ্রী কত উজ্জ্বল হইয়াছে? দেখ মদন; দেখ, দেখিয়া আনন্দিত ও পূর্ণকাম হও? যেই পরপদ প্রান্তে পঁহুছিবার জন্য তুমি অনঙ্গ হইয়াছ, হে মনোভব আজ ভক্তাশ্রয়ের অপূর্ব্ব পুণ্য-ফলে তুমি প্রেমের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই পরপদে উপনীত হইতে সমর্থ হইলে? দেবি মানসীপ্রকৃতি তুমিও আজ ধন্যা, দেখ তোমার সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মিকা খেলার চঞ্চলতা আজ কি মহান্ কৌশলে সেই পরমপদে লীন হইয়া বায়ু ব্যোম, বিশ্বচরাচরে কি এক মনোহর রবে মুখরিত হইতেছে? বাহ্য কর্ণে তাহার সেই অব্যক্ত পরানুভূতির ব্যক্তভাষা "নমঃ শিবায়" "নমঃ শিবায়"। যেই প্রকৃতিদেবী মনোভব সহায়ে যুশ্মার হৃদয়পুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন

তিনি'ত সেই পরমকারণ পরদেবতার প্রকৃতিই ; তিনি মানসী মূর্ত্তিতে বিরাজমান থাকিলেও তিনি সর্ব্বাত্মিকা ; কাযেই যুশ্মার হৃদয়ের আনন্দাভিসিঞ্চনে তিনি যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন তাহা স্বভাবতঃ সর্ব্বে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল সুতরাং মুষাও ক্ষণকালের নিমিত্ত বিলুপ্ত-চেতনা সুষুপ্তার ন্যায় পড়িয়া রহিল।

যুশ্মার শিবার্চ্চন যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে লাগিল। যুশ্মার বহিরঙ্গ সকল যেন অন্তরঙ্গের সহিত সমানুপাতিত কি এক অলৌকিক সংস্কার বশে কার্য্য করিয়া যাইতেছিল, বাহিরের সমগ্র দ্রব্য সেই এক অদ্বৈত সত্ত্বা ব্যতিরেকে আর কিছুরই ইঙ্গিতে অসমর্থ, তাই সকল বস্তু, ক্রিয়া ও ভাব এক অদ্বৈত সত্ত্বায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যুশ্মার পূজার সহায়তায় তৎপর হইয়াছিল। যুশ্মা, একটী পুষ্প লইয়া পরদেবতার পদে অর্পণ করিলেন। আবার সেই সাক্ষাৎ শিবময় মন্ত্র উচ্চারিত হইল—'নমঃ শিবায়'। কুসুমে, যুশ্মা-হৃদয়ে ও শিবমূর্ত্তিতে, সমস্বরে ধ্বনিত হইল 'নমঃ শিবায়'—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশে ধ্বনিত হইল—'নমঃ শিবায়' রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দে গীত হইল—'নমঃ শিবায়' ; যেমন নকার, মকার, শিকার, বকার, ও যকার, মিলিয়া এক অর্থ ঘোষণা করিতেছে 'নমঃ শিবায়', তেমনই যুশ্মার বাহ্য জগৎ, বাহ্য ইন্দ্রিয়, অন্তর্জ্জগৎ, অন্তরেন্দ্রিয় ও মন সব মিলিয়া একটী অর্থ ঘোষণা করিল 'নমঃ শিবায়'। কি আলোক-তরঙ্গ, কি শব্দ তরঙ্গ, কি অন্তর্বাহ্য অনুভূতির অনন্ত মনোময় তরঙ্গ, সকলই সেই এক সর্ব্বব্যাপী শব্দ-তরঙ্গে—সেই 'নমঃ শিবায়' সঙ্গীতে, মিশিয়া কোথায়—কোন্ অনাদি-অনন্ত মহাশূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে। আর যুশ্মা, বারম্বার নমস্কার নিরত হইয়া ভক্তি উদ্গত চিত্তে তন্ময় হইয়া যেন কোন প্রাণের প্রাণতম, পরাৎপর, ঘন দেবতার চরণে বিলীন হইতেছেন।

যুশ্মা, তখন 'শর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ" বলিয়া সমগ্র বিশ্বের আধার ভুত একমাত্র মহান্ সত্ত্বা, ক্ষিতিতত্ত্বোপলক্ষিত সর্ব্বশক্তির, জ্ঞানের, বস্তুর, ও ক্রিয়ার আধার ভাব যাঁহাতে নিরন্তর সংন্যস্ত সেই পরমতত্ত্ব শিবে আত্মনিবেদন করিলেন। তখন সর্ব্বাধার স্বরূপ ক্ষিতিতত্ত্ব উজ্জ্বল বিভূতিরূপে সেই পর অঙ্গে দ্যোতিত হইয়া উঠিল যুশ্মা বুঝিলেন তাহার পর-অঙ্গের সামিপ্য বশতঃই ক্ষিতি, তত্ত্বরূপে তাঁহার বিভূতি আর তিনিই ভূমা তত্ত্বনিচয়ের তত্ত্ব। সেই পরাগন্ধমোদিতক্ষিতি তত্ত্বের অধিষ্ঠানপদে যুশ্মা আত্মনিবেদন করিলেন—"নমঃ শিবায়"।

সর্ব্বের যাবতীয় বিচ্ছিন্নভাবরাশি যে তত্ত্বরসে দ্রাবিত ও অনুপিণ্ডিত হইয়া যায় ও যাহা তৃপ্তির আভাসসূচক, পিপাসায় শান্তিসূচক, আপ্যায়নী জলরূপে বিলসিত আপ্‌তত্ত্ব সেই তত্ত্বাভ্যন্তরে ধ্যানের একতানতায় দেবাদিদেবের ভবমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করত তাহাতেই দ্রবীভূত হইয়া সেই আনন্দময়ের তৃপ্তি সুধা পানে বিভোর হৃদয়ে "ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ" বলিয়া তাঁহাতেই আপনাকে ভাসাইয়া দিলেন। উৎগ্রাহিণী মাতরিশ্বা তত্ত্বের অন্তরালে তাঁহাকেই তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা বিলোকন করত "উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ" বলিয়া সেই তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা উগ্ররূপী পরদেবে আত্মসমর্পণ করিল, যুধ্মার ত্রিপুটীর সামান্য ও বিশেষ বন্ধন, পবন ঘূর্ণাবর্ত্তবিতাড়িত ধূলিকণার ন্যায় কোথায় উড়িয়া গেল। যুধ্মা তখন শব্দতত্ত্বের নিধান স্বরূপ ভীমরূপী আকাশ-মূর্ত্তি পরদেবতাকে কারণাব্ধিশায়ী সঙ্কর্ষণরূপে অবলোকন করত নিত্যানন্দস্বরূপ সর্ব্বকারণ-কারণ ভয়ানাং ভয়ং, নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং পরদেবতায় পদে "ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ" বলিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। এইরূপ ক্ষিতিতে সর্ব্বাধার তত্ত্বরূপে, শর্ব্বমূর্ত্তি জলে রসতত্ত্বরূপে ভবমূর্ত্তি, অগ্নিতে রুদ্রমূর্ত্তি, বায়ুতে উগ্র বিগ্রহ আকাশে ভীমরূপে ভূমা মনে শ্রীগুরুমূর্ত্তিতে পশুপতিরূপে, বুদ্ধির অবসানতত্ত্বে সর্ব্বজ্ঞানালয় সোমমূর্ত্তিতে মহাদেবরূপে ও আত্মাতে ঈশানরূপে সূর্য্যরূপী শুদ্ধঅহঙ্কারতত্ত্বে অধিরূঢ় হইয়া আমি তুমি প্রভৃতি ভেদের ভাষা বিস্মৃত হইয়া কি এক অনির্ব্বচনীয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির মর্ম্ম কন্দরে উপনীত হইয়া 'নমঃ শিবায়" মন্ত্রে কখনো বা "শিবোহহং" কখনও বা "সোহহং" কখনও কেবল 'অহং" কখনও বা 'তং' মাত্র প্রত্যয়ের একতানতায় তাহার মনঃকন্দর মুখরিত হইয়া উঠিল। বাহিরে শিষ্যবর্গের হাহাকার ও আত্মীয়গণের কোলাহলময় আর্ত্তনাদে যুধ্মার হৃদয়ে সেই একই তান ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল "নমঃ শিবায়"।

অদূরে সুধর্ম্মা দণ্ডায়মান। বাষ্প বিগলিত নয়নে ভক্তিমতী পতির পরদেব প্রেমামৃতপানপুলকিত শান্ত, স্থির, জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডলে, পরদেবের কস্তুরি কুঙ্কুমরাগানুলেপিত বিভূতির আভাস পাইয়া একতান-প্রাণমনে তাহাই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যোগিগণের চিত্তবৃত্তি নিরোধ, সাংখ্যের তত্ত্বা-বলীর অবসান, বেদান্তের লক্ষ্য সমাধির ভাষা সেই এক ভক্তিমতী অবলার মুখমণ্ডলে সার্থক দর্শন করিয়া সুধর্ম্মা শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যানুধাবনে কৃতার্থ হইলেন ও বুঝিলেন যুধ্মার যিনি অন্তরাত্মা সে আর ইহধামে নাই, সর্ব্ববেদ যাঁহার পাদপীঠসমীপে সুষুপ্ত হইয়া পড়ে সে তাঁহার সেই পরমানন্দকন্দরে অবগাহিত ও নিমজ্জিত রহিয়াছে, তাই শাস্ত্রের ভাষা উহার বহিরবয়বে দ্যোতিত হইতেছে। সুধর্ম্মা দেখিতে দেখিতে পুত্রশোকাদি বিস্মৃত হইয়া ভক্তিরসপ্রবাহে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। এইভাবে কিয়ৎকাল অবস্থিত থাকিয়া তিনি সে স্থান হইতে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৫ম ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ ; ১৩২৩। [২য় সংখ্যা

জীবনসর্ব্বস্ব।

(১)

আমি যারি তরে দিবানিশি কান্দি, তুমি দেখি শুধু তাই।
আমি যাহা চেয়ে ছুটি দেশে দেশে, তোমাতেই তাহা পাই॥
যাহা কিছু আমি শয়নে স্বপনে, গেয়ানে ধেয়ানে প্রেমে জাগরণে
অলসে বিলাসে সুখে সমাধানে যেখানেই যাহা পাই,
সবই দেখি তুমি, চাওয়া পাওয়া ছলে তোমারেই শুধু চাই॥

(২)

আমি যাহা কিছু পাই নাই ভবে তারও মাঝে তব ঠাঁই।
যাহা কিছু আমি যাচি নাই কভু সেথায় গো তুমি তাই॥
আমি যাহা কিছু মনে প্রাণে জ্ঞানে পারি নাই কভু ধরিতে জীবনে
তারও মাঝে তুমি রয়েছ গোপনে, আমি তাহা দেখি নাই ;
(শুধু) অন্ধেরি মত ঘুরিয়াছি কত, পথ নাই দিশা নাই॥

(৩)

আমি ভাবিয়াছি এ জীবন বুঝি মিছে হ'য়ে সব গেল।
এ বুকের মোর আরাধনা যত, হাহাকারে ভরে র'ল।
তাহা নয়, ওগো নিয়ত গোপনে পরশন তব রেখে গেছ মনে,
মুগ্ধ-জীবন বেড়ি অযতনে শুধু হাসিটুকু র'ল।
আমি বুঝি নাই—নির্ব্বাক ভয়ে, কিসে কি যে মোর হ'ল॥

(৪)

আমি ভাবিয়াছি চাওয়া পাওয়া বুঝি সবই মোর ধুলা-খেলা,
সবই এক মায়ামৃগিকার মত, শত স্বপনের মেলা ;
সবই বুঝি মোর অন্ধ জীবনে ধুয়ে মিশে যাবে ধূলিকণা সনে,
একটুকু তার রহিবে না মনে, শুধু ফাঁকা শুধু ছলা।
তাহা নয়, এযে মহাজীবনের বন্দনাহীন খেলা ॥

(৫)

আমাব যে সুখ এ ভুবন মাঝে, বহু রূপে বহু সাজে
নিতি নিতি আসে নব নব ভাবে, নব অভিনয় মাঝে ,
ভাবিতাম বুঝি সে শুধু কেবল, পুঞ্জে পুঞ্জে হাসি নিরমল,
তাহা নয়, এযে তব সুকোমল প্রিয় বাহুপাশ রাজে ,
তোমারি নিবিড় মন্দির হতে সুমধুর বাঁশী বাজে ॥

(৬)

এত কাল আমি আমাব এ হৃদে, স্নেহ দয়া মায়া যত
আপনার বলি কত না গরবে পুষিয়াছি অবিরত ,
তাহা নয়, তুমি একা দেখি এসে, সব দয়া মায়া স্নেহ ঢেকে বসে,
মহা আকাশের সমীরণে মিশে, আছ ভাব নিয়ে রত ;
বন্দনা গীতি ভকতি মুকতি, মিলে মিশে অবিরত ॥

(৭)

আমি ঘুরিয়াছি সারা চরাচরে, মিছামিছি তোমা খুঁজে ,
মিছামিছি সব বন্ধ আগারে, অন্ধেরি মত সেজে ॥
তুমি যে আমার,আপনার মনে আপনার প্রাণে আপনার সনে
চির নিভৃত মরম আসনে রহিয়াছ বর সাজে।
আমি দেখি নাই আঁখি পালটিয়ে, শুধু মরিয়াছি খুঁজে ॥

(৮)

অই যে অসীম আলোক ঝাঁপিয়ে রাশি রাশি পড়ে ছুটে,
ধেয়ান রঙ্গিন মায়ারথে চড়ে, ধরণীর বুকে লুটে,
তাহাদের চল চঞ্চল দোলে, তব প্রাণ খানি শুধু হাসে খেলে,
আমি দেখি নাই ভাবিয়াছি বুঝি শুধু শুধু নিতি ফুটে।
তাহা নয়, এযে আলোকের মাঝে, আছ তুমি করপুটে ॥

(৯)

নিতি সাঁজ হ'তে নিবিড় আঁধারে অবশে রহগো জাগি
নিত্য নিয়মে চাঁদিমা কিরণে অর্ঘ্য লহগো মাগি ॥
নিতি সাঁজ ফুলে অধরে কপোলে, গ'রমায় ঝরে পড়িছ বিরলে,
সারা চরাচরে শূন্যে সলিলে, স্নিগ্ধ পরশে লাগি।
নিতি নিতি তুমি বিশ্বের দুয়ারে উপহার লও মাগি ॥

(১০)

রাশি রাশি বাজ মাথায় পরিয়ে, গুরু গম্ভীর নাদে,
অসীম শূন্যে কাল পাখা মেলি মরণ তীব্র স্বাদে,
অই ছুটে যায় আঁখি পালটনে, শত ঝঙ্কার মহাঝল্‌কানে,
অশীতি লক্ষ মরণ সৈন্যে, পরলয় কলনাদে
তারও মাঝে তুমি বাধা দেখি তব, অমৃত পারস্বাদে ॥

(১১)

তুমি শুধু বাধা নহ মোর প্রাণে, নহ শুধু তুমি মনে,
নহ শুধু তুমি বাক্যে বিমানে, সখ্যে প্রণয়ে দানে ॥
নহ শুধু তুমি বদ্ধ নিয়মে, দীক্ষা শিক্ষা ধরমে করমে,
মোক্ষেরি দ্বারে মুক্ত মরমে, আর্ত্তেরি ক্ষীণ তানে'
মুগ্ধেরি মত বুঝিছই শুধু, বিশ্বেরি সব টানে ॥

(১২)

জীবনে মরণ-পয়োধি ছুটায়ে, জীবন মরণ জুড়ি,
মরণের পারে মহা অবসাদে, বাধা বন্ধন ছিঁড়ি,
কিযে এক মহা অজ্ঞেয় লোকে, এক নিরাবিল নিঝুম আলোকে
আছ চিরকাল আপনারে ঢেকে, চিদ অন্তর বেড়ি,
স্বর্গের সুর সপ্তক সনে, মর্ত্ত্য সাহানা জুড়ি ॥

(১৩)

প্রভো!
তব মঞ্জুল রাগিণীর সনে, (মম) দীন পিপাসিত স্বরে
ভ'রে থাক্ মোর স্মৃতিভাণ্ডার, অমিয় পরশ তরে;
তব ভঙ্গিমা অন্তর হ'তে, ছুটে যাক্ তব স্বপনের সাথে
দোলায়ে আবেশে আলোকে দ্যুলোকে, অলক্ষিত মহাঝড়ে।
মহা নিভৃত সাগরের এক, নিরাবিল দেশ পরে ॥

শ্রীনরেশভূষণ দত্ত।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-বদনকমলনিঃসৃত অমৃতময় প্রেম-পরিপ্লুত অপূর্ব্ব উপদেশে ও নন্দনন্দনে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতারূপ আচরণে ভক্তিমার্গের যে আত্মহারা বাহ্যজ্ঞানহীন প্রেমের পরাকাষ্ঠা মহাভাবমাধুর্য্যের যে আভাস পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে প্রবন্ধান্তরে "পন্থার" পাঠকগণের নিকটে উপহার প্রদান করিয়াছি। প্রেমের সেই মহাভাব সাধারণ বা প্রাকৃত জীবে সম্ভবপর নহে। সে ধর্ম্ম ত্রিগুণাতীত সর্ব্বত্যাগীর ধর্ম্ম। ভাগবত তাঁহাকে "প্রোজ্ঝিত কৈতব" ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সে ধর্ম্মের আরম্ভ আপনার স্বরূপ নির্দ্ধারণের পর।

রাগানুগা-ভজনের দেহ—প্রাকৃত দেহ নহে। প্রাকৃত দেহ দ্বারা সে ভজন সিদ্ধ হয় না। সে ভজন স্বাভাবিক—তাহাতে চিত্ত সমুদ্রাভিমুখী ভাগীরথী-প্রবাহের ন্যায় নিরন্তর অবিচ্ছিন্নগতিতে ছুটিতেছে—সে দেহ চিদানন্দময়। মহাপ্রভু নিজেই বলিলেন—

* * বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥

* * * *

অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

তাই প্রকৃত বৈষ্ণব হওয়া বড় শক্ত কথা। বৈষ্ণব অভিমান সহজসাধ্য, কারণ তাহাতে চিত্তের সে গতির কোন কথাবার্ত্তা নাই—শুধু বহিরঙ্গ কতকগুলি আচার-পদ্ধতি অবলম্বন করিলেই হইল। মহাপ্রভুর জীবনে একটী ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, বৈষ্ণবতা ও বৈষ্ণবতার অভিমান সম্পূর্ণ পৃথক্। যখন মহাপ্রভু তীর্থভ্রমণব্যপদেশে দাক্ষিণাত্যে মধ্বাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করিতে যান, তখন সেই তত্ত্ববাদী বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বোধে কোনরূপ সম্ভাষণ করিল না।

তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদী জ্ঞানে।
প্রথমে প্রভুর না কৈল সম্ভাষণে॥

অন্তর্য্যামী গৌরচন্দ্র তাহাদের হৃদয়গত ভাব বুঝিতে পারিলেন। জীবকুলের কল্যাণকল্পে যাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ, তিনি তাহাদিগকে এই ঘোর ভেদদুষ্ট বৈষ্ণবাভি-

মান হইতে উদ্ধার না করিবেন কেন? প্রকৃত বৈষ্ণব ঐরূপ ব্যক্তিগত সাম্প্রদায়িক ভাবের উপাসক নহে—তাঁহার নিকট জীবমাত্রই সেই পরমপুরুষের প্রকাশ-শক্তি। ভেদাত্মক বুদ্ধি বৈষ্ণবতার অন্তরায়—বৈষ্ণবাভিমান কখনও সেই পরমপুরুষের মিলনে সহায়তা করিতে পারে না।

"বৈষ্ণবতার গর্ব্ব" হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকাতেই তাঁহাদের মনে হইয়াছিল "এত আর বৈষ্ণব নহে, মায়াবাদী সন্ন্যাসী," কাজেই তাঁহার সহিত সম্ভাষণের প্রয়োজন বুঝে নাই—আমরাও সম্প্রদায়ের এই মোহে ডুবিয়া আছি বলিয়া কত সময়ে মহাত্মাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতেছি। শাস্ত্রে সম্প্রদায়ের সার্থকতা অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছে বটে তাহার অর্থ ভেদাত্মক গণ্ডীর দৃঢ়তা করিবার জন্য নহে—সম্প্রদায়ের মধ্যে একত্ববুদ্ধি সংসাধনে একত্ববুদ্ধির উন্মেষে যাহাতে "সর্ব্বের" মধ্যে ঐ অভেদ ভাব প্রকট হয় সেইজন্য।

ভগবানই ত সত্য বস্তু—যাহা সত্য তাহার ত ব্যভিচার হয় না; তাহা ত সর্ব্বপুরুষ সাধারণ। ব্যক্তিগত ভাব বা অভাবের জন্য সত্য বস্তু পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। কাজেই যাহা সকল বস্তুর ভিতর দিয়া সর্ব্বকালে সর্ব্বাবস্থায় একই ভাবে প্রতীয়মান হয় তাহাই সত্য—এই সত্য বস্তু ভেদের ভাষায় বুঝিতে গিয়াই বিশিষ্ট ভাবের উপাসনার সৃষ্টি হইয়াছে। এই ভেদদুষ্ট ভাবেই এক সম্প্রদায়ী অন্য সম্প্রদায়ীকে একটু পৃথক্ রাখিবার চেষ্টা করে, কাহাকেও বা হীন সম্প্রদায় বলিয়া মনে করে। কেহ বা অন্য ধর্ম্মের নিন্দা বা গ্লানির দ্বারা আপন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতে প্রয়াস করেন। মহাপ্রভু কিন্তু প্রথমেই "অমানী মানদ" ভাবের কথাই উপদেশ দিয়াছেন। ভিতরে অভেদভাব না জাগিলে বাহিরে কি সে ভাব প্রকাশিত হইতে পারে? যাহাই হউক, তত্ত্ববাদী বৈষ্ণবগণ প্রথমে সম্ভাষণ না করিলেও সেই প্রেমিক-প্রবরের বাহ্যজ্ঞানহীন প্রেমাবেশে নৃত্য সন্দর্শনে তাহারা বৈষ্ণব বলিয়া বুঝিলেন—তখন ব্যস্ত হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন—মহাপ্রভু বুঝিলেন যে ইহাদের হৃদয়ে "বৈষ্ণবতা-গর্ব্ব" স্থান পাইয়াছে। কারণ "এই ব্যক্তি বৈষ্ণব" এই জ্ঞানে বৈষ্ণব-সেবা—সেবার অন্তর্ভূত হইলেও মহাপ্রভু বোধ হয় ইহার এতটুকু ক্ষুদ্রভাবে পরিতুষ্ট হইতে পারিলেন না। তত্ত্ববাদিগণের সৌভাগ্য উদয় হইয়াছিল, তাই মহাপ্রভুর অমৃতায়মান উপদেশ শ্রবণে তাহাদের ভ্রমান্ধকার দূরে গেল। যে প্রকৃত বৈষ্ণব তাহার আত্মপর ভেদ নাই, সে যে চিদানন্দময়—উপাসক সচ্চিদানন্দ-ময়ের—তাঁর দেখা শুনা সবই যে আমাদের হইতে পৃথক্। তাই মহাপ্রভু

বলিলেন,—বাপু হে, বৈষ্ণবতা-গর্ব্ব ত্যাগ কর—ঐ অহমিকায় ডুবিয়া থাকিলে বৈষ্ণব হইতে পারিবে না।

সেই পরমপুরুষাভিমুখী চিত্তের স্বাভাবিক গতিকেই ত পরাভক্তি বলে। সে ভক্তিকে বৈষ্ণবশাস্ত্রে "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং" বলিয়া উল্লেখ আছে। সে ভক্তিতে সাধনামূলক কর্ম্মের স্থান নাই, যেমন আমরা যাহা কিছু করি না কেন আমাদের চিত্তবৃত্তি অবিচ্ছিন্ন ও অপ্রতিহত ভাবে এক "আমি" জ্ঞানেই পরি সমাপ্ত হইয়া যায়, তদ্রূপ চিত্তের গতি "আমি"রূপ জীবভাবে সিদ্ধ হওয়ার পর 'বস্তু' প্রভৃতির অতিগ বুদ্ধি লাভ করিয়া ভগবানেই পরিসমাপ্ত হয়। এই স্বাভাবিক গতিকে পরাভক্তি বলে। কাজেই তখন আর ক্রিয়া কর্ম্ম বা প্রযত্নের অবসর থাকে না। কারণ তখন কাজ করিবে কে, তখন যে সে স্রোতে গা ঢালিয়াছে, আর কি দাঁড়াইতে পারে আর কি নিজেকে স্ববশে আনিতে পারে—কাজেই অবশভাবে সেই স্রোতে চলিয়া গিয়া স্রোতের মিলনস্থান নীলমহোদধিতে আপনাকে মিশাইয়া দেয়।

আমাদের অবস্থা সেরূপ নহে—সে স্রোতে আমাদের দেহতরীকে ভাসাইয়া দিতে চাহি না বরং ধন মান যশ, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি কতকগুলির সহিত আপনাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছি। বিশিষ্ট সুখের জন্য—পাছে সেই স্রোতে গেলে এ তরীখানি আবার কূলে আবদ্ধ করিতে না পারি তজ্জন্যই সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছি। "আমার সুখ" "আমার দুঃখ" এই হাসি-কান্নার মধ্যে থাকিয়া বস্তুগুলিকে ভোগ করিবার জন্য জীবন যাপন করিতেছি। কিন্তু বস্তুর সবটুকু ভোগ করিতে পারি না, কতকটা আমার সুখ দুঃখের বাহিরে থাকিয়া যায়, আমার সহিত মিশিতে পারে না; তাই সেই অংশটুকু ভেদাত্মক জগৎরূপে থাকিয়া যায়। যতদিন সেই ভোগের স্পৃহা বলবতী থাকে, যতদিন সেই অংশটুকু ভোগ করিবার কামনা বর্ত্তমান থাকে ততদিন এইভাবে "পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী-জঠরে শয়নং।"

এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে সৌভাগ্যক্রমে কোন সাধু বা শ্রীভগবানের কৃপায় জীবের হৃদয়ে তত্ত্ব-জ্ঞানের উন্মেষ হয়।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥

তখন আর ঐ খেলা ভাল লাগে না, ও খেলায় তৃপ্তিবোধ হয় না, যেন ও খেলা খেলিতে গেলে বস্তুগুলি হাত হইতে পিছলাইয়া যায়। তখন জীব কাঁদিয়া

বলে—প্রভু, সাধ্যসাধন তত্ত্ব কিছুই জানি না, গ্রাম্যব্যবহারে পণ্ডিত কিন্তু জানি না যে—

"কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয় ?"

বাস্তবিক কথা "আমার আমার করে মত্ত হ'য়ে অনিবার ইন্দ্রিয়াদি দারাসুত সকলি ভাব আপনার" কিন্তু সত্য সত্যই "কিবা আমি কোন খানে, খুঁজিয়া না পাই ধ্যানে।" ইহা সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য কথা। তাই সমস্ত জীবের মঙ্গলের জন্য সনাতন গোস্বামী প্রশ্ন করিলেন "কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয় ?" এই তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ে উদিত না হইলে, আপনার স্বরূপ অনুভূতি না করিলে বৈষ্ণবদিগের 'পরাভক্তির' ভাষা বুঝিতে পারিবে কেন।

সনাতন ধর্ম্মের উপদেশগুলি অধিকারিভেদে ও স্তবভেদে প্রদত্ত হইয়াছে। পন্থার পাঠক যোগানন্দ ভারতীর "ভাগবতের উপদেশ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া থাকিবেন। তিনি তন্ত্র ও বেদান্ত হইতে এই স্তবভেদের সুন্দর সামঞ্জস্য করিয়াছেন। এই তিনটী স্তব যথাক্রমে বিশ্বাতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব। "Light on the Path" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এই তিনটী স্তরের কথা বেশ সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে।

প্রথম —Seek out the way অর্থাৎ বাহিরে জগৎভাবের মধ্য দিয়া পথ অন্বেষণ কর। ইহাই বিশ্বাতত্ত্বের সাধনা। পন্থার পাঠকগণের নিকট "সর্ব্বে—ভগবৎ ভাবদর্শন" বলা যাইতে পারে—কারণ ভারতী মহাশয় "সর্ব্ব" কথাই ব্যবহার করিয়াছেন। বেদান্তের ইহাই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।"

দ্বিতীয়।—Seek the way by retreating within you অর্থাৎ ভিতরে অহং-তত্ত্বের মধ্যে পথ অন্বেষণ কর। ইহাই আত্মতত্ত্ব বা আমিটীর মধ্যে ভগবানের সত্তার দর্শন। বেদান্তের ইহাই "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইহার অর্থ এই "আমি" ও ভগবান্ তুল্য এ অর্থ নহে। তবে ভগবানের সহিত জীবের ভেদ থাকিলেও অভেদ প্রকাশ অহং বা আমির ভিতর তাঁহার করুণ পদাঙ্ক দেখিতে না পাইলে বাহিরের দিকে ছুটাছুটি নিবৃত্ত হয় না, তাই Light on the Path বলিলেন—for within you is the light of the world the only light that can be shed on the Path. এই আমিতে ভগভাব দর্শন করিলে জগতের কোলাহল নীরব হইয়া যায়, সুখ-দুঃখ পাপ-পুণ্য এই আমিরূপ সমুদ্রে তরঙ্গের ন্যায় উঠিয়া তাহাতেই মিশিয়া যায়। ইহা ভাগবতের "দৃষ্টৈমনীশ্বরে"

তৃতীয়।—Seek the way by boldly stepping forth beyond

অর্থাৎ অহং ও জগৎ ছাড়িয়া অকুতোভয়ে আমির অতিগ শ্রীভগবানে ঝাঁপ দেও। অর্থাৎ অহংতত্ত্বের সিদ্ধি হইলে অহংটী সেই অখণ্ড "স" বা ভগবানে ছাড়িয়া দাও। তখন আমি থাকিবে না, থাকিবে—তুমি। সেই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিলেন—"ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কালরূপসাগরে।"

পাঠক হয়ত ভাবিতে পারেন মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মে এ সকল ভাবের স্থান নাই। এ সব ত জ্ঞানীর কথা, যোগের কথা—ভক্তিযোগে ও সব স্তরভেদের প্রয়োজন কি? মহাপ্রভু জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানশূন্যা ভক্তির প্রাধান্য দেখাইয়াছেন সে কথা ঠিক, কিন্তু মহাপ্রভু কোথাও কি অজ্ঞানতার প্রশংসা করিয়াছেন? কি শাস্ত্রপাঠ নিষেধ করিয়াছেন? ভাগবত পাঠ ত বৈষ্ণবের নিত্য-কর্ত্তব্য। যখন সেই গোবিন্দচরণই একমাত্র সার বস্তু বলিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিবে—যখন "কানুর পিরীতি" সত্য সত্যই আমাদিগকে ডুবাইতে পারিবে, তখন ত আর আমিকে বিচ্ছিন্ন বস্তু বলিয়া মনে হইবে না—তখন আমিকে বিশ্বানুস্যূত বিশ্বাতিগ গতি বলিয়া বুঝা যায়। তখন ত "জানার" কার্য্য হইয়া গিয়াছে—তখন ত প্রেমময়ের স্বরূপ জানিতে পারা গিয়াছে—কিন্তু যাহার বিবেক-বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, সাধনার প্রধান ভিত্তি আত্মতত্ত্বের উন্মেষ হয় নাই, তার পক্ষে যে জ্ঞান-কর্ম্মের প্রয়োজন নাই একথা স্বীকার করিতে পারা যায় না। আপনার স্বরূপ না জানিলে তিনিই আমার গতি, তাঁহার সহিত আমার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ইহা না জানিলে তিনিই আমার "গতি র্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ" একথা হৃদয়ঙ্গম না হইলে তাঁহাকে চাহিব কেন?

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

গোপন।

অসীম হ'য়ে রয়েছ বেশ গুমরে,
আড়াল পেয়ে রয়েছ বেশ গভীরে,
নয়ত কি এই রাত্রি দিনে,
এমন করে টেনে হেনে,
শিউলি বনের উদাস ঘ্রাণে,
টান্‌তে পাব আমারে,
অসীম হ'য়ে রয়েছ বলে গুমরে॥

বিশ্ব ভরে রূপের ঝলক্ বিছায়ে,
দেখ্‌তে চেলেই নীরবে যাও সরিয়ে,
নয়ত কি আর এত করে,
ব্যর্থ আশায় ঘুরে ঘুরে
নেশার ঘোরে ফিরে ফিরে,
আবারও যাই ছুটিয়ে,
রূপের ঘোরে পাগল আঁখি তুলিয়ে॥
দাওনা ধরা তাইত এমন আড়ালে,
মোহন সাজে চোখের চমক্ লাগালে॥
এলিয়ে পড়া আশাগুলি,
শিশির-ধোয়া কনক কলি।
সকল ফেলি কাকন বাজা
এমন করে ভুলালে
গোপন ভূমে আছ বলে আড়ালে।
নয়ত কি আর ইপ্সাটুকু বহিয়ে
সারা আকাশ পাতাল মরি ঘুরিয়ে॥
যবনিকার ভিন্ন পাশে
বারেক যদি বস্‌তে এসে
নিত্য নূতন ভাবটি তোমার
দিতাম করে ঘুচিয়ে,
সবার মনে হেথায় দিতাম সাড়য়ে॥
এখনো অই মোহন বংশী বাজায়ে
নূপুর পায়ে চূড়াটী বাঁয়ে হেলায়ে
ডাক্‌ছ কোন্ সে কদমতলে
আকুল ডাকে আত্ম ভুলে
পাইনা খুঁজে চমক্ দিয়ে
ফির্‌ছ শুধু মজায়ে,
নিত্য নূতন অসীম ভাবটী জাঁকায়ে।
হওনা অসীম রওনা যতই গোপনে
তোমায় একদিন বাঁধব হেথা জীবনে,

নয়ত তোমার নামটী নিয়ে
ঝাঁপ দিব অই অসীম চেয়ে
দেখ্‌ব তখন কোথায় থাক গোপনে
গোপন ভুমে বাঁধব তোমায় গোপনে ॥

শ্রীনরেশ—

সহজ যোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অহঙ্কার তত্ত্ব।

এইবার আমরা অহঙ্কার তত্ত্বের বিবৃতির চেষ্টা করিব। প্রত্যেক তত্ত্বই তাঁর ভাব, সেই জন্যই উহারা তত্ত্ব; (তৎ+ত্ব) তৎ পদার্থের তত্ত্ব লয় বলিয়াও 'তত্ত্ব'। সংসার—প্রকৃতি—একটী সপ্তসুরাত্মক বীণা, ইহার প্রত্যেক সুরই তাঁহার ইঙ্গিত করে, প্রত্যেক লোকই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় তাঁহারই বাণী পচার করে। ইন্দ্রিয়ের স্তরে বস্তুর বাহ্য রূপ ও শক্তি ছাড়াইয়া তাহার অভ্যন্তরে যে সুখ ও জ্ঞানাত্মক কি একটা আছে তাহারই ইঙ্গিত দেয়। ইহাই আত্মার প্রথম সঙ্কেত ও হৃষীকেশ তত্ত্বের প্রথম বিকাশস্থল। রূপ, স্পর্শ প্রভৃতি ভাব-সমূহ জ্ঞানাত্মক ও সুখদায়ক, বস্তুর অনু-পরমাণুর ভিতরে উহারা নাই; অথচ ইন্দ্রিয়গণ কি প্রকারে অণুনিচয়ের সমষ্টি হইতে অণুসমষ্টি মাত্র না দেখিয়া কি এক মধুর সুখদ ভাব অনুভূতি করাইয়া দিল। যাহা নাই তাহা হইল। যে জ্যোতি বস্তুতে নাই সেই জ্যোতির আভাস পাইয়া, কি এক অপরিজ্ঞাত পরিপূর্ণতার স্বাদ পাইয়া, জীব তাহার তামসিক অহঙ্কারের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কাহার অন্বেষণে বাহিরে ছুটিতেছে।

কাম আসিয়া আর একটু অভিনব, কমনীয় ভাষায় জীবকে সম্বোধন করিল। বস্তুসমূহ কেবল রুচির ও সুদৃশ্যই রহিল না, তাহার ব্যক্ত আমির 'আমার'—আপন—হইয়া গেল। সুসজ্জিত অট্টালিকা দর্শনে দরিদ্র দ্রষ্টার নয়নরঞ্জন হইতে পারে উহাও বাহিরের ভাবে ভাল-লাগা। যে দিন জগতের কি এক শুভ মুহূর্ত্তে জীবহৃদয়ে কামের বাণী প্রথম ঘোষিত হইল, সেদিন স্বভাবসৌন্দর্য্য পরিতৃপ্ত, প্রকৃতির বিক্ষোভ-বিতাড়িত জীব সহসা বুঝিতে পারিল যে বাহিরের

এত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ও বিপদ্‌রাশি তাহারই জন্য। ছিন্ন বাহ্য পরিতৃপ্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল। এই বিশাল বিশ্বকে জীব আমার বলিয়া আলিঙ্গন করিতে ছুটিল। অতলস্পর্শী বারিধি, অম্বুদচুম্বী গগনভেদী হিমালয়, জীবকে কেবল বিস্মিত করিয়া রাখিতে পারিল না। প্রকৃতির বাহ্য মহিমায় আর কেবল স্বীয় ক্ষুদ্রতানুভব না করিয়া কি এক অদৃশ্য শক্তির বশে সেই মহিমায় আপনাকে মহিমান্বিত করিবার নিমিত্ত জীবের প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হইল।

এই মাত্রা কিয়ৎপরিমাণে সিদ্ধ হইলে মন আসিয়া অপর ভাষা প্রচার করিল। সে বলিল—"যে বস্তুসমূহকে আমার বলিয়া ঘরে আনিয়াছ বটে কিন্তু এখনও তাহাদের ছিন্ন ভাব লইয়া ডুবিয়া রহিয়াছ। এখনও তোমার দৃষ্টি বস্তুর দিকে ন্যস্ত রহিয়াছে। বাহ্য বস্তুসমুদয় বাস্তবিক ছিন্ন নহে। শীতকালে সূর্য্যকে প্রিয়বোধে আলিঙ্গন করিয়াছিলে আর আজ গ্রীষ্মকালে তাহাকে শত্রুভাবে দেখিয়া ভয় পাইতেছ। এরূপ ভাবে ত' বস্তুকে আমার করিতে পারিবে না। এস, বস্তুর সবটা ধরিবার চেষ্টা করা যা'ক।" এই বলিয়া জীবকে বস্তুগুলিকে এক করিয়া দেখা বা সঙ্কল্প আর সেই সঙ্কল্পের মধ্যে তাহার বিশেষ ভাব সংরক্ষণ বা বিকল্প-তত্ত্ব বুঝাইয়া দিল। জীব দেখিল যে আমার ভাব বর্জ্জন করিয়াও একত্বের অপলাপ হয় না। তখনই ক্ষুদ্র আমির বাহিরে যে মহত্তর সত্তা আছে তাহার প্রাথমিক ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল।

তাহার পর জীব দেখিতে পাইল যে এইরূপ ভাবে সমগ্র ও অনন্ত বিশ্বকে একীভূত করা দুঃসাধ্য। আলোকতত্ত্ব ও তাহার খেলা সমুদয় সর্ব্বদা মনে রাখিতে গেলে নূতন জ্ঞানের, নূতন ভোগের অবসর হয় না। সুতরাং আর একটু সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক ভাষা না শিখিলে চলে না। হারাধনের মত নয়টী ছেলের বিশেষ ভাব লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে থাকিতে যখন একটী ছেলে কাঠ কাটিতে যাইয়া মরিয়া গেল, তখন জীব দেখিল যে বাহ্য বিশিষ্ট পুত্রটীর অভাবেও পুত্র-বুদ্ধি স্থির রহিয়াছে। সেই পুত্রবুদ্ধিতে বাহ্যবিকাশ-সমূহ লীন করিয়া রাখিতে পারা যায়। তখন বুদ্ধির সাহায্যে সে পুত্রত্ব, স্ত্রীত্ব প্রভৃতি কেন্দ্র (centre) ভাব অবলোকন করিল। এইরূপে জড়দর্শন ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইল ও জীব সাঙ্কেতিক ভাষায় চিন্তা করিতে ও বাহ্যভাব সকল রক্ষা করিতে শিক্ষা করিল।

এইবার সনাতন ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া জীবের নিকট প্রচার করিল যে "তুমি অনন্ত বস্তু ও শক্তিরাশিকে যে বুদ্ধির সাহায্যে কতকগুলি বিশিষ্ট কেন্দ্রজ্ঞানে (concepts) মিলাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছ ও যে সঙ্কেতনিচয়ের

সাহায্যে তোমার ব্যবহারিক জীবন সিদ্ধ হইতেছে, ঐ বুদ্ধিটী মলিন ও উহাতে প্রকৃত একত্বের সম্ভাবনা নাই। উচ্চ বৈজ্ঞানিক ভাবে কেন্দ্রজ্ঞানসমূহের সাহায্যে তুমি আজ প্রাকৃতিক শক্তিরাশকে নিজের বৃদ্ধির জন্য ইউরোপীয় মহাসমরক্ষেত্রে বেশ নিয়োগ করিতে সক্ষম হইয়াছে বটে; দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহকে এক নিশ্বাসে ভূমিসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াছ বটে; কিন্তু এই জ্ঞানদ্বারা জীবের একত্ব, প্রকৃতির একত্ব ত' সিদ্ধ হইল না। ভিতরের 'আমি' জ্ঞানটীর সহিত বাহিরের বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রজ্ঞান ও খেলার সহিত মিলন সংসাধিত হইল না; আমির ক্ষুদ্রতা দূরীভূত হইল না, প্রকৃতির ক্ষেত্রে ভগবানের আবির্ভাব হইল না, এই বিজ্ঞান অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য, ইহা দ্বারা মানবের অকল্যাণই সাধিত হইতে পারে। তোমার জ্ঞানরাশি ত অপরিণত রহিয়াছে, 'আমি'র সহিত মিশিতে পারিতেছে না। শুন, আর এক বুদ্ধি আছে, তাহা কেবল কতকগুলি শক্তি ও ক্রিয়াকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশিষ্ট কেন্দ্রজ্ঞানে একত্রিত করিয়া তৃপ্ত হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি ও নিম্নতর ভাবসমূহকে এক আমিতে লীন করাই রসিক জ্ঞানীর কার্য্য। যখন পায়ে হাটিতে, তখনও তোমার যে আমি ছিল এখন জেপলিনে চড়িয়াও তোমার সেই আমিই আছে, আমির ত কোনও উৎকর্ষ সাধিত হইল না। বুদ্ধির যথার্থ খেলা এই যে বাহ্যগুলিকে এমন এক ঘন একত্বে মিশাইয়া দেয় যে তদ্দ্বারা আমির একত্ব লক্ষিত হয়।

তারপর দেখ, সমগ্র বিশ্বই যে মহাশক্তির বলে একমাত্র আমির কথাই বুঝাইয়া দেয় তাহার তত্ত্ব তোমরা কিছুই বুঝিতে পার নাই। হে জর্ম্মণ সম্রাট্, সমগ্র বিশ্বকে তুমি আমার করিবার জন্য এই মহাসমরানল প্রজ্বালিত করিয়াছ, কিন্তু কি প্রকারে যে উহা আমির সহিত মিলিতে পারে তাহা অবগত নহ। আরব্যোপন্যাসের দৈত্য যেমন রাজকুমারীকে কুহকমন্ত্রে মোহিত করিয়া সর্ব্বত্রই তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইত, অথচ রাজকন্যার আমিটীকে তদীয় স্বীয় আমির সহিত মিলাইতে না পারাতে তাহার কেবল বোঝা বহন সার হইয়াছিল, সেইরূপ তুমি দানবী শক্তির কুহকপ্রকাশে জগৎকে স্তম্ভিত ও মোহিত করিতে পারিয়াছ বটে কিন্তু আমার ও 'আমি' করিতে পারিলে না।

সনাতন ধর্ম্মের গতি দর্শন কর। তুমি বীট (Beat root) মূল ও অঙ্গারাদি হইতে শর্করা প্রস্তুত করিয়া জীবকে সুখী করিতে চাহ কিন্তু ভুলিয়া যে এই পন্থানুসরণে চলিলে বাহ্য বস্তুর স্বাতন্ত্র্য ও মোহ থাকিয়া যাইবে? এমন কি, যথার্থ বৈজ্ঞানিক চিন্তাও এরূপ কামাত্মগণের পক্ষে সম্ভব নহে। জীবগণ

যখন বাহিরের আকুল পিপাসায় ক্ষুধিত কুক্কুরের ন্যায় প্রধাবিত হয়, তাহাদ্বারা কি কাহারও মঙ্গল সাধিত হয়? আত্মতৃপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত কেহ কি অপরের মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হয়? তোমার জ্ঞানের ফল কামোপভোগ বা বাহিরের বস্তুর সহিত সম্বন্ধ। আর্য্যগণের জ্ঞানের ফল অপবর্গ বা বাহিরের বস্তুসমূহকে আমির ভিতরে নিঃশেষে নিমজ্জিত করা। তাই দেখ, অশিক্ষিত হিন্দু কৃষকের ভিতরেও যে উচ্চভাবের ও উচ্চ চিন্তার বীজ নিহিত আছে, সমগ্র জগতের কল্যাণকরী যে প্রবৃত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, হে জর্ম্মণ সম্রাট্ বলিব কি, তোমাতে তাহা নাই। অহঙ্কারের প্রকৃত ভাষাটী বুঝ, দেখিবে যে বিনা আয়াসে সমগ্র বিশ্ব হইতেই আমিটী আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিতেছে। তোমরা বাহ্য ভাব ও বৃত্তিগুলিকে অবসান না করিয়াই একত্বের সন্ধান কর। জ্ঞানী অভিমানী মূর্খ, তোমরা বুঝ না যে শক্তিরূপে অন্নের পরিণতি হইতে গেলে, অন্নের বিশিষ্ট ভাবসমূহের অবসান হওয়া আবশ্যক। মনের বৃত্তিগুলি ডুবিয়া না গেলে, এমন কি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও আবিষ্কৃত হইতে পারে না। তোমাদের সভ্যতা ভোগভাবপ্রবণতা দুষ্ট বলিয়া আজ এই মহাসমরে উহার অনার্য্যত্ব ও অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রকটিত হইতেছে।

আমরা জগতের এমন এক মহান্ মাহেন্দ্র ক্ষণে উপস্থিত হইয়াছি যে, অহঙ্কার তত্ত্বের মহিমানুভব কিছু সুগম হইয়াছে। ইউরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহাদের ক্ষুদ্রতা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছে। জাতীয় বা ব্যক্তিগত আমি ও আমার জ্ঞানে যে প্রতিষ্ঠা নাই তাহা বুঝিতে পারিয়া সকলেই "সভ্যতার কঙ্কেট" ঢালিয়া সাজিতে হইবে ইহা এক প্রকার স্থির করিয়াছেন। প্রকৃত বুদ্ধির ভাষা অবসান কার্য্য শক্তিসমূহকে স্বরূপ বা বীজ শক্তিতে নিঃশেষে লীন করা; সুতরাং বৃত্তি ছাড়িয়া, খেলা ছাড়িয়া দাঁড়াইতে না শিখিলে বুদ্ধির বিকাশ হয় না। "বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণা ফলহেতবঃ।" 'আমার'-পিপাসায় ফল ও বস্তু থাকে তাই উহাকে মমতা বলা উহার ফল বন্ধন।

যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে তাহার সারাংশ এই যে, নিবৃত্তি মার্গে জগতের দিকে চাহিলে দেখা যায় যে এক ঘন স্রোত কোথা হইতে উদ্ভাসিত হইয়া একের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। এই স্রোতের গতি একটি একত্ব জ্ঞানের স্থাপন। গতির ভিতর দিয়া, পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া, জগতের ক্ষণভঙ্গুরত্বের ভিতর দিয়া স্রোত চলিতেছে। হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত একই স্রোত। তবে কোথাও বা পূর্ব্ববাহিনী কোথাও বা দক্ষিণবাহিনী, কোথাও

বা অন্যদিকে যাইতেছে। তদ্রূপ একও স্রোতের অন্তর্ভূত হইয়া ইন্দ্রিয়, কাম প্রভৃতির স্রোত গতিগুলি ক্ষুদ্র জ্ঞানে পৃথক্ বোধ হইলেও সাম্যজ্ঞানের সাহায্যে দেখিলে একই বোধ হয়। বিপরীত ক্রমে সৃষ্টিমার্গে এই স্রোতটীও একত্বের দিকে ধাবিত। প্রকাশের মধ্যে বিশেষ একত্ব দেখান বিশ্বতোমুখে স্রোতের গতি ; প্রকাশের বাহিরে সেই একত্ব দেখান নিবৃত্তিমার্গের স্রোতের গতি। মনে কর, কোনও যাদুকর আসিয়া শুদ্ধ কামনাশক্তি দর্শকগণের মধ্যে সঞ্চারিত করিল, দর্শকগণ স্ব স্ব আধারে মোহিত, সুতরাং তাহাদের ভিতরে ঐ স্রোতটী পুত্রৈষণা, ধনৈষণা প্রভৃতি নানাভাবে স্ফুরিত হইল। সেইরূপ 'যস্য:ইদং কল্পিতং ইন্দ্রজালং চরাচরং ভাতি মনোবিলাসং' সেই যাদুকর 'একোহহং বহু স্যাম' বলিয়া আপনার ভাষায় আপনার স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া ঈক্ষণ করিলেন। সেই ঈক্ষণের ফলে একদিকে "একোহহং" অপরদিকে "বহু স্যাম" এই সঙ্কল্প এই দুই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার একোহহং এতে আর কিছু নূতন বলা হইল না, একমাত্র তিনিত আছেনই কাযেই ইহাতে কেবল ইচ্ছা ভিন্ন নূতন কিছু হইতে পারে না। তেমনি তাঁহার 'বহু স্যাম'তেও একটী প্রদীপ হইতে অনন্ত প্রদীপ প্রজ্বালনের ন্যায় একেরই বিন্যাস ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। কিন্তু যে সকল প্রতিবিম্ব চৈতন্য উৎপন্ন হইল তাহাদিগের ভিতর এই ভাবটীর খেলা অন্যরূপ হইয়া গেল।

"আমি কলিকাতা যাইব" এ কথা বলিলে জ্ঞানটি একই বটে, কিন্তু বিশেষ ভাবে দেখিতে গেলে উহাতে যেমন তিনটি পদ দেখা যায়, তেমন ভগবানের একোহহং বহু স্যাম ও স্বক্ষেত্রে একত্বের ব্যঞ্জক। কথাটি বুঝিতে গেলে, বহু ও এক অহং যেখানে ঘন হইয়া মিশিয়া গিয়াছে এমন একটী জ্ঞান আছে বলিয়া বুঝা যায়। বহুত্বের ভাবটী লইলেও সেই বহুত্ব কিছু আমি ছাড়া নহে।

সুতরাং এই জ্ঞানে সৃষ্টি হইতে পারে না। অতএব আর এক স্তর নীচে আসিয়া ঐ জ্ঞানটাকে, দর্পণের সাহায্যে আমির বাহিরে রাখা আবশ্যক। সচ্চিদানন্দময়ী প্রকৃতি এবার ইচ্ছারূপিণী হইয়া প্রকট হইলেন। স্থিরত্বের পরিবর্ত্তে গতির ভাষা দেখা দিল। তিনি যে কৌশলে বাহিরের ভাষার মধ্যে এক সঙ্গে আমিকেও দেখান এবং বহুত্বকেও দেখান তাহাই আমাদের অহঙ্কার তত্ত্ব।

অঙ্কশাস্ত্রে যেমন একটী অবিশেষ প্রতিজ্ঞা (theorem) করা হইল যে বড় ক = ক + খ + গ + ঘ + ইত্যাদি। যে পূর্ব্বেই এই অঙ্কটী করিয়াছে

তাহার পক্ষে ইহা একত্বের বাচক। এদিকে যাহাকে বড় ক বলিলাম ও-দিকে তাহাই ছোট ক+খ+গ ইত্যাদি। কিন্তু যে ইহা বুঝিতে পারে নাই তাহাকে এই অঙ্কটী বিশেষ ভাবে সমাধান করিয়া বুদ্ধিগত করিতে হইবে। এই জন্য বুদ্ধিতত্ত্ব প্রস্তুত হইল। অঙ্কটী সত্য বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস, তবু ত উহা বুঝা চাই !! দুইটী দিক্ পরস্পর মিশাইয়া দেওয়াই হইল অবসানক্রিয়া। অঙ্কশাস্ত্রে আমরা যেমন বলিয়া থাকি ধর ক সমান এক (ক = ১) ঐ যে মানিয়া লইলাম উহা কেবল অঙ্ক কষিবার জন্যই। ঐ মানিয়া লওয়াকে শুদ্ধ অহঙ্কারের বুদ্ধির ভিতর প্রকাশিত অভিমান ক্রিয়া বলে। এইরূপে ভগবানের স্বরূপপ্রতিষ্ঠ "অহং সর্ব্ব" জ্ঞানটী মহৎ স্রষ্টার ভিতর "আমি যেন সর্ব্ব হইব" বলিয়া ফুটিয়া উঠিল। আমরা জীব। অঙ্ক কষিতে যাইয়া যাই ধরিয়া লইলাম যে 'আমি রাম' অমনি সর্ব্বভাবটীর মানও (পরিমাণ) ছোট হইয়া গেল। ছোটর ভিতর সর্ব্বভাব স্থাপনা করিতে হইবে ও আমির একত্ব সিদ্ধি করিতে হইবে; না করিয়াত থাকিতে পারি না! এই প্রবৃত্তিকেই ত ভগবান্ "পুরাণী প্রবৃত্তি" (যতঃ প্রসৃতা পুরাণী প্রবৃত্তিঃ—গীতা) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

আমির উপর যে মাত্রার অভিমানটী পড়ে তাহার নাম তন্মাত্র; আর সর্ব্বের ভিতর দিয়া যে ভাবটী ফুটাইতে হইলে যে বিশেষ ভাবের বিন্যাস আবশ্যক, মোটামুটি কথায় তাহাকে তত্ত্ব বলে।

আমি রাম এই মাত্রাই আসিয়া জন্ম প্রভৃতি ভাবসমূহকে লইয়া আমরা অঙ্ক কষিতেছি। আমি এক ও অদ্বিতীয়, সুতরাং জন্মব্যাপারেও এই অদ্বিতীয়তা রক্ষা করিতে হইবে, অথচ বহুর খেলাও হওয়া চাই। কাজেই ঋষি, প্রবর, গোত্র, জাতি, ধর্ম্ম, পিতামাতা, জন্মলগ্ন ও সেই ক্ষণের গ্রহসন্নিবেশ প্রভৃতি নানা কৌশলে একদিকে অদ্বিতীয়ত্ব আর একদিকে সর্ব্বাত্মক ভাবটী সিদ্ধ করিতে হইতেছে। অহঙ্কারবশে জামদগ্নিও ভগবানের সাক্ষাতে একদিন বলিয়াছিলেন 'এ আবার কোন্ রাম!' আমরাও সেই প্রকার করিতে প্রবৃত্ত। সর্ব্বের ভিতর দিয়া যে স্রোতের বশে একসঙ্গে আমির অদ্বিতীয়তা ভাবটী সংরক্ষিত হয় অথচ সর্ব্বাত্মিকা ভাবেরও অপলাপ না হয়—ইহাই অহঙ্কার-তত্ত্বের মূল ভাষা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ অলব্ধবেদান্ত।

সাহিত্যসম্মিলন।

নবম অধিবেশন—১৩২৩ সাল।

সভাপতির অভিভাষণ। *

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! আপনারা আমাকে সাহিত্য সম্মিলনের বর্ত্তমান অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া যে অতুল সম্মান প্রদান করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি আপনাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। সাহিত্যসম্মিলন বাঙ্গালী জাতির বাণীপূজার সমবেত অনুষ্ঠান। এই মহৎ অনুষ্ঠানে অনেক মহাত্মা কাব্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির উদ্যান হইতে নানাবিধ সুরভি কুসুম সঞ্চয় করিয়া বাগ্‌দেবীর যথাবিধি অর্চ্চনা করিবার জন্য সমাগত হইয়াছেন। আমি পূজার উপযোগী কোন গন্ধপুষ্প আহরণ করিতে পারি নাই। বাণীর চরণে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবার জন্যই আমি আপনাদের আহ্বানে এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

যশোহরের অবস্থা।

বঙ্গেশ্বরের অধিকার মধ্যে যে সকল সমৃদ্ধ স্থান আছে যশোহর তাহাদের অন্যতম। যশোহরের ন্যায় সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা ভূমি বঙ্গদেশে কেন, ভারতে অতি বিরল। অধুনা আমরা যাহাকে বাঙ্গালা দেশ বলি পূর্ব্বকালে উহার সমগ্র অংশ একত্র ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন অংশের রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। যে অংশ খাঁটি বঙ্গ নামে অভিহিত হইত যশোহর তাহারই অন্তর্গত। পুণ্যতোয়া ভাগীরথী সমুদ্রে

প্রাচীন অবস্থা।

---

* মহামান্য মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের যশোহর সম্মিলিত সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত অভিভাষণ পাঠ করিয়া বহুবিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছি। ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় লিখিত হইয়াছে। অভিভাষণের ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও সুমধুর হইয়াছে। অভিভাষণে অনেক তথ্য সংগৃহীত হওয়াতে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। এইরূপ সাহিত্যসম্পদের তথ্য-পূর্ণ অভিভাষণ সম্মিলনের গৌরববৃদ্ধিকর যে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৬।৪।১৬। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী।

পতিত হইয়া পূর্ব্বাংশে যে ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে, যশোহর উহারই অন্তর্গত। রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষ সঃ॥

(রঘুবংশ, ৪ সর্গ।)

"বঙ্গীয়গণ নৌ-সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে আসিলে বীর রঘু তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গঙ্গাস্রোতের মধ্যভাগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন।" কালিদাসের এই উক্তি দ্বারা বোধ হয় খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে যখন রঘুবংশ রচিত হয়, তখনও যশোহর প্রভৃতি স্থান নদীবহুল ও জলাকীর্ণ ছিল। যদিও যশোহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধযুগের কতিপয় মুদ্রা এবং প্রস্তরময় ও ধাতুময় মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং প্রাচীনকালের কোন কোন উৎকীর্ণ লিপিতে যশোহরের অন্তর্গত ভূভাগ বিশেষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তথাপি আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যশোহরের প্রাচীনযুগের কোন সুস্পষ্ট ইতিহাস বিদ্যমান নাই। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর শেষ ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ ভারত ভ্রমণ করিতে আসিয়া যশোহর অঞ্চলের কোন উল্লেখ করেন নাই। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হুয়েন্ সাঙ ভারতের অনেকস্থল পরিদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যশোহর প্রদেশের কোন বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয় না। তাঁহার বর্ণিত সমতট রাজ্যের দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও পরিধির বিষয় বিবেচনা করিলে অনুভূত হয় যে, যশোহর প্রদেশ উহার অন্তর্গত ছিল না, কুমিল্লা ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ সমতট নামে অভিহিত ছিল। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক সুবিখ্যাত দার্শনিক শান্তরক্ষিত তিব্বতরাজ শ্রী-সোঙ্-দেউচেনের আহ্বানে হ্লাসা নগরীতে গমন করিয়া তথায় ধর্ম্মযাজকের পদ গ্রহণপূর্ব্বক "সাম-য়িএ" (অচিন্ত্য) নামক অনুপম বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শান্তরক্ষিত তিব্বতরাজের নিকট আত্মপরিচয় প্রদানকালে বলিয়াছিলেন যে তিনি যহোরের রাজবংশসম্ভূত। কেহ কেহ বলেন, সার্দ্ধ একাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে শান্তরক্ষিত যে যহোরকে নিজের জন্মভূমি বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান যশোরের (যশোহরের) নামান্তর মাত্র। কিন্তু এই মতের সমর্থক আরও প্রমাণ প্রয়োজনীয়। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দী ও তৎপরবর্ত্তী কালে যে সকল বিদেশীয় পর্য্যটক বঙ্গদেশে আগমন করেন, তাঁহাদের কেহই যশোহরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। প্রবাদমূলক কুলকারিকাসমূহে

যশোহর ভূভাগের কিঞ্চিৎ উল্লেখ দৃষ্ট হয় বটে কিন্তু উহাতেও ঐ দেশের সমৃদ্ধির সবিশেষ বর্ণনা নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমান রাজত্বের সময়ে যশোহর সর্ব্বপ্রথম ইতিহাসের অঙ্কে স্থান লাভ করে। অনেকেই জানেন অনুমান ১৫০০ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি অপর দুইজন পণ্ডিত সমভিব্যাহারে মিথিলায় গমন করিয়া তত্রত্য প্রধান নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে বলিয়াছিলেন—

নলদ্বীপ-কুশদ্বীপ-নবদ্বীপনিবাসিনঃ।
তর্কসিদ্ধান্ত-সিদ্ধান্ত-শিরোমণি মনীষিণঃ॥

"আমাদের নিবাস নলদ্বীপ, কুশদ্বীপ ও নবদ্বীপ এবং তর্কসিদ্ধান্ত, সিদ্ধান্ত ও শিরোমণি আমাদের যথাক্রম নাম।" কেহ কেহ বলেন যে নলদ্বীপ তর্কসিদ্ধান্তের নিবাস ছিল, উহা যশোহরের অন্তঃপাতী নলদার প্রাচীন নাম। এই মত যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যশোহরের স্থানে স্থানে সংস্কৃতের বহুল চর্চ্চা ছিল। ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বীয় কীর্ত্তিদ্বারা দিঙ্মণ্ডল ধবলিত করিয়া যশোহরের অধিকাংশ শাসন করেন। উহার কিঞ্চিৎ পরে সুপ্রসিদ্ধ চাঁচড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নলডাঙ্গার রাজবংশ অভ্যুন্নতি লাভ করিতে থাকেন, এবং ঐ শতাব্দীর শেষভাগে স্বনামধন্য সীতারাম রায় ভূষণায় আধিপত্য স্থাপন করেন। ১৮শ শতাব্দীর শেষ ভাগে নড়ালের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বংশের অভ্যুদয় ঘটে। বর্ত্তমান ইংরেজ রাজত্ব কালে যশোহর সর্ব্বতোমুখী সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ধনধান্যে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে যশোহর এখন বাঙ্গালার অগ্রণী। শান্তিপ্রিয়তা ও রাজভক্তিতে যশোহর বঙ্গের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে।

বর্ত্তমান অবস্থা।

সাহিত্যসেবীর পক্ষে যশোহর পুণ্যতীর্থ। ইহা স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের জন্মভূমি। নাট্যরসিক স্বর্গীয় দীনবন্ধু এই খানেই বাল্য জীবন যাপন করেন। ভক্তচূড়ামণি স্বর্গীয় শিশিরকুমার এই খানে জন্মিয়াই বিশ্বপ্রেম প্রচার করিয়াছিলেন। ভাবুক কবি স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এই খানে অবস্থান করিয়াই বালক ও যুবক বৃন্দকে সদ্ভাবশতক শিক্ষা দিয়াছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কবিরাজ স্বর্গীয় গঙ্গাধর সেন, অভিনেতৃগণের নেতা স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, মহিলাকাব্যপ্রণেতা স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ব্যবহারাজীবিগণের অগ্রণী ৺শ্রীনাথদাস, পণ্ডিতকুলশিরোমণি ৺পার্ব্বতীনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ও ৺শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন এবং টপসংগীতপ্রণেতা ৺মধু কাইন, প্রভৃতি

কত শত মহারত্ন এই যশোহর ভূমিকে সমলঙ্কৃত করিয়াছেন তাহা গণিয়া ঠিক করা যায় না।

শিক্ষা, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে এখনও যশোহর বঙ্গের অগ্রগণ্য। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, বেদান্তবিশারদ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও বেদান্তবাচস্পতি সরকারী উকিল রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর প্রভৃতি মনীষিগণ এখনও যশোহরের কীর্ত্তিধ্বজারূপে বিরাজমান। রমণীকুলের ললামভূতা শ্রীমতী মানকুমারীর সুমধুর কবিতা এখনও বঙ্গের প্রতিগৃহে মহাসমাদরে পঠিত হইয়া থাকে। রাসায়নাচার্য্য ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মভূমি বলিয়া যশোহর-খুলনা এখনও গৌরবান্বিত। সুকবি হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে এখনও সিংহের ন্যায় প্রতাপ প্রকাশ করিতেছেন। প্রবীণ শিক্ষক রায়সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ নানা বিদ্যালয়-পাঠ্য-গ্রন্থ ও পালিজাতকের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। সমসাময়িক ভারতের সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার স্বীয় গবেষণার প্রভাবে আধুনিক সাহিত্যিকগণের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন। আলিপুরের সরকারী উকিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ ও কৃষ্ণনগরের সর্ব্বপ্রধান উকিল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বসু এখনও যশোহরের মুখ সমুজ্জ্বল রাখিয়াছেন। "নব্য জাপান" প্রণেতা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, নড়ালের সুশিক্ষিত ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সহায়তায়, চিরুণীর কারখানা স্থাপন ও অন্যান্য উপায়ে এতদ্দেশে জাপানী শিল্পের প্রচার করিয়া বঙ্গেশ্বরের নিকট হইতে যথোচিত সাধুবাদ লাভ করিয়াছেন।

"দাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধি স্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কবতক্ষতীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী॥"

মধুসূদনের সমাধিস্তম্ভোৎকীর্ণ এই লিপি দর্শন করিয়া কোন্ বাঙ্গালী ক্ষণকাল

স্তম্ভিতভাবে না দাঁড়াইয়াছেন, এবং "মাইকেল আমার স্বদেশবাসী" বলিয়া কোন্ বাঙ্গালীর চিত্তে ক্ষণকাল আত্মশ্লাঘা উৎপন্ন হয় নাই?

বস্তুতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের এই পবিত্র লীলাভূমিতে সমাহূত হইয়া আজ আমরা অতীতের অনেক কথা স্মরণ করিতেছি। কল্পনার রথে আরোহণ করিয়া আমরা কথনও পুণ্যময় নৈমিষারণ্যে শৌনকের মহাযজ্ঞে উপস্থিত হইতেছি। কথনও মগধসম্রাট্ অজাতশত্রুর পরম রমণীয় রাজগৃহে অভ্যর্থিত হইতেছি, এবং কখনও বা স্থাণ্বীশ্বরে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজভবনে বাদবিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। যাঁহারা নৈমিষারণ্যে সমাহূত হইয়াছিলেন, মহাভারতের অমৃতময় কথায় তাঁহাদের কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইয়াছিল; রাজগৃহে সমবেত হইয়া শ্রমণগণ সদ্ধর্ম্ম সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং স্থাণ্বীশ্বরে শৈব ও বৌদ্ধমতের সামঞ্জস্য সংসাধিত হইয়াছিল। আজ আমরা কি কার্য্য সাধনের নিমিত্ত এথানে সমবেত হইয়াছি? আমাদের করণীয় কি কার্য্য আছে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি বাণীর অর্চ্চনা করাই আমাদের এথানকার মুখ্য কর্ম। আমরা এথানে ক্ষণকাল একাগ্রচিত্তে বঙ্গবাণীর গতি ও পরিণতির বিষয় ধ্যান করিব।

বঙ্গের জাতীয় সাহিত্য কি?

প্রত্যেক সভ্য দেশে এক একটী জাতীয় সাহিত্য National Literature থাকে। ঐ সাহিত্য উক্ত দেশের শারীরিক ও মানসিক শক্তির মানদণ্ড। ইংলণ্ডের জাতীয় সাহিত্য ইংরেজী, ফ্রান্সের জাতীয় সাহিত্য ফ্রেঞ্চ এবং জার্ম্মাণীর জাতীয় সাহিত্য জার্ম্মান্। এইরূপ প্রত্যেক দেশেই এক একটী জাতীয় সাহিত্য বিদ্যমান আছে। প্রাচীনকালে সংস্কৃত সাহিত্যই ভারতের জাতীয় সাহিত্য ছিল। কিন্তু গত আটশত বৎসর হইতে ভারতে কতকগুলি নূতন সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে,—যথা বঙ্গদেশে বাঙ্গালা সাহিত্য, বেহার ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে হিন্দী, মহারাষ্ট্রে মহারাষ্ট্রী, গুজরাটে গুজরাটী, পঞ্জাবে গুরুমুখী, উড়িষ্যায় উড়িয়া ইত্যাদি।

ঐ সকল সাহিত্যের যথন প্রথম উদ্ভব হয় তথন তাহাদিগের প্রতি বিদ্বমণ্ডলীর কোন প্রকার তীক্ষ্ণ বা কোমল দৃষ্টি পতিত হয় নাই। বস্তুতঃ তদানীন্তন পণ্ডিতগণের অজ্ঞাতসারেই ঐ সকল সাহিত্য জন্মলাভ করিয়াছিল। যদিও তৎকালে উহারা গণনার বিষয়ীভূত ছিল না, তথাপি উহারা শনৈঃ শনৈঃ এমন শক্তিলাভ করিয়াছে যে এক্ষণে আর উহাদিগকে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।

এক্ষণে সমগ্র ভারতে কোন একটী জাতীয় সাহিত্য নাই বলিলেও চলে। ঐ সকল নূতন সাহিত্যই এক্ষণে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতীয় সাহিত্যের কার্য্য করিবার উপক্রম করিতেছে।

সংস্কৃত সাহিত্য।

আর্য্যজাতির ভারতে আগমনের পূর্ব্বে এ দেশের ভাষা বিভাগ কিরূপ ছিল বলা যায় না। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যীশু খৃষ্টের জন্মগ্রহণের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যজাতির একটী শাখা কাস্পিয়ান্ হ্রদের সন্নিহিত কোন স্থান হইতে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া কিয়ৎ কাল বাহ্লীক (Bactria) দেশে অবস্থান করেন এবং ঐ জাতির অপর একটী শাখা ঐ স্থান হতে উরল পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ইউরোপখণ্ডে প্রবেশ করেন। পারসীকগণের জেন্দ-আবেস্তা নামক প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের বেন্দিদদ্ অধ্যায়ে যে দেশ "ঐর্য্যনেম্ বীজো" বা পূর্ব্বাভিমুখী আর্য্যগণের আদিভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ঐ দেশ সম্ভবতঃ বাহ্লীক দেশ। ঐ দেশ হইতে ইঁহারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে ইরাণ্ (পারস্য) ও ভারতের দিকে ধাবমান হন। ভারতাভিমুখী আর্য্যগণ পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া প্রচুর অন্ন ও জল উপভোগ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

আর্য্যজাতির ভারতে আগমন।

> অশ্মন্বতী রীয়তে সংরভধ্বং বীরয়ধ্বং প্রতরতা সখায়ঃ।
> অত্রাজহীত যে অসন্ দুরেবা অনমীবানুত্তরেমাভি বাজান্॥
> (ঋগ্বেদ ১০—৪—৫৩, অথর্ব্ববেদ ১২—২—৯)।

"হে বন্ধুগণ! দেখ অশ্মন্বতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। তোমরা বীর্য্য ও উৎসাহের সহিত এই নদী উত্তীর্ণ হও। আমাদের যে সকল দুর্দ্দশা ছিল তাহা এই খানেই বিসর্জ্জন করিয়া যাই। আমরা এই নদী পার হইলেই অনায়াসে প্রচুর অন্ন লাভ করিব।"

ভারতে আগমন করিয়া আর্য্যগণ প্রকৃতির ভীষণ ও কমনীয় মূর্ত্তি অবলোকনপূর্ব্বক বিস্ময়ে যে সকল স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, ঐ সকল একত্র সংগ্রহ করিয়া বেদ অর্থাৎ ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব সংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। ঋক্ সংহিতা হইতে একটী স্তোত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ছন্দস্ ও জেন্দ ভাষা।

> নূ ষ্ঠিরং মরুতো বীরবন্তম্
> ঋতীষাহং রয়িং মস্মাসু ধত্ত।

সহস্রিণং শতিনং শূশুবাংসং
প্রাতর্মক্ষু ধিয়া বসুর্জগম্যাৎ॥

(ঋগ্বেদ ১।৬৪।১৫।)

"হে মরুদ্‌গণ! আমাদিগকে স্থায়ী, পুত্রপৌত্রাদি সহিত, শত্রুবিজয়ী, শত-সহস্রযুক্ত ও চিরবর্দ্ধমান ধন দাও। যাঁহারা কর্ম্মের দ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন এতাদৃশ মরুদ্‌গণ আমাদের রক্ষার নিমিত্ত প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করুন।"

পক্ষান্তরে আর্য্যজাতির যে সম্প্রদায় ইরাণ্ বা পারস্যে গমন করিয়াছিলেন তাঁহারাও অনেক স্তোত্র বিরচন করিয়াছিলেন। ঐ সকল স্তোত্র একত্র সংগৃহীত হইয়া পারসীকগণের আবেস্তা গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। আবেস্তার যস্ন নামক প্রথম পরিচ্ছেদ হইতে নিম্নে একটি স্তোত্র উদ্ধৃত করিলাম—

যূঝেম্ জেবিষ্ট্যাংহো (অ) এষ-ক্ষত্রেং চা সবংহাম্।

জেন্দ-আবেস্তা, যস্ন, ৯।

"তোমরা কামনা পূরণের নিমিত্ত, যিনি ইচ্ছার একমাত্র রাজা, তাঁহার দিকে বেগে ধাবমান হও।'

পারসীকগণের আবেস্তা যে ভাষায় লিখিত তাহাকে "জেন্দ" ভাষা বলে, আর ভারতীয় আর্য্যগণের বৈদিক সংহিতা যে ভাষায় লিখিত তাহাকে "ছন্দস্" ভাষা বলে। পাণিনি "ছন্দসি বহুলম্" ইত্যাদি সূত্রে "ছন্দস্" শব্দ দ্বারা বৈদিক ভাষাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। ছন্দস্ ও জেন্দ ভাষার পরস্পর এত অধিক সৌসাদৃশ্য যে আমাদের বোধ হয় ইরাণীয় ও ভারতীয় আর্য্যগণের পরস্পর পৃথক্ হইবার অত্যল্প কাল পরেই অর্থাৎ অনুমান খৃঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দীতে এই দুই ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। উপরে জেন্দ ভাষার যে স্তোত্র উদ্ধৃত হইয়াছে উহার শব্দসমূহ বিশ্লেষণপূর্ব্বক ছন্দস্ ভাষার নৈকট্য সম্বন্ধ নিম্নে প্রদর্শন করিলাম—

জেন্দ	ছন্দস্	অর্থ
যূঝেম্	যূয়ম্	তোমরা।
জেবিষ্ট্যাংহো	জবিষ্ঠাসঃ	জবনতম, বেগবত্তম।
এষ	ইষ্	ইচ্ছা।
ক্ষত্রেম্	ক্ষত্রম্	রাজা।
চ	চ	সমুচ্চয়ে।
আ	আ	সম্বন্ধে।
সবংহাম্	শবসাং	কৃতার্থতা।
	(স্ববশাং ?)	(স্বীয় কামনা)।

আর্য্য জাতির যে শাখা অনুমান খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া নানা বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক ১৪৩৩ খৃঃ পূঃ অব্দে গ্রীস দেশে বসতি স্থাপন করেন, তাঁহারাই হেলেনিক বা গ্রীক জাতি। তাঁহাদের আদিম গ্রন্থ হোমার প্রণীত ইলিয়ড্ মহাকাব্য। উহা খৃঃ পূঃ ৯ম বা ১০ম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার সহিত ছন্দস্ ও জেন্দ ভাষার কিঞ্চিৎ পার্থক্য সত্ত্বেও, শব্দ এবং ব্যাকরণগত অনেক সাম্য আছে। বাহুল্য ভয়ে উহার উদাহরণ এস্থলে প্রদর্শিত হইল না।

সংস্কৃত ভাষা।

আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া অনেক দিন পঞ্জাবে অবস্থিতি করেন এবং ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে ব্যাপ্ত হইয়া পড়েন। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে দাক্ষিণাত্যেও তাঁহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। ভারতের আদিম অধিবাসিগণের ভাষাসমূহের সহিত সংঘর্ষ প্রাপ্ত হইয়া আর্য্যগণের ছন্দস্ ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। এই পরিবর্ত্তিত ছন্দস্ ভাষা ব্যাকরণাদির নিয়মে সংস্কারপূত হইয়া যে অপূর্ব্ব ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত ভাষার উপসর্গ, ধাতু ও প্রত্যয়ের সংযোগে নূতন শব্দ সৃষ্টি করিবার উপায় আছে। ইহা এত বিপুল ও ইহার সংগ্রন্থন-কৌশল এত চমৎকার যে, যে কোন নূতন শব্দে আচ্ছাদিত করিয়া ইহাতে অনায়াসে সন্নিবিষ্ট করা যাইতে পারে। এই সংস্কৃত ভাষা প্রকৃতির নিয়মে ক্ষয় ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না বলিয়া উহা প্রাকৃতিক ভাষা নহে। কথনোপকথনের ভাষা কাল সহকারে জীর্ণ ও রূপান্তরিত হয় দেখিয়া আর্য্যগণ এই সংস্কৃত ভাষাকে এমন কতকগুলি নিয়ম-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছেন যে উহার আর পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাচীন মিসরবাসিগণ যে প্রণালিতে মৃতদেহ বামী (Balmy) দ্বারা সংরক্ষণ করিতেন, সংস্কৃত ভাষাও সেইরূপ অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মাবলী দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছে। বোধ হয়, পাণিনি মুনি যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই সংস্কৃত ভাষার শেষ নিয়মশৃঙ্খল। কাহারও মতে পাণিনি খৃঃ পূঃ ৩৫০ অব্দে এবং অপর কাহারও মতে খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পাণিনির পূর্ব্বে যে বহু বৈয়াকরণ বিদ্যমান ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কারণ পাণিনি স্বয়ং দশ জন প্রাচীন বৈয়াকরণের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—আপিশলি, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব, চাক্রবর্ম্মণ, ভারদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকল্য, সেনক এবং স্ফোটায়ন।

কেহ কেহ বলেন যাস্ক পাণিনি অপেক্ষাও প্রাচীন। তাঁহার নিরুক্তগ্রন্থেও

বহু শাব্দিকের উল্লেখ আছে, যথা—আগ্রয়ণ, আগ্রায়ণ, ঔদুংবরায়ণ, ঔপমন্যবঃ, ঔর্ণনাভ, কাৎথক্য, ক্রৌষ্টুকি, চর্ম্মশিরাঃ, তৈটিকি, বার্ষ্যায়ণি, শাকপূণি, স্থৌলাষ্টীবি এবং হারিদ্রবক।

উদ্ধৃত বৈয়াকরণ ও শাব্দিকগণ কত কাল পরিশ্রম করিয়া সংস্কৃত ভাষা বর্ত্তমান আকারে নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বলা যায় না। অনুমান খৃঃ পূঃ ১০০০ অব্দে তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রথম প্রবৃত্ত হন, এবং অনুমান খৃঃ পূঃ ৬০০ অব্দে তাহাদের কার্য্য পরিসমাপ্ত হয়। তাহার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষার আর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। যাঁহারা এই সংস্কৃত ভাষার সংঘটন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন তাহাদের আশা ছিল যে এই ভাষা অজর ও অমর হইয়া সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিবে। সেই জন্য তাঁহারা বলিয়াছেন :—

স বাচং ব্যসৃজত। সা ইদং সর্ব্বং বিভবন্তী ঐৎ।
সা উর্দ্ধা উদাতনোৎ যথা অপাং ধারা সন্ততা এবম্।
(পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, ২০।১৪।)

"প্রজাপতি বাক্ প্রেরণ করিলেন। বাক্ পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্যাপিয়া অগ্রসর হইল। জলের ধারা যেমন চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, বাক্‌ও উর্দ্ধ হইতে চারিদিকে বিস্তৃত হইল।"

যে সময়ে আর্য্যগণ সংস্কৃত ভাষার নিয়ম প্রণয়নে ব্যাপৃত ছিলেন সেই সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে খৃঃ পূঃ ৬০০ পর্য্যন্ত কালমধ্যে ঐতরেয়, শতপথ, গোপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপ-নিষদ্, আশ্বলায়ন, শাংখ্যায়ন, কাত্যায়ন প্রভৃতি শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্র, গৌতম, বৌধায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসূত্র, তৈত্তিরীয়, বাজসনেয়ী প্রভৃতি প্রাতিশাখ্য রচিত হয়। এই সকল গ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বসংহিতার সহিত যুক্ত হইয়া বিপুল বৈদিক সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

বৈদিক সংস্কৃত সাহিত্য।

ব্যাকরণের নিয়মসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিধিবদ্ধ হইবার পর সংস্কৃত ভাষায় যে বিরাট্ সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে উহার নাম সংস্কৃত সাহিত্য। বৈদিক সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্য মূলতঃ অভিন্ন বলিয়া উভয়ই সংস্কৃত সাহিত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরস্পরের প্রভেদ করিবার প্রয়োজন হইলে একটাকে বৈদিক সংস্কৃত

লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য।

সাহিত্য ও অপরটীকে লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্য বলা হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের বৈভব অতুলনীয়। ইহাতে কবিকুলগুরু বাল্মীকির প্রতিভা প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের জ্ঞানভাণ্ডার মহাভারত ও পুরাণ ইহাতে নিহিত আছে। কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিগণের শান্ত-হাস্য-করুণাদি রসে ইহা পরিপ্লুত হইয়াছে। ভারবির অর্থগৌরব ও নৈষধের পদলালিত্যে ইহা অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়াছে। জয়দেবের ভাব ও ভাষার সঙ্গীতে ইহা বিহ্বল হইয়াছে। সুবন্ধু, দণ্ডী ও বাণভট্টের মসীবেগ ধারণ করিয়া ইহা অনন্যসাধারণ সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছে। বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, চাণক্য প্রভৃতি নীতিবিদ্গণ ইহাতে রাজ্যরক্ষা ও সমাজ-রক্ষার উপায় লিখিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ও ভক্তির পথ ইহাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। জড়, বিজ্ঞান ও শূন্যের একীভাব এই খানেই উপলব্ধি হইয়াছে। দ্বৈত ও অদ্বৈততত্ত্বের বিবাদ, এবং প্রমাণ ও প্রমেয়ের স্বরূপ ইহাতেই বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। গর্গ, পরাশর, জৈমিনি, আর্য্যভট, বরাহমিহির, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষিগণ ভূলোক ও দ্যুলোকের জ্ঞানরাশি একত্র সংগ্রহ করিয়া এই খানেই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। চরক, সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটের আলৌকিক শারীর বিজ্ঞান ইহারই অন্তর্গত। ধনুর্বেদ, গন্ধর্ব্ব বিদ্যা, স্থাপত্য প্রভৃতি ইহার বিষয়ীভূত। ছন্দঃ ও অলঙ্কার ইহার সৌন্দর্য্যমুকুর। বস্তুতঃ এই অসীম ও অগাধ সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয় কি দিব, ইহা "স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতঃ।"　　　　(ক্রমশঃ)

অনুভূতি।

আমি　কোথায় চলেছি ভাসিয়া
তবু　থেকে থেকে পথ কে যেন দেখায়
　　　　ইঙ্গিতে ঈষৎ হাসিয়া।
ওই　মাপি মহাকাল রবি শশী তারা
　　　　অবিরল গতি ধাইয়া
সদা　ব্যাপিয়া অনন্ত বিশ্ব প্রকৃতি
　　　　তাঁহারই মহিমা গাহিয়া

চলে তাঁহারই উদ্দেশ্য ধরিয়া
সবে তাঁহারই করুণা স্মরিয়া ;
আছে প্রীতি ভালবাসা হতাশ বিশ্বাস
নানা ভাব মাঝে মিশিয়া।
এই দিশেহারা প্রায় ছুটিছে আমার
এই ক্ষুদ্র জীব-তরণী
বাঁধা তাঁহারই চরণে নিয়তির তারে
রহিয়াছে দিন যামিনী ;
আমি পড়িয়া অকূল পাথারে
কভু পশিয়া তরঙ্গ মাঝারে
ধাই হতাশে অধীর বিশ্বাস মলিন
আঁধার ব্যাকুল পরাণি।
পুনঃ কে যেন বুঝিয়া মরমের ব্যথা
মরমের বাণী শুনিয়া
তাঁর করুণা অপার ধরি দুটি কর
ল'তে চায় তাঁরে টানিয়া
তাঁর শুভময় কর পরশে
মোর প্রাণ মন নাচে হরষে
ফেলে নিমেষের মাঝে বিকট আঁধার
মোহ কোয়াশায় আনিয়া।
সেই ক্ষীণ স্মৃতি টুকু চেনা চেনা পথে
বেড়াই নিয়ত ঘুরিয়া
এই আসি যাই পুনঃ আসি যাই ধাই
যেন চেনা পথ ধরিয়া
মোর বাসনা তথায় যাইতে
সেই আপন রতনে পাইতে
তবু কুহকে কাহার অনিত্যে আপন
ভাবিয়া রয়েছি পড়িয়া
আমি বুঝিতে না পারি কেন এত টান
প্রবাস নিবাস বলিয়া

মোর　কেন এত ভয় যাইতে তথায়

কে রেখেছে মোরে ছলিয়া

মোরে　কতই আদর যতনে

মোর　ভুলায়ে আপন রতনে;

ভাবি　জীবনে মরণে জীবের চরম

ভয় তাই যেতে ছাড়িয়া।

তবে　তাঁহারই ইচ্ছার হইবে পূরণ

তাঁহারই একই নিয়মে

ভাবি　চলে নাকি জীর্ণ এই ক্ষুদ্র তরী

আমার জনমে জনমে?

তাই　মোর প্রাণ চায় যাঁহারে

আর　কি ভয় পাইতে তাঁহারে?

আমি　ভেসে যাই তাই ক্ষতি নাই তাঁরে

পাই যেন সদা মরমে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস ভক্তিবিনোদ বি, এ,

তীর্থ ভ্রমণ।

হৃষীকেশ।

(১)

হরিদ্বার তীর্থ সেবা করিয়া তীর্থযাত্রী শ্রীবদরীনারায়ণের পথে প্রথমতঃ হৃষীকেশ দর্শন করিয়া থাকেন। হরিদ্বার হইতে তীর্থ সেবন আরম্ভ করিয়া হৃষীকেশ, দেব-প্রয়াগ, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, গৌরীকুণ্ড, কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ, বিষ্ণুপ্রয়াগ প্রভৃতি বহু তীর্থ সেবন করত তীর্থাধিষ্ঠাতা দেবতার প্রসাদ লাভ করিয়া যাত্রীকে পরমধাম শ্রীনরনারায়ণ আশ্রমক্ষেত্রে পৌছিতে হয়। হিমালয়ের এই তীর্থযাত্রায় ক্রমের সহিত সাধনপথের ধাপের পর ধাপের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। প্রত্যেক তীর্থেই এক একটী বিশেষ আধ্যাত্মিক শক্তি বা ভাব আছে। যাঁহারা প্রকৃত সাধক তাঁহারা তাহা অনুভব করিতে পারেন। অখিল রসামৃত মূর্ত্তি শ্রীভগবান্ যাঁহাকে শ্রুতি "রসঃ বৈ সঃ" আনন্দস্বরূপ বলিয়া ইঙ্গিত

করিয়াছেন তিনি স্বরূপতঃ এক এবং অদ্বিতীয় হইলেও ভক্তের প্রতি করুণা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বা ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রস প্রকট করিয়া লীলা করিতেছেন।

সাধক যদি সাধনপথে চলিতে আরম্ভ করিয়া নানা বিচিত্র রস অনুভব করিতে না পারেন, তবে তাঁহার পক্ষে এই দুর্গম পন্থায় অগ্রসর হওয়া সুকঠিন। তাই এক তিনি নানা বিচিত্র মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। যতদিন অদ্বৈতানুভূতি না হয় ততদিন সাধক তাঁহাকে নানারূপে না পাইলে পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন কেন? বৈচিত্র্য আছে বলিয়াই সাধনা অমৃতবৎ রমণীয় হয়। তাই ভক্ত সাধক কবীর বলিয়াছেন—

বইচিত্র সাধনকে অমৃত হ্যায়, বৈচিত্র সাধক মাহি।
বৈচিত্র মন্দিরকে অমৃত হৈ সাঙ্গ বইচিত্র অবগাহ॥

হরিদ্বারের দক্ষিণে আর্য্যাবর্ত্ত কর্ম্মভূমি। আর উত্তরে হিমালয়ান্তর্গত কেদার প্রদেশ সাধনভূমি, তপোবন ও তপস্যাক্ষেত্র। আর্য্যাবর্ত্ত ধর্ম্মার্থকাম ভোগের স্থান। আর হিমালয় মোক্ষক্ষেত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, সংসার-কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে যখন সকল কার্য্য শেষ হইয়াছিল, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির হৃদয়ে পরব্রহ্মের ধ্যান করত এই উদীচী প্রদেশে অর্থাৎ উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী হিমালয় প্রদেশে যে দিকে গমন করিলে আর প্রতিনিবৃত্ত হইতে হয় না, এবং নিবৃত্তি পরায়ণ মোক্ষপথের যাত্রী পূর্ব্বজগণ যে দিকে গমন করিয়াছেন, সেই দিকে গমন করিলেন।

উদীচীং প্রবিবেশাশাং গতপূর্ব্বাং মহাত্মভিঃ।
হৃদি ব্রহ্মপরং ধ্যায়ন্নাবর্ত্তত যতো গতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত। ১ ১৫ অধ্যায়

রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ পাঠেও অবগত হওয়া যায় যে প্রাচীন কালেও মুনি ও রাজর্ষিগণ প্রাচীন বয়সে এই হিমালয়ে মহাপ্রস্থান করিয়া সমাধিস্থ হইতেন। প্রাচীন শাস্ত্র পাঠেই আমরা অবগত হই যে, ভারতের প্রাচীন ঋষি ও রাজগণ জীবনের শেষাবস্থায় নিবৃত্তিপরায়ণচিত্তে তপস্যার্থ এই হিমালয় প্রদেশের গিরিমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং অন্তিমে যোগাবলম্বনে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইতেন। আজিও হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন উপত্যকা ও গুহা প্রাচীন রাজর্ষি ও মুনিগণের স্মৃতি বহন করিতেছে এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শিব-

লিঙ্গাদি অদ্যাপি বিরাজিত থাকিয়া ভক্তের পূজাগ্রহণ করিতেছেন। তাই পুরাণ বলিতেছেন :—

ইদং ক্ষেত্রং তু যৎ প্রোক্তং কেদারাখ্যং সুপুণ্যদম্।
অতি পুণ্যতমং স্থানং হিমালয়পদান্তিকম্॥
অস্মিন্ দেশে তু যে মর্ত্ত্যা বসন্তি দৃঢ়নিশ্চয়াঃ।
তেষাং মুক্তির্মহাভাগ মন্তব্যা হি করে স্থিতাঃ॥

স্কন্দপুরাণ—কেদার খণ্ড।

মোক্ষক্ষেত্র হিমালয় আরোহণের প্রথম সোপান হরিদ্বার বা মোক্ষদ্বার। এই স্থানে চিত্ত, সংসাররূপে প্রবাহিতা না হইয়া, কৈবল্যাভিমুখে ধাবিত হইলে সাধনার প্রারম্ভ। গঙ্গাস্নানে শারীর মল ধৌত হইয়া স্থূল শরীর শুদ্ধ হইলে অন্তর্মুখীন ভগবৎনিষ্ঠা হয়। স্থূল শরীর ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত এবং আত্মা লইয়া জীব গঠিত। মল, আবরণ ও বিক্ষেপ দোষে দূষিত জীবের ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি আদি বহির্মুখীন,—এইগুলি নিরুদ্ধ অর্থাৎ অন্তর্মুখীন হইলে চিত্ত শুদ্ধি হইয়া মোক্ষ বা ভগবৎ প্রাপ্তি হয়। ক্রমে ক্রমে এইগুলিকে নিরুদ্ধ বা ভগবৎ অভিমুখীন করাই সাধনা। হরিদ্বারে স্থূল শরীরের শুদ্ধি হইয়া ভগবৎ-নিষ্ঠা, হৃষীকেশে ইন্দ্রিয় দমন হইয়া মনস্থির, বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা দেবতা চতুর্মুখের যজ্ঞক্ষেত্র দেবপ্রয়াগে বুদ্ধি স্থির, দেবীপীঠ শ্রীনগর এবং গৌরীকুণ্ডে বুদ্ধির সর্ব্বাত্মিকাভাব সিদ্ধি, কেদারে জগদ্‌গুরু অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা মহাদেব দর্শনে তাঁহার প্রসাদলাভ করিলে "সব্ব অহং বৃত্তিতে একপর শুদ্ধ নিষ্কল অহং দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকে শিবময়রূপে জানিয়া" স্থূল অহঙ্কারের নাশ হইলে চিত্ত নির্ম্মল হয়। অতঃপর চিত্তের অধিষ্ঠাতা দেবতা নারায়ণের "জ্যোতির্ম্ময় হিরণ্ময় কোষাধিষ্ঠিত প্রকট মূর্ত্তি সন্দর্শনপূর্ব্বক সাধক সেই শুদ্ধ কালঘন নিষ্কল তত্ত্বে পর্য্যবসিত হন।" (১) সাধনের এই পথ অতি দুর্গম। "দুর্গং পথং তৎ কবয়ো বদন্তি।" ইহা কেবল কল্পনা নহে, উচ্চ সাধকগণের অনুভূতি-গম্য। সাধনক্রমের সহিত তীর্থের পর তীর্থে ক্রমোচ্চ সূক্ষ্মানুভূতির সামঞ্জস্য বুঝাইতে হইলে একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিতে হয়। বর্ত্তমান লেখকের সাধনা রাজ্যের এই সূক্ষ্মানুভূতির কথা বুঝাইবার অধিকার ও সামর্থ্য নাই। শ্রীগুরু-দেবের মুখে যে টুকু শুনিয়াছি তাহাই উল্লেখ করিলাম মাত্র। "পন্থার"

---

(১) "পন্থা"—আশ্বিন ১৩২০ —"সহজ যোগ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কোন সাধক লেখক এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। তাই অন্য সে চেষ্টা না করিয়া "হৃষীকেশ" তীর্থের কথাই বুঝিবার চেষ্টা করিব।

সাধকের প্রথম কর্ত্তব্য ইন্দ্রিয়দমন। ইন্দ্রিয়দমন না হইলে মন স্থির হয় না। ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া মন বহির্ম্মুখে ছুটিয়া রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ত্বক্ বস্তুতে আশক্ত হইতেছে। ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দ স্পর্শাদি বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হইলে, অগ্নি যেমন বায়ুর অনুসরণ করে, সেইরূপ মনও স্বভাবের বশে ইন্দ্রিয়গণেরই অনুসরণ করিয়া থাকে।

ইন্দ্রিয়েষিন্দ্রিয়ার্থেষু প্রবৃত্তেষু যদৃচ্ছয়া।
অনুধাবতি তান্যেব মনো বায়ুরিবানলঃ॥ ১৩১।

সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারসংগ্রহ।

ইন্দ্রিয়গণ নিরুদ্ধ হইলে মন (বাহ্য বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার) বেগ নিজেই পরিত্যাগ করিয়া, "সত্যভাব" প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতেই চিত্তের প্রসন্নতা উৎপন্ন হয়।

ইন্দ্রিয়েষু নিরুদ্ধেষু ত্যক্ত্বা বেগম্ মনঃ স্বয়ম্।
সত্ত্বভাবমুপাদত্তে প্রসাদস্তেন জায়তে॥ ১৩২ ঐ শ্লোক।

"কঠশ্রুতি"ও বলিয়াছেন—

যখন জ্ঞানসাধন শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় মনের সহিত অবস্থান করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তর্মুখ হইয়া থাকে এবং বুদ্ধিও চেষ্টা না করে অর্থাৎ স্বীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হয়, যোগিগণ সেই অবস্থাকে পরমা-গতি (জ্ঞানের পরম সাধন) বলিয়া থাকেন। এই স্থিরতর ইন্দ্রিয় ধারণা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের স্থিরীকরণকেই "যোগ" বলা যায়।

(পণ্ডিত দুর্গাচরণ বেদান্ততীর্থের অনুবাদ।)

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥ ১১৯
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরমিন্দ্রিয়ধারণাম্।

ইন্দ্রিয়ের দমন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ম্মুখীন পরাগতি সিদ্ধ হইয়া মন স্থির হইলে মানসদর্পণে হৃষীকেশ ভগবানের দর্শনলাভ হয়। তাঁহার অনুপম মাধুরী দর্শনে জীবের ইন্দ্রিয় আর বাহ্য বস্তুতে আশক্ত হয় না, মন বাসনাবিহীন হইয়া যায়, তখন জীব যাহা দেখে যাহা শুনে সমস্তই ভগবৎ-বিভূতি

বলিয়া এবং তাঁহারই ছায়া বলিয়া অনুভব করে। তখন ইন্দ্রিয় সকল যাহা আহরণ করিয়া আনে তাহা শ্রীভগবানেরই ইঙ্গিত করে। ইন্দ্রিয়ের এই তৎপরতা অর্থাৎ ভগবৎ-মুখাপেক্ষিতা সিদ্ধ হইলে শুদ্ধাভক্তির আরম্ভ। শুদ্ধাভক্তি উদিত হইলে জীব বাসনাবিরহিত হইয়া একাগ্রমনে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা ভগবান্ হৃষীকেশের যে সেবা করে তাহাই শুদ্ধাভক্তি।

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তঃ তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

নারদ পঞ্চরাত্র।

হৃষীকেশ ভগবানের নামান্তর। "হৃষীক" শব্দের অর্থ "বিষয়গ্রাহক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ।" শ্রীমদ্ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন—"হৃষীকাণামিন্দ্রিয়াণামীশঃ হৃষীকেশঃ। ক্ষেত্রজ্ঞরূপকত্বাৎ পরমাত্মা, ইন্দ্রিয়াণি যদবশে বর্ত্তন্তে স পরমাত্মা।" অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ বা পরমাত্মারূপে তিনি ইন্দ্রিয়ের অধিপতি বা ইন্দ্রিয় সকল যাঁহার বশে আছে এই জন্য তাঁহার নাম হৃষীকেশ; "সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং" সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশ ভগবানের সর্ব্বোপাধিবিনিযুক্ত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সেবাই "ভক্তি"।

যাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম হৃষীকেশ ভগবানে স্থিরগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, এই অনিত্য সংসারে একমাত্র তিনিই ধৈর্য্যলাভ করিয়াছেন। তাঁহারই তপস্যা সার্থক।

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীব চঞ্চলে॥

"হৃষীকেশ" তীর্থ ইন্দ্রিয়দমনের স্থান। এই স্থানে তপস্যা করিলে ইন্দ্রিয় দমন হইয়া হৃষীকেশ ভগবানের দর্শন লাভ হয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম ভগবানে স্থির-গতি প্রাপ্ত হইয়া সাধক ধৈর্য্য লাভ করেন। ইহাই এই তীর্থের বিশেষত্ব। তীর্থোৎপত্তি কালে ভগবান্ রৈভ্য মুনিকে বর দিয়াছিলেন যে,—এই পবিত্র তীর্থে আমি লক্ষ্মীসহ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিব এবং এই শ্রেষ্ঠতীর্থে যিনি নিবাস করিয়া তপস্যা করিবেন তিনি ইন্দ্রিয়দমন করিয়া আমার পরমধাম প্রাপ্ত হইবেন এবং এখানে সকল পাপের ক্ষয় হইবে। পুরাণশাস্ত্র পাঠে আমরা অবগত হই এই মহাতীর্থে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দিক্‌পালগণ তপস্যা করিয়া পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ঋষি সিদ্ধ গন্ধর্ব্বগণ এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ রাবণবধজনিত ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হওয়ায় ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের

আজ্ঞায় এই পরম পবিত্র কুব্জাম্রক ক্ষেত্রে (২) তপস্যা করিয়া পাপমুক্ত হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন :—

কুব্জাম্রকাৎ পরং ক্ষেত্রং ব্রহ্মহত্যানিবারণম্।
নাস্তি রাঘব-শার্দ্দূল পৃথিব্যাং পুণ্যদং মহৎ॥

যে স্থানে রামচন্দ্র তপস্যা করিয়াছিলেন তাহা রামাশ্রম নামে খ্যাত, লক্ষ্মণের তপস্যা স্থান লক্ষ্মণতীর্থ নামে খ্যাত; ইহার নিকটই প্রসিদ্ধ লছমণঝোলা। দ্রোণাচার্য্যের তপস্যাস্থানের নাম দ্রোণাশ্রম, ইহাই বর্ত্তমান দেরাদুন। এই সমস্ত ক্ষেত্রই হৃষীকেশ বা কুব্জাম্রক ক্ষেত্রের অন্তর্গত। প্রবাদ আছে—এই হৃষীকেশ ক্ষেত্রেই মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বেদবিভাগ করিয়াছিলেন। এই আশ্রমে বসিয়াই তিনি মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে আছে ঋষি সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব এইস্থানে এখনও তপস্যা করিতেছেন।

ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বা স্তত্র সন্তি মহামুনে!

দেব-ঋষি-সেবিত পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অসংখ্যতীর্থ ও ক্ষেত্র বিরাজমান। প্রাচীনকালে এই সকল ক্ষেত্রে ঋষিগণ তপস্যা করিয়া এই সকল ক্ষেত্রকে তীর্থে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা তপস্যাপ্রভাবে ঐ সকল ক্ষেত্রে এরূপ শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন যে তাহা তীর্থে পরিণত হইয়াছে। তাই শাস্ত্রে আছে "ক্ষেত্রাণি সরিতশ্চৈব পর্ব্বতাশ্চ নদাস্তথা। ঋষীণাং তপসো বীর্য্যান্মাহাত্ম্যং পরমং গতাঃ॥" প্রাচীনকালে সমস্ত তীর্থেই ঋষিগণ তপস্যা করিতেন। এখন কলিযুগের প্রাদুর্ভাব। কলিযুগের আগমনে ঋষিগণ অপ্রকট হইয়াছেন, জীব বহির্ম্মুখীন হইয়াছেন। ভজনপরায়ণ প্রকৃত ভক্ত সন্ন্যাসীর অভাব হইয়াছে, তাই অধিকাংশ তীর্থেই এখন প্রকৃত সাধু সন্ন্যাসী আর অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু হৃষীকেশের পূর্ব্ব গৌরব এখনও বিরাজমান।

হিমালয়ের এই নির্জ্জন তপোবনে শত শত প্রকৃত নিবৃত্তিপরায়ণ ভজন-সাধন-সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী যোগী সন্ন্যাসী এখনও তপস্যায় নিরত আছেন। সেই সত্যযুগে যখন রৈভ্য মুনিকে শ্রীভগবান্ বর প্রদান করিয়া হৃষীকেশকে তীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন। সেই স্মরণাতীত যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত এই পরম পবিত্র তীর্থে ভগবানের বরপ্রভাবে অসংখ্য দেব ঋষি যোগিগণ তপস্যা করিয়া ইন্দ্রিয় জয় করত ভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছেন। এই ঘোর কলিকালে বহুতীর্থের

---

(২) হৃষীকেশের নামান্তর কুব্জাম্রক ক্ষেত্র।

প্রভাব বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু হৃষীকেশ আজিও মুক্তিপ্রদ। তাহা না হইলে আজিও কেন শত শত মহাত্মা সংসার ত্যাগ করিয়া এই আশ্রমে ভগবৎ-ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন।

হৃষীকেশের শোভা অতি মনোহর, চারিদিকে নগাধিরাজ হিমালয়ের অভ্রভেদী অপরিমেয় অফুরন্ত শোভা, চতুর্দ্দিকেই মহান্ মহীরুহসমূহ, কত ফুল্ল কুসুমিত লতামণ্ডপে শোভিত শান্তিরসাস্পদ আশ্রমসমূহ শোভা পাইতেছে। হিমালয়ের বক্ষোবিদারি পুণ্যতোয়া গঙ্গা কুল কুল নাদে প্রবাহিতা হইতেছেন। সমস্তই নীরব গম্ভীর, কেবল গঙ্গার কুল কুল নাদই যোগমগ্ন সাধকের হৃদয়ে প্রণবধ্বনির ন্যায় সেই বিষ্ণুর পরমপদে চিত্তকে মিশাইয়া দিতেছে। এই পরম পবিত্র আশ্রমে বনের মধ্যে শত শত সন্ন্যাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরে তপস্যা করিতেছেন। ইঁহারা শাস্ত্রালোচনা, অধ্যাপনা ও সমাগত জনগণকে উপদেশাদি প্রদান করিয়া থাকেন এবং নিজ কুটিরে ধ্যান ধারণা সমাধি করিয়া থাকেন। বাবা কালী কমলী বাবার ছত্র এবং অন্যান্য ছত্র হইতে ইঁহাদের দেহ ধারণের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তাহা ইঁহারা পাইয়া থাকেন। পাঠক, হৃষীকেশের ন্যায় পবিত্র আশ্রম ভারতে আর কোথাও আছে কিনা জানি না। আপনাদের মধ্যে কাহারও যদি প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে, যদি প্রকৃতই পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে আপনার সংসারসুখ "ফণি-ফণা-ছায়া তুল্য' অসার ও ক্ষণস্থায়ী জ্ঞান হইয়া থাকে এবং আপনার "শ্রীভগবানকে" পাইবার জন্য প্রাণ প্রকৃতই আকুল হইয়া থাকে এবং আপনি তপস্যার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকেন, তবে এই পবিত্র আশ্রমে গমন করুন। এখানে অধিকারী হইলে গুরুলাভ হইবে, বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে। উপযুক্ত সন্ন্যাসী আপনাকে অধিকারী জানিলে পাঠের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠে যদি আপনার অনুরাগ বা শিক্ষা না থাকে তবে "বিচারসাগর' কবীর সাহেব কৃত দোঁহা প্রভৃতি হিন্দি ভাষা গ্রন্থের সাহায্যে বেদান্ত ও যোগ শাস্ত্রের তত্ত্বগুলি বুঝাইয়া দিবেন। এবং উপযুক্তরূপ সাধন ভজনের উপদেশ দিবেন। এবং বাবা কালীকমলী বাবার ছত্র হইতে আপনি নিত্য আহার্য্য, কম্বল, গৈরিক বসনাদি ও আবশ্যক মত ভিক্ষা পাইবেন। আপনাকে ভিক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে না। গুরু-গৃহে প্রাচীনকালে যেরূপ শিক্ষা হইত, এখনও এখানে সেইরূপ অধ্যয়ন ও তপস্যা করিতে পারিবেন। সন্ন্যাসী মহাত্মারা সংসার ত্যাগ করিয়া পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন আছেন বটে, ইঁহারা সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ও দার্শনিক বটেন কিন্তু ইঁহাদের

হৃদয় শুষ্ক নহে। এবং এক একজন সন্ন্যাসীর হৃদয় স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালবাসায় পূর্ণ। জগতের প্রত্যেক জীবকেই "শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান" জানিয়া ইঁহারা ভালবাসিতে শিক্ষা করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রাণ জগতের সর্ব্ব জীবের জন্য কাঁদিয়া উঠে। সংসারত্যাগী শিষ্য ইঁহাদের নিকট পুত্রবৎ স্নেহ পাইয়া থাকেন। সাধনার দুর্গম পথে যখন নূতন পথিক আত্মহারা হইয়া পড়েন, তখন এই সকল করুণাময় মহাত্মা তাঁহাদের হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করিয়া থাকেন। প্রত্যহ বৈকালে গঙ্গাতীরে এবং তাঁহাদের আশ্রমে যাইয়া দেখুন তাঁহারা শাস্ত্র গ্রন্থাদি-পাঠ, উপদেশদান, ভগবৎ বিষয়ক ভজনাদি করিতেছেন। কোন স্থানে বা নিত্য-বস্তুবিচার করিতেছেন। কোন স্থানে বা সমাগত গৃহস্থকে বা ছাত্রগণকে সহজ ভাষায় বেদান্তের ও শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিতেছেন। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইলে যখন সমস্ত শান্ত ও নীরব হইয়া যায়, তখন তাঁহারা আপন আপন কুটীরে প্রবেশ করিয়া গভীর ধ্যানে সমাধিতে নিমগ্ন হইতেছেন।

প্রাচীন যুগের এই আশ্রমচিত্র ভারতে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। পরলোকগতা "নিবেদিতা'' হৃষীকেশ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

Hrisikesh is a university of an ancient type. Here amongst some of the most beautiful scenery of the Himalayas, just at the rapids of the Ganges, are hundreds of straw huts in which live sadhus. Amongst these, it is doubtless, possible to realize the *ideal of the vedic Asramas*, in a life of simplicity order and learning. *The first duty of the new arrival is, as I have heard, to build his own hut.* Within these men live alone or in couples, according to the merciful custom that usually carries the begging friars forth, not alone, but by twos. But when evening comes, the great meditation fires are lighted here and there, in open air, and seated round them the monks discourse *"of settled things." Then they relapse by degrees* into the depths of thought, and when darkness has fallen and all in quite one after another each man slips quietly away to his own hut. In modern times it could certainly paralleled no-where outside India.

The *sadabratas* in the little town close by are another institution that correspond to nothing in foreign countries. Here the *sadhus* daily receive their rations of food. For it is a mistake to think that those who have taken up the life of the *sannyashed* can study and think without a certain amount of bodily nourishment *The sadabratas* relieve the monks of the dishonour of becoming beggars and the community of the scandal of a disorderly burden.

Sister Nivedita's
The Northern Tirtea
a Pilgrim's Diary.

রমণীয় পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং পর্ব্বতবাহিনী পুণ্য নদীর তটে কিছুক্ষণ অবস্থান করিলে যে মনে কুভাবের লয় হইয়া সদ্ভাবের বিকাশ হয় তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ। যাঁহারা ঐ সকল প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। বৈজ্ঞানিক আচার্য্য Tyndall অনুভব করিয়াছেন পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিলে নৈতিক উন্নতি হয়। At Alps পর্ব্বতের প্রসঙ্গে তাঁহার একটী উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

There is assuredly morality in the oxygen of the mountains, as there is immorality in the miasma of a marsh and a higher power than a mere brate force lies latent in Alpine mutton, we are recognising more and more the influence of physical elements in the conduct of life, for when the blood flows in a purer current the heart is capable of a higher glow. Spirit and matter are interfused, the Alps improves totally and we return from their precipieces wiser as well as stronger men.

Hours of exercise in the Alps.
Page 155—156.

উচ্চ পর্ব্বত মাত্রেরই যখন মানুষের চিত্তের উপর এইরূপ প্রভাব, তখন সিদ্ধচারণ-অধ্যুষিত দেবর্ষিগণ-সেবিত দেবতাত্মা হিমালয়ের অঙ্কেস্থিত ভগবান্

পরমাত্মা বিষ্ণুর বরপ্রভাবে পবিত্রীকৃত হৃষীকেশ আশ্রম, যেখানে স্মরণাতীত যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত মহর্ষিগণ তপস্যা করিতেছেন এবং নিত্যই ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, তাহার যে আশ্চর্য্য প্রভাব হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি এবং তথায় যাওয়া মাত্র যে ইন্দ্রিয় দমন হইবে ও চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হইয়া ভগবৎ-মুখীন প্রবৃত্তি হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? হৃষীকেশের প্রভাব প্রত্যক্ষ। আজিও এখানে তপস্যা করিলে পরম সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। তাই ঋষি বলিয়াছেন "যে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যে সুধী হৃষীকেশ-ক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন তাহারই মনুষ্যজন্ম সার্থক। হৃষীকেশে একরাত্রিমাত্র অবস্থান করিলে নারায়ণের কৃপাপাত্র হয়! ইহা পরমাত্মা হরির গুহ্যক্ষেত্র। যাঁহার স্মরণমাত্রেই শত জন্মসমুদ্ভব পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া লোকে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। হে নারদ! এই পরম পবিত্রক্ষেত্রে ভগবান্ বিষ্ণুর নিত্য সান্নিধ্য আছে। হৃষীকেশ একটী মহাক্ষেত্র। ইহা মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকে।

মানুষং জন্ম সংপ্রাপ্য তৈরেব সফলং কৃতম্।
হৃষীকেশাশ্রমে ক্ষেত্রে গচ্ছন্তি সুধিয়শ্চ যে।
একরাত্রিমপি স্থিত্বা নারায়ণময়ো ভবেৎ॥
শৃণু নারদ! বক্ষ্যামি গুহ্যং ক্ষেত্রং পরং হরেঃ।
যস্য স্মরণমাত্রেণ শতজন্মসমুদ্ভবৈঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈশ্চ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥
সান্নিধ্য যত্র বিষ্ণোহি নিত্যং তিষ্ঠতি নারদ॥

কেদার খণ্ড।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপান্নালাল সিংহ।

উদ্‌ভ্রান্ত।

কতদূরে আসিয়াছি খুঁজিতে খুঁজিতে,
হলনা তাহার সনে দেখা
অবসন্ন ভ্রান্ত দেহে এমন করিয়া,
কত আর চলিব গো একা।

তেয়াগিয়া লাজ, ভয়, সংসার বন্ধন,
　　দীনহীন পাগলের বেশে,
একাকী, সহায়হীন, উৎসাহবিহীন,
　　চলিয়াছি কোন্ দূর দেশে।
অজানিত দূর হ'তে কোন দূরতর
　　প্রবাসের নিভৃত বিপিনে
আমার অদৃষ্ট-চক্র ফিরিবে যে দিন
　　দেখা নাকি হবে সেই দিনে ?
একদিন একদিন যদি পাই দেখা
　　ঘুচে যাবে জীবনের ভার,
নতুবা এমনি করি দিবস যামিনী
　　জ্বলি হৃদি হইবে অঙ্গার।

শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত এম্, এ, বি, এল্।

আর্য্য-ললনা।

লোপামুদ্রা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নববসন্তের আলিঙ্গনে বনভূমি যখন নানাবর্ণবিচিত্রিত কুসুমখচিত নব-পল্লব-প্রবালাদির শ্যামল শোভায় সুশোভিত হইয়া সুখোষ্ণ মলয়নিশ্বাসে সমগ্রবনচারী প্রাণিকুলের হৃদয় আনন্দের উচ্ছ্বাসে পুলকিত করিয়া তুলিতেছিল, তখন একদা ঋতুস্নাতা লোপামুদ্রা অপরাহ্ণ সময়ে ভূপতিত বকুলফুলের হার গাঁথিয়া আনন্দভরে পতি-দেবতাকে উপহার দিলেন। স্নিগ্ধচ্ছায়াসমন্বিত সহকারমূলে শাদ্বলাসনোপবিষ্ট পতির পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক নবমুকুলিতা তরুরাশির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক কহিলেন—"আর্য্যপুত্র, দেখুন, ঐ নব-মুকুলিত বিটপিগণ কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। এই তরুগণ অচিরেই ফলভারে অবনত হইয়া পড়িবে, তখন ইহাদের ঈদৃশ পুষ্পাভরণভূষিত উজ্জ্বল রমণীয় রূপ থাকিবে না ; কিন্তু সন্তানবতী জননীর মহিমায় মণ্ডিত হইয়া কি অসাধারণ শোভায় শোভিত হইবে !"

ঋষিসত্তম তাঁহার অভিলাষ বুঝিতে পারিয়া সাদরে ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন,—"বনলক্ষ্মি, সুফলসম্পন্না তরুরাজি অপেক্ষা সৎপুত্রবতী রমণীর শোভা আরও অধিক মনোরম। বনফলসমূহ অল্পকাল মধ্যেই থাকিয়া বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে আর সুপুত্রের জন্মে মানবের ঐহিক ও পারত্রিক উভয়প্রকারেই মহৎ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।

লোপামুদ্রা। "নাথ!"—এইমাত্র বলিয়া চরণসমীপবর্ত্তী প্রিয়ঙ্গুকলিকাটীকে করাঙ্গুলের অগ্রভাগে ঈষৎ হেলাইতে লাগিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রকোবিদ অগস্ত্য অপত্যকামা পত্নীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া নিরতিশয় আনন্দলাভ করিলেন। এবং স্বীয় সহধর্ম্মিণীর মনোরঞ্জনপূর্ব্বক কহিলেন,—চারুশীলে, আমি বননিবাসী তাপস, শৈশবাবধি গৃহস্থাশ্রমযোগ্য কোনও প্রকার বিলাসভোগের তথ্য অবগত নহি। পুত্রার্থি কামিনীগণের অভিমতানুসারে ভোগবিহারই সাধুজনসম্মত, কারণ তাহাতে জাতকের আন্তরিক বৃত্তিসমূহ প্রফুল্লতা লাভ করে। শাস্ত্রান্তরে কথিত আছে—

নিরুৎসাহং নিরানন্দং নির্বীর্য্যং শত্রুনন্দনং।
মাস্ম সীমন্তিনী কাচিৎ জনয়েৎ পুত্রমিদৃশং॥

সুতরাং বরাননে, কি প্রকার ভোগ তোমার অভীপ্সিত, অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর।"

লজ্জাবনতবদনা লোপামুদ্রা কহিলেন,—স্বামিন্, কৈশোরেপিতৃগৃহে যেরূপ মহার্ঘ্য ভোগোপাদানে পরিবৃত থাকিতাম, তৎকালে তাহার কোনই গৌরব অনুভব করিতে পারি নাই। অধুনা সেই প্রকার উপাদানসম্ভারে আপনার সেবা করিতে পারিলে আমার অধিকতর তৃপ্তিলাভ হয় বলিয়া মনে হয়। সেই সকল বস্তু তখন কেবল দৈহিক তৃপ্তির উপাদান বলিয়া মনে হইত, তৎসমুদয় আপনার সেবায় নিয়োগ করিতে পারিলে যেন হৃদয়েরও তৃপ্তি সাধিত হয় বলিয়া অনুমান করিতেছি।'

অগস্ত্য। প্রিয়ে, আমি বননিবাসী তপস্বী; তাদৃশ রাজোচিত ভোগ-সম্ভার আমি কোথায় পাইব?

লোপামুদ্রা। স্বামিন্, প্রশ্রয়-প্রলুব্ধা রমণীর অপরাধ গ্রহণ করিবেন না; নাথ, যাঁহার তপোমহিমার আশ্চর্য্য প্রভাববশে, ত্রিদিবনিবাসী নির্জ্জরগণও অবনতমস্তকে বশ্যতা স্বীকার করে; তাঁহার পক্ষে সামান্য পার্থিবভোগ সংগ্রহ কি অতিশয় কঠিন, প্রভো?

অগস্ত্য। প্রিয়ভাষিণি, তোমার কথা যথার্থ, সন্দেহ নাই। কিন্তু সহৃদয়ে, তুমিই বিচার করিয়া দেখ দেখি, যে তপস্যার বলে চিত্তক্ষেত্র মার্জ্জিত হইয়া সকল অর্থের শ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্তিরূপ পরমার্থ লাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারে, অকিঞ্চিৎকর অথচ অলীক পার্থিব ভোগে সেই তপোবল প্রয়োগ কি অপব্যয় নহে ?

লোপামুদ্রা। স্বামিন্, আপনার তপোবলের অপচয় আমার অভিপ্রেত নহে। পরন্তু তপোবলের হানি না করিয়া উপায়ান্তর অবলম্বনে অর্থোপার্জ্জন করা আপনার ন্যায় গুণবান্ ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে ইহাই আমার বিশ্বাস।

ঈষৎ হাস্য সহকারে অগস্ত্য কহিলেন,—"আয়ুষ্মতি, তোমার বচনপরম্পরা শ্রবণে আমি অতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। ফলতঃ তোমার অভীপ্সিত ভোগোপকরণ সংগ্রহের নিমিত্ত লৌকিক বিধানে চেষ্টা করা আমার কর্ত্তব্য। প্রিয়ে, ক্ষুণ্ণ না হইয়া কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর, আমি প্রত্যূষেই তোমার অভিলষিত ভোগ সংগ্রহের উপায় বিধান করিতে যত্নবান্ হইব।

পরদিবস প্রত্যূষে যথারীতি গাত্রোত্থান ও নিত্যকর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক অগস্ত্য ঋষি অর্থ সংগ্রহের নিমিত্ত বহির্গত হইলেন।

শ্রুতর্ব্বা নৃপতি যেমন ধনসম্পদে তেমনই বীর্য্য ও শাস্ত্র জ্ঞানে সমসাময়িক আর্য্য নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রের ন্যায় প্রজাদিগকে পালন করিতেন। তাঁহার রাজ্যে কখনও দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির কথা শুনা যায় নাই। অকালমৃত্যু, চৌর্য্য, দস্যুতা প্রভৃতি তদীয় প্রজাবৃন্দের নিকট অবিদিত ছিল।

একদা প্রাতঃকালে নৃপতি সভামণ্ডপে সমাসীন হইয়া রাষ্ট্রকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে দৌবারিক আসিয়া অগস্ত্য ঋষির আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিলে, নৃপতি সসম্ভ্রমে সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক মণ্ডপদ্বার পর্য্যন্ত আগমন করত যথোচিত অভ্যর্থনায় সৎকৃত করিয়া তাঁহাকে সভামণ্ডপে আনয়ন করিলেন ও বিধিপূর্ব্বক পাদ্যার্ঘ্যাদি সহকারে তাঁহার অর্চনা করিলেন। ঋষিপ্রবর সুখোপবিষ্ট হইলে রাজা বিনয়নম্রবচনে কহিলেন—"গৃহীদিগের অতিশয় সুকৃতির ফলেই ভবাদৃশ মহাপুরুষগণের শুভাগমন হইয়া থাকে। আপনাদিগের স্বকীয় কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও সংসার-পীড়িত গৃহীদিগকে অনুগৃহীত করিবার নিমিত্তই আপনারা তাহাদিগের আলয়ে পদার্পণ

করিয়া থাকেন। অহো, স্তন্য-ভারাক্রান্তা জননীর ন্যায় আপনারাও দীনচেতা সংসারীদিগকে পরমার্থ দান করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাকেন। আপনারা কদাপি কাহারও দান গ্রহণ করেন না অপিচ পরম জ্ঞানধন বিতরণপূর্ব্বক সামান্যার্থক কথঞ্চিৎ প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন। হে ব্রহ্মন্, অদ্য ভবদীয় চরণরেণু-স্পর্শে ও আগমনজনিত মঙ্গলাভে মাদৃশ ব্যক্তি ও এই জনপদ যতদূর চরিতার্থতা লাভ করিল, পার্থিব কোনও সম্পদেই তাহার যথোচিত প্রতিদান হইতে পারে না, তথাপি ভবাদৃশ ব্যক্তিগণের হস্তে যে অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে তাহাই বিশ্ব ও নররূপে বিদ্যমান ভগবানের সাক্ষাৎ সেবায় লাগিয়া সার্থকতা প্রাপ্ত হয়; অতএব মহাত্মন্ আমার অভিলাষ, আপনি এই রাজকোষ হইতে কিঞ্চিৎ অর্থের প্রতিগ্রহ স্বীকার করুন।"

অগস্ত্য কহিলেন,—মহারাজ, আপনি সাধু; আপনার সদ্ভাবপ্রণোদিত বচনে আমি অতিশয় পরিতোষ লাভ করিলাম। অধুনা দারপরিগ্রহ করত আমি গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনে ব্রতী হইয়াছি। ঋতুমতী ভার্য্যার ভোগাভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্যই আমি আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। সুতরাং আপনার আয় ও ব্যয় যথোপযুক্ত রূপে সঙ্কুলান হইয়া উদ্বৃত্ত অর্থ কোষে সঞ্চিত থাকিলে তাহা হইতে আপনার ইচ্ছানুরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ দান করুন।"

রাজা। প্রভো, এই রাজ্যের আয় ও ব্যয় সমান। অর্থ উদ্বৃত্ত হইয়া কখনও কোষে সঞ্চিত হয় না। নির্দ্ধারিত ব্যয়ের অতিরিক্ত অন্য কোনও অভিনব ব্যয়ের আবশ্যক হইলে যেমন অপর কোনও ব্যয় সঙ্কোচন করত উহা সাধন করিতে হয়, ইহাও সেই প্রকারেই সাধিত হইবে।

ঋষি। না মহারাজ, আমি সে প্রকার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিব না। বিশেষতঃ এই অর্থ আমি ভোগের জন্যই গ্রহণ করিতেছি—যজ্ঞার্থে নহে। সুতরাং যে অর্থ গ্রহণে জনসাধারণের ক্লেশ সম্ভাবনা আছে, আমি তাদৃশ অর্থ গ্রহণে অভিলাষী নহি। সুতরাং আমি অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমাকে অনুমতি করুন।

রাজা। আপনকার অভিলাষ অবশ্য প্রতিপালনীয়। আপনাদিগের ভোগও গৃহিগণের আচরিত যজ্ঞাপেক্ষা বহু গুণে শ্রেয়ঃ, যেহেতু আপনাদিগের অন্তরাত্মা নিরন্তরই সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবানের সহিত এক ও সমভাবে অন্বিত; সুতরাং আপনাদিগের ভোগই গৃহীদিগের পক্ষে যজ্ঞ। তথাপি অনুগ্রহপূর্ব্বক

আপনার অঙ্গসেবকরূপেও আমাকে আপনার অনুগমনের আদেশ করিলে আমি অতিশয় আপ্যায়িত হইব।

অনন্তর ঋষিপ্রবর শ্রুতর্ব্বা নৃপতি সমভিব্যাহারে একে একে মূধ্রশ্ব, পুরুকুৎস, সুত, মহৈশ্বর্য্য প্রভৃতি আর্য্য নৃপতিগণের নিকট উপনীত হইলেন। সেই নৃপতিগণও তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই আয়, ব্যয় সমান দর্শন করিয়া তিনি কাহারও নিকট অর্থ গ্রহণ করিলেন না।

অনন্তর তিনি শুনিতে পাইলেন যে অসুররাজ ইল্বল অতিশয় ধনবান্; তাঁহার বহু সঞ্চিতধন আছে। সুতরাং ঋষিপ্রবর অপর রাজেন্দ্রবৃন্দ সমভিব্যাহারে ইল্বল-ভবনে গমন করিলেন।

অসুররাজ ইল্বল অত্যন্ত পরাক্রমশালী নৃপতি। তাঁহার রাজ্যের প্রজাগণ নিরন্তর নানা প্রকার বিলাসভোগে নিরত থাকিত। রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই ধনাঢ্য, রূপবান্, বিদ্যোৎসাহী ও বলবান্ ছিল। তাহাদের দেহকান্তি সুন্দর ও সুদৃঢ় গঠিত, এমন কি রমণীগণেরও দেহ সুবলিত দৃঢ় পেশী সমূহে গঠিত। দৈহিক গঠন ও বর্ণে তাহাদিগের নানা প্রকার বৈচিত্র্য বিদ্যমান ছিল।

নানাপ্রকার বিলাসভোগই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য সাধনের নিমিত্ত সদসদ্ যে কোনও উপায় অবলম্বনে তাহারা কুণ্ঠিত নহে। হিংসা, দ্বেষ, দম্ভ প্রভৃতি তাহাদিগের চরিত্রের ভূষণ ছিল। নিজ নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দিবার নিমিত্তই নানাবিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও দান প্রভৃতি ক্রিয়া আচরণ করিয়া থাকে। নিজের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত অপরের মহৎ অনিষ্ট সাধনে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত নহে পরন্তু তাহাদিগের সামাজিক বিচারে তাহাই ন্যায়ানুমোদিত।

তাহাদিগের ধর্ম্ম কতিপয় ব্যবহারসিদ্ধ অনুষ্ঠানের উপর সংস্থাপিত। ধর্ম্মা-চরণেও তাহাদের আচরণ ও পরিচ্ছদাদি দর্শনে অপরের সাধুবাদ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাই প্রধান প্ররোচক। পাপের কোনও নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই ও পাপে কাহারও অনাসক্তি বা ঘৃণা নাই। তাহাদের কুকার্য্য দর্শনে অপরের অবজ্ঞার ভয়েই তাহারা প্রকাশ্য ভাবে অসদাচরণে বিরত থাকে।

রমণীগণ স্বেচ্ছাপরতন্ত্রা। এই স্বেচ্ছাচারিত্বই তাহাদিগের পরম গৌর-বান্বিত স্বাধীন পদবীরূপে পরিগৃহীত। পুরুষ ও রমণীগণ ইচ্ছানুসারে স্ব স্ব পত্নী ও পতি মনোনয়ন করে, সেই প্রকারে নির্ব্বাচিত পতি, পত্নী অভিমত না

হইলে যখন তখনই পরস্পরের সম্বন্ধচ্ছেদ হইতে পারে। পরদার ও পরপুরুষা-সঙ্গাদি সামাজিক ব্যভিচার ও রাষ্ট্রীয় শাসনবিধির সীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী না হইলে পাপবোধে উহার কোনও শাস্তি বা প্রায়শ্চিত্তবিধান নাই। সমাজে নরনারীর তুল্য অধিকার থাকাতে রমণীগণও বহু পুরুষোচিত কার্য্যে বদ্ধপরিকর হয় ও পুরুষগণের সহিত প্রতিযোগিতাচরণ করিয়া থাকে।

তাহাদিগের জ্ঞান ও বিজ্ঞান কেবল স্থূল জগৎব্যাপারে পর্য্যবসিত। তাহারা বিদ্যা ও জ্ঞানবলে নানাবিধ অদ্ভুত ভোগোপকরণ সংগ্রহে বিশেষ পটু, তাহাদিগের স্থপতি ও ভাস্কর্য্য বিদ্যার কৃতিত্ব জগতে অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহারা বিদ্যাবলে নানাবিধ অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত নিপুণ। পরধন হরণের নিমিত্ত যুদ্ধার্থে ঐ সকল অস্ত্রের প্রয়োগ করিত। ছলে বলে বা কৌশলে যে যত অধিক প্রাণিহিংসা করিতে পারে, সে তত অধিক বীর বলিয়া পরিগণিত হয়। এমন কি, বিপক্ষের খাদ্যদ্রব্যের অপচয়, পানীয় জলে বিষ প্রদান, শিশু, বৃদ্ধ ও রমণীগণের প্রতি ব্যভিচার ও হত্যা প্রভৃতিও যুদ্ধের অঙ্গরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। তাই তাহাদিগের সমস্ত জীবনব্যাপারটাই একটা মহান্ সংগ্রাম বলিয়া পরিগণিত। শান্তিপ্রিয়তার অর্থ তাহাদিগের নিকট কাপুরুষতা।

বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতিপালন ও সেবা তাহাদিগের ন্যায়ানুমোদিত কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত নহে। পুত্র যৌবনদশা প্রাপ্ত হইলেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনপূর্ব্বক পিতামাতার বাধ্যতা ছেদন করে ও তাহাদের গুরুত্ব স্বীকারে পরাঙ্মুখ হয় এবং নিজের জন্মব্যাপার পিতামাতার কামোপভোগের অনিচ্ছালব্ধ নৈসর্গিক পরিণাম বিবেচনায় জন্মদাতা ও গর্ভধারিণীর প্রতি বরং দ্বেষপরায়ণ হইয়া থাকে।

রাজা প্রজাদিগের সম্পদের রক্ষক ও সুখবিধায়ক বলিয়া সমাদৃত। স্থূলতঃ অসুরদিগের রীতি, চরিত্র ও সমাজ কেবল দেহাত্মবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই আত্মমর্য্যাদা রক্ষণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহারা নিরন্তর ব্যাগ্র। সুতরাং তাহাদের আহার-বিহার ইন্দ্রিয়-সেবাদিও অতীব স্থূল। তাহাদিগের ভক্ষ্য ও পানীয় অত্যন্ত তীব্রস্বাদবান না হইলে তাহাদের রসনার তৃপ্তি সাধন হয় না। উচ্চনিনাদ ও বহু কোলাহলপূর্ণ না হইলে তাহারা সঙ্গীতের সুখোপভোগ করিতে পারে না। অত্যুজ্জ্বল বর্ণবিচিত্রিত না হইলে কোনও দৃশ্যই তাহাদের নয়নরঞ্জন হয় না। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির নিমিত্ত সৌগন্ধ-দ্রব্যের মধ্যেও দুর্গন্ধের তীব্রতা মিশ্রিত করিয়া লয়। ফলতঃ অসুর নামে

আমরা যে একপ্রকার কিম্ভূত কিমাকার অমানুষিক জীবের কল্পনা করিয়া থাকি, তাহারা তদ্বৎ কিছুই নহে। বাহ্য দৃশ্যে তাহারাও মানব ও মানবসাধারণ সর্ব্বাবয়ববিশিষ্ট জীব। কেবল আচার-চরিত্র ও রুচির পার্থক্যেই আর্য্য ও অসুরে যাহা কিছু ভেদ। দেহাত্মক বুদ্ধি বা 'অসু' ভাবের প্রাধান্য নিবন্ধন তাহারা অসুর। আর যাঁহারা এই দেহ ও জগৎকে সনাতনবদ্ধ জানিয়া ইহারই অন্তেস্থিত সর্ব্বকারণকারণরূপ ভগবানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার চেষ্টা করিতেন বা এই দেহাদিকে সেই ভগবৎ প্রাপ্তির সোপান বলিয়া জানিতেন তাঁহারা 'আর্য্য'। এই প্রকারে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে সর্ব্বত্রই দিব্য (kinetic) বা প্রকাশ ভাবের ও অসুর বা স্থিতি (static) ভাবের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। মানবমণ্ডলেও এই উভয় ভাবপ্রবণ চরিত্রের লোক ও তাহাদিগের সঙ্ঘ বা সমাজ পরিদৃষ্ট হয়। আর্য্যগণ ও অসুরগণের দৈহিক উপাদানের গুণবৈলক্ষণ্য থাকিলেও তাহাদিগের গঠনসৌসাদৃশ্যের তেমন কোনও ঘোরতর পার্থক্য ছিল না; তবে রুচি ও সমাজভেদে গঠনের যে তারতম্য হওয়া সম্ভব তাহাই ছিল।

অসুররাজ ইল্বল অতিশয় দম্ভী. মদগর্ব্বপরায়ণ ছিলেন। বাতাপি নামে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মায়াবিদ্যা ও ইন্দ্রজালাদিতে বিশেষ পারদর্শী ছিল। সে ইচ্ছাক্রমে নানারূপ জীবদেহ ধারণ করিতে পারিত। এই প্রকারে দক্ষিণা-পথনিবাসী তাপসদিগের প্রতি নানারূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিত। দম্ভপরায়ণ ইল্বল ব্রাহ্মণ ও তাপসদিগকে অতিযত্ন সহকারে অতিথিসেবার ছলে আহ্বান করিত ও মেষরূপধারী ভ্রাতার মাংস দ্বারা যথেষ্ট রূপে পরিতোষ-রূপে ভোজন করাইত। ভোজনান্তে অতিথি যখন দেহ ও মন কথঞ্চিৎ শ্লথ করিয়া একটু বিশ্রামোপভোগ করিতেন, তখন নামোল্লেখপূর্ব্বক ডাকিবামাত্রই বাতাপি অতিথিগণের উদর বিদীর্ণ করিয়া বহিরাগমন করিত। নিরীহ অতিথি জীবন বিসর্জ্জন করিতেন। এই প্রকারে সে বহু লোক হত্যা করিয়াছিল।

পঞ্চশায়কধারিণী আদিকাম দেবতা অধ্যাত্মবিদ্যাপঞ্চক সহ দেহপুরে প্রবেশ করিবার ন্যায় ষোড়শী মহাবিদ্যার মন্ত্রদ্রষ্টা সাধকসত্তম অগস্ত্য ঋষি পঞ্চনরপতি সমভিব্যাহারে ইল্বল-রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন।

ইল্বলপুরের রাজপথসমূহ সুপ্রশস্ত ও সরল, তাহার উভয় পার্শ্বে শিংশপা, শাল, দেবদারু, ঝাবুক, অশ্বত্থ ও পিপ্পলাদি স্নিগ্ধচ্ছায়াবান উন্নতকায় বনস্পতি সকল সমদূরে দণ্ডায়মান, তাহাদিগের ব্যবচ্ছেদস্থলে সমান্তরালবর্ত্তী চারু কারুকার্য্যখচিত

আলোকস্তম্ভসমূহ স্ফটকবিনির্ম্মিত আলোকাধার শির্ষে বিরাজিত রহিয়াছে; তাহাদের বর্ত্তিকাধার সমূহে সৌর-কর-রাশি প্রতিফলিত হইয়া গগনমার্গবিহারী ইন্দ্রধনুর বর্ণসৌন্দর্য্যে রাজপথ, পুষ্পবাটিকা ও পথিপার্শ্বস্থ হর্ম্ম্যরাশিকে অতুল শোভাসম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সুগন্ধ পুষ্পাসবাভিসিঞ্চনে রাজপথসমূহ পাংশু-বিরহিত ও সুগন্ধযুক্ত। রাজবর্ত্মের উভয় পার্শ্বে নানা বর্ণের ষড়ঋতু কুসুমরাজির সৌন্দর্য্য-সমুজ্জ্বল পুষ্পবাটিকাসমূহের শ্যামল আস্তরণে সুসজ্জিত রূপের পসরার মাঝে মাঝে শ্বেত, পীত, কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখোদিত নানাভাবময়ী নগ্না বা অর্দ্ধনগ্না রমণীমূর্ত্তিসমূহ একাধারে অসুরকুলের ভাস্কর্য্যের দক্ষতা ও রুচির পরিচয় প্রদান করিতেছে। পুষ্পবাটিকার পশ্চাদ্দেশে বিমানস্পর্শি তুঙ্গ হর্ম্ম্যমালা নিরন্তর মৃদঙ্গ-মুরজ-মন্দিরাদি বাদিত্ররবে মুখরিত; নৃত্যগীতপরায়ণ আসবসেবনোন্মত্ত নরনারী-গণের কণ্ঠনিঃসৃত বিকৃত রবে ধ্বনিত সঙ্গীত কোলাহলে এবং প্রমোদোল্লাসে ও মদনোৎসবমত্ত বিকট নিনাদে কোলাহল পূর্ণ। রাজপথসমূহ নানাবিধ প্রমোদ বিহারী ও পণ্যবাহী যন্ত্রযানসমূহের প্রবল ঘর্ষণ শব্দে ও পণ্যবিক্রেতাগণের উচ্চ চীৎকারে শব্দায়মান, বহু কম্মব্যপদেশে নিরন্তর ব্যাপৃত নাগরিকগণের দ্রুতপাদ-ক্ষেপে, ও কার্য্যাদির ক্ষিপ্রকারিতায় তাহাদিগের কর্ম্মঠ জীবনের চঞ্চলতা প্রতি-পাদন করিতেছে। ধাতু ও প্রস্তরাদিবিনির্ম্মিত অসুরগণের প্রতিমূর্ত্তিসনাথ সুপ্রশস্ত চত্বর, নানাবর্ণের মৎস্য ও হংসকারণ্ডবাদি জলচর বিহঙ্গসমাকুল বৃহৎ তড়াগসমূহে সমলঙ্কৃত রাজনগরী অতুল শোভা ধারণ করিয়াছে।

চতুর্দ্দিকে প্রাকার ও দৃঢ় প্রাচীরবেষ্টিত ইল্বলপুর হৃদয়ের ন্যায় নগরের মধ্যভাগে অবস্থিত। মধ্যাহ্নের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঋষিপ্রধান অগস্ত্য রাজন্য-গণ সহ ইল্বলপুরে প্রবেশ করিলেন। দুরভিসন্ধিপরায়ণ ইল্বল ইতিপূর্ব্বেই চরমুখে অগস্ত্যাগমনসংবাদ অবগত ছিলেন, কাজেই নগরে প্রবেশ করিতে তাহাকে কোনও রূপ বাধা প্রদান করেন নাই, পরন্তু তদীয় মায়াবী ভ্রাতা বাতাপির সাহায্যে অনুচরগণসহ অগস্ত্যের বধসাধন-সঙ্কল্পেও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। অগস্ত্যের আগমনমাত্র তাঁহার অতিশয় শিষ্টাচারপূর্ণ সৎকার আদি দর্শনে ঋষিপ্রবর পূর্ব্ব হইতেই কথঞ্চিৎ সাবধান ও সন্দিহান হইয়াছিলেন। সুতরাং দুষ্টবুদ্ধি ইল্বল মেষরূপধারী স্বীয় ভ্রাতার মাংসদ্বারা অতিথিদিগকে ভোজন করাইলে, অনেকের কুক্ষীবিদারণকারী বাতাপি অগস্ত্যের জঠরানলে পতিত হইবামাত্রই ভস্মসাৎ হইয়া গেল। ভোজনান্তে সহস্র সম্বোধনেও বাতাপির আর কোনও সাড়া সংজ্ঞা না পাইয়া, অসুররাজ ইল্বল মর্ম্মে মর্ম্মে অগস্ত্যকে

চিনিতে পারিলেন। তাঁহার জীবনে এই প্রকার মর্ম্মান্তিক পরাজয় ইহাই তাঁহার প্রথম। যে আসুরী মায়াবিদ্যার প্রতি তাঁহার অটুট বিশ্বাস ছিল, নিষ্কিঞ্চন ঋষি অগস্ত্যের নিকট তাহার ঈদৃশ পরাভব দর্শনে তিনি অতিশয় বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। দৈবী সম্পৎসম্পন্ন তাপস ঋষিদিগের ক্ষমতা যে তাঁহাদিগের তথাকথিত যোগ বা বিজ্ঞানবল অপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষমতাশালী এতদিনে ইল্বলের তাহা কিয়ৎ পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম হইল।

বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ অনার্য্যজুষ্ট আসুরী বিদ্যা অপেক্ষা দৈবী বিদ্যার শক্তিপ্রাবল্য দর্শনে বিস্ময়াভিভূত ইল্বল অগস্ত্যের পদ বন্দনা করিলেন ও তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিপ্রবর স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। দানবরাজ কহিলেন, আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বেই আমি আপনাকে কিঞ্চিৎ ধনদান করিবার মনস্থ করিয়াছিলাম, আপনারা পাছে প্রত্যাখ্যান করেন সেই সন্দেহে আমি তাহা এতক্ষণ প্রকাশ করি নাই। ভবাদৃশ অন্তর্দ্দর্শী ব্যক্তির নিকট বোধ হয় তাহা অবিদিত নাই।

ঋষিপ্রবর দানবরাজের বাক্যাবলী শ্রবণে তদীয় অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,—আমি যথার্থই আপনার অভিলাষ অবগত আছি। আপনি এই নৃপতিগণের প্রত্যেককে দশ সহস্রসংখ্যক ও আমাকে তাহার দ্বিগুণ কাঞ্চন মুদ্রা এবং গো, সুবর্ণ ও মনোজব গামী অশ্বদ্বয় ও হিরণ্ময় রথ দান কবিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা আমার অন্তর্দ্দর্শনশক্তির পরীক্ষা করাও আপনার অভিপ্রায় ছিল। যাহা হউক, আমরা আপনাকে বিপুল ধনশালী বলিয়া অবগত আছি। আমার সমভিব্যাহারী নৃপতিগণ বহু ধনবান্ নহেন; আমারও ধনের অতিশয় প্রয়োজন, অতএব অপরের হানি না করিয়া বিভাগানুসারে উদ্বৃত্ত ধন হইতে আমাদিগকে কিঞ্চিৎ দান করুন। ঋষিপ্রবরের বাক্যশ্রবণে ইল্বল আর্য্যগণের জীবানুকম্পার আদর্শের আভাস প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর আশ্চর্য্য হইলেন এবং তাঁহার ও তাঁহার স্বজাতীয়গণের হৃদয়হীনতার পরিচয় পাইয়া আর্য্য ও অসুরের কি প্রভেদ তাহা বুঝিতে পারিলেন। আর্য্যগণের আড়ম্বরবিহীন গৃহস্থালী ও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্রতনিয়মাদির অন্তরালে যে কি মহান্ শান্তিপূর্ণ মাধুর্য্যরাশি বিরাজিত তাহার আভাস পাইলেন ও কি আশ্চর্য্য কৌশলে আর্য্যগণের জীবানুকম্পা বৃত্তিতে তাঁহার মানসক্ষেত্র তৎকালে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি নিজকে নবজীবন প্রাপ্ত বোধ করিলেন এবং অগস্ত্য ঋষিকে এই অভিনব বৃত্তি সংক্রমণকর্ত্তা গুরুজ্ঞানে বারম্বার ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রত্যেক

নৃপতিকে সানন্দচিত্তে দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা দান করিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে প্রচুর সুবর্ণমুদ্রা এবং বিরাব ও স্বরাব নামক মনোজবগামী অশ্বদ্বয়সমন্বিত কাঞ্চনময় রথ দান করিলেন।

মহর্ষি অগস্ত্য অসুররাজের দান প্রতিগ্রহ করিয়া মনোজবগামী রথারোহণে নিমেষ মধ্যে আশ্রমে আগমন করিলেন। নৃপতিগণও মহর্ষির অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিলেন।

লোপামুদ্রা দেবী অভিলষিত রূপে পার্থিব বিষয় দ্বারা পতিদেবতার অর্চ্চনা করিয়া পরম পরিতোষ সহকারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। দেবী মহর্ষিপ্রসাদাৎ ইধ্মবাহ নামক অমিতপরাক্রমশালী পুত্র লাভ করিলেন। মহর্ষির সেই ব্রহ্মজ্ঞানবান্ মহাকবি পুত্রের অপর নাম "দৃঢ়স্যু"। অগস্ত্য ও লোপমুদ্রা সেই সর্ব্ববেদবিৎ পুত্র দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যথা সময়ে অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তপস্যানিরত হইলেন।

পুত্রের জন্য দারপরিগ্রহের ও জলপিণ্ডাদিদ্বারা পিতৃদেবতার শুশ্রূষার জন্য পুত্রের প্রয়োজন। সুতরাং পুরুষ ও রমণী উভয়ের পক্ষেই বিবাহ এবং পুত্রোৎপাদন আবশ্যক। জগতের সকল ব্যক্তির পিতৃশক্তিকেই পিতৃদেবতা নামে অভিহিত করা হয়। পিতৃদেবতা কেবল ব্যক্তিবিশেষের পিতা নহেন। উপযুক্ত লোকদ্বারা অভ্যর্চ্চিত হইলে জগতের পিতৃশক্তি তৃপ্ত হয়, তাহাতে জীবের মঙ্গল সাধিত হয়, সুতরাং সর্ব্বগুণবান্ পুত্র উৎপাদন করাও একটী বিশেষ তপস্যা। পুত্রোৎপাদন সামান্য ইন্দ্রিয় সেবার অনভিমত পরিণতি নহে।

দেবী লোপামুদ্রার জীবনযাত্রা সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় সহজ, তাঁহার তপস্যা কঠিন, ব্রত সুদৃঢ়। সংসারে দেহ, বাসনা প্রাণ মন ইত্যাদি কতিপয় উপাদান লইয়া আমরা খেলা করিয়া থাকি, ইহাদের সকলকে সমানভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যিনি এই ভবরঙ্গের অভিনয় শেষ করিতে পারেন তিনিই চতুর।

অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার জীবনের ঘটনাগুলি সাধারণ সাংসারিক মানবের জীবনের ঘটনাবলি অপেক্ষা কোনও বিশেষভাবে অনুরঞ্জিত নহে ; এই সাধারণ ঘটনার অন্তরালে মহৎ উদার হৃদয়ের অভিব্যক্তি লক্ষ্য ও তাহার অনুসরণ করিয়া সংসারের চরম লক্ষ্য ও পরমাগতিস্বরূপিণী আদি দেবতার আভাস অনুসন্ধান করাই অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার জীবন। সংসারতাপিত জীব যে কৌশল অবলম্বনে সেই পথের সন্ধান পাইতে পারে তাহাদের জীবনের কার্য্যসমূহ তাহারই ইঙ্গিত মাত্র।

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক চৌধুরী।

প্রকৃত পূজা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ঘুশ্মা সকল কর্ম্ম শঙ্করচরণে অর্পণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও সেই মৃন্ময় মূর্ত্তি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক হৃদয়েই সেই হৃদয়ের দেবতাকে বিলীন করিলেন। এইরূপে ঘুশ্মা নিয়মিত একশত একটী লিঙ্গ-মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার নিত্য-কর্ম্ম সমাপন করিলেন। পরে সেই উৎসৃষ্ট পুষ্পাদি ও মৃন্ময় লিঙ্গমূর্ত্তি সমূহ একটী পাত্রে লইয়া সরোবরে বিসর্জ্জন করিবার নিমিত্ত গাত্রোত্থান করিলেন। ঘাটের পথে যাইতে যাইতে অন্তঃপুরের কোলাহলধ্বনি ঘুশ্মার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তিনি সহসা চমকিত হইলেন; তাঁহার করধৃত নির্ম্মাল্য-পাত্রসহ দ্রুতপাদবিক্ষেপে পুত্রের শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন—ধূল্যবলুণ্ঠিতা দলিতকুসুমের ন্যায় পুত্রবধূ মূর্চ্ছিতা—সংজ্ঞাহীনা; শিষ্যমণ্ডলী রোদনপরায়ণ, বাষ্পাকুললোচন সুধর্ম্মা অধোবদনে উপবিষ্ট। শুষ্কনয়না সুদেহার আরক্ত নয়নপ্রান্তে এক নিদারুণ মনোবেদনার ও অনুতাপের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে, তাঁহার উন্মত্ত উদ্দামদৃষ্টি সঞ্চালন কি জানি কাহাকে দেখিবে বলিয়া, কি-জানি কি দেখিয়া সন্ত্রস্ত ও শশঙ্কিত।

ঘুশ্মা গৃহে প্রবেশ করিয়াই সমুদয় প্রত্যক্ষ করিলেন ও বুঝিলেন; কিন্তু যাহা বুঝিলেন তাহা গৃহস্থ মানবের নিত্য-প্রচলিত ভাষায় দুর্ল্লভ বলিয়াই লক্ষণা দ্বারা তাহার আভাস পাওয়া যায়—শব্দার্থের ব্যবহারিকভাবে তাহা দুর্ঘট। ঘুশ্মা গৃহস্থ যাবতীয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া "জয় শিবশম্ভো" এই একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অবয়বের তাৎকালিক প্রশান্ততা কি পুত্র-শোকোন্মত্তা জননীর আত্মবিস্মৃতি না ভক্তিমতী সেবিকায় একান্ত নির্ভরপ্রসূত, পাঠক তাহা অনুমান করিয়া লউন।

সমবেত পুরবাসী ও প্রতিবাসিগণের শোকোচ্ছ্বাস ঘুশ্মার প্রশান্ততা দর্শনে ক্ষণকালের জন্য স্থগিত হইল। তাহারা বিস্মিতনয়নে দেখিতে লাগিল যে, সেই পুত্র-শোকশেলাহতা জননীর নয়নে পলক নাই, অশ্রু নাই, ওষ্ঠাধরে চাঞ্চল্য নাই, মুখে শব্দ নাই, দেহে স্পন্দন নাই,—সর্ব্বত্র এক প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান। এই স্থির গাম্ভীর্য্যের সমীপে সমাগত জনমণ্ডলীর শোকের উদ্বেলতা স্তম্ভিত হইয়া গেল। বুঝি মর্ম্মের অন্তরালে একটী সমবেদনার ধ্বনি উত্থিত হইয়া বিশ্বনিয়ন্তার চরণারবিন্দাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছিল বলিয়াই আন্তরিক

গতিপ্রবাহে বহির্বিকাশ রুদ্ধ হইয়া গেল। যুশ্মা অতি ধীর অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "দয়াময়, জীবের জীবন ও মরণ ত' সমস্বরে তোমারই করুণাময় পদচিহ্নসমূহের ইঙ্গিত করে? নাথ, তবে আর আমাদের শোক কি, দুঃখ কি, তোমার খেলার পুতুল লইয়া তুমিই খেলা কর, আমরা ত' তোমার পুতুল! আমাদের সুখ-দুঃখাভিনয় তোমারই খেলার খেলা!! আমরা অবনত মস্তকে তাহাই করি নাথ! প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তে প্রপীড়িত জীব প্রাণান্তক বেদনায় ব্যথিত হইয়াও যেমন তন্মুহূর্ত্তে সেই বায়ুকেই নিশ্বাসপথে গ্রহণ করিয়া হৃদয় পূর্ণ করে ও তাহাকেই আত্মরক্ষার প্রধানতম সহায় বলিয়া জানে; দয়াময়, জীবনের যাবতীয় পীড়ার কঠোরতা যে সেই প্রকার তোমারই মহিমা ঘোষণা করে! নাথ, পুত্রশোক-কাতরার হৃদয়ের যে স্থানটুকু এতকাল পুত্রের পার্থিব রূপের দ্বারা অধিকৃত ছিল, দয়াময় আজ তোমার সেই আসনে তুমিই আসিয়া ব'স। আমার হৃদয়-আসন পূর্ণ হ'য়ে থাকুক। বায়ু ব্যতিরেকে নিশ্বাসের যেমন দ্বিতীয় বস্তু নাই, তুমি ভিন্ন হৃদ'য় ধারণ করিবার মত দ্বিতীয় বস্তু আর কোথায় প্রভো!" বলিতে বলিতে যুশ্মার গণ্ডদ্বয় বহিয়া দুটী গলিত হীরকপ্রবাহ বহিয়া গেল। সমবেত জনমণ্ডলী "জয় হরশঙ্কর" নাদে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

সেই জয়ধ্বনির উচ্চনাদে একটী পিশাচমূর্ত্তি - পিশাচ বৈ কি? নরঘাতিনী, পুত্রঘাতিনী রমণীকে পিশাচী বলিলে পিশাচেরও যে মর্য্যাদার হানি হয়!—ক্ষিপ্ত কুক্কুরীর ন্যায়, কোটরগতলোচনা, সৃক্কণীপরিলেহিতবহিষ্কৃতদশনা ব্যাদিতবদনা রমণী, বিকটনাদে চিৎকার করিয়া উঠিল—"যুশ্মা।" ওঃ কি মর্ম্মন্তুদ কঠোরধ্বনি!! যেই শব্দ শ্রবণে ধমনীর রক্ত শুষ্ক হইয়া যায় এ সেই ধ্বনি; তাহা শুনিয়া সকলেই সহসা শিহরিয়া উঠিল!! কিন্তু যুশ্মা যেমন তেমন ধ্যানস্তিমিতা দণ্ডায়মানা।

সুদেহা বলিল, যুশ্মা! যুশ্মা! ও'লো তোর চ'খে কি পুত্রহীনা মাতার শোকাশ্রু নাই! পুত্রঘাতিনী পিশাচীকে দগ্ধ করিবার মত এক ফোঁটা আগুনও নাই! যুশ্মা এই কে? এ তোর সতীন! কালসাপিনী! তোর পুত্রকে স্বহস্তে সংহার করিয়াছে! এই কালসাপিনীকে পায়ে দলিয়ে মেরে ফেল্! মেরে ফেল!! বেশী নয়, পুত্রশোকাতুরা সতীর একটা দীর্ঘশ্বাস বিশ্বদহন কর্‌তে পারে, তা না থাকে, তোর ঐ নির্ম্মাল্যভাণ্ডে মহাদেবের 'বজ্র' আছে, ও যে মহারুদ্রের বিশ্ব-প্রলয়কারী বীর্য্য, তার একটু ফেলে এই কালসাপিনীকে মেরে ফেল্!! আর না—আর দেরী না! শিগ্‌গির—শিগ্‌গির—

যুশ্মা। হা দিদি; তুমিই পুত্রের যথার্থ মাতা! গর্ত্তে ধারণ না করেও এত অগাধ স্নেহ! এত মমতা! এ অভাগিনী তার একটী কণাও পায় নাই! উন্মাদিনি, কার পুত্র কে মারে! কে রাখে! এই বিশ্ব-সংসার যাঁর খেলার ঘর, পুত্রও তাঁর, কন্যাও তাঁর; রাখেও সে, মারেও সে; তোমার আমার অভিনয়ের পালা; যার যা' পাঠ অভিনয় কর! এই বলিয়া যুশ্মা ধীরপাদবিক্ষেপে নির্ম্মাল্যোত্থিত পুষ্পতোয়াদি সরোবরে বিসর্জ্জন করিতে চলিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)
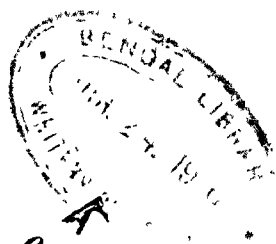
"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৫ম ভাগ।] আষাঢ়; ১৩২৩। [৩য় সংখ্যা

"প্রকৃতির হাসিমুখে আনন্দ ধরে না আর।"

তোমাদের মুখে আজ অত কেন হাসি ?
সুগন্ধ মাখিয়া গায়
বসন্তের এ নিশায়
কার তরে বসে আছ আপনা প্রকাশি ?
এদিকে ও-দিকে ঢলে
আহ্লাদে পড়িছ গলে
ছড়াইয়া রূপ সবে হ'য়ে পাশাপাশি,
হাসিও না হাসিও না গোলাপের রাশি।
হাসিও না হাসিও না পূর্ণিমার শশী,
আহা কিবা মরি মরি
দিগন্ত উজল করি
রূপের পসরা লয়ে হোথা আছ বসি,
কোন দূর কক্ষ হ'তে
নামিয়া এসেছ পথে
দূর করি ধরা হ'তে দুঃখের তামসী,
জুড়াইতে তপ্ত প্রাণ অমিয়া বরষি।
তোমাদের মুখে আজ অত কেন হাসি
ওহে ধীর সমীরণ !

কেন এত আলিঙ্গন
গায়ে গায়ে মাখামাখি, ভালবাসাবাসি ?
কি চাহ আমার কাছে
কিবা দিব কিবা আছে
আজি আমি প্রতিদান হে প্রেমপিয়াসি !
বৃথা কেন মোরে লজ্জা দেও হেথা আসি ?
বল বল কেন ওহে সুনীল অম্বর
আপনার দেহ পরে
সাজাইয়া থরে থরে
রক্ত শ্বেত কৃষ্ণ মেঘে সেজেছ সুন্দর ?
অযুত হীরকরাজি
দিয়ে বল কেন আজি
ঢেকেছ প্রশান্ত তব বপু মনোহর ?
কি সুখে ভরেছে আজি তোমার অন্তর ?
তোর কেন এত হাসি ওলো তরঙ্গিণি !
নির্ম্মাল্য দোলায়ে বুকে
লহরী তুলিয়া সুখে
কোথা যাস্ নেচে নেচে উর্ম্মিবিলাসিনি !
রাঙ্গা মুখে গেয়ে গান
কারে বিলাইতে প্রাণ
চলেছিস্ অভিসারে প্রেমে উন্মাদিনী ?
আজি কেন এত হাসি কলনিনাদিনি !
হাসিও না হসিও না, বিমল সরসী !
কুমুদ বালিকাগুলি
বসে আছে মুখ তুলি
চুম্বনে যাইছ কেন তাহারে পরশি ?
কেমনে উঠেছে জাগি
আজিকে কাহার লাগি
কক্ষে লয়ে আসিয়াছ সুধার কলসী,
লাবণ্য পড়িছে দেহে উছসি উছসি।

আজি কেন এতহাসি ওহে মহীধর?
সানুদেশে বৃক্ষরাজি
শ্যামল শোভায় সাজি
দোলায় পল্লবগুচ্ছ কেন নিরন্তর?
জোছনার বাসখানি
আপনার অঙ্গে টানি
ঊর্দ্ধে দাঁড়াইয়া তব উন্নত শিখর
কি সুখে আজিকে এত হাসিছে ভূধর?
সাগর! তোমার একি আনন্দের খেলা?
অনন্ত তরঙ্গ রাশি
হাসিয়া মুচকি-হাসি
শশাঙ্কে ছুঁইতে গিয়ে ধুয়ে যায় বেলা,
হাসিতে হাসিতে সুখে
ফেনা উঠিয়াছে মুখে,
বক্ষে বসায়েছ কত হীরকের মেলা?
কি দেখিয়া আজি এত হাসিছ একেলা?
এত কেন হাসি মুখে ওলো বসুন্ধরা?
আজিকে যে অঙ্গে তোর
ফিরিছে নয়ন মোর
হেরিছে সে প্রতি অঙ্গ সুষমায় ভরা,
জোছনায় স্নান করি
জরীর বসন পরি
ছড়াইছ কি মাধুরী প্রাণমনোহরা,
চৌদিকে ফাটিয়া পড়ে রূপের পসরা।
কি দেখিয়া মজিয়াছে তোমাদের মন?
আজন্ম তপস্যা করে
বসেছিলে যার তরে
তোমরা কি পেয়েছ সে সাধনার ধন?
যাঁর তরে দিবানিশি
ধ্যানে রত যোগী ঋষি

জীবন কাটায়ে দেয় করি অন্বেষণ,
তোমরা কি লভিয়াছ তাঁহার দর্শন ?
হাস, তবে হাস, সবে হাস, প্রাণ ভরে,
তাঁহার করুণা যাচি
আমরা বসিয়া আছি,
তোমাদের সাথে যদি লও দয়া করে।
অপরূপ রূপ তাঁর
হেরি বুঝি একবার
হাসিবে জীবন চিরজীবনের তরে
সমর্পি এ প্রাণ মন সেই বিশ্বেশ্বরে।

শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত, এম, এ, বি এল্।

তৃপ্তি ও অতৃপ্তি।

সমস্ত জীবজগৎ ব্যাপিয়া দিবানিশি যে অবিরাম সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে কি দেখিতে পাইব ? দেখিব, কি মার্জ্জিতবুদ্ধি মানব, কি জড়ভাবাপন্ন ইতর প্রাণী, সকলেই অতৃপ্তির তাড়নায় উত্তেজিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। ইহার জন্যই এত বিগ্রহ বিরোধ; একে অন্যের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে; ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া যাইতেছে; অন্তরঙ্গ বন্ধুও বিষম শত্রুতে পরিণত হইতেছে। ইহাই জীবের স্বভাব; এই বিগ্রহ বিরোধের সমষ্টিই পার্থিব জীবন।

ইতর প্রাণী পান-ভোজনের প্রাচুর্য্য এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতায় তৃপ্তি লাভ করে। অন্ততঃ আপাততঃ আমরা তাহাদিগের অন্যবিধ আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব পরিজ্ঞাত নহি। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে কেবল আহার বিহারের প্রাচুর্য্যই যথেষ্ট নহে। মনুষ্যের স্বভাবগত এমন একটী বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা আমরা এ পর্য্যন্ত মনুষ্যেতর প্রাণীতে খুঁজিয়া পাই নাই। সভ্যতার প্রথম সোপানে দাঁড়াইয়া মহারাজ মনু উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন—

"আহার-নিদ্রা ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

অদ্যাবধি পণ্ডিতগণ এই বাক্যেরই প্রতিধ্বনি করিতেছেন। কিন্তু ধর্ম্ম

কি? ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কি? মনুষ্যজীবনে উহার প্রয়োজন কি? এ সকল প্রশ্নের সুমীমাংসার প্রয়াস বহুকাল হইতেই হইতেছে; ভিন্ন ভিন্ন দেশের—বিভিন্ন জাতির মনীষিগণ এ সকল প্রশ্নের পৃথক্ পৃথক্ উত্তর দিয়াছেন। কেহ বলেন কর্ত্তব্যানুষ্ঠানই ধর্ম্ম; কেহ বলেন প্রাচীনগণের নির্দ্দিষ্ট পথে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহই ধর্ম্ম; কেহ বলেন ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের সম্পর্ক মাত্রই নাই,—সান্ত মানবের অনন্তজীবন লাভের প্রবল আগ্রহই 'ধর্ম্ম'পদবাচ্য; আবার কেহ বা বলেন ধর্ম্ম বলিয়া কোন "ধরা বাঁধা" ব্যাপার নাই,—পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া বিবেকানুমোদিত কর্ম্ম করাই ধর্ম্ম। যাহা হউক সভ্যতা-বিস্তৃতির সহিত এই দুর্ব্বোধ্য 'ধর্ম্ম' কথাটীও মানবসমাজে প্রসার লাভ করিয়াছে। বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, মানব উপর্য্যুক্ত কোন কোন মতকে ধর্ম্মমত বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, এবং যথাসম্ভব তদনুযায়ী কার্য্যও করিতেছে। কিন্তু তাহার ফলে কি হইয়াছে? তথাকথিত ধর্ম্মানুষ্ঠান মানবকে তৃপ্তি দিতে পারিয়াছে কি? বর্ত্তমান জগতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াও যদি কেহ বলিতে চাহেন যে মানব বহুশতাব্দীব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে তৃপ্তির তীরোপান্তে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইলে অনেকেই বক্তার মস্তিষ্ক-বিকার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবেন।

তবে কি জীবনে তৃপ্তির আশা দুরাশা? মানবজীবন কি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ, অনির্ব্বাচ্য অতৃপ্তির তুষানলে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে? ধর্ম্মাচরণ সদনুষ্ঠান প্রভৃতির কি কোন সার্থকতা নাই? কর্ম্মক্লান্ত সংসারতাপতপ্ত মানব হতাশব্যাকুল কণ্ঠে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। কে উত্তর দিবে? এক দিন যাহারা উত্তর দিয়াছিল, আজি তাহারা নীরব। কাল-বশে ও অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সেই চিরোচ্চারিত বাক্যসকল এক্ষণে আমাদের মুগ্ধ শ্রবণে স্বপ্নশ্রুত অলীক বাক্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে; সুতরাং সে কথায় আর আমাদেব আস্থা নাই। আমরা কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছি অথবা কর্ত্তব্য নির্ণয়ে উদাসীন; ধর্ম্মের নামে যাহা করি, তাহাও প্রাণহীন বিশ্বাসশূন্য। আমরা অতৃপ্তির তাড়নায় এত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছি যে, যাহা আপাতরম্য, যাহা আপাতমধুর তাহারই প্রতি সাগ্রহে ধাবিত হইতেছি—; তাহারই উপভোগে অতৃপ্তির তীব্র-তৃষা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

আহুতির পর আহুতি দাও, অগ্নির উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইবে; যদি প্রকৃতই—অগ্নির তর্পণ করিতে হয় ত "অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ, পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব" বলিয়া সুশীতল দধি-জল ঢালিয়া দাও!

বিদ্যাপতির রাধা অতৃপ্তির আকুল আবেগে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিতেছেন—

'জনম অবধি হাম, রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভিল।
সোহি মধুর রব, শ্রবণহি শুনমু
শ্রুতিপথে পরথ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঙায়নু
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবি হিয়ে জুড়ন না গেল॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ পাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥"

শরীরিণী ভক্তি ও মূর্ত্তিমান্ প্রেমস্বরূপা রাধার মুখে একথার যেরূপ অর্থই হউক না কেন, আমরা—সংসার-মৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ আমরা, ইহাতে কেবল মাত্র অতৃপ্তির আকুল ক্রন্দন শুনিতে পাই। আমরাও জনম অবধি কতমত রূপ দেখিলাম! শৈশবে জননীর স্নেহময় মুখে স্বর্গের সুষমা দেখিয়াছি, কৈশোরে পৃথিবীর বক্ষে সরল সৌন্দর্য্যের অবিরাম উচ্ছ্বাস দেখিয়া মোহিত হইয়াছি, যৌবনে যুবতীর মুখেই যেন যাবতীয় রূপ প্রতিফলিত দেখিয়াছি;—অরুণের প্রণয়কুস্বনে যখন উষার সলজ্জগণ্ডে রক্তিমাভার বিকাশ হইয়াছে, তখনই আমার রূপোন্মত্ত মন সে মোহনদৃশ্যে মজিয়াছে; পূর্ণসুধাকরের করস্পর্শ যখন উন্মাদিনী তরঙ্গিণী উচ্ছ্বসিতা হইয়া উঠিয়াছে তখনই আমার মুগ্ধ হৃদয় সে রূপের প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে, কিন্তু কই, সৌন্দর্য্যের সে মোহিনী শক্তি, রূপের সে উন্মাদনা কোথা গেল? রোগশোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আর ত সে আবেগ তেমন করিয়া অনুভূত হয় না; যৌবনের দূরপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রূপের সে উজ্জ্বল আলেখ্য আর ত তেমন দেখায় না! এত দিন তবে কি দেখিলাম, কি বুঝিলাম? যাহা মধুর, যাহা শ্রবণসুখকর বোধ হইয়াছে তাহাই উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়াছি; এখনও শ্রবণ

তেমনই অতৃপ্ত? কত মধুযামিনী কতমত ক্রীড়ারসভোগে অতিবাহিত করিয়াছি; তৃপ্তি হইল কৈ? যাহাকে হৃদয়ে ধরিলে সকল অতৃপ্তি দূরে যাইবে ভাবিয়া আকুল আগ্রহে বক্ষে সাপটিয়া ধরিলাম, সেত বুক জুড়াইতে পারিল না? এই বিশাল ধরিত্রীবক্ষে প্রাণে শান্তি আনিতে, অন্তরে তৃপ্তি দিতে একজনও কি মিলিল না? কেন?

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু
ভবতি হীয়তেঽর্থাদ্য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥

কঠ, ২য়া বল্লী, ১ম শ্লোক।*

এই খানেই গোল;—এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ লইয়া! উপনিষৎ বলিতেছেন প্রেয়ঃকামীর পুরুষার্থ নষ্ট হয়—জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়। সুখান্বেষণ বা বাসনার তৃপ্তি সাধন জীবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি, অস্থিমজ্জাগত অভ্যাস। সুতরাং জীব যাহাতে সুখানুভব করে তাহাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করে। উপনিষৎ বলিতেছেন—প্রকৃত শ্রেয়ঃ প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধক বস্তু হইতে পৃথক্; প্রকৃত শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির ফলে যে তৃপ্তিলাভ হয় তাহা অনশ্বর, অবিকারী। কিন্তু সে বস্তুর সন্ধান কে বলিবে? উপনিষৎ বলিতেছেন—সংসারী জীবের উপর উভয়বিধ বস্তুরই আকর্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। তাহা হইলে বুঝিব নাকি যে শ্রেয়ঃপদার্থের আকর্ষণ অতি ক্ষীণ, উহা প্রেয়ের প্রবলাকর্ষণে অভিভূত হইয়া আছে? প্রেয়ের চাকচিক্যে শ্রেয়ের জ্যোতিঃ ঢাকিয়া রাখিয়াছে? তাই কি উপনিষদান্তরে শ্রেয়ঃকামের করুণ আবেদন ধ্বনিত হইতেছে?—

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে॥

ঈশঃ—১৯।

শ্রেয়ঃ পদার্থরূপ সুবর্ণমণ্ডলে সত্যপদার্থ আবৃত রহিয়াছে। হে বিশ্বপালক!

---

* শ্রেয়ঃ অর্থাৎ প্রকৃত মঙ্গলকর বস্তু এবং প্রেয়ঃ অর্থাৎ আপাতপ্রিয় ভোগসুখের উপাদানভূত বস্তু; ইহারা পরস্পর পৃথক্ ভাবাপন্ন। সংসারী এই উভয়বিধ বস্তুর আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু যে প্রেয়ঃপদার্থের আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া শ্রেয়োমার্গ অবলম্বন করে, তাহার পরিণামে মঙ্গল হয়; আর যে শ্রেয়ঃপদার্থে অনাদর করিয়া প্রেয়ঃপ্রলোভনে পতিত হয়, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য বিফল হয়।

সেই আবরণ উন্মোচন কর; অনুসন্ধিৎসু ভক্ত সত্যপদার্থের পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হউক!

তবে কি সংসারের ভোগসুখ পরিহার না করিলে তৃপ্তি মিলিবে না? উপনিষৎ বলিতেছেন ভোগসুখ পরিহারের প্রয়োজন নাই; দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য যথাপ্রয়োজন ভোগকর, কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিও যে সেই ভোগ তোমার জীবনের চরম লক্ষ্য নহে—সর্ব্ববিধ ভোগ্যবস্তুর অন্তর্নিহিত সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরই তোমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য :—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥

ঈশঃ—১।*

অপিচ উপনিষৎ আরও বলিতেছেন :—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

মুণ্ডক—

সেই পরাবর পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার দ্বারাই হৃদয় বিকশিত হয়, সর্ব্বসন্দেহ দূরীভূত এবং সর্ব্বকর্ম্ম বিনষ্ট হয়। ইহাই পরাশান্তি, ইহাই পরাতৃপ্তি।

আর কেন মন! এইত শ্রেয়ঃপদার্থের সন্ধান মিলিয়াছে! এসো, তবে তাঁহাকেই ডাকি?—সুখসম্ভোগের পঙ্কে আকণ্ঠ ডুবিয়াছ, তাহাতে ভয় কি? এসো, ডুবিয়া ডুবিয়াই ডাকি! স্বর্ণপিঞ্জরগত বন্যবিহঙ্গের মুক্তিকামনার মত, সমুদ্রতীরগত পিপাসিতের জলপ্রার্থনার মত আকুল আগ্রহে ডাকি! যেমন ডাকিয়াছিলেন শ্রীমতী রাধিকা কুলমানে জলাঞ্জলি দিয়া গুরুগঞ্জনায় উপেক্ষা করিয়া, এসো আমরাও তেমনই সুখসম্ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া আত্মাভিমানের গঞ্জনায় উপেক্ষা করিয়া সেই প্রাণপ্রিয়কে ডাকি! তেমন করিয়া ডাকিতে পারিলে তিনি অবশ্যই আসিবেন; সেই আত্মারামের মিলনে শোক সন্তাপ জ্বালা যন্ত্রণা সব দূরে যাইবে—পরম পুলকে চিরস্থায়িনী তৃপ্তিতে প্রাণ ভরিয়া যাইবে! আর সংশয় সম্ভ্রম থাকিবে না। এক অশ্রুতপূর্ব্ব আনন্দ-সঙ্গীত মুগ্ধশ্রবণে অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হইবে :—

---

* জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে তাহারই ভিতরে বাহিরে পরমেশ্বরের সত্তা ও চৈতন্য বিরাজমান। অতএব যাহা কিছু ভোগ করিবে তাহা ত্যাগবুদ্ধিতে করিবে। কাহারও সম্পদে লোভ করিও না।

আজু রজনী হাস　　ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা ;
জীবন যৌবন　　সফল করি মাননু
দশদিশ ভেল নিরনন্দা।

×　　×　　×　　×

সোহি কোকিল অব　　লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা ;
পাঁচ বাণ অব　　লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র প্রধান এম্, এ।

প্রাণ-সখা।

(১)

কে তুমি গো প্রাণসখা, আছ কোন্ খানে ;
দুঃখ-তাপভরা ধরা ধরে না কি মনে ?
তাই কি রয়েছ কোন সুদূর প্রবাসে ?
ব্যাকুল পরাণ মোর কাঁদিছে হতাশে।

(২)

শুনি তুমি প্রাণপ্রিয়, প্রেম পারাবার ;
যার আর কেহ নাই আছ তুমি তার !
তাই ত তোমারে সখা নিশিদিন ডাকি ;
দীননাথ, এদীনের কতদিন বাকী !

(৩)

চকিতা হরিণী সম ক্ষুদ্র এ হৃদয় ;
অনুক্ষণ আশঙ্কায় হতেছে চঞ্চল।
ক্ষণে চমকিয়া ভাবি "এসেছো নিদয়
চকিতে চাহিয়া দেখি শূন্য গো সকল।

(৪)

কল্পনায় গড়া যবে তব মূর্ত্তিখানি ;
অলক্ষ্যে অঙ্কিত হয় এ মানসপটে।
আনন্দে নাচিয়া উঠে হৃদয় অমনি ;
শতখণ্ড হয় ছবি ; সুখস্বপ্ন টুটে।

(৫)

কিন্তু তব পুণ্য স্মৃতি ব্যাপি এ অন্তর
রহিয়াছে জাগরূক প্রিয়! নিরন্তর।
যাবে যাও, যেথা যথা সুদূর প্রবাসে
অন্তর করিতে তোমা নারিব মানসে।

শ্রীসতীনাথ মিশ্র।

মায়াপথ।

হে পথিক যেই পথে ভ্রমিতেছ তুমি,
মায়াময় সে পথের প্রতি ধূলিকণা,
অই যে সরল, দৃঢ়, অবন্ধুর ভূমি,
ও পথের পদে পদে ভীষণ যন্ত্রণা।
ঘুরিবে চক্রের মত পথহারা প্রায়,
কভু ও অগাধ জলে হ'বে বা মগন,
এমনি এ সংসারের চিররীতি হায়,
নহে পরিচিত পথ ভেবেছ যেমন।
সহায়, গৌরব, বল, সম্পদ্, সম্মান,
এ সব তোমার শুধু ক্ষণিক সান্ত্বনা,
দুইদিন পরে তব হ'তে পারে জ্ঞান,
ঘটনার চক্রে এযে অসার কল্পনা।
সম্মুখে করিয়া স্থির লক্ষ্য আপনার,
পথ বাহি চলে যাও হ'য়ে সাবধান,

নির্ব্বিঘ্নে হইবে যদি ভবনদী পার,
বিপথে পড়িয়া যেন হারাও না প্রাণ।
মায়াময় যিনি—এই মায়াচক্র যাঁর,
বিকারের মাঝে চির শান্ত নির্ব্বিকার,
এপথ ফুরালে মূর্ত্তি হেরিয়া তাঁহার,
বুঝিবে প্রকৃত তথ্য—ত্যজ অহঙ্কার।

শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত, এম, এ, বি, এল্।

সন্ধ্যা-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইয়াছে, এখনও দুই চারিটি কথা বলিবার আছে। প্রাণ জীব ভূ বায়ু, আয়াম=সেই বায়ুর বিধিপূর্ব্বক নিরোধ। সাধারণ প্রাণবায়ুর গমন আগমন যে হইয়া থাকে তাহাকে গুরূপদেশ ও শাস্ত্রবিধি অনুসারে নিয়মিত ও আয়ত্ত করিতে পারিলে অর্থাৎ যথেচ্ছ ভাবে বায়ুর প্রবাহ এবং অন্তঃপ্রবেশ নিরুদ্ধ করিলে মানব দীর্ঘায়ু স্বাস্থ্যবান্, লঘু এবং যোগপ্রবণ দেহ হইয়া থাকে। প্রণায়ামে শরীর খুব লঘু হয়। তাহাতে প্রাণায়ামশীর্ণ ব্যক্তি স্বেচ্ছায় শূন্যমার্গে ও জলপ্রবাহে গমন ও উপবেশন করিতে সক্ষম হয়। ইহা অভ্যাস করিতে হইলে সৎগুরুর উপদেশ ও সংযম আবশ্যক। প্রথমতঃ একান্তে স্থিরভাবে উপবেশন এবং মনের ইতস্ততঃ ভাবের নিরোধ অভ্যাস করিয়া অনন্তর হিত-মিত আহার করা অভ্যাস করিতে হয়। তাহার পর ক্রমে পদ্ধতির নিয়মানুসারে সুখ ও স্থৈর্য্যজনক আসনে পবিত্রস্থানে উপবেশন করিয়া ক্রমশঃ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। তদ্দ্বারা মনের প্রসাদন, চিত্তস্থৈর্য্য, বায়ুর সাম্য, ইন্দ্রিয়ের নৈর্ম্মল্য, শারীরিক শান্তি ও স্মৃতিবৃদ্ধি প্রভৃতি হইয়া থাকে। ইহাই শাস্ত্রে কথিত আছে,—

"প্রাণায়ামৈর্দ্দহেৎ দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্"

প্রাণায়াম দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও ইন্দ্রিয়ের দোষসমূহ নষ্ট হয়। এবং যোগাঙ্গ ধারণা, ধ্যান, সমাধি দ্বারা অশেষ পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ধন্মপ্তে ধ্যায় মাননাং ধাতূনাং হি যথামলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥

যেরূপ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত লৌহ প্রভৃতির মল যেমন অগ্নির উত্তাপে বিদূরিত করিয়া লৌহপ্রভৃতিকে স্বচ্ছ করিয়া দেয়, সেরূপ প্রণায়ামজাত তাপ, ঘর্ম্মাদি দ্বারা দৈহিক ও ইন্দ্রিয়ের মল বহিষ্কৃত করিয়া দেহ ও ইন্দ্রিয়কে নির্ম্মল করে। প্রাণায়াম সমুদ্রবিশেষ—তাহার বিবরণ দশটী প্রবন্ধেও শেষ হইবার নহে। অতএব যোগশাস্ত্রীয় আলোচনা এবং গুরূপদেশ এসকল বিষয়ে একান্ত প্রয়োজন। সন্ধ্যোক্ত প্রাণায়াম অন্তর্লোকে ও বহির্জগতে বিশ্বস্রষ্টা শ্রীভগবানের যে সকল ভূঃ প্রভৃতি স্তর বিভক্ত আছে তাহার চিন্তা ও অনুধাবন করিবার নিমিত্ত উক্ত ভূরাদি সপ্ত ব্যাহৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভূরাদি সপ্তব্যাবহৃতির বর্ণনা ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ও সংহিতাদিতে বিস্তর রহিয়াছে। ভূরাদি ব্যাহৃতি সপ্ত পরমেশ্বরের ত্রৈশ পাদ বা স্তরবিশেষ। সেই সেই বিভক্ত স্তরে নানা অবস্থায় পরমেশ্বরভাব বিরাজিত। অতএব প্রানায়ামকালে উক্ত পাদ সকলের চিন্তা ও ব্যাহরণ করিতে হয়। অন্তর্জ্জগতে ভূরাদির ভাব চিন্তা করিতে করিতে দিব্য লোকসমূহের দিব্যভাবের ব্যাহরণ হইয়া থাকে। ভূরাদি সপ্তলোকের মহা ব্যাহরণ হয় বলিয়া তাহাকে "মহাব্যাহৃতি" বলে। প্রাণবায়ু ক্ষিতি প্রভৃতি সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে সূক্ষ্ম গতিতে গমনাগমন করে তাহার নিয়মিত নিরোধ সাধন করিতে হইলে ভূরাদি সপ্তস্থানে অস্থূল রূপে বিরাজমান প্রাণবায়ুর আকর্ষণ, স্তম্ভন, রেচন করিতে হয়। এই ভাবের অভিব্যক্তিতে বিশেষ একাগ্রতা জন্মে, তদ্দ্বারা শ্রীভগবদ্‌-বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে অচিরে শ্রীভগবদ্‌ভাবের আবির্ভাব হয়।

এই ভাবে দীর্ঘকাল প্রাণায়াম করিলে যোগী বিশ্বপ্রাণের আয়ত্ত করিয়া বিশ্বতত্ত্ব অবগতপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র শ্রীভগবদ্ দর্শনে সক্ষম হন। (প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে কথিত আছে, প্রাণায়াম দ্বারা অশেষবিধ দুরারোগ্য রোগ বিনষ্ট হয়।) সামান্য ভাবে সপ্ত ব্যাহৃতি মর্ত্ত্য লোক, নক্ষত্রলোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক সত্যলোক,—এই সপ্তলোকস্থ সূক্ষ্ম প্রাণবায়ু জল স্বরূপ, জ্যোতিঃস্বরূপ, পরমাত্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরস্বরূপে অনুচিন্তা করা হয়।

"আপো জ্যোতিরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোঁম্।"

আপঃ (জলস্বরূপ) জ্যোতিঃ (অশেষ প্রকাশস্বরূপ) রস (রসস্বরূপ) অমৃতং (চৈতন্যস্বরূপ) ব্রহ্ম (পরমাত্মস্বরূপ) ভূঃ ভুবঃ স্বঃ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর স্বরূপ)

এই সকল তত্ত্বের স্বরূপের, আবির্ভাব হওয়ার নিমিত্ত প্রাণায়াম কালে অনুচিন্তন ও অনুধান করিতে হয়। পূর্ব্বোক্ত সপ্ত ব্যাহৃতি সম্বন্ধে মনুসংহিতায় মেধাতিথি-কৃত ভাষ্যে, পাতঞ্জল দর্শনে "ভুবন জ্ঞানং সূর্য্যে সংযম্যাৎ" এই সূত্রের বেদব্যাস-কৃত ভাষ্যে এবং ছান্দোগ্য উপনিষৎ ভাষ্যে ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়।

মহামন্ত্রার্থ,—

সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী তেজের প্রাণভূত অর্থাৎ অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতের সমস্ত তেজের আধারস্বরূপ। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারিণী শক্তির অভিন্ন অধিষ্ঠানের স্বরূপ (মহাশক্তি ও মহাপুরুষ উভ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কালে একরূপে অবস্থান করেন) সেই হরিব্রহ্মাহরাত্মক পরব্রহ্মকে আমি (মনের প্রণিধান সহকারে) চিন্তা করি। যিনি (সর্ব্বান্তর্য্যামী, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা সর্ব্ব ভূতে বিরাজমান) জন্ম-মৃত্যু-দুঃখাদি বিনাশের নিমিত্ত উপাসনীয়, এবং যিনি আমাদিগের (সকল ইন্দ্রিয়ে নৈর্ম্মল্য সাধন করিয়া) বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ (পুরুষার্থ চতুষ্টয়) বিষয়ে পরম কল্যাণ ও নির্ব্বাণের নিমিত্ত প্রেরণ করিতে-ছেন, তিনিই পুনঃ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য এই সপ্ত লোককে ওতপ্রোত (ব্যাপ্ত) থাকিয়া আপন জ্যোতিতে প্রকাশিত করিতেছেন। তিনিই জগতের কারণীভূত জলস্বরূপ. তিনিই মণি-পাষাণাদি স্থাবরে পরম জ্যোতিঃস্বরূপে এবং তৃণ বৃক্ষ ঔষধি প্রভৃতির অন্তরে বিশেষ রসরূপে অবস্থিত। তিনি মনুষ্য পশু পক্ষী কীটাদিজঙ্গমের হৃদয়ে চেতনাস্বরূপে বিরাজমান। তিনিই ত্রিগুণাতীত (সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই ত্রিগুণময় সংসারের পরপারে) পরব্রহ্ম স্বরূপ, এবং তিনিই সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণময় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় বিধান করিতেছেন। এই পরমপুরুষকে অন্তরে বাহিরে নানা রূপে নানা নামে নানা যোগ ধ্যানে নানা গুণে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত লোকে অনন্ত ভাবে আরাধনা করে।

সংক্ষেপে সংস্কৃতান্বয়ঃ—ভূঃ (মর্ত্ত্যলোক) ভুবঃ (নক্ষত্রলোক) স্বঃ (স্বর্গলোক) জনঃ (জনলোক) তপঃ (তপোলোক) সত্যং (সত্যলোক) (এই সকলের অধিষ্ঠাতা বা প্রকাশক) তৎ (সেই) সবিতুঃ (সর্ব্ব ভূতের উৎপাদক পরমেশ্বরের) বরেণ্যং (উপাসনীয়) ভর্গঃ (তেজঃ) দেবস্য (দীপ্তিযুক্ত, স্বয়ংপ্রকাশ) ধীমহি (চিন্তা করি) ধিয়ঃ (বুদ্ধিকে) যঃ (যিনি) নঃ (আমাদের) প্রচোদয়াৎ (নিযুক্ত বা পরিচালিত করিতেছেন) আপঃ (জলস্বরূপ) জ্যোতিঃ (পরম জ্যোতিঃস্বরূপ) রস (রস স্বরূপ) অমৃতং (চৈতন্য স্বরূপ) (ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র স্বরূপ)। ক্রমশঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য বেদান্ত দর্শন-ন্যায়-তীর্থ।

চূড়ালার উপাখ্যান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রমণীয় মন্দর-কন্দরে তৃণ-গুল্মলতা-বেষ্টিত বনৈকদেশে স্বহস্তনির্ম্মিত ক্ষুদ্র কুটিরে মহারাজ শিখিধ্বজ আজ সমাধিনিমগ্ন। রাজাধিরাজ আজ তপস্বী, ভোগী আজ ত্যাগী, সংসারী আজ যোগী। যে শিরে মণিমুকুট শোভা পাইত, তাহা আজ জটাজুট-শোভিত। যে অঙ্গ সুগন্ধি কুসুম-চন্দনে আর প্রণয়িনীর চারু আলিঙ্গনেও ব্যথা বোধ করিত, তাহা আজ ভস্মানুলেপিত। মহার্হ রাজপোষাকে যে দেহ নিরন্তর সমাবৃত থাকিত, তাহা আজ জীর্ণচীরে আচ্ছাদিত। শিবাগণের কলরব বৈতালিকের সঙ্গীত, পক্ষিসমূহের কূজন প্রণয়িনীর রসালাপ, দূরবর্ত্তী সিংহের গর্জ্জন বিপক্ষের রণবাদ্য। মৃগদলের বিচরণ ক্ষেত্র রাজসভা।

শিখিধ্বজ যোগাসনে প্রত্যগাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন। চক্ষু বাহ্যবিষয় হইতে আকৃষ্ট হইয়া অন্তর্লক্ষ্যে স্থির; কর্ণ অন্তর্জ্জগতের প্রণবধ্বনি শ্রবণে ব্যাপৃত। জনসমাগমরহিত নির্জ্জন গুহায় অকস্মাৎ মানবের সমাগম হইল, পূজ্য অতিথির পাদস্পর্শে সেই যোগস্থান পবিত্রীকৃত হইল। সম্মুখে এক সুন্দর ব্রাহ্মণকুমার মূর্ত্তিমান্ তপোদেবের মত শিখিধ্বজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার গলিত স্বর্ণসম গৌরবর্ণ, পরিধানে শুভ্র পট্টবস্ত্র, গলদেশে পুষ্পের মালা, আর করে কমণ্ডলু, ললাটে ভস্মতিলক। "হিমাভ ভস্মতিলকভূষিতানিন্দ্যসুন্দর' ব্রাহ্মণ বালক সুমেরুলগ্ন পূর্ণচন্দ্রের মত সম্মুখে দণ্ডায়মান। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজার যোগনিমগ্ন নিস্তরঙ্গসমুদ্রবৎ দেহ চঞ্চল হইল, নির্ব্বাতপ্রদীপবৎ অচঞ্চল চিত্ত বাহ্যাভিমুখে ফিরিয়া আসিল, শিখিধ্বজ যোগাসন ত্যাগ করিয়া অতিথিপরিচর্য্যায় মন দিলেন।

অতিথি আতিথ্যে তুষ্ট হইলেন। শিখিধ্বজ তখন বিনীত ভাবে ব্রাহ্মণকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন "দেববালকের সহসা এই নির্জ্জন অরণ্যে আসিবার কারণ কি? এই সুকুমার বয়সে বার্দ্ধক্যোচিত কমণ্ডলু গ্রহণের আবশ্যকতাই বা কি? সংসারের ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া কিশোরবয়সে ভস্ম মাখিবারই বা হেতু কি? এত অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ!"

ব্রাহ্মণকুমার মৃদু হাস্য করিলেন। সে হাস্যচ্ছটায় তাঁহার অঙ্গ যেন দ্বিগুণতর শুভ্র হইয়া উঠিল, সত্ত্বগুণ তাঁহার হাস্যের অন্তরালে দীপ্তিময় হইয়া দেখা দিল। উত্তর দিলেন,—

"রাজর্ষে, আপনি রাজা হইয়া ভোগসুখের আস্বাদ পাইয়াও নবীন যৌবনে যদি রাজ্য ঐশ্বর্য্য ভোগসুখ সকলই ত্যাগ করিতে পারিলেন, প্রণয়বতী রূপবতী পত্নীকে অসহায়া করিয়া অনায়াসে পরিহার করিতে পারিলেন, তবে আমি ব্রাহ্মণ হইয়া যৌবনের প্রারম্ভে ভোগসুখে অনভ্যস্ত বয়সে কেন তাহা পারিব না? আপনি কি শুনেন নাই যে উপনয়নের পরই কোন কোন ব্রাহ্মণবালক চির ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন? আপনি কি জানেন না যে, প্রথম বয়সে চিরব্রহ্মচর্যপালন, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়াই সন্তানোৎপত্তির পর সংসারত্যাগ ব্যবস্থিত হইয়াছে? তাহাও সকলে পারে না বলিয়াই শাস্ত্রের শেষ আদেশ—"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ।" যৌবন-ভোগ শেষ করিয়া পরিণত বয়সে প্রৌঢ়কালে সাধারণ ব্যক্তি ত্যাগপথ অবলম্বনে সক্ষম হইতে পারেন, তাই—"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহীভূত্বা বনী ভবেৎ, বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ" ইহাও কি আপনি অবগত নন?

রাজা বুঝিলেন ইহা একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। এই বালক বড় সহজ ব্যক্তি নন। ইনি কি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব, কিংবা অগ্নি দেবতা, অথবা সত্যই ত্যাগব্রতে ব্রতী ব্রাহ্মণবালক! তখন শিখিধ্বজ সেই ব্রাহ্মণবালকের চরণে পতিত হইলেন, কহিলেন—

"ভগবন্ আমাকে উদ্ধার করিবার জন্যই কি আপনি এ স্থানে আসিয়াছেন? আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আমার এই স্থানে বাস করুন, সদুপদেশদানে কৃতার্থ করুন। প্রভু এখনও আমি সর্ব্বতোভাবে বাসনার জয় করিতে পারি নাই, মাঝে মাঝে আমার প্রিয়তমার ম্লান মুখশ্রী চক্ষুর উপরে ভাসিয়া উঠে, মনের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন আর আমি ভগবৎপাদপদ্ম ভাবিতে পারি না। সতী লক্ষ্মীকে অসহায়া অবস্থায় ফেলিয়া আসিয়াছি, সেজন্য মধ্যে মধ্যে মন ব্যাকুল হয়। প্রভু, উপদেশ দানে শান্তিদান করুন।"

বালক তখন সহসা গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার শারদচন্দ্রপ্রতীকাশ মুখখানি কালিমাময় মেঘে ঢাকা পড়িল; চক্ষুপল্লব সজল হইয়া উঠিল, ছিন্নতার বীণাস্বরে ঝঙ্কার দিল—

"রাজর্ষে! তাহার জন্য চিত্ত ব্যাকুল করিবেন না, যখন ত্যাগই করিয়া আসিয়াছেন, তখন বৃথা কেন সে চিন্তা করেন? আপনার রাজ্যের সমস্তই কুশল। আমি সেই রাজ্যে গিয়াই শুনিলাম, আপনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া তপস্বী হইয়াছেন। আপনার পত্নী চূড়ালা আপনার মত রাজ্য পালন করত

প্রজাগণকে সন্তুষ্ট রাখিয়াছেন, সতী সাধ্বী পত্নী আপনার তত্ত্বজ্ঞানের বিঘ্ন চাহেন না। তিনিও আপনাকে আর শ্রীভগবানকে অভিন্ন জানিয়া সেই ধ্যানে নিমগ্না। নিষ্কাম হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন। সংসারে মানবী দেবী ও তপস্বিনী এই ত্রিবিধভাবের আদর্শ সেই চূড়ালাকে দেখিয়া আসিয়াছি।”

শিখি। প্রভু, সে যে কুররীর মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে না, সে যে যূথভ্রষ্টা হরিণীর মত ব্যাকুলনেত্রে আমার অন্বেষণ করিতেছে না, জানিয়া স্বস্তি পাইলাম। এবার আমি সম্পূর্ণ চিত্তজয় করিতে পারিব। সে যে রাজ্যে সুখে শান্তিতে আছে, এ সংবাদে আমি কৃতার্থ হইলাম।

বালক। রাজর্ষে, সংসারে দ্বিবিধ আদর্শ। প্রথম সর্ব্বত্যাগ বা সন্ন্যাস, দ্বিতীয় ত্যাগ। সন্ন্যাস প্রধানতঃ ব্রাহ্মণগণের জন্য। ত্যাগ সর্ব্বসাধারণের জন্য। বিশেষতঃ কর্ম্মফলরূপ ত্যাগরূপ এই ত্যাগই ক্ষত্রিয়ের জন্য। রাজর্ষি জনকই এই দ্বিতীয় আদর্শের। আপনি যে রাজা হইয়া ক্ষত্রিয় হইয়া কঠোর সর্ব্বত্যাগব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, এজন্য আমি আপনার উপর অনুরক্ত হইতেছি। আপনার নিকটে থাকিয়া আমিও সাধনা শিক্ষা করিব, আপনার আদর্শে আপনাকে অনুপ্রাণিত করি, একলক্ষ্যে দুজনে একপ্রাণে সিদ্ধিপথে অগ্রসর হইব। আপনি সাবধান হইয়া এক প্রাণে সাধনায় রত হউন, আমি অনুসরণ করিতে থাকি।

শিখি। মহাভাগ, আপনি দেবতা, ছলনা করেন কেন প্রভু? আপনি ত সকলই বুঝিতেছেন। আপনার এই কান্তি ত মানুষে সম্ভব হয় না। নিশ্চয়ই আমাকেও এত সহজে আয়ত্ত করিলেন, আপনাকে দেখিতে দেখিতে যে আমি আত্মহারা হইতেছি। আপনার অমৃতনিস্রাবী দেহলাবণ্যে আমার প্রাণ মন ভরিয়া গিয়াছে।

হে সুন্দর, আপনাকে দেখিয়া আমার চিত্তে যে কত ভাব উঠিতেছে, তাহা আমি ভাবিতে পারিতেছি না। চূড়ালার যে অঙ্গসৌকুমার্য্য একদিন যৌবনে বড় প্রিয় ছিল, আজ আমার নিকট তেমন ভাবেই আপনার অঙ্গসৌন্দর্য্য মধুর ঠেকিতেছে। যেন যৌবনের প্রিয়তমাই আজ পুরুষমূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে আসীন।

বালক। রাজর্ষে, এখনও আপনি চূড়ালাকে ভুলিতে পারেন নাই, আপনি যথার্থ প্রণয়ী, তাই আপনার ভালবাসা আমাকে আকর্ষণ করিয়াছে, শ্রীভগবান্ আপনার ভালবাসায় আকৃষ্ট হইবেন এ আশা আমি করি। যে ভালবাসার

দৃষ্টিতে স্ত্রীকে দেখিতেন, আজ আমাকে সেই ভালবাসার দৃষ্টিতেই দেখিতেছেন, তাই আমি আপনার পত্নীর মতই প্রিয় হইয়াছি। আমার জীবন সার্থক।

শিখি। প্রভু, আপনি কে? কোথা হইতে আসিতেছেন? কি উদ্দেশ্যে এখানে শুভাগমন হইয়াছে জানিতে ইচ্ছা করি।

বালক। কৌতূহলের আধিক্য সাধকের পক্ষে শুভফলপ্রদ নহে। আজ আমি আপনার কৌতূহল নিবৃত্তি করিব না। যখন দেখিব, আমার সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল আর নাই, তখনই আমার পরিচয় দিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামসহায় বেদান্তশস্ত্রী কাব্যতীর্থ।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আমরা জ্ঞান বা প্রেম যে কি তা আদৌ বুঝি না, কেবল কথা লইয়া তর্ক-বিতর্ক করি—বাক্‌বিতণ্ডা করি, আসল দিকে মোটেই দৃষ্টি নাই। বিষয়াসক্তি ও দুর্ব্বাসনার প্রাচীর এরূপ দৃঢ় করিয়া দিয়া বসিয়া আছি যে, জ্ঞান বা প্রেম কোনটীই তাহার ভিতরে প্রকাশ হইতেছে না। মহাপ্রভু বলিলেও আমরা শুনি কৈ? দোহাই তাঁর দিয়া থাকি বটে, কিন্তু তাঁর উপদেশ শুনি কৈ? যাঁরা আসল জিনিষ পাইয়াছেন বা আসল জিনিষ দেখিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই এক কথা।

আচার্য্য শঙ্কর "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলিয়া যে একত্বভাবের স্থাপনা করিলেন, মহাপ্রভু তাহার বিপরীত কথা বলেন নাই—সেই মহাবাক্যটীই প্রেমপুটিত করিয়া তাঁহার অমৃতনিস্যন্দী বদন হইতে নিঃসৃত হইল—

"সর্ব্বজীবে সম্মানিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।"

'জীবমাত্রই কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান' ইহা অভ্যাস করিতে করিতে চিত্ত সুসংস্কৃত ও মলিনতামুক্ত হইতে থাকিবে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, তিনি জীবমাত্রেই সম্মান প্রদর্শন করিতে বলিলেন—আমরা ঐ আদর্শের কতটুকু রক্ষা করি তাহা আপনা-আপনি বুঝিতে পারিবেন। ইহাই হইল প্রথম স্তরের কথা;—তারপর দ্বিতীয় স্তরে 'আমি'কে ভগবানের ছায়া বা প্রতিবিম্ব তাঁহার অংশ বুঝিলে তবে পরতত্ত্ব বুঝিবার অধিকার হইবে। আজ সত্য সত্য কয়জন এই অবস্থায় বর্ত্তমান আছেন—এই অবস্থা আসিবার পূর্ব্বে—অর্থাৎ সিদ্ধদেহরূপ অহংভাবে

নিজের স্বরূপানুভূতি না হইলে রাগানুগা ভজনা হইবে কিরূপে? তাই মহাপ্রভু বলিলেন, "ভাই রে তুমি 'জাতি' অভিমানে বসিয়া আছ—ওটা ত্যাগ কর, তুমি ধনের অভিমানে তুমি সন্ন্যাসের অভিমানে থাকিয়া সেই অজাতি পুরুষের সহিত মিলনাশায় বসিয়া আছ, ওভাবে হইবে না—সেই পুরুষটী কেমন রকমের যে একটুও অভিমান সে দেখিতে পারে না—ঐ অভিমানটুকু ছাড়িয়া আপনাকে শুধু ক্ষেত্রমাত্র বলিয়া বা ''গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ'' বলিয়া জান, তবে তাঁহার সহিত মিলিতে পারিবে।" সেই করুণহৃদয় পুরুষটী কতরূপে আমাদের কাছে আসিতেছেন, আমরা অভিমানের প্রাচীরের ভিতরে বসিয়া আছি বলিয়া একটীবারও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ দর্শন হইতেছে না। এই অভিমানের বশে যুগযুগান্তর কাটিয়া গেল—এই ভ্রমাত্মক ভাব লইয়া জন্ম-জন্মান্তর কাটিয়া গেল তাঁহার সহিত মিলন হইল না।

তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্যই ত সকল সম্প্রদায়ের চেষ্টা এবং সেই জন্যই ধর্ম্মানুষ্ঠান এখনও একেবারে জগৎ হইতে লুপ্ত হয় নাই। সম্প্রদায়গত আবরণের মধ্য হইতে সম্প্রদায়ের বরেণ্য সেই ভাবটী যখন একেবারে হারাইয়া গিয়াছিল, দেশের সেই অবস্থায় বঙ্গদেশের কি সৌভাগ্য যে এই বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সেই পরম প্রেমতত্ত্ব পাত্রাপাত্রনির্ব্বিশেষে বিতরিত হইয়াছিল। যখন দেশ ব্যবহার-রসে মত্ত, কৃষ্ণভক্তিশূন্য সেই অবস্থায় পরম প্রেমিক শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীমৎ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত অবতীর্ণ হইয়া গদাধর-আদি শক্তি-অবতার ও শ্রীবাসাদি ভক্তির সহিত সেই প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উদ্ঘাটন করিয়া জগতের এক নূতন অভিনয় দেখাইয়া গেলেন।

সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া।
পূর্ব্ব-প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘারিয়া॥
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন।
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ॥

কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে এত অল্পদিনের মধ্যেই সেই প্রেমবন্যার স্রোত ক্ষীণ হইয়া গেল—জগতে সেই প্রেমবন্যা এত অল্পদিনে শুকাইয়া গেল।

তাঁহাদের বৈরাগ্য, ত্যাগ ও অকৈতব কৃষ্ণভক্তি যে আদর্শ রাখিয়া গেল, শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ সেই স্রোত বজায় রাখিলেও অল্পদিনের মধ্যেই সে প্রণালী ক্রমে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িল। সেই যতীন্দ্র-প্রবরের ধর্ম্ম এখন "ন্যাড়ানেড়ীর" ধর্ম্ম। আজ "বৈষ্ণব' ' বলিলেই তাঁহার সহিত

"প্রকৃতি" আছেই এই বুঝিতে হয়। যে ধর্ম্মের স্থাপনা করিতে গিয়া "হরিদাস বর্জ্জনের" কঠোরতার চিত্র মহাপ্রভুর কমনীয় চরিত্রে স্থান পাইয়াছে—স্ত্রীসঙ্গ-সঙ্গী পর্য্যন্ত যাঁহার উপদিষ্ট বৈধীভক্তিতে স্থান পায় না, সেই ধর্ম্মের যাজকগণ আজ মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া "রামানন্দের প্রকৃতি সঙ্গের" কথা উল্লেখ করিতেছেন—ইহা অপেক্ষা আস্পর্দ্ধার কথা আর কি হইতে পারে!

তোমার আমার কি "রামানন্দের" সহিত তুলনা হয়? ভাই, তুমি কি প্রাণখুলিয়া "রাম রায়ের" ভাষায় বলিতে পার "না সো রমণ ন হাম রমণী"? তুমি কি হৃদয়ের সহিত "আমি যে সেই কৃষ্ণপদদাসী" এই বলিয়া বুদ্ধিতেও অনুমান করিতে পার? যদি পার তবে ও-পথে যাও—আর যদি তা না পার তবে ঐরূপভাবে জগৎকে বঞ্চনা করিও না, আপনাকে বঞ্চনা করিও না ও পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইও না। মহাপ্রভুর সমসাময়িক তদানীন্তন ভক্তসঙ্ঘের মধ্যে এক রামানন্দেরই এইরূপ যুবতী-সংসর্গের কথা শুনা যায়। মহাপ্রভু তাঁহার সম্বন্ধে বলিলেন—

"এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।"

সেই অধিকার আজ ঘরে ঘরে হইয়াছে—সেই অধিকার আজ এত সস্তা ইহা বিশ্বাস করিতে প্রাণ চায় না। হইতে পারে এও সাধনার এক পন্থা, হইতে পারে এরূপ সাধনার ফলও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-স্ফূর্ত্তি, হইতে পারে এ পথও কিশোরশেখরের কেলিকুঞ্জে পরিসমাপ্ত; কিন্তু মহাপ্রভু সাধারণের জন্য এ মত সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া বোধ করা যায় না। মহাপ্রভুর কথা হইতে বেশ বুঝা যায় যে রামানন্দরায়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাঁহার নির্ব্বিকার হৃদয়ে স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম—সে প্রেমের স্ফুরণে 'স্ত্রীত্ববুদ্ধি' ফুটিতে পারিত না, সে প্রেমপ্রবাহে তরুণী যুবতীর অস্তিত্ব থাকিত না, সে প্রেমে ব্রজরসশিক্ষার সাধিকা ভিন্ন অন্যভাব স্থান পাইত না। তাঁহার মুখের কথা—

নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য্য তরুণীস্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥

তিনি জগতের জীবের মঙ্গলের জন্য আপনাকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

আমি ত সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে থাকুক প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহি বিকার পায় মোর তনু মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির রহে কোন জন॥

কাজেই "রামানন্দের অধিকার" আমাদের দাবী করিবার কিছুই নাই, আমাদের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—

কামে মোর হতচিত নাহি মানে নিজহিত
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা॥

তারপর ঐরূপভাবে সাধনা করিতে গেলে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি আর কি? রামরায়ের চক্ষে সেই তরুণী আর তরুণী নহে, সে শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক দাসী—তাহার অনুগত হইয়া রামানন্দ যে প্রেমভক্তিরসে নিমজ্জিত থাকিতেন সে কথা বুঝিবার শক্তিও আমাদের হয় নাই। মহাপ্রভু তাই বলিলেন—

তাঁহার মনের ভাব তেঁহো জানে মাত্র।
তাহা জানিবার দ্বিতীয় নাহি পাত্র॥

সেই সিদ্ধদেহ—সেই অপ্রাকৃত মন লইয়া তিনি যে রাগানুগাভজন দেখাইয়াছেন—প্রাকৃত দেহ, প্রাকৃত মন লইয়া সে ভজন হইবে কিরূপে? তাই—শুদ্ধ আমি বা আত্মানুভূতি না হইলে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে পারা যায় না।

"সখী বিনা এই লীলার অন্যের নাহি গতি।"

তাই বলিয়া জোর করিয়া সখী সাজিলে হইবে না বা পুরুষবুদ্ধি বা কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি ষোল আনা বজায় রাখিয়া মনে মনে কেবল চিত্র আঁকিলে হইবে কেন? তাই সাধারণ জীবের অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন—"বাপু হে, জীবে দয়া কর, নামে রুচি কর, আর বৈষ্ণব-সেবা কর"। জীবে দয়া করিতে গেলেই সকল জীবের সহিত একটা একত্ববুদ্ধি আপনি আসিয়া পড়িবে। একজনকে দয়া করিতে গেলেই অস্পষ্টরূপে বুঝিয়া ফেলি যে সেও আমারই মতন একজন। এইরূপে ভক্তিযোগের প্রথম কথা যে অভেদবুদ্ধি—হৃদয়ে স্ফুরিত হইবে।

আমরা নিত্যলীলার নিত্যসঙ্গী হইতে চাই—কিন্তু একটু ভেদ থাকিলেই মৃত্যু হইতে মৃত্যুই প্রাপ্ত হইব। ভাগবতে স্পষ্টই আছে—

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরং।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণং॥ ১।২৯।২৬

ভিন্ন দৃষ্টি না গেলে মৃত্যুর হাত এড়ান যায় না, তাই যদি নিত্য লীলাপ্রবাহ নিজ হৃদয়ে প্রকট করিবার ইচ্ছা থাকে তবে অভিন্নদৃষ্টি হইতে হইবে। তাই "প্রতিজীবে কৃষ্ণঅধিষ্ঠান" জানিতে হইবে।

তিনি ত সর্ব্বজীবের হৃদয়ে আছেন, কিন্তু কৈ সে লীলারস ত প্রবাহিত হইতেছে না—তিনি ত স্বতঃ অভিব্যক্ত, কিন্তু কৈ তাঁহার সহিত ত মিলন হইতেছে না। ইহার কারণ আমাদের ভেদবুদ্ধি, ইহার কারণ অভিন্ন-দৃষ্টির অভাব। বাহিরে এই অভেদ ভাব দেখিতে দেখিতে ভিতরেও সেই ভগবদ্ভাব প্রকট হইবে—তখন দেখা যাইবে যে অহংটী অগ্নির ন্যায় প্রকৃতিরূপ কাষ্ঠ হইতে প্রকট হইলে শিখারূপে সর্ব্বদাই উর্দ্ধাভিমুখী—তখন এই অহংএর সর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও কি এক অভিনব ভাবের খেলা দেখা যায়। এই সম্বন্ধের ফলে মেঘদর্শনে শ্রীকৃষ্ণানুভূতি, চটক পর্ব্বত দেখিয়া গোবর্দ্ধনবুদ্ধি এবং নদী সন্দর্শনে কালিন্দী বুদ্ধি ফুটিয়া উঠে—সর্ব্বও থাকিল, অহংও থাকিল, ফুটিল কি—এক অপূর্ব্বভাবমাধুর্য্য। সর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ থাকিলেও তখন তাঁহার মূর্ত্তি নয়নে পড়ে না, কেবল ইষ্টদেবের স্ফুরণ হয়।

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥

এইরূপে বাহিরের ভাব ও ভিতরের ভাব একসুরে বাঁধা হইলে সেই অন্তর-বাহিরে অবস্থিত কাল পুরুষটী এই অহংএর সহিত এক বিচিত্র অভিনয় আরম্ভ করে। সেই "বিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামা" অহং গোপীদিগের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে। সেই বিতৃষ্ণ আত্মা সেই সর্ব্ব সমর্পণের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত মিলিত হইলেও কি একটা ব্যাকুলতা, কি একটা ভয়, কি এক অভূত-পূর্ব্ব বিস্ময় আসিয়া তাহাকে অধিকার করে।

সব সখি মিলি যব শুতায়ল পাশ।
চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস॥

তখনও সম্পূর্ণ ত্যাগ হয় নাই, একটু আমিত্ব তখনও রক্ষা করিবার বৃত্তি ক্ষীণ ভাবে হৃদয়দেশ অধিকার করিয়া আছে, তাই প্রেমময় তাহাকে ক্রোড়ে লইলেও ঈষৎ সঙ্কোচতার ভাব দৃষ্ট হয়—এই অহংকে তাঁহার চরণে ছাড়িয়া দিলে সে জানে যে কেবল আনন্দই লাভ হইবে কিন্তু ছাড়িতে যেন একটু কষ্ট হয়, তাই

করইতে কোরে ধনী মোরসি অঙ্গ।
মন্ত্রণা শুনে যেন বাল ভুজঙ্গ॥

কিন্তু তার পরক্ষণেই সে সর্ব্বসমর্পণ করিয়া অহংকে তাঁহার চরণে ছাড়িয়া দিয়া সে বলিতে পারে—

সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।

এইবার ঠাকুর ছাড়িব না, সব ছাড়িয়াছি—মন একাভিমুখী হইয়াছে, তোমার চরণের এইবার নিশ্চয় দাসী লইলাম—আপনাকে তোমার চরণে বিনামূল্যে বিক্রয় করিলাম। প্রাণবঁধু! এখনও বেশ দেখিতেছি যে তুমি ভিন্ন "এ তিন ভুবনে আর কে আমার আছে।" এখন তুমি যে একমাত্র গতি—যতদিন অন্য গতি ছিল ততদিন ত বাহিরে কত জন্মজন্মান্তর ঘুরিয়াছি, কৈ সে গতির ত বিরাম হয় নাই—আজ বেশ বুঝিলাম

"প্রাণনাথ বিনে গতি যে নাহিক মোর"

এই গতি বা 'অহং' সেই পর বা ভগবৎ-তত্ত্বে পরিসমাপ্ত হইতে পারে। ব্যক্ত যাহা কিছু তাহা সেই নীল মহোদধির উর্ম্মিমালা, কাজেই "ব্রহ্মা পুরন্দর" প্রভৃতি কোন ব্যক্ত ভাবে এই অহং পরিসমাপ্ত হইবে না। কোন ব্যক্ত ভাবই স্থির শাশ্বত ভাব নহে, সমুদ্রের লহরীর সমান সর্ব্বদাই অস্থির—চঞ্চল।

কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমায়ত সাগর লহরী সমানা॥

এই অব্যক্ত পুরুষের সহিত মিলিত হইবার সময়ে কি ব্যক্ত অহংভাব প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। তখন আমিত্ব রক্ষা করা যায় না। তখন—

আপনার নাম সখি নাহি পরে মনে।
তখন—শয়নে স্বপনে দেখে কালরূপ খানি॥

ইহাই হইল আসল ভক্তি—ইহাই হইল মহাপ্রভুর দিব্যভাবোন্মাদ, ইহাই হইল রাগানুগা ভক্তি। ভক্তেরও যেরূপ জগৎ-ভোলা ভাব হয়, জ্ঞানীরও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

ভক্ত ও অব্যক্তের উপাসক জ্ঞানীও তাই—উভয়ের সাধ্য বস্তুই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব। তবে প্রভেদ এই যে জ্ঞানী অগ্রে অহংকে ভগবানে লয় করিয়া তৎকার্য্যভূত জগৎকেও লয় করেন। ভক্ত অব্যক্তভাবকে ভগবান্ রূপে লক্ষিত করিয়া তাঁহাতে ব্যক্তজগতের লয় করেন এবং পরিশেষে সেই চৈতন্য-সাগরে আপনাকেও হারাইয়া ফেলেন।

মহাপ্রভু ভক্তের এই ভাবের ইঙ্গিত করিয়াছেন—ভগবানের কথা শুনিতে তাঁহার বাহিরের জগৎভাব একবারে তিরোহিত হইয়া যাইত, তখন তাঁহার 'আমি' জ্ঞানটী যেন দেশাবচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় চলিয়া যাইত। তখন এই 'আমি' সেই আমির সহিত মিলিত হইয়া দুই আমির ঘন ঐক্য বোধগত হইয়া যাইত। তখন 'জীব আমি'র আমিত্ব রক্ষা করা যায় না। কখনও একবার "এ আমি"

একবার সেই "পর আমি" ফুটিতে ফুটিতে "এ আমিটী" সেই "আমিটীর" স্বরূপ-গত ঐক্য চিনিয়া ফেলে—সেই সময়ে কি আর দ্বৈত থাকে—তখন "অহং" 'স"এর সহিত মিশিয়া যায়। ইহাই ত "সোঽহং" মূর্ত্তি। মহাপ্রভু এই "সোঽহং" মূর্ত্তির অভিনয় করিয়া গিয়াছেন। "সোঽহং" অর্থে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি বা শ্রীগৌরাঙ্গ। "সোঽহং"এর অহং শব্দে শ্রীমতী রাধিকা—এইটী হইল বাহিরের ব্যক্তভাব বা প্রকাশ ভাব, তাই কান্তি বা রূপ হইয়া বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে। মহাপ্রভুর এই যথার্থ রূপ ব্রজের বিশাখা সখী রামানন্দের আবরণে আপনাকে আবৃত করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন—

তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তার অঙ্গ-আভায় তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা॥

কিন্তু এই রূপের পশ্চাতে এই ব্যক্তের অতিগ আর একটী ভাব লুক্কায়িত আছে, সেই ভাবটী বেদান্তের "স" বা ভাগবতের ভগবান্ বা শ্রীকৃষ্ণ। এই দুইটী পৃথক্ বস্তু নহে, অগ্নি ও দাহিকা শক্তির ন্যায় অবিচ্ছিন্ন—সোঽহং শব্দে দুইটী বিভিন্ন বস্তুর সংমিশ্রণ নহে। 'অহং'এর স্বরূপভূত পরাভাবই "সোঽহং" শব্দের ইঙ্গিত। একই বস্তু "লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ" সেই ব্রজের দুইরূপ মিলিয়া নদীয়ায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাই নদীয়াবিহারীর লীলায় কখনও অব্যক্ত স্বরূপ "স" প্রধান হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাবে—

দুই হাত বুকে ধরি রাই রাই করি
ধরণী পরল মুরছিয়া।

আবার কখনও "অহং" প্রধান করিয়া শ্রীমতী রাধিকার ভাবে—

কানু কানু করি রোঅই সুন্দরী
দারুণ বিরহ হুতাশে॥

এই অপূর্ব্ব লীলাই—"সোঽহং" শব্দের ব্যাখ্যা। "অহং'এর স বা পরাভাব, কিংবা 'স'এর অহংরূপে প্রকাশশীলতা "সোঽহং" শব্দের ব্যুৎপত্তি। 'অহং" এর 'স' অভিমুখী স্বাভাবিক গতিই ব্রজগোপিকাগণের পরকীয়া প্রেম। ইহাই হইল "নির্ধূতভেদভ্রমং", ইহাই হইল "সাধ্য বস্তুর অবধি"—

প্রভু কহে সাধ্য বস্তু অবধি এই হয়
কৃপাকরি কহ রায় পাবার উপায়॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

সুখ ও স্বাস্থ্য।

এই বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রধান নিয়ম এই যে বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, মানব সকলেরই ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। এই নিয়ম অখণ্ডনীয়। ইচ্ছাশক্তি-দ্বারাই এই নিরবচ্ছিন্ন উন্নতি হইতেছে। ইহাকে ক্রমোন্নতির নিয়ম বলে। এই নিয়মকে কেহ কেহ ঈশ্বর বলিয়াছেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন ইহা ভালবাসা, কেহ কেহ বলিয়াছেন এই নিয়মই আকর্ষণ-শক্তি। ফলতঃ এই নিয়মদ্বারাই যে জগৎ পরিচালিত হইতেছে ইহা একটী মীমাংসিত বিষয়। এই নিয়মটি ভালবাসার আকর্ষণ-শক্তি। এই শক্তি মানবহৃদয়ে কিরূপে কার্য্য করিতেছে? উত্তর :—সুখের ইচ্ছাদ্বারা। প্রত্যেক মানবের হৃদয়মন্দিরে স্পষ্টরূপে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে যে—সুখ চাই। দুঃখ কেহ চাহে না। সুখ চাই! সুখ চাই! সুখ চাই! নিরবচ্ছিন্ন সুখ চাই ইহাই সমস্ত নরনারীর ঐকান্তিক বাসনা। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষীদিগেরও এই বাসনা আছে, মৃত্তিকা, সোনা, রূপা, প্রভৃতি পদার্থের মধ্যেও এই বাসনা নিহিত আছে। আমি জানি যে আমার এই বাসনা আছে। সদ্যঃপ্রসূত শিশু ও মৃত্তিকা, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জানে না যে তাহাদের কোনও বাসনা আছে। জানা কি না জানাদ্বারা বাসনা থাকা কি না থাকা নির্ণীত হয় না। জগতে যে মন ব্যতীত কিছু নাই, যাহাকে জড় পদার্থ বলা যায় তাহারও শেষ বিশ্লেষণ যে মন, তৎসম্বন্ধে এই প্রবন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা অসম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন এই যে সকলেই সুখ চায় তথাপি সকলেরই দুঃখ দেখিতেছি ইহার কারণ কি?

সুখের কামনায় সুখের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম, ফল হইল দুঃখ। ইহা বাসনার ত্রুটি নহে। বহুদর্শিতার ত্রুটি। ধন চাই, চুরি করিয়া ধন উপার্জ্জন আরম্ভ করিলাম। বহুদর্শিতার অভাবে উপায় নির্ব্বাচনে ভুল হইল। সেই ভুলে অনেক কষ্ট পাইলাম। পরে এই বহুদর্শিতালাভ করিলাম যে চুরি করিয়া ধন উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে সুখ হয় না।

এই প্রকারে আমাদিগের মনে সুখের বাসনায় নানাপ্রকার উপায় অর্থাৎ পথ উদ্ভাবিত হইতেছে। বহুদর্শিতার অভাবে সুখের প্রকৃত পথ আবিষ্কার করিতে পারিতেছি না। ঠিক পথ না পাইয়া বিপথে ভ্রমণ করিতেছি এবং ঠেকিয়া ঠেকিয়া—কষ্ট পাইয়া পাইয়া বহুদর্শিতালাভ করিতেছি। যে মহাপুরুষ-দিগের এইপ্রকারে কষ্ট পাইয়া পাইয়া সংসার-অরণ্যে ভ্রমণ শেষ হইয়াছিল,

তাঁহারা সুখের প্রকৃত পথ বাহির করিয়া পৃথিবীর উপকারার্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যদিগের শিক্ষা-প্রণালী একপ্রকার, প্রকৃতির শিক্ষা-প্রণালী অন্যপ্রকার। প্রকৃতি দুঃখ দিয়াই শিক্ষা দেন। তিনি যে শিক্ষা দিতে চাহেন তাহা বহুদর্শিতালাভ দ্বারাই শিক্ষা করিতে হয়। যদিও ইহাই প্রকৃতির নিয়ম বটে, তথাপি মহাত্মাদিগের প্রদর্শিত পথ দ্বারাও মানবগণের যথেষ্ট সাহায্য হইতেছে।

অন্তর্নিহিত বাসনা সুখ প্রাপ্তি। প্রকৃতি নানাপ্রকার কষ্ট প্রদান করিয়া দীর্ঘকাল অন্তে তোমাকে প্রকৃত পথ দেখাইবেন। মহাত্মাদিগের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন কর, অচিরে নিশ্চিত নিত্য সুখ প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। সুখ কি? উত্তর:—এখন এই পৃথিবীর মনুষ্যদিগের যে পর্য্যন্ত উন্নতি হইয়াছে তদনুসারে তাহাদিগের সুখের আকাঙ্ক্ষা হইতেছে। এখন আমরা শারীরিক স্বাস্থ্য ও সর্ব্বদা মনের সন্তোষ চাই। কি উপায়ে তাহা পাইতে পারি? উত্তর:—মহাত্মাদিগের প্রদর্শিত পন্থা এই যে আমাদিগের মনের ভাব মিথ্যা না হইয়া সত্য হইলেই শরীরটি সুস্থ ও নিরোগী থাকিবে এবং আমরা সর্ব্বদা আনন্দ-সাগরে ভাসিত থাকিব। জীবন আর ভারবহ থাকিবে না, অত্যন্ত হাল্‌কা হইয়া যাইবে।

সত্য কি? এবং মিথ্যা কি? নিত্যতা, সাহস, প্রফুল্লতা, নিশ্চিন্ততা ভবিষৎচিন্তারাহিত্য, ভালবাসা প্রভৃতি গুণগুলি স্বাভাবিক ও সত্য। অনিত্যতা, ভীরুতা, বিষণ্নতা, দুশ্চিন্তা, ভবিষ্যৎচিন্তা, সন্দেহ ও নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি গুণগুলি মিথ্যা ও অস্বাভাবিক। সুখ সর্ব্বদা আপনিই আছে। দুঃখ উৎপন্ন করিয়া লইতে হয়। এতৎসম্বন্ধে পঞ্চদশীতে একটি উত্তম শ্লোক আছে। তাহার মর্ম্ম এই যে, 'শিশু মাতৃস্তন্য পান করিয়া মৃদু শয্যাতে শায়িত থাকিয়া আপনি আপনি হাসিতে থাকে। অনুরাগ ও বিদ্বেষ প্রভৃতির উৎপত্তি তাহার হৃদয়ে না থাকায় আনন্দই তাহার স্বভাব। ক্ষুধা পাইলে কান্দে। ক্রন্দনের অর্থাৎ দুঃখের হেতু ক্ষুধা। সেই হেতু নিবারিত হইলে স্বাভাবিক আনন্দ আপনি আপনি প্রকাশিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি দ্বারা দুঃখ হয়। মনের ঐ সকল বৃত্তি না থাকিলে সুখ আপনিই উদ্ভাসিত হয়। সুখই অস্বাভাবিক। এই সুখস্বরূপে স্বাভাবিক অবস্থার কোন সীমা নির্দ্দিষ্ট নাই। সীমা ব্যক্তিগত মনের কার্য্য, সুতরাং কাল্পনিক। অসীম অনন্ত একমাত্র সচ্চিদানন্দ কোটী কোটী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যে মূল কারণ তাহাই সৃষ্টির পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থা—এই সচ্চিদানন্দ

অবস্থায় যুক্ত হইয়া থাকা, আমিই এই অনন্ত আনন্দসাগর, আমি ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহি, সর্ব্বদা এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাসে থাকাই প্রকৃত পন্থা। এইভাবে থাকিলে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিবে ও অন্যান্য সকল বিষয়েই সর্ব্বদা সুবিধা হইয়া আসিবে। বিশ্বাসপূর্ব্বক এইভাবে থাকিলে অনতিবিলম্বে অল্পে অল্পে ফল প্রত্যক্ষীভূত হইবে। মনের ভাবগুলি বিশুদ্ধ হইলেই সুখ ও স্বাস্থ্য, এবং অবিশুদ্ধ হইলে রোগ ও দুঃখ হয়।

কি উপায়ে মনের ভাব সর্ব্বদা বিশুদ্ধ রাখা যায় ইহা অতি দুরূহ সমস্যা। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এখন পর্য্যন্ত নানাদেশের মহাপুরুষগণ এতৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। ফলতঃ মানব-মনের স্বভাব এই যে একপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে অতি সহজে সেই প্রকার চিন্তা করা অভ্যাস হয়, ক্রমে সেই অভ্যাস ঘনীভূত ও অতিদৃঢ় হয়। যেরূপ চিন্তা করে যদি সেইরূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে আরও সহজে ঐরূপ চিন্তা করার ও কার্য্য করার অভ্যাস জন্মে। আমরা এই জন্মে যেরূপ চিন্তা করিতেছি ও কার্য্য করিতেছি. এইরূপ চিন্তা করিতে ও কার্য্য করিতে এই জন্মেও অভ্যাস করিয়াছি এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেও অভ্যাস করিয়াছিলাম। প্রত্যেক ব্যক্তি বিগত বহু জন্মের ও বর্ত্তমান জন্মের অভ্যাসের সমষ্টি মাত্র। জীব অর্থ ই অভ্যাসের সমষ্টি। কোন ব্যক্তির অভ্যাস দুশ্চিন্তা করা। এর অভ্যাস পরিবর্ত্তিত করা অতি দুরূহ ব্যাপার। কোন ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে ভীরু, এক্ষণ প্রাচীন বয়সে কি উপায়ে সে নির্ভীক হইবে? দীর্ঘকালের অভ্যাস পরিবর্ত্তিত করা অতি দুরূহ হইলেও অসাধ্য নহে।

ভীরুতা, বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তা. ভবিষ্যৎ চিন্তা, নিষ্ঠুরতা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি অবিশুদ্ধ ভাবের স্রোত রুদ্ধ করিয়া তৎস্থানে ঐ সকল ভাবের বিপরীত বিশুদ্ধ স্রোত প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই জগতের বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী সকলই মন। সকলই মনের আকার মাত্র। দুশ্চিন্তা, ভীরুতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি মনের কার্য্য। এই সকল দুশ্চিন্তা, ভীরুতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি রোগের আকারে শরীরে প্রকাশিত হয়। রোগ মনের কুপ্রবৃত্তির বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মনের কার্য্যদ্বারাই রোগের উৎপত্তি হয় এবং মনের কার্য্য দ্বারাই রোগের বিনাশ সাধিত হইতে পারে। অতএব পূর্ব্বে যে ব্যক্তি দুশ্চিন্তা প্রভৃতি অবিশুদ্ধ মনের ভাব পোষণের অভ্যাস-বশতঃ রোগাক্রান্ত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তিই এই প্রবন্ধ পাঠের পর হইতে দুশ্চিন্তা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিলে নিরোগী হইতে পারেন। মনে মনে অভ্যাস করিতে

হইবে যে আমি চিন্তাশূন্য জীব, আমি নির্ভীক পুরুষ, এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে অবিশুদ্ধ চিন্তাস্রোত রুদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে।

মনের ভাবগুলিও একপ্রকার পদার্থ। ইহাদিগের আকার আছে, রং আছে এবং ওজন আছে। আমি ভীরু নহি এইরূপ চিন্তা অপেক্ষা দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত আমি সাহসী এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে এবং কাজকর্ম্ম কথাবার্ত্তা সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারেই সাহস প্রদর্শন করিতে হইবে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন —আপনি কেমন আছেন ? বিশ্বাসের সহিত উত্তর দিবেন—বেশ আছি। এই ভাবে যতই মনে মনে বিশুদ্ধভাব পোষণ করিতে থাকিবেন ততই পূর্ব্বরোগ নষ্ট হইয়া নূতন স্বাস্থ্য উৎপন্ন হইতে থাকিবে। সার কথা এই যে, সত্য ও বিশুদ্ধ ভাব পোষণ করা অভ্যাস হইলেই চিরসুখ ও স্বাস্থ্য নিত্যসহচর হইবে। কোন ব্যক্তি একবৎসর অথবা অন্ততঃ ছয় মাস এই প্রবন্ধের লিখিতানুযায়ী অভ্যাস করিলে স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিবেন যে আর পূর্ব্বের ন্যায় মাসে মাসে সর্দ্দি ও পেটের অসুখ হয় না। আর দুশ্চিন্তার স্রোত তাঁহাকে দিক্‌বিদিক্ ভাসাইয়া নেয় না এবং বহু অর্থ ধ্বংস করিয়া ও অতি সতর্কতার সহিত জীবন পরিচালিত করিয়াও যে স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন নাই সেই স্বাস্থ্য আপন হইতে তাঁহার নিত্যসহচর হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীরজনীকান্ত ঘটক চৌধুরী।

প্রকৃত পূজা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"দাঁড়া—দাঁড়া"! পুত্রঘাতিনীকে অভিশাপ দিতে পার্‌লিনি? আশীর্ব্বাদ দে; রোষানলে ভস্ম কর্! তার চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আর কি আছে!! ওঃ সুদেহার স্বামী—না না যুশ্মার স্বামী!—তোমাদের প্রাণেও কি আগুন নাই? তুমিও কি ভস্ম কর্‌তে পারলে না!! পুত্রঘাতিনী পাপিনীর সামান্য স্থূল দেহটা কি এতই অদাহ্য! অশোষ্য! অচ্ছেদ্য!! তোমাদের পদতলে ফেলে না হয় এই ক্রূর খল সর্পকে মেরে ফেল! এই ক্ষমা ক্ষমা-ধর্ম্ম নহে! এ অধর্ম্মের প্রশ্রয়!! ক্ষমা করো না; মার, মার!! ওঃ এই পাপিনীর পাপতন্তুর

মৃত্যুতেও অধিকার নাই! মৃত্যু ইহাকে স্পর্শ করিতে ঘৃণা করে, ভয় করে! যাই; যেই সরোবর-কুক্ষিতে আমার সোণার চাঁদের নবীন দেহ রহিয়াছে দেখি সে ইহাকেও গ্রহণ করে কি না? এই বলিতে বলিতে উন্মাদিনী সুদেহা যুশ্মার অনুসরণ করিল।

শঙ্করদীঘির বীচি-বিক্ষুব্ধ কাল সলিলে প্রভাত রবির বাল কিরণমালা, একই সূর্য্যবিম্বকে কোটী খণ্ডে বিভক্ত করিয়া সরসী রূপসীর তরুচ্ছায়াসমাকুল কৃষ্ণাঙ্গে কি মনোরম হীরকহার দোলাইতেছে! মরি মরি কি অপরিসীম শোভার আস্পদ! এই সেই সরোবর যাহার কাকচক্ষুবিনিন্দিত কৃষ্ণসলিল-ভাণ্ডে,—ব্যক্তজগতের অন্ধকাশস্বরূপিণী প্রকৃতির ঘোরতম তমোময় হৃদয়ক্ষেত্রে সজল মালূরপুষ্পাক্ষত সমাকুল, লিঙ্গমূর্ত্তি সমূহ বিসর্জ্জন করিতে তাহারই তীর্থ-সোপানে অবতীর্ণা। শঙ্কর সরসি! তুমি ভক্তিমতী যুশ্মার দেহ স্পর্শে কি আনন্দের হাস্যচ্ছলে উছলিয়া উঠিতেছ? না পুত্রহারা জননীর শোককাতর হৃদয়ের সহিত সমবেদনার ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইতেছ? তোমার প্রশান্ত হৃদয়ের হাস্যরোদনবিলাস আমরা বুঝি না, সরসি! আমাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিবে কি? তরলে বীচিবিক্ষোভ-মধুর কোমল স্বর লয়-সঙ্গত জলতরঙ্গ বাদিত্রের তানে এই কি গান গাহিতেছ? কলনাদিনি! গাও, বালে গাও, ঐ দেখ তোমারই সঙ্গীতধারা যুশ্মার কর্ণকুহরে শিবজয়ধ্বনি বর্ষণ করিতেছে; তাই তাহার প্রশান্ত পুলকিত অপাঙ্গপ্রান্ত বহিয়া ঐ প্রেমাশ্রু-ধারা ঐ শিবানন্দ প্রশান্ত গণ্ডদ্বয়ে কি অপরূপ শোভায় দ্যোতিত হইয়া উঠিতেছে—গাও, গাও, বারম্বার গাও—

শান্তং মধুরং শিবমদ্বৈতং
সুন্দরং চিদানন্দকন্দং।

প্রভাতসমীরণ! তুমিও গাও—নবমুকুলিতা লতিকার কণ্ঠালিঙ্গনপূর্ব্বক নাচিয়া নাচিয়া গাও—

শান্তং সুন্দরং শিবমদ্বৈতং—

বনস্পতিগণ তোমরাও নীরবে থাকিও না। মধুর কাকলিকুশল বনবিহগ-কুল তোমরাও গাও ঐ তানে তান মিলাইয়া গাও,

গাওরে—গগন পবন জল—
তরু লতা তৃণদল
গাও শাখী গাও পাখী গাও ফুলফল,

গাহ নর গাহ নারী
মুক্তকণ্ঠে নাম তাঁরি
শান্তং শিবসুন্দর সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গল ॥

তোমাদের সর্ব্বময় কণ্ঠে মঙ্গলালয়ের মাঙ্গল্য নাম সর্ব্বত্র মঙ্গলময় হউক।

একাতান-লয়সমন্বিত যুশ্মার হৃদয়সরোবরও তখন বহির্ব্বিশ্বের সহিত সমতানের আনন্দপ্রবাহে দ্রবিত ও সম্মিলিত থাকা প্রযুক্ত তদীয় নির্ম্মল স্বচ্ছ চিত্তখানিকে সরসীসলিলে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইল। সরসীর সলিলবক্ষে অনন্ত বীচিমালায় প্রতিবিম্বিত একই তপনতনু অবলোকন করত তাঁহার ভগবদ-ভিমুখিনী চিত্তবৃত্তি সেই পরম অহঙ্কাররূপী শিবপদাভিমুখে প্রবাহিত হইল, তখন কি-জানি-কি স্মরণ করিয়া অমিত আনন্দভরে যুশ্মা জলরূপী ভবপদাম্বুজে আপনার স্থূলদেহ বিন্যস্ত করিয়া পিতৃ-অঙ্কগত শিশুবালিকার অপার সুখে নিমজ্জিত হইল।

স্নানাবগাহন সমাপনপূর্ব্বক বাহ্যজ্ঞানবিরহিতা যুশ্মা কি-জানি-কেমন একটী নিরালম্ব বৃত্তির উত্তেজনায় গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহার বহির্দৃষ্টি বিলুপ্ত-প্রায় হইলেও বীজরূপী অন্তর্নিহিত সংস্কারসমূহ তাঁহাকে যথাযোগ্য পথেই চালাইয়া লইতেছিল। শাস্ত্র বোধ হয় ইহাকেই নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। ঘাটের সোপানাবলী অতিক্রম করত তটাভিমুখে উঠিতে উঠিতে সরোবরের জলের আলোড়ন শব্দে চমকিত হইয়া যুশ্মা সহসা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন যুশ্মার সেই বিশলভাব অনুভূতির মধ্যে, লয়োন্মুখিনী মনের একাগ্রতার মধ্যে, তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে একটী বহির্মুখী স্বর-লহরী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। "মা"!—যে একমাত্র প্রণব ঝঙ্কার সাধককে লয়াভিমুখী করিয়া জগদ্ভাব বিলীন করিয়া দেয়, এই কি সেই! সেই শক্তিময়ী স্বরের বিপরীত আবৃত্তি? সেই লয়-কারিণী শক্তির বিশ্বতোমুখী আকর্ষণী বাণী? তাহা না হইলে যুশ্মা এত চমকিত হইবেন কেন? যুশ্মার দেহ ভার বোধ হইতে লাগিল, জগৎ সত্যানুভূত হইতে লাগিল; চিত্তে যুশ্মা বোধ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, যুশ্মা যেন স্থবিষ্ট হইয়া আবার নব কলেবর ধারণ করিলেন। যুশ্মা আবার শুনিলেন 'মা',—'মা'—এযে যুশ্মার পরিচিত প্রিয়কণ্ঠস্বর!! যুশ্মার প্রতিলোমকূপ কণ্ট-কিত হইয়া উঠিল—ধমনীতে সবেগে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠিল, কি এক অব্যক্ত উন্মাদনার বশবর্ত্তী হইয়া যুশ্মা সেই ভ্রাম্যমাণ শব্দাভিমুখে ফিরিয়া চাহিলেন—যাহা দেখিলেন তাহা সাধারণ স্থূল বুদ্ধিতে যথার্থ

বলিয়া বিশ্বাস হয় না! দেখিলেন তাঁহারই পুত্র, তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছে। যুশ্মার নয়নদ্বয় অশ্রুধারে প্লাবিত হইয়া উঠিল; আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। চক্ষু মুছিয়া আবার দেখিলেন আবার শুনিলেন সেই প্রীতিপূর্ণ 'মা' শব্দ। যুশ্মা বিস্ময়স্তিমিত অনিমেষনয়নে সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে সেই মূর্ত্তি নিকটবর্ত্তী হইল; তাহার প্রসারিত করদ্বয় কাহার উদ্দেশ্যে ঊর্দ্ধাভিমুখে উৎক্ষিপ্ত ললাট স্পর্শ করিল!! এই অবসরে সেই মনুষ্যমূর্ত্তি মাতার চরণ বন্দন করিল। যুশ্মার অপত্যবৎসল হৃদয়বেগাকৃষ্ট দেহলতা "জয় মহাদেব" রবে পদাবনত যুবকের কণ্ঠালিঙ্গনে গলিয়া পড়িল। যুশ্মা আবার বাহ্যজ্ঞান হারাইলেন।

চকিতের ন্যায় চক্ষুরুন্মীলন করিয়া যুশ্মা দেখিতে পাইলেন দেবাদিদেব শশাঙ্ক-শেখর স্থূল জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গ মূর্ত্তিতে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন।

"মার! মার! মেরেফেল!! এই বুকে শূলাঘাত কর!! বলিয়া উচ্চ-নিনাদ করিতে করিতে উন্মাদিনী সুদেহা গুল্মান্তরাল হইতে সহসা যুশ্মার সমীপবর্ত্তিনী হইল। যুশ্মা দেখিতে পাইলেন যে মহাদেবের ত্রিশূলাগ্রে সহসা তাহার হৃদয় আহত হইল, সে হত চৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িতে যাইতেছিল অমনি যুশ্মা তাহাকে অপনার অঙ্কে ধারণ করত দেবাদিদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন— "তব হাতে ম'র' অধমপাতকী

নব জীবন পাইবে হে"—

প্রেমাশ্রুবিগলিতনয়না যুশ্মা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—দেব, ঠাকুর! এত দয়া! এত দয়া তোমার!! আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের পুণ্য কেবল মন বুঝান। নাথ তোমার কৃপা ত পাপী তাপী বাছে না!! পুণ্যবতী সুদেহা, সৌভাগ্যবতী সুদেহা দিদি, তোমার অক্ষয় পুণ্যে আজ এই অভাগিনীর ভাগ্যে ভগবানের দর্শন লাভ ঘটিল!! ঠাকুর, অন্তর্য্যামিন্, এই অযাচিত কৃপারাশি দান করিবার নিমিত্তই কি তুমি তোমার এই জীব অণুটীকে কি আশ্চর্য্য কৌশলে সমস্ত জীবন যাপন করাইয়া অবশেষে লোকলোচনের সমক্ষে পুত্রঘাতিনী সাজাইলে? দয়াময়! তোমার কৃপার রহস্য তোমারই বিদিত!' দেবাদিদেব ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন, যুশ্মে! অভীপ্সিত বর গ্রহণ কর।

যুশ্মা। কি বর চাহিব প্রভো! আমার মত ক্ষুদ্র জীবকণাসমূহের যাহা প্রয়োজন, তাহা ত তুমি সকলই পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ। তবে আর আমার চাহিবার মত কি আছে নাথ! তবে আমার সামান্য স্ত্রীবুদ্ধিতে একটী কথা

জাগিল!—সুদেহা আমার সপত্নী, আমরা উভয়ে দেহ ও মনের ন্যায় পতির সেবায় নিযুক্ত আছি। হে দেব! তোমার অর্চ্চনে যদ্যপি আমার কোনও পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে, তবে সুদেহাও যেন তাহার অংশভাগিনী হয় এবং সর্ব্বজীবের আধারেই যেন দেহরূপিণী সুদেহা মনোরূপিণী যুশ্মার পুণ্যকর্ম্মনিচয়ের ফলভাগিনী হইয়া এই সংসারে সুধর্ম্মারূপ পতিকে আশ্রয় করিয়া কালযাপন করিতে পারে।

মহাদেব বলিলেন, "তথাস্তু; বৎসে! তোমার শিবার্চ্চন-ব্রত সংসারের মানব-মনে যাহাতে নিত্য জাগরিত থাকে, সেই নিমিত্ত আমি অনাদিলিঙ্গরূপে এই সরোবরতীরে অবস্থিত রহিলাম। তপঃপরায়ণ সুদেহাশ্রয়ী জীব যখনই স্বীয় হৃদয়সরসীর দিকে দৃষ্টি করিবে, তখনই যুশ্মার প্রতিষ্ঠিত এই অনাদিলিঙ্গ তাহার মানসনেত্রে প্রতিফলিত হইবে ও জীব তখন আমাতেই তাহার নিজ স্বরূপ দেখিতে পাইয়া কৃতার্থ হইবে। বৎসে! তোমাদের পুণ্যফল অক্ষয় হইবে, তোমাদিগের বংশধরগণই লোকশিক্ষার নিমিত্ত সংসারের গুরুরূপে অধিষ্ঠিত থাকিবে। সুধর্ম্মার বংশই আমার অতি প্রিয় হইবে। সুধর্ম্মা আমারই অবয়ব জানিবে।"

ইতিমধ্যে সশিষ্য সুধর্ম্মা ও প্রতিবাসিগণ সকলে সেই শঙ্কর-সরোবরতীরে উপনীত হইয়া সেই অনাদিলিঙ্গমূর্ত্তি দর্শনে পরম পরিতৃপ্ত ও পুলকিত হইয়া সুধর্ম্মার পুত্র পুত্রবধু, সুদেহা ও যুশ্মার সহিত সেই অনাদিলিঙ্গমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে পরিক্রম করিতে করিতে 'হর হর বম্ বম্' শব্দে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিল।

পাঠক! যদি কাহারও এই দেবালয় দর্শন করিবার সাধ থাকে, তাহা হইলে সুধর্ম্মাপুরে গমন করুন, তথায় শিবসরোবরকূলে যুশ্মেশ্বরের মন্দির ও দেবতা দেখিয়া কৃতার্থ হইবেন। তবে একটী কথা মনে রাখিবেন যে, "যুষ্মদ্" শব্দের অর্থ "তুমি"। সমগ্র জীবের জন্য, ভগবানের জন্য প্রাণ না কাঁদিলে, জীবে দয়া ও নামে রুচি না হইলে সুধর্ম্মা-সন্ততিগণের আশ্রয় পাওয়া যায় না। সেই পরম ভাগবৎ পরম বৈষ্ণবগণের সেবা ব্যতিরেকেও আবার নামে রুচি আদি হয় না; অতএব এক সঙ্গে এই তিনটি সম্বল করিয়া নয়নদ্বয় স্থির করিলেই দেখিতে পাইবে, তোমার দেহপুরেই এই মন্দির অবস্থিত; কেবল তোমার দেহপুরেই নহে, সর্ব্বদেহপুরই যুশ্মেশ্বরের মন্দির ও যুশ্মার পূজাই প্রকৃত পূজা।

ওঁ তৎসৎ হরিঃ ওঁ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

দিশেহারা—

প্রলাপ।

(১)

ও মন পারে যাবার সময় হ'ল কাজ সেরেনে ত্বরা করে,—
পারের মাঝি বড়ই কড়া নইলে খেয়া দেবে ছেড়ে।
থাকবি প'ড়ে সিন্ধুতীরে
কেউ চাবে না বারেক ফিরে
প্রাণের জ্বালায় মরবি ফেটে কাঁদ'বি কেবল হা হা করে ;
খেয়া তখন নেচে নেচে হেলে দুলে যাবে পারে।

(২)

অনিত্য এ বিষয় আশয় ভাসিয়ে দিয়ে অতল নীরে,
ভেঙ্গে দিয়ে এসব খেলা চলরে ত্বরা চলরে তীরে।
নইলে খেয়া দেবে ছেড়ে
পাবি না আর যেতে পারে ;
তা'ই থাকতে সময় চলনারে মন উঠি গিয়ে খেয়ার 'পরে,
দেখব মাঝি কেমন ক'রে আমায় ছেড়ে যায়রে পারে।

(৩)

ঐ যে রে ঐ ডাকছে মাঝি বেঁধে খেয়া সিন্ধু-তটে—
সন্ধ্যা যে রে ঘুনিয়ে এলো পারে যাবি ত আয় ছুটে।
সময় হলেই দেব ছেড়ে
দাঁড়াব না কারুর তরে
শুনব না রে কারুর কথা ডাকলে তখন কাতর স্বরে,
তাই থাকতে সময় ডাকছি আবার কে যাবি রে আয় ছুটে।

শ্রীজীবনধন চক্রবর্ত্তী।

শর্ম্মার পত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

মহাশয়, আমার একটী উপসর্গ জুটেছে। নানা সর্গ নিয়েই আছি—সর্গ, বিসর্গ, উপসর্গ, সংসর্গ ইত্যাদি। তার মধ্যে একটা উপসর্গ যদিও বিশেষ কিছুই নয়। আপনার পন্থার দায়ে ও আমার 'আমি' বদলানর দায়ে পড়ে আমার এই উপসর্গটী জোটাইতে হয়েছে। এর নাম চিন্তামণি চমৎকার! আমি বক্তা, ইনি আমার লেখক। লেখাটা আমার বড় আসে না, কাযেই একে জুটাতে হয়েছে। আমি উহার নামটা বিলাতি হিসাবে "সংক্ষেপ" ক'রে চি. ম. চ. করেছি। চিমচে একটা কথা তুলে ফেলেছে, তার একটু উত্তর না দিলেও চল্‌ছে না, কারণ আপনার পন্থায় যেমন আমার মত চৌঁরাসহির পণ্ডিতও অনেক আছেন, তেমন চিমচের মত "পোড়ামুখো" পণ্ডিতও অনেক চলে, কাযেই অনেকেরই সেই প্রশ্ন উঠতে পারে। গতবারে হঠাৎ মুখদিয়ে বেড়িয়ে গেছে যে এই বিসর্গগুলির বর্জ্জনই হল কর্ম্ম। চি.ম.চ মহাশয় ধরে ফেল্লেন ও আমার আঁতে ঘা দিয়ে বল্লেন, মহাশয় ও বিসর্গ বর্জ্জনের কথা বড় সহজেই বলে ফেল্লেন কিন্তু ওটা যদি বলামাত্রই বর্জ্জন করা যেত তবে আপনিই বা ঐ সম্বিদার বিসর্গ-নিয়ে পড়ে আছেন কেন?

বাপু চিন্তামণি ভুল ক'র না, বিসর্গটাও যেমন কর্ম্ম, বিসর্গ ছাড়াটাও তেমনই কর্ম্ম। এইখানে একটু 'যোগের' কথা বলতে হচ্ছে—যোগটা আদৌ কর্ম্মই নয়; যোগটাই হচ্ছে ধর্ম্ম। যোগ সনাতন, চিরন্তন, নিত্য। কর্ম্মদ্বারা যোগ হয় না। কর্ম্মছাড়া হইলেই যোগ হয়। মূলে যোগেরও হওয়া-হয়ি নাই। যোগ নিত্য; তবে যে যোগ হওয়া বলা ওটা ভাষার খাতিরে—কথার দায়ে পড়ে বলতে হয়। যদি ঠিক কথাটা বলতে হয় তবে 'যোগ' 'বিয়োগ' কিছুই নাই, আছে কেবল এক অখণ্ড 'আমি'।

তবে যখন তোমরা দেখছ যে বিসর্গই আছে, কর্ম্মই আছে, যোগকরা আছে, ব্রহ্মকে লাভ করা আছে—তোমাদের এতগুলি দোকানদারী বুদ্ধি আছে অর্থাৎ শর্ম্মার শাস্ত্রে যাহা নাই তোমাদের শাস্ত্রে যখন তাহা আছে, তখন কাযে কাযেই তোমাকে ভেড়ার দলের সিংহের ছানার মত কুয়োর

জলে মুখ দেখাতে হচ্ছে; কি করি? বিসর্গ—ভূতভাবোদ্ভবকর বিসর্গটা কি বুঝেছ'ত? ঠিক ঠিক বল।

চি.ম.চ। হাঁ, বিসর্গ'ত যেন বুঝলাম। এখন বিসর্গ ছাড়া যায় কি করে?

শর্ম্মা। তা বাপু হাঁ করে'ত দিব্যি বল্লে বিসর্গটা বেশ বুঝেছ। কিন্তু আসলে যে বিসর্গটা কিচ্ছুই বোঝ নাই। তা বুঝলে যে আর বিসর্গের ছাড়াছাড়ি থাকে না!

চি.ম.চ। সেকি মহাশয়? এই বল্লেন বিসর্গ কর্ম্ম, তা' সংসারে কর্ম্ম নিয়েই আছি; আর সেই কর্ম্মটাই বুঝলাম না?

শর্ম্মা। যদি না বুঝে থাক সেটা কি আর আমার দোষ বাপু? ওতে কারো দোষ হ'লে যে তোমারই কর্ম্মের দোষ! বাপুহে বিসর্গটা বুঝতে হ'লে আগে যে 'আমি'টাকে বুঝতে হয়। 'আমি'কে না বুঝলে যে বিসর্গের কোনও বোধই জন্মে না? 'আমি'কে একটা বিশেষ করে সর্জ্জন (বা সৃজন) করে বলেইত বিসর্গ বিসর্গ। ফলতঃ বিসর্গটা যেন একটা রঙ্গিণ কাচের ফানুস আমিকে ধরে না ছোঁয় না; ও'র কাছে থেকে নানা রকম দেখায়, তাইত! তবেই দেখ যেয়ে ও শুধু ইচ্ছা-ঠাকুরাণীর খেলার খেলা। ইচ্ছা-ঠাকুরাণী ঐ পরকলা চ'খে দিয়ে 'আমি'কে নানারকম দেখছেন বা ইচ্ছা-ঠাকুরাণীর খেলার দায়ে 'আমি' মহাশয় এই পরকলার প্রতিবিম্বে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে আছেন। বস্তুতঃ আমির সহিত বিসর্গের কোনও যোগ নাই। আমি অপরামৃষ্ট; আমিকে কেহই স্পর্শ করতে পারে না।

তোমাদের হিসাবে দেখতে গেলে তোমরা যখন দেখছ আমিই সব কর্ম্ম করি,—আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি, তখন কাযেই বিসর্গটা ছাড়ার কথা বলতে হয়। তা যা কিছু আহরণ বা আহার কর সবটাই যদি আত্মসাৎ অর্থাৎ একদম নিঃশেষে হজম করে ফেলতে পার তা'হলেই আর বিসর্গ থাকে না। হজম না হইলেই ত বিসর্গ হয়। তোমাদের সেটা হচ্ছে না। তোমাদের ত' আর অনাহার সহ্য হচ্ছে না, আহারটা চাই-ই; তাই ওর সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ঔষধ তোমাদের দরকার, সেই ঔষধটা এমন হওয়া চাই যা'তে সব একদম হজম হয়ে যায়। সেই ঔষধের নামটা তোমাদের কাছে বলতেও ভয় হয়; কারণ তোমাদের বুদ্ধিটা বড় মোটা। তোমাদিগকে বল্লাম হয়ত একটু সম্বিদা সেবন করতে, তোমরা হয়ত সিদ্ধি নিয়েই মস্‌গুল হ'য়ে রইলে, নয়'ত গাঁজায় দমকসে বুঁদ হয়ে বসে রইলে। আসল কথাটা হ'ল সম্বিৎ চৈতন্যকে বেশ ক'রে

জাগিয়ে তোল—সম্বিতের সেবা কর—সম্বিদার জোরে বৈশ্বানর হুহু করে জ্বলে উঠবে, তাতে তখন যাহাই আহুতি দেবে তাহাই তখন ভস্মসাৎ হয়ে যাবে। বেশ হজম—কোন গোল নাই। * আরো একটা কথা হচ্ছে যখনই যাহা কিছু আহার কর তা বেশ ভাল করে দেখে, বুঝে আহার করলেও কোনো গোল থাকে না। বস্তুটা ভালকরে চিবিয়ে ছাঁকা রস টুকু নিয়ে যদি তোমার ভিতরকার আত্মরস টুকুর সহিত মিলায়ে ফেলতে পার তাহলেই—"রসে রস মিলে গেলে হাতে কিছু রয় না।" † তাও যদি না হয় তবে কোনও কবিরাজ মহাশয়ের টোলে যেয়ে কিছু পাঠ গ্রহণ কর। তবে আধুনিক এম্, বিঃ এম্, ডিঃ বিশারদ-বৈদ্যরত্ন-ভিষকরত্নদের থারমোমিটার ষ্টেথিস্কোপের ভিতরে কিন্তু পাবে না, যদি চড়ক বা শুশ্রুতের শরণাপন্ন হ'তে পার তাহা হ'লেই দেখতে পাবে তোমার দেহে যাহা পিত্ত, পলতাতে তাহা ক্লোমরস, জগৎ-ব্যাপারে তাহাই সূর্য্য, ও বিশ্বের নিয়ন্তা ব্রহ্মা সেই ব্রহ্মাতত্ত্বটী তোমার আমির—বিশ্বের আমির—পাদপীঠের কাছে থেকে সর্ব্ব দেব ও পিতৃ শক্তি সমভিব্যাহারের মনোরূপে সেই পরম দেবতাকে প্রণাম করছে আর বিশ্বে তিনিই প্রদ্যুম্নরূপে পুরুষোত্তমের পাদপদ্মে সমাসক্ত রয়েছেন। তখনই দেখতে পাবে তুমিই ভোক্তা, তুমিই ভক্ষ্য, তুমিই ভক্ষণ (১); তুমিই ব্যাধি, তুমিই ভেষজ, তুমিই শান্তি। সকলই তুমি, আর সকলই ভূমা। আহারও নাই বিসর্গও নাই। আছ কেবল তুমিই তুমি। অর্থাৎ শর্ম্মার হিসাবে এক অখণ্ড ঘন সত্তা "আমি"। ইহাই বিশ্বের আদির আদি বীজের বীজ সনাতন পুরাণ পুরুষ। মোটা হিসাবে ব্যক্তিরূপে বিতন্বত বলিয়া ইহাকেই পরম পুরুষ ভূমার অণু বলিয়া মনে হয়। সেই জন্যই "তত্ত্বমসি" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ও "সোঽহং" প্রভৃতি মহাবাক্যে সেই একেরই ইঙ্গিত করা হইয়া থাকে। ফল কথা তোমার আমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'আমি' সংজ্ঞাগুলিকেও সংখ্যা দ্বারা যতই ছোট কর না কেন, এই 'আমিই' তাঁহার প্রতিষ্ঠান। এই আমির দিকে চাহিলেই সেই পরম পুরুষেরই দিকে চ'খ পড়িবেই পড়িবে।

---

* যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি র্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥—গীতা।

† রসো বৈ স।—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

(১) ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।—গীতা ৪।২৪।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ গীতা ১৪।১৭

যখনই এই 'আমিকে' দেখতে পাবে ও চিনতে পারবে তখনই তোমার সকল বাঁধ, সকল বিসর্গ সব ছেড়ে যাবে বাপু! শাস্ত্রকর্ত্তারা বলেছেন—দেখে বুঝে বলেছেন—

ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
নশ্যন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট্বাত্মনি পরাবরে॥

মূলকথা যদি আহার বা আহরণ আর বিসর্গই বুঝে থাক, তবে কেমন ক'রে করলে সবটা হজম হয় তা বুঝতে বড় গোল হয় না। মোট কথা, আগে যেমন ক'রে আহরণ করে অস্‌ছিলে সে রকম করলে আর চলছে না। যা হ'য়ে ব'য়ে গেছে ত গেছেই; এখন থেকে ফের কেঁচে গণ্ডূষ করতে হচ্ছে। শাস্ত্রকর্ত্তারা একেই বলেছেন প্রত্যাহার (প্রতি+আহার)। মোটামুটি হিসাবে এর মধ্যেও ক্রিয়া কর্ম্ম কুস্তি কস্‌রৎ দেখা যায়। ঐ কুস্তিটুকু বাদ দিতে হলেই সদানন্দের শরণ নিতে হয়। একদমে আমি—আম হয়ে বস; বস্‌; আর কুস্তি নাই, কস্‌রত নাই, চেষ্টা নাই—চরিত্র নাই—আছে কেবল আনন্দ।

যাক বিসর্গের লোপ করতে হলে বিসর্গ-সন্ধি জানা আবশ্যক, বুঝা আবশ্যক। তা' যদি অত জানাজানি বুঝাবুঝি করতে না পার তাহলে কালীঘাটের কালা মাতাকে সার কর আর হালদার মহাশয়ের উপর আমমোক্তার-নামা দেও। যা' করেন তিনি। কলিকাতার কালী সার ক'রে একবার হালদার মহাশয়ের চৌকীর নীচে বস্‌তে পারলে সেই আত্মারাম হালদার অন্ধি সন্ধি সব দেখা'য়ে বুঝা'য়ে, কুঁদে ফেলে, সকল বাঁক সোজা ক'রে ঠিক পথে চালা'য় নিবেন; কোনও ভয় ভাবনা থাকবে না। মনে রেখ সকল "ধরে-নেওয়ার" মধ্যে কেবল "কালীঘাটের কালী আর আত্মারাম হালদার" এই টুকুই ধরে নেওয়া নয়; এই টুকুই খাঁটি সত্য। এই সত্যটুকু "ধরে-নেওয়ার" মত হয়ে আছে বলেই ত' সত্যের পথ পাওয়া যায়! গুরু কল্পতরু হালদার মহাশয়ের কাছে যেয়ে পড়তে পারলেই তোমার সকল আনাগোনা ফুরিয়ে গেল; তার পর তাঁর ব্যবস্থা তিনিই করে নিবেন। হঠাৎ যদি হালদার মহাশয়কে চিনতে না পার তা'তেও ভয় নাই—কালীঘাটের সব অলিতে গলিতে তাঁর দালাল আছে। হালদার মহাশয়ের নাম করলেই তা'রা নিয়ে তোমাকে তাঁর কাছে পৌঁছায়ে দিবে। তোমার কেবল একটা কথা ঠিক রাখা চাই—"হালদার আর কালী।"

বাজেকথা সব ছেড়ে কেবল একমনে স্মরণ রাখবে হালদার আর কালী। যাওয়ার স্থানটা যদি ঠিক নাও থাকে তাহা হ'লে যেখানেই কেন থাক না, হয় শ্যামবাজার নয় চিৎপুরের পথ দিয়ে এলেই ধর্ম্মতলার পথ পাবে, সেই পথের মোড় থেকেই চৌরঙ্গী রাস্তা সোজা ভবানীপুরের দিকে চ'লে গিয়েছে। একবার পথ ধরলে পথই তোমাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে। বেশী ভাবতে হবে না।

সাধক সর্ব্বানন্দ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সর্ব্ব। একি ?—

উজ্জ্বল জাজ্বল্যমান

বহ্নিশক্তি মূর্ত্তিমান,

হুহুঙ্কার ফট্‌কারে কুটায়ে জগৎ ;

কূটস্থা ভৈরবী শেষে

ব্যক্তরূপে রঙ্গে এসে,

কি দারুণ লীলারসে হইলি মা রত।

প্রতি জীবে বিশ্বে দেহে,

কমনীয় কাম গেহে

এই কি দুদ্ধর্ষলীলা দিগম্বরি তোর

দেহ মুণ্ড পরস্পর

কাটি করি পরাপর

স্বরুধিরপানে তারা উন্মত্তা বিভোর ?

রঙ্গিণী সঙ্গিনী সঙ্গে

উন্মত্তা উদ্দাম রঙ্গে

সে রুধির পিয়ে রঙ্গে নাচিছে কেমন ?

করে নরশির, খাণ্ডা,

দুদ্ধরষা পরচণ্ডা,

প্রচণ্ড চামুণ্ডা কিবা ব্যাদিত বদন ?

জীবের জনমধাম,—
কিবা মনোহভিরাম,—
নাভি সরসিজ মাঝে চারু কর্ণিকারে,
বালার্ক অরুণ বিভা,
ব্রহ্মযোনি কোষে কিবা,
বিপরীতরতাতুরা রতিকামাধারে—
বিশ্বে যাহা রমণীয়
জীবে যাহা কমনীয়
কাম হ'ক—প্রেম হ'ক—সে কারুণ্যরাশি
দলিয়া চরণতলে
অস্থি মুণ্ডমালাগলে,
নাগযজ্ঞসূত্র পরি' নাচ সর্ব্বনাশি ?
তুই যে মা রক্ষাকালী,
কেন মা রাক্ষসী হ'লি
ক্ষুদ্র শিশু জীব তবে রক্ষা পাবে কিসে ?
বৈশ্বানর রূপে তা'য়,
জঠর অনলে হায়,
আহার করিলে সব তুমি নির্ব্বিশেষে ?
তাহে তুমি নহ একা
সঙ্গে ঐ যায় দেখা
বিশ্ব আর নর দুই সঙ্গিনী তোমার,
দ্রব্য-ক্রিয়া-ভাবপুঞ্জে
ব্যাদিত বদনে ভুঞ্জে,
সবার সর্ব্বস্বসার রুধিরের ধার ?
সম্বর ওরূপ তারা
ভূতপতি আত্মহারা,
সমগ্র জগৎ জীব হ'ল ছারখার,
ভয়ানক মহাঘোর
দারুণ খেলায় তোর,
মহাভয়ে সন্তাপিত হয়েছে সংসার !

কে কোথা শুনেছে হায়,
প্রসূতি সন্তান খায়,
গলে পরে হার তা'র অস্থিমুণ্ডমালে,
কি তোর দারুণ স্ফূর্ত্তি
সর্ব্ব সংহারিণী মূর্ত্তি,
জীবে বিশ্বে যুগপৎ গ্রাস এককালে !!
জলে, স্থলে, বায়ু, ব্যোমে,
গ্রহ, তারা, সূর্য্যে সোমে,
ভূলোকে দ্যুলোকে আর নিজ কোষাধারে
সর্ব্ব মধ্যে মহাদ্বন্দ্ব
দেখি ভয়ে সর্ব্বানন্দ
আশঙ্কা আকুল ধরে পূর্ণানন্দ করে।
আশ্বাসিয়া সর্ব্বানন্দে,
পূর্ণ কহে পূর্ণানন্দে,
কেন সর্ব্ব আত্মহারা হইলি এমন,
দেখিতেছ যাহা এই,
বাহিরের খেলা সেই
দেখরে অন্তরে চাহি মধুর কেমন !!
তখন—ধ্যানযোগে সমতানে
সম্রাট্ ছন্দের গানে
ভৈরব ঋষির ভাবে হৃদয়ের মাঝে
বৈশ্বানরে সমুদয়
সর্ব্ববিশ্ব করি লয়
সর্ব্ব দেখে সর্ব্ব মাঝে ছিন্নমস্তা রাজে।
এই বিশ্ব তাঁর লীলা
কিবা চমৎকার খেলা
নিজে বিশ্ব, নর নিজে অদ্ভুত বিধান
নর দিয়া বিশ্ব গড়ে
বিশ্ব দিয়া পোষে নরে,
অনেকধা সুখরাশি করি সমাধান ॥

নিজে সে পুরুষ নারী
সকলই চিহ্ন তারি,
অনুরাগে রক্তবর্ণা নীল সরস্বতী
হাড় মালা কণ্ঠে তাই,
মা তোরে দেখিতে পাই,
গলে মুণ্ডমালা নাগযজ্ঞ-সূত্রবতী।
নিরখি প্রকৃতি কান্তি
পাছে জীব পায় ভ্রান্তি
তাই নিজ মুণ্ড কাটি ধরেছ শ্রীকরে
তোমার নিজস্ব চিহ্ন
নহে অন্য 'পর' ভিন্ন
পরচিহ্ন ছিন্নশির রেখেছ বাহিরে।
নিজের সর্ব্বস্ব সার
অনুরাগ রক্তধার
পান করাইয়া সুখে তৃপ্ত কর তারে
প্রেমের প্ররাগে রঙ্গে
জাহ্নবী যমুনা সঙ্গে,
সুষুম্নারূপিণী চারু সরস্বতী ধারে।
প্রপঞ্চ প্রয়াগ ধামে
সঙ্গে লয়ে রূপ নামে
প্রাণাপান সহ যোগে সমান শকতি
মৌলিক চৈতন্য চিত্তে
পরকাশি নানা বৃত্তে
কিবা অনুরাগে লাল পরমা প্রকৃতি!
দিব্য আদিকামশক্তি—
পরদেবে পরাভক্তি—
মূর্ত্তিমতি উর্দ্ধরতি কামহৃদি 'পরে,
সেই রতি অংশোপরে
দক্ষপাদ যত্নে ধ'রে
দেখাইছে উর্দ্ধগতি যেতে পর পারে।

বামপদ কাম অঙ্গে
প্রজাসৃষ্টি পর সঙ্গে,
রাখিয়া নেমেছ আসি জগত মণ্ডলে
পরাপর পদ দ্বন্দ্বে
দেখায়ে সম্রাট্ ছন্দে
আধার ও গতি তব জগতমঙ্গলে।
ছিন্নমস্তা মহা বিদ্যা
সর্ব্বাত্মিকা সর্ব্বসিদ্ধা
উপাধির স্থূল সূক্ষ্ম বিষয় আশয়ে;
পরম পুরুষবরে
বামা ধরে বাম করে
স্বরূপ মূরতি দিয়ে রেখেছ শোয়া'য়ে।
অভিন্ন শকতি সঙ্গে
নাচিছে উদ্দাম রঙ্গে
নাম-রূপ দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী
সর্ব্বভাবে দোহে সম
কেবল একটু কম,
সবেমাত্র নহে তা'রা পরাভিসারিণী।
কিম্ভূত এ কিমাকার
একি লীলা চমৎকার
ঈক্ষণমাত্রেতে তাঁরে দেখাও অদ্ভুত.
কোটী লীলা ছড়াইয়া
কোটী বিশ্ব জড়াইয়া
দশচক্রে গড়ে তুল ভগবানে ভূত?
বিদ্যা যে অবিদ্যা হ'য়ে
মিথ্যা বিশ্বভাণ ল'য়ে
কিবা ছন্দ অনুবন্ধে খেল চমৎকার,
করি লুকাচুরি সৃষ্টি
না হেরে করাও দৃষ্টি
অখণ্ড অম্বুধিবক্ষে বীচির বিস্তার।

সর্ব্বাতীত পরাৎপর আনন্দ কন্দরে,
আপনি মজিয়াছিল আপন অন্তরে।
তাঁহার আনন্দ-সুপ্ত হৃদয় নন্দনে,
অভিনব কামরূপে নীরব স্পন্দনে
জাগিয়া নিভৃত তাঁর মরম কক্ষায়
"একোঽহং বহু স্যাম" কি মন্ত্র ভাষায়—
মহাতমোময়ী রাত্রি কারণ-শয্যায়
ঘুমাইতে'ছিল বিশ্ব বিভোর নিদ্রায়
ঘুমন্ত বদনে তাব আকুল চুম্বনে—
জাগায়ে তুলিলি কিবা নব জাগরণে ?
সেই আদি শুদ্ধ কামে রচিয়া আসন
অনন্ত খেলার খেলা করিয়া'সৃজন,
সেই কামে নানারূপে সাজায়ে মূরতি
জীবে, বিশ্বে, ভাবে সাজি সংসপ্ত ব্যাহৃতি,
পরাগতি উর্দ্ধরতি শিব-সীমন্তিনী
কিরূপে সাজিয়া এলি জগতরঙ্গিণী ?
অনন্ত অসংখ্য বহু কেমন রচিয়া
কি কৌশলে দ্বন্দ্বে ছন্দে সবে নাচাইয়া
সমভাবে বিরাজিত সম্রাট্ ছন্দেতে
প্রচারি অভয়বাণী ভৈরব মন্ত্রেতে।
কি কর মা কেবা জানে মিলন কি ভেদ ?
কে ব'লিবে কহিতে যা হারিমানে বেদ !
সেই 'এক' সেই 'আমি' সেই 'বহু স্যাম'—
কত রংএ ঢংএ সাজি লয়ে রূপ নাম,
এক 'আমি', তুমি একা বহুত্ব বিলাসে
কারণে সূক্ষ্মেতে স্থূলে প্রপঞ্চ বিকাশে,
লোকে লোকে সপ্তীকৃত সপ্ত ব্যাহৃতিতে
সেই এক 'আমি' মন্ত্র সর্ব্বে সর্ব্বভিতে,
সম্রাট্ ছন্দেতে বাজে সে এক রাগিণী—
ভৈরব মন্ত্রের দ্রষ্টা অভয়ের বাণী !!

উৎ-আসীনবৎ আসীন নিষ্কল বিরাগ
যে, তা'রে সাজাতে কোথা পেলে অনুরাগ ?
বিশ্ব-তনু অণু অণু ভস্মরূপে তা'য়—
স্নায়ুকেন্দ্রে সুসংস্থিত তুমি বি-শ্বকা'য়
ছিন্নমস্তে, ছিন্ন ভিন্ন বস্তু, ক্রিয়া, ভাবে,
গুছায়ে মিলায়ে রাখ কিবা পরভাবে ?
স্বতন্ত্র সবারে ঐ হেলায়ে অঙ্গুলি,
কি দেখাও উর্দ্ধে ঐ পরতত্ত্ব বলি' ?—
নহে জীব অন্য কিছু—পর পরমাণু
তোরই অবয়বী অঙ্কে রাজে তার তনু—
কিরঙ্গে শ্রীঅঙ্গে তারে মিলাইয়া তব
দেখাইয়া বিশ্বে, ছিন্ন ভিন্ন, নব নব
দেহ, কাম, মন, বুদ্ধি আধারে পুটিত
স্তরে স্তরে পরে পরে কর সমুদিত !!
কোথায় লইয়া যেতে আমিরে আমার
অলক্ষ্যে নীরবে বসি জাগ অনিবার
কোটী কোটী জনমের পরপার হতে,
অদ্যাপিও জীবনের প্রতি নিমিষেতে
তোমারই অলক্ষ্য স্পর্শ দিতেছে জাগায়ে
মরমের মর্ম্মপুরে নীরবে পশিয়ে,—
সদ্যোজাত ব্রহ্মাণ্ডের জন্মলগ্ন হ'তে
দিন, মাস, বর্ষ, যুগ সঙ্কুলিত পথে
আশার উদ্দাম ছন্দে উল্লাসে নাচায়ে
সুখের সুখোষ্ণ শ্বাসে হরষে গলায়ে—
কাঁদাইয়া নিরাশার তীব্র কষাঘাতে
নিরন্তর ছুটাইছ তোমারই পশ্চাতে !
কে তুমি অটল স্থির শান্ত সমুজ্জ্বল,
নিজ অধিষ্ঠানে থাকি স্থির অচঞ্চল,
কি অজ্ঞাত মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ করি মোরে
টেনে নেও কোথা, বাঁধি কি অলক্ষ্য-ডোরে।

তুমিত দেও না ধরা শত আকিঞ্চনে,
পাই না দেখিতে তোমা জীবনে মরণে ?
কিবা ইন্দ্রজাল-মালা করিয়া বিস্তার--
জানাও অস্তিত্ব তব তিলে শতবার।
(মোর) জীবনে, জনমে গাঁথা 'আমি' কণাগুলি
দেখায়ে কৌশলে তুলি কনক অঙ্গুলি
স্থূল সূক্ষ্ম সর্ব্বভাবে তোমারি ইঙ্গিত
নীরব ভঙ্গিতে গাহে কি পর সঙ্গীত ?
গোপন থাকিয়া তুমি অজ্ঞাতে আমার
অলক্ষ্যে খুলিয়া তব আনন্দ আগার,
ছুটিয়া পলাও কোথা উড়ায়ে অঞ্চল,
লালসা-সুরায় হৃদি করিয়া চঞ্চল,
মর্ম্ম যবে দোলি উঠে উদ্দাম পিয়াসে
অজ্ঞাত কি জানি কার পদস্পর্শে আশে—
ইষৎ উন্মুক্ত করি গুপ্ত পুরদ্বার
সঙ্গোপনে দেও আনি কার সমাচার ?
আকুল পরাণ মম যারে সদা চা'য়
তাহার ইঙ্গিত পাই তব ইসারায়
কাহারে দেখাও তুমি আকার ইঙ্গিতে
শুনাও কাহার কথা নীরব সঙ্গীতে,
সেই তব পরাবাণী কি জানি কেমন
মরমে জাগায়ে তু'লে আকুল স্পন্দন
সুতীব্র মধুর শান্ত অদম্য লালসে,
মমত্বের মর্ম্ম টানি লয় পরবশে।
কেগো তুমি চিরকাল অলক্ষ্যে থাকিয়া
স্নেহভরে ধরে আছ বক্ষেতে চাপিয়া,
সস্নেহ মধুর তব আকুল স্পন্দন
হৃদয়ের গুপ্ত কক্ষে জাগি অনুক্ষণ
জীবনের দুঃখ দৈন্য কুহেলিকা মাঝে
আশার আশ্বাসবাণী সম সদা রাজে।

জন্মের নিস্মৃতি রেতে মর্ম্ম পিপাসায়
হিয়া যবে কাঁদি উঠে আকুল তৃষ্ণায়,
জনমের সহচর কামবুদ্ধি মনে
তোমারই প্রেমপূর্ণ প্রীতি পরশনে,
হেলায়ে কমল করে কনক অঙ্গুলি,
কাহারে দেখাও এই 'অস্তি' 'ভাতি' বলি ?
আমার আমিরে রঙ্গে দুলিয়ে ফুলিয়ে
সংসারের শত সুখ আশা তৃষ্ণা দিয়ে
অনন্ত উপাধি-মালা পড়াইয়া গলে,
কোথা যাও শিশুসম তুলে লয়ে কোলে ?
নিত্য নূতনের খেলা নব-রত্ন-হার
পরায়ে জড়ায়ে দেবি কণ্ঠেতে আমার,
সুখের কোমলকর বুলাইয়া শিরে,
কোথায় চলেছ ল'য়ে আমার আমিরে ?
নিমিষে বিকট হাসি ব্যাদিত বদনে
করিছ সকল চুর্ণ নিঃয়মে সঘনে
একি রুদ্রমূর্ত্তি দীপ্ত হুতাশন সম,
দলিয়া চরণে শত সাধ আশা মম,
নগ্না দিগম্বরী অসি ধারিয়া ভীষণ
আমার যা-কিছু সব করিয়া ছেদন
মরমে জাগায়ে তুলি ভয়ানক ভয়,
তোমারই অভয় অঙ্কে দিতেছ আশ্রয় !!
সুখ দুঃখ শান্তি ভীতি আকুলিবিকুলি,
দেখায় কেমন তুলি' কনক অঙ্গুলি,
কোথা কোন উর্দ্ধে কোথা ছাড়ায়ে তোমায়—
কি পর বিরামস্থল রাজিত কোথায় !
আত্মদেহ সমুৎক্ষিপ্ত তপ্ত রক্ত ধারে
তা'রে পোষ তুমি বসি প্রতি জীবাধারে !
তোমারই আকুল ছন্দ মরমের বীণাতানে
কি লক্ষ্যে উঠিছে জাগি' কি চারু উদ্গীথগানে !

মর্ম্মের অতৃপ্ত ধ্বনি তুলিয়া কি ফল তান
'নেতি' 'নেতি' রবে ধায় লভিতে কি নিরবাণ!
স্তরে স্তরে, পরে পরে, বিশ্ব চরাচরে
স্থূলে সূক্ষ্মে কামে মনে মরম কন্দরে
আকুল পিয়াসা জাগি করিছে সন্ধান,
সেই এক মহালক্ষ্য বিরামের স্থান!
বাক্‌, মাত্রা, দৃশ্যে, রূপে, সরবত্র ভবে
ধ্যানে, জ্ঞানে, স্থূলে, সূক্ষ্মে, কারণেতে সবে,
ব্যাপ্তি তুমি ব্যক্তরূপে শক্তি দেবতায়
সকলেই সমস্বরে তব স্তুতি গা'য় ?
বারুণী শকতি তুমি সুধার আধার!
জ্যোতির্ম্ময়ী দিব্যা তুমি রাণী দেবতার।
বহ্নিশক্তি তুমি তব রূপ হুতাশন
বসুধা আধার মূর্ত্তি উদার আসন
ঐশ্বর্য্য বিভূতি জ্যোতি ত্রিপুর-ঈশ্বরী
রূপে তুমি সর্ব্বরূপা ত্রিপুরসুন্দরী।
হরি হরে স্থিতানিত্যা ত্রৈলোক্যবিজয়া
চন্দ্রমা তোমারি রূপ সর্ব্বজ্ঞানালয়া
নাশিতে সকল বিঘ্ন বিনায়ক বেশে—
ঈশ্বরী কমলারূপা বিলাস বিশেষে
যে পরা পশ্যন্তি বাণীরূপে সরস্বতী
হুহুঙ্কারে সেই তুমি প্রকৃতি সংহতি।
ফট্‌কারে বৈখরী বাণী ভুবনে প্রকাশ
স্বাকার কুসুমধন্বা তোমারি বিলাস
হা রূপেতে ঊর্দ্ধরাত ওগো সর্ব্বময়ি
মন্ত্রানুসন্ধিনী তুমি পরাপরে, অয়ি,
বজ্রবৈরোচনীয়ে হুং হুং ফট্‌ স্বাহা
শব্দে মন্ত্রে ভাবে সর্ব্বে প্রকটিত তাহা।
মন্ত্রবর্ণ পূর্ব্বাপর ভাবিয়া যে ভাবে
তব ভাবে ডুবে তারে লহ সেই ভাবে॥

তোমারি খেলায় মাগো নামরূপ দিয়ে
আমি রূপে রাখিয়াছ আমিরে সাজিয়ে,
নানাবর্গে নানাবর্ণে বিসর্গাদি দিয়ে,
বাক্, মাত্রা, দৃশ্য, দৃক্ আদি সমুদয়ে,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যাহা কিছু বলি,
তোমার খেলার ঘরে খেলাতে সকলি।
অনুগত জীব মর্ম্মে তোল সেই বাণী
যাহে বাজি উঠে পরমানন্দ রাগিণী
তোমারি খেলার তালে হ'ক তা'র লয়
তব রঙ্গে যাহে রসভঙ্গ নাহি হয়,
তাই বলি করপুটে বন্দি তব শ্রীচরণ
যৎকরোমি জগন্মাত তদস্তু তব পূজন ॥

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক।

সাহিত্যসম্মেলন।

নবম অধিবেশন—১৩২৩ সাল।

সভাপতির অভিভাষণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সংস্কৃত সাহিত্যের দিগ্বিজয়।

এই পরম মহৎ সংস্কৃত সাহিত্য দীর্ঘকাল ভারতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে নিবদ্ধ না থাকিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহা চীনদেশে প্রবিষ্ট হয় এবং তথায় শত শত ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ চীন ভাষায় অনূদিত করাইয়া খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে অগ্রসর হয়। বজ্রচ্ছেদিকা, সুখাবতীব্যূহ প্রভৃতি যে সকল উপাদেয় সংস্কৃত গ্রন্থ জাপান হইতে আবিষ্কৃত হইতেছে, উহা ঐ সময়ে তথায় নীত হইয়াছিল। তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, সাইবীরিয়া প্রভৃতি দেশের ভাষার উপর সংস্কৃতের অসীম প্রভাব। কথিত আছে ৩৩১ খৃঃ অব্দে হ্লা-থো-থোরির রাজত্বকালে ভারত হইতে "ওম্-মণি-পদ্মে-হুং" এই ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যাসমন্বিত একখানি সংস্কৃত পুস্তক তিব্বতরাজের সভায় নীত হয়। ঐ পুস্তকের অর্থ তখন কেহই

চীন, জাপান ও তিব্বতে সংস্কৃত

বুঝিত না। পরে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে তিব্বতদেশে সংস্কৃত ভাষা প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ পুস্তকের তিব্বতীয় অনুবাদ প্রকাশিত হয়। খৃষ্টীয় ৭ম হইতে ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ৩০০ বৎসর মধ্যে ভারতে যাবতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ ও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়া ক্যাঙ্গুর ও ত্যাঙ্গুর নামক দুইখানি সুবৃহৎ গ্রন্থাভিধানের সৃষ্টি করিয়াছে। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসের ভগবদ্গীতা ও বাল্মীকি রামায়ণের কিয়দংশ, কালিদাসের মেঘদূত, রবিগুপ্তের আর্য্যাশতক, বহুটীকাসমন্বিত দণ্ডীর কাব্যাদর্শ ও পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, এবং কাতন্ত্র ব্যাকরণ, সারস্বত ব্যাকরণ, চান্দ্র ব্যাকরণ, অমরকোষ প্রভৃতি অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় সংরক্ষিত হইয়াছে। যদিও তিব্বতীয় ভাষার সহিত আর্য্য বা সেমিটিক ভাষার কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই, উহাতে সুপ্, তিঙ, কৃৎ ও তদ্ধিতের কোন অবকাশ নাই এবং উহার বর্ণবিন্যাস ও উচ্চারণ-প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তথাপি সংস্কৃতের সংসর্গে আসিয়া ঐ ভাষার শব্দসম্পদ্ ও বাগ্ভঙ্গী অসামান্য স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। খোটান্ ও খাসগড় হইতে সম্প্রতি যে হস্তলিপির উদ্ধার হইয়াছে এবং যাহা সাধারণতঃ Bower manuscripts নামে অভিহিত, উহা তত্র প্রচলিত খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর সংস্কৃত সাহিত্যের অখণ্ডনীয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শ্যাম ও ব্রহ্মদেশের ধর্ম্মাধিকরণে মনুসংহিতার মত এখনও পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

লঙ্কায় সংস্কৃত চর্চ্চা।

সিংহল বা লঙ্কাদ্বীপে সংস্কৃত ভাষার কিরূপ সমাদর ছিল, তাহা অনেকেই জানেন। ৫১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৫২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৯ বৎসর কাল কুমারদাস নামক একজন বিদ্বান্ নৃপতি লঙ্কার সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। কথিত আছে তিনি জানকীহরণ নামে এক মহাকাব্য রচনা করিয়া বিক্রমাদিত্যের সভায় প্রেরণ করেন। রঘুবংশপ্রণেতা কালিদাস ঐ কাব্যের কখনই প্রশংসা করিবেন না এই ভাবিয়া বিক্রমাদিত্য অপর আট জন সভাপণ্ডিতকে উহা পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা উহা পাঠ করিয়া বলেন :—

জানকীহরণং কর্ত্তুং রঘুবংশে স্থিতে সতি।
কবিঃ কুমারদাসশ্চ রাবণশ্চ যদি ক্ষমাঃ॥ *

---

* জহ্লনের সূক্তিমুক্তাবলী গ্রন্থে ইহা রাজশেখরের উক্তি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৫ম ভাগ। | শ্রাবণ ১৩২৩। | ১০শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

আনন্দ।

(১)

স্বষ্টির প্রথম দিনে অন্ধকার ছিল যবে
ব্যাপি দিগন্তর ;
উদেনি যখন রবি হাসেনিকো সুধাকর
এমন সুন্দর।
প্রকৃতি-পুরুষ-যোগে তারপর, হ'ল এই
বিশ্বের উদয়,
চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারা উদিল আকাশে যত
দৃশ্য সমুদয়।

(২)

তারপর অকস্মাৎ এ মহা-জগতীতলে
কার প্রেরণায় ;—
বয়েগেল অপরূপ আনন্দের ধারা এক
প্লাবি সমুদয়।

বয়েগেল সে তরঙ্গ নানা রঙ্গে নানা ভঙ্গে
হইয়া অস্থির ;—
ব্যাপি এ বিরাট্ বিশ্ব,—করি তার প্রতি অণু
উদ্বেল অধীর।

(৩)

আ'জও এই বিশ্বে তাই আনন্দের সেই স্মৃতি
করেগো পাগল ;
মুগ্ধ জীব তাই ছুটে আনন্দের অন্বেষণে
হইয়া চঞ্চল।
কিন্তু হায়! ওরে অন্ধ! কোথা সেই আনন্দের
ভূমা-প্রস্রবণ ?
নাহি সেত কল্পনায়, নাহি ধনে, নাহি মানে
অর্থে অগণন।

(৪)

ত্যাগে সে পরমানন্দ, শান্তির আলয় সেই
নহে কামনায় ;
হৃদয়মন্দিরে সে গো আপন স্বরূপে তথা
বসি আপনায়।
নিত্য শুদ্ধ মুক্তরূপে, তিমিরের পারে সেই
আত্মা নিরঞ্জন,
সেই সে পরম শান্তি, আনন্দসাগর সে গো
হের তাঁরে মন।

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

———

ভগবদ্ভক্তির প্রয়োজনীয়তা।

(১)

চিত্তের পবিত্রতা, প্রসার এবং সর্ব্বোপরি পরমানন্দ লাভই ভগবদ্ভক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য। ভক্তির সাধনায় প্রথম লাভই এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব আনন্দ। সাধনার অন্য মার্গদ্বয়ে প্রথমেই এত আনন্দ, এত সুখ লাভ হয় না। ভক্তি-পথের সাধনায় প্রথমেই পরমানন্দের সঞ্চার হয় বলিয়া এই পথ সহজ, সুগম এবং চিত্তাকর্ষক। এই পথে শারীরিক সহিষ্ণুতার প্রয়োজন নাই; কোন প্রকার শাস্ত্রীয় কঠোর নিষেধবাণীও সর্ব্বদা পালন করিতে হয় না। দীনহীন ভগ্নস্বাস্থ্য স্বল্পসামর্থ্য ব্যক্তি হইতে কঠোর সংযমী সামর্থ্যশালী ব্যক্তি—সকলেরই এপথে অবাধ প্রবেশাধিকার আছে। তবে ভক্তির অধিকারি-বিষয়ে একটু তারতম্য আছে। সুখের পীযূষ-প্রস্রবণে যাঁহাদের জন্ম, যাঁহারা অহরহঃ বিলাসের বিবিধ প্রমোদে মত্ত, দুঃখের নির্ম্মম কঠিন ঘাত-প্রতিঘাত যাঁহারা অপরিচিত, এমন সর্ব্বসুখসম্পদ্‌শালী ব্যক্তি কদাচিৎ এপথের পথিক। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, ভক্তির সহিত শোক দুঃখের বড় নিকট সম্বন্ধ। যে হৃদয় দুঃখ-তাপের নির্ম্মম আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়, যে হৃদয় অহরহঃ দুঃখের করুণতন্ত্রী মর্ম্মস্পর্শী সুরে বিলাপ করে, যে সংসারের সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হয়—সেই হৃদয়ে বোধ হয়, ভক্তিমন্দাকিনীর পীযূষধারা অবাধগতিতে প্রবাহিত হয়। সুখদুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে বোধ হয় মানব-হৃদয়ের ভক্তি-প্রস্রবণ প্রথম উত্থিত হইয়াছিল। মানুষ দুঃখে বা বিপদে পড়িলে বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে শিখে; দুঃখতাপের অগ্নিদাহে হৃদয়ের কলুষতা কাটিয়া যায়, কোথা হইতে অশরণের শরণ লইবার জন্য অন্তরের অন্তস্তলে সাড়া পড়ে ও ভগবদ্ভক্তির আবেশে দু' নয়নে দরবিগলিত ধারায় প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, বুঝিবা ভগবদ্ভক্তির ক্রমবিকাশ প্রথমে দুঃখের অভিব্যক্তি হইতেই হইয়াছিল। জীব সংসার-চক্রের জ্বালাময় নিষ্পেষণে পিষ্ট হইয়া সমস্ত দুঃখ-দৈন্য-মালিন্যের পরপারে সত্যসুন্দরের সুশীতল চরণচ্ছায়ায় তাহার দুঃখ-দৈন্যের জ্বালা-তাপ জুড়াইতে চেষ্টা করে। ফলতঃ যখন সংসারের সর্ব্ববিধ সুখ শান্তি আশা আকাঙ্ক্ষা আত্মশক্তির সীমার অতীত বলিয়া বোধ হয়, সেই সময়ে ভগবদ্ভক্তির প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে অনুভূত হয়।

সংসারে সর্ব্বদাই এক শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। যাঁহারা প্রায়ই কোন এক অদৃশ্য অচিন্ত্য সর্ব্বশক্তিমানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না; যুক্তিতর্কের খাতিরে স্বীকার করিলেও তাঁহার সাধনার, তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন স্বীকার করেন না। এই সকল ব্যক্তি প্রায়ই আবাল্য বিলাস-বিভবের ক্রোড়ে পালিত, দুঃখ-দারিদ্র্য অভাব-অভিযোগের পেষণে অপিষ্ট এবং জ্ঞান-বৈরাগ্যের মধুর স্বাদে বঞ্চিত। ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কিংবা ভক্তিতত্ত্বসম্বন্ধীয় কোন কথা উঠিলে এই সব আসুরস্বভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়ত বলিবেন "ঈশ্বর থাকেন থাকুন, তাঁহার সাধনার, তাঁহার ভক্তির প্রয়োজন কি?" কিন্তু শাস্ত্র বহুকাল পূর্ব্বে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। শাস্ত্র বলেন ভগবদ্‌ভক্তি ও তাঁহার সাধনার প্রয়োজন আছে;—

"যৎপাদপদ্মস্মরণাৎ অণিমাদি বিভূতয়ঃ।
ভবন্তি ভবিনামস্ত ভূতনাথ স ভূতয়ে॥"

যে ভূতপতি পরমেশ্বরের পাদপদ্ম স্মরণ করিলে অণিমাদি মহাগুণ লাভের সম্ভাবনা আছে, তাঁহার চিন্তা, তাঁহার ভক্তি করিবার প্রয়োজন আছে বৈ কি? কিন্তু কুতর্কপরায়ণ বিবেকশূন্য ব্যক্তিদিগের ঈদৃশ উপদেশে চৈতন্য লাভ হয় না। ইহাদের সম্বন্ধে ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥

"পাপপরায়ণ বিবেকশূন্য নরাধমগণ মায়াদ্বারা হৃতজ্ঞান ও আসুর-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে না।" তাহারা তাহাদের পরিপুষ্ট "অহং" ভাবের বশে মনে করে তাহারাই যেন জগৎসংসারের কর্ত্তা; এবং অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া নানাবিধ দুষ্কর্ম্ম করে ও আপন ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে ভুলিয়া যায়। তারপর এই সমস্ত দুষ্কৃতকারিগণ যখন কর্ম্মদোষে পাপতাপের অগ্নিদাহে দগ্ধ হইতে থাকে, তখন স্বতঃই ভগবদ্‌ভক্তির পন্থা অনুসরণ করে। দুঃখই মানবকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ পদবীতে আরোহণ করায়। নিতান্ত পাপাত্মা ইহ-পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তিও দুঃখে পড়িলে চৈতন্য লাভ করে, ভগবদ্ভক্ত হয়। বিত্ত-বিভব সুখ-সম্পদের কোলে ডুবিয়া থাকিলে মানব ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকে; তাই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত কখন সুখ-সম্পদের মোহে ডুবিয়া থাকিতে চাহিবেন না। নিত্য নূতন সুখের রসাস্বাদ হইতে থাকিলে ভগবান্‌কে প্রাণভরিয়া ডাকা যায় না, এজন্য প্রকৃত ভক্তিমান্ ব্যক্তি ঈশ্বরসাধনার মধুর রস আস্বাদনের আশায়,

তাঁহার প্রেমময় মধুর নাম স্মরণ করিবার আশায়, সুখের বিনিময়ে দুঃখকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সেই পৃথিবীবিশ্রুতা মহীয়সী মহিলা কুন্তীদেবী —যাঁহার অতুল্য চরিত্রের অনুপম কীর্ত্তিকথা আজও সমস্ত হিন্দুনরনারীর হৃদয়ে জ্বলন্ত অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে, তিনি বনবাসের অসহনীয় জ্বালা ও দুঃখ-দুর্দ্দশা উপেক্ষা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—"ঠাকুর, দুঃখ কষ্টেই যেন আমার দিনগুলি অতিবাহিত হয়।" ভক্তসাধকের সুখ-সম্পদের কোলে বসিয়া আত্মতৃপ্তি হয় না। তিনি দুঃখের অগ্নিদীক্ষা লইয়া ভগবানের নাম করিতে ভালবাসেন। সুখ-সম্পদের মাঝে দুঃখের দীক্ষা চাহিয়া কবিও গাহিয়াছেন--

> "সম্পদের কোলে বসাইয়ে হরি
> সুখ দিয়ে এ পরীক্ষে।
> আমি সুখের মাঝে তোমায় ভুলে থাকি,
> আমায় দুঃখ দিয়ে দাও দীক্ষে॥"

বাস্তবিক দুঃখের দীক্ষা বড় সুন্দর দীক্ষা। মানবকে সন্মার্গে পরিচালিত করিবার এমন সুন্দর দীক্ষা বুঝিবা আর নাই। মানব প্রথমে দুঃখের দীক্ষা লইয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে শিখে। এই হিসাবে দুঃখী মানুষই সুখী। আর ঈদৃশ দুঃখই সুখের মূল ভিত্তি। দুঃখ কেবল ভক্তিদাতা নহে—জ্ঞানদাতাও। দুঃখের মরমমাঝারে সুখের অনন্ত প্রস্রবণ লুক্কায়িত আছে। Theosophical Societyর কর্ণধার বিদুষী শ্রীমতী বেসান্ত একস্থলে বলিয়াছেন—"আমার জীবন-ইতিহাসের সুখস্মৃতিগুলি আমি সাহ্লাদে মুছিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু আমার জীবনের একটী দুঃখ-স্মৃতিও আমি মুছিতে চাহি না; কেননা, দুঃখই আমার জ্ঞানদাতা।" এখন একবার জানিতে ইচ্ছা হয় তবে প্রকৃত দুঃখী কে? ভগবচ্চিন্তা-বিমুখ বিলাস-বিভ্রান্ত আত্ম-সুখ-সর্ব্বস্ব ক্ষণস্থায়ী পার্থিবসুখমত্ত জীব সুখী?—না, ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ অতুল্য ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদী তুচ্ছ পার্থিব ক্ষণস্থায়ী লৌকিক দুঃখপ্রাপ্ত জীব দুঃখী? বাস্তবিক এই দু'য়ের তুলনা যেন বিন্দুর সহিত সিন্ধুর তুলনার তুল্য। ঈদৃশ ভগবদ্ভক্তিরসাস্বাদী পার্থিবদুঃখপ্রাপ্ত জীব দুঃখী নহে—সুখী। যাঁহারা ঈশ্বর-ভজনপরায়ণ, দুঃখের তাড়নায় হউক, আর অহৈতুকী ভক্তির বশেই হউক, তাঁহারা সুখী। যাঁহারা দিনান্তেও একবার হৃদয়ের অন্তস্তলে সেই চিদ্‌ঘন আনন্দময় পুরুষের অরূপ সত্তা ভক্তির উজ্জ্বল আলোকে দেখিতে পান, তাঁহারা সংসারের সহস্র দুঃখতরঙ্গাঘাতে ব্যথিত

হইলেও সুখী। ইঁহারাই সুকৃতশালী; তারতম্যানুসারে ইঁহারাই চতুর্ব্বিধ। ভগবান্ ইঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

গীতা—৭মঃ অঃ, ১৬ শ্লোক।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! রোগাদিতে অভিভূত, আত্মজ্ঞানেচ্ছু, অর্থের আকাঙ্ক্ষী এবং আত্মজ্ঞানবান্—এই চারি প্রকার সুকৃতশালী ব্যক্তি আমাকে ভজনা করেন।

ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলেও বুঝা যায় যে, দুঃখাদির সৃষ্টি মানবকে কেবল যন্ত্রণা দিবার জন্য নহে,—নির্ম্মল ও পবিত্র করিবার জন্য। দুঃখের সৃষ্টিই মানবকে সংযত করিবার ও শিক্ষা দিবার জন্য। উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল মানব ভগবানের নাম স্মরণ করিতে জানে না, ভুলিয়াও একবার সে নাম মুখে আনে না। তাই করুণৈকসিন্ধু ভগবান্ মহামোহগ্রস্ত জীবের উদ্ধারের জন্য সংসারে দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ সংসার মঙ্গলের রাজ্য, এখানে অমঙ্গলের স্থান নাই; মঙ্গলময়ের সকল কার্য্যই মঙ্গলের জন্য। আমাদের জীবনে যখন দুঃখতাপের ঝঞ্ঝাপাত হয়, তখন মোহান্ধ আমরা, তথায় মঙ্গলের নিদর্শন খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু যিনি প্রাজ্ঞ, ভগবৎ-করুণায় যাঁহার দিব্য-দৃষ্টি লাভ হইয়াছে, তিনি সংসারে দুঃখের অস্তিত্ব দেখিতে পান না, সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র মঙ্গলময়ের মঙ্গলের কার্য্যই দেখিতে পান। প্রকৃত সাধু ব্যক্তি রোগে শোকে, দুঃখ তাপে কখন অধীর হন না। দুঃখকে মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদরূপে গ্রহণ করিয়া ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে গাহিয়া থাকেন,—

"হরি আমি দুঃখ ভালবাসি, সুখ সাধ নাই হে।
আমি জনমে জনমে যেন দুঃখ পাই হে॥
সুখে যে দুঃখের স্মৃতি চলে যায়,
দুঃখ-স্মৃতি লোপে মোহ-মদিরায়;
বিলাস কামনা লালসা জাগায়,—
শেষে অবসাদে অলসে ঘুমাই হে।
দুঃখেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে,
দুঃখেই আমার চেতনা হয়েছে;
দুঃখেই তোমার চরণে লুটাই হে।

যত তাপে ফোটে বেদনা আমার,
তত তাপে উঠে স্মরণ তোমার,
সাধে কি সাধিয়ে ডেকে দুঃখ যাচাই হে॥"

বাস্তবিক দুঃখই মানুষকে সুন্দর হইতে সুন্দর করে। যে হৃদয়ে দুঃখের গভীরতা যত অধিক হয়, সেই হৃদয় কালে মনুষ্যত্বের পূর্ণালোকে তত উদ্ভাসিত হয়। অহঙ্কারী উদ্ধত দয়ালেশহীন ব্যক্তি দুঃখেই প্রকৃত হৃদয়বান্ হয়। একজন ইংরাজ কবি (Wordsworth) সত্যই বলিয়াছেন—A deep sorrow hath huminised my soul.

আর এক কথা—দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্যই ঈশ্বরসাধনার প্রয়োজন। সংসারে দুঃখনিবৃত্তির কতকগুলি দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উপায় আছে। কিন্তু ইহাতে দুঃখনাশের অবশ্যম্ভাবিতা নাই। দৃষ্ট উপায়ে দুঃখ একবার দূরীভূত হইলেও আবার পুনরায় উপস্থিত হইতে পারে। দুঃখনাশের উপায় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন মত হইলেও দুঃখনাশের উপায় সকল দর্শনেরই উদ্দেশ্য। দর্শনের নিরস কঠিন পন্থা ত্যাগ করিলেও দুঃখনাশের আরো সুগম ও সুন্দর উপায় আছে, তাহাই ঈশ্বরে ভক্তি বা তাঁহাকে ভজনা করা। ঈশ্বরের ভজনা বা সাধনা করিলে দুঃখের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আমরা দুঃখ না পাইলে ঈশ্বরের ভজনা করি না, কিন্তু যদি সুখের সময় ঈশ্বরের ভজনা করি, তবে দুঃখ হইবে কি প্রকারে? ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন—

দুঃখ পাওয়ে তো হরি ভজে, সুখে না ভজে কোই।
সুখসে যো হরি ভজে, দুঃখ কাঁহাসে হোই॥
"দুঃখে সবে ভজে হরি সুখে ভজে কবে।
সুখে যদি ভজে হরি দুঃখ কেন তবে॥"

উক্তিটী অবিসংবাদিত সত্য। সুখের সময়ে যদি ঈশ্বরভজনা করা যায় তবে দুঃখের মূল উৎস বন্ধ হইল। কিন্তু মানুষের স্বভাবই যে তাহা নহে। সুখের দিনে মানুষ ঈশ্বরকে ডাকিতে চাহিলেও প্রাণভরিয়া ডাকিতে পারে না, কিন্তু দুঃখের দিনে তাঁহাকে প্রাণভরিয়া ডাকা যায়।

"সুখের দিনে তোমাকে ডাকি প্রাণমন ভরে না।
দুঃখের দিনে আপনা ভুলে করি তোমারে কামনা॥"

মানুষ দুঃখের দিনেই প্রাণমন এক করিয়া ভক্তির সহিত তাঁহাকে ডাকিতে পারে, সুতরাং দুঃখ ভক্তিলাভের একটী উপায়মাত্র।

সুখ ও দুঃখের সমষ্টি লইয়াই মানবজীবন গঠিত। মানবের সমস্ত জীবন সুখ দুঃখের ঘটনা-পরম্পরায় গঠিত হইলেও অনেকে জীবনকে শুধুই সুখময় মনে করিয়া থাকেন এবং সুখের সময় আনন্দে আকুল হইয়া পড়েন। ইঁহারা দুঃখকে বড় আমলে আনিতে চাহেন না। কিন্তু মানুষের জীবনে অনাবিল সুখের সম্ভাবনা কোথায়? সুখবাদী বলিতে পারেন সংসারে সুখসম্ভোগের অনন্ত অসংখ্য উপকরণ রহিয়াছে, তবে মানব-জীবনের দুঃখ কি? ইহার উত্তরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন—

"যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ?

তবেই দেখ মানবজীবন অনন্ত দুঃখময়। জীবনে যতই সুখ থাকুক, পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণরূপ এই স্ফুটতর দোষ দূরীভূত করিতে না পারিলে মানব-জীবনে শান্তি নাই। অতএব মানবজীবনের এই স্ফুটতর দোষ হইতে যাহাতে উদ্ধারলাভ করা যায়, তাহাই মানবের পরম পুরুষার্থ এবং শ্রেয়ঃ। হিন্দুর ঐহিক ও পারত্রিক কাম্যকর্ম্মের মূলে এই জীবন্মুক্তির বাঞ্ছাই স্পষ্ট প্রকট। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানব জীবনের এই সুদীর্ঘ কাল কেবল জীবন-মরণের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় চেষ্টিত হওয়া প্রয়োজন। জীবন্মুক্তি একদিনে কাহারও লাভ হয় না। কোটী কোটী জন্মের সুকৃতি থাকিলে তবে আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া মুক্তি হয়। কিন্তু এই আত্মজ্ঞান লাভের মূল—ভগবদ্ভক্তি। ভগবদ্ভক্তির বিমল আলোক স্পর্শে অন্তরের মলা দূর করিতে না পারিলে প্রকৃত জ্ঞানের পথ পাওয়া যায় না। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বপ্রযত্নে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ভক্তিযোগ অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। ভক্তিযোগ সকলের পক্ষেই সুগম এবং নিরুপম। শ্রুতি বলেন—"তস্মাৎ সর্ব্বেষামধিকরণমনধিকরণম্ ভক্তিযোগ এব প্রশস্যতে। ভক্তিযোগ এব নিরুপদ্রবঃ। ভক্তিযোগান্মুক্তিঃ। বুদ্ধিমতামনায়াসেনাচিরাদেব তত্ত্বজ্ঞানং ভবতি। তৎকথমিতি? ভক্তবৎসলঃ স্বয়মেব সর্ব্বেভ্যো মোক্ষবিঘ্নেভ্যো ভক্তিনিষ্ঠান্ সর্ব্বান্ পরিপালয়তি। সর্ব্বাভীষ্টান্ প্রযচ্ছতি। মোক্ষং প্রাপয়তি। ভক্ত্যা বিনা ব্রহ্মজ্ঞানং কদাপি ন জায়তে। তস্মাৎ ত্বমপি সর্ব্বোপায়ান্ পরিত্যজ্য ভক্তিমাশ্রয়। ভক্তিনিষ্ঠো ভব! ভক্তিনিষ্ঠো ভব!"

অধিকারী ও অনধিকারী সকলের পক্ষে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ। ভক্তিযোগ সাধনায় কোন উপদ্রব নাই। ভক্তিযোগ হইতেই মুক্তি হইয়া থাকে। যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা অনায়াসে শীঘ্রই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

ভক্তিযোগে সংসার পার হওয়া যায় কিরূপে ? তাহার উত্তরে শ্রুতি বলেন—'ভক্তবৎসল ভগবান্ আপনিই সমস্ত মোক্ষবিঘ্ন হইতে সকলকে রক্ষা করেন। তিনি ভক্তের সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন। ভক্তি ভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান কখন জন্মায় না, তদ্ধেতু তুমিও সকল উপায় ত্যাগ করিয়া ভক্তিকেই আশ্রয় কর। ভক্তিনিষ্ঠ হও, ভক্তিনিষ্ঠ হও !'

পারত্রিক মঙ্গলের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহজীবনে ভগবদ্‌ভক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে। এ সংসার-সমুদ্র সদাই শোক-দুঃখময় ভীষণ তরঙ্গমালা-সঙ্কুল। জীবন-পথের নবীন যাত্রী আমরা, আমরা এখনও উপকূলে ;—পিতৃপরিজনের স্নেহরক্ষিত আশ্রয়-মধ্যে অবস্থিত। সংসার-সমুদ্রের দুঃখতরঙ্গের তাণ্ডব নৃত্য, মৃত্যুভয়বিভীষিকার প্রলয় হুঙ্কার এখনও আমাদের অপরিচিত। কালচক্র-নেমির আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আয়ু নিঃশেষিত হইতেছে ও আমরা সংসার-সমুদ্রের উপকূল ছাড়িয়া অকূল পাথারে নীত হইতেছি। নানাবিধ উদ্বেগ আশঙ্কার প্রলয়ঝটিকা দিগন্ত আঁধার করিয়া উঠিতেছে। এই বহু বাধাবিপত্তি-সঙ্কুল সংসার-সমুদ্রে আমাদের পাড়ি দিবার উপায় নাই। 'আত্মীয় স্বজন বন্ধু পুত্র পরিবার'—এ যাত্রায় কেহই কোন সাহায্য করিতে পারিবে না। সেইজন্য সময় থাকিতে প্রস্তুত হইতে হইবে, অন্তরকে দৃঢ় করিতে হইবে. আর শেষের সে দিনের নিমিত্ত দুঃখতরঙ্গবিক্ষোভিত সংসার-সমুদ্রে জীবন তরীকে অবিচলিত রাখিবার জন্য ভগবদ্‌ভক্তির রক্ষাকবচ বুকে বাঁধিয়া ভবসাগর পারের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইবে। উহার গুণে তরঙ্গমালাকুল সংসার সমুদ্র ভগবদ্‌ভক্তির শান্ত-শীতল প্রেমপাথারে পরিণত হইবে ; উহাতে সাঁতার দিতে থাকিলে তার আর দুঃখযন্ত্রণা মৃত্যুভয় থাকে না। ভক্তের কথায়—

"তাঁর প্রেমপাথারে যে সাঁতারে, তার মরণের ভয় কি আছে ?"

বাস্তবিক যিনি ভগবদ্‌ভক্তির পুণ্য পাথারে ডুবিয়াছেন, তাঁহার আর এ সংসার-দুঃখ-যন্ত্রণা কি ? তিনি শোক-দুঃখ বিপদ্-আপদ্ এমন কি মৃত্যুকেও তুচ্ছ করিয়া সেই প্রেমনিধির প্রেমপাথারে ডুবিয়া অতুল্য আনন্দ উপভোগ করেন।

এমন যে সুমধুর ভগবদ্ভক্তি, এ ভক্তি যে জীবনে নাই, সে জীবন বৃথা ; যিনি এই ভক্তিগঙ্গানীরে অবগাহন না করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থ-ভ্রমণ করিলেও তাঁহার শান্তি নাই। এ ভক্তি সাধনার ধন। ভগবানের কিংবা মহাত্মার কৃপা হইতেও এ ভক্তি লাভ হয়।—

"মহৎকৃপয়া এব ভগবৎকৃপালেশদ্বা"।

তুমি দুরাচার বলিয়া ভাবিও না, ভক্তিরাজ্যে তোমার স্থান নাই। তুমি অসাধু বলিয়া ভাবিও না, তুমি মহৎকৃপা হইতে বঞ্চিত। তুমি পাপ-প্রতারণা-পরায়ণ বলিয়া ভাবিও না এ সংসারে তোমার স্থান নাই। চন্দ্রের বিমল কিরণ যেমন আচণ্ডাল মহতের গৃহে তুল্যরূপে পতিত হয়, মাতা-পিতার স্নেহ যেমন সৎ অসৎ উভয় পুত্রের উপর পতিত হয়, তদ্রূপ সেই করুণৈকসিন্ধু ভক্তের ভগবান্ সকলের উপর সমদৃষ্টিসম্পন্ন। ঐকান্তিক ভাবে তাঁহার ভজনা করিতে পারিলে, তাঁহার করুণা লাভে বঞ্চিত হইতে হয় না। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥"

হে অর্জ্জুন! অতি দুরাচার লোকও যদি অনন্যচেতা হইয়া আমাকে ভজনা করে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিতে হইবে। সে সম্যক্ জ্ঞানবান্ হইয়াছে। যে এরূপে আমায় ভজনা করে সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া যায় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। হে কৌন্তেয়, নিশ্চয় জানিও আমার ভক্ত কখন নাশপ্রাপ্ত হয় না।

তবে এস ভাই, ভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিয়া অনন্যচেতা হইয়া ভক্তি-যোগে তাঁহার আরাধনা করি। তাঁহাতে সমর্পিতচিত্ত হইয়া ভজনা করিতে পারিলে সকল জ্বালা যন্ত্রণা-মৃত্যুযুক্ত সংসার-সাগর হইতে অচিরাৎ উদ্ধার পাইতে পারিব। ঐ শুন ভগবান্ অভয় দিয়া বলিতেছেন—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্ত মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

গীতা, ১২। ৬। ৭

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

আর্য্যললনা।

শশিকলা।

(১)

যামঘোষ-পশুপক্ষিকুলের কোলাহল যখন ত্রিযামার অবসান ঘোষণা করিয়া নিরস্ত হইয়া গেল, সেই সময়ে কাশীরাজ-নন্দিনী শশিকলা স্বপ্নাবসানে সহসা জাগরিত হইয়া শয্যার উপরে উপবেশন করত অশ্রু-সলিলে ভাসিতেছিলেন। তখন সহচরী আসিয়া বিস্ময়সহকারে জিজ্ঞাসা করিল—"সই, এমন ক'রে কাঁদছ কেন ভাই? তোমার কি হয়েছে বল, আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ছে; তোমার কি কোনও অসুখ হয়েছে? বল, শীঘ্র রাণীমাকে সংবাদ দিয়ে আসি।"

ক্ষণকাল পরে অশ্রুসম্বরণপূর্ব্বক রাজকুমারী কহিলেন—"সই, আমার শরীরে কোনও অসুখ নাই; কিন্তু আমি বড়ই বিপন্না! মাঁ জগদম্বা কি বিপন্না বালিকাকে রক্ষা করিবেন না?"

সখী। তোমার এমন কি বিপদ্ রাজনন্দিনি। আমার নিকট সমুদায় প্রকাশ ক'রে বল, আমি রাণীমাতাকে সংবাদ দেই; তাঁহারা বিবেচনাপূর্ব্বক যা' ক'রে হয় তা'র প্রতিকার করবেন্।

শশিকলা। না সই, তুমি বুঝতে পারছ না; এই ঘোর বিপদ্ হইতে একমাত্র জগদম্বা ব্যতিরেকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। তিনি রক্ষা করিলেই রক্ষা, নতুবা আর উপায় নাই।

সখী। বিষয়টা কি প্রকাশ করেই বল না শুনি।

শশিকলা। ভাই শোন, রাত্রির অবসান সময়ে আমি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখেছি। সেই স্বপ্নভঙ্গে জাগ্রত হ'য়েই দেখি প্রভাত হইয়াছে; শুনিয়াছি প্রভাতের স্বপ্ন নাকি বৃথা হয় না। আর মিথ্যাই হউক কি সত্যই হউক—যে স্বপ্ন দেখিয়াছি উহা মিথ্যা হইলেও, রমণীর পক্ষে সত্যের সত্য! মহা সত্য!!

সখী। এখনত' জেগেই আছ, তবে আর স্বপ্নের জন্য অত ভয় কেন?

শশিকলা। জেগেই যত ভয় ভাবনা। স্বপ্নে ত' পরম সুখেই ছিলাম। আমার এই স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই যদি এই জীবন-স্বপ্নেরও অবসান হ'ত!— আমি দেখিলাম আমি কোনও অজ্ঞাত আশ্রমেই হউক অথবা কোনও উদ্যানেই

হউক—স্বহস্তে কুসুম চয়ন করিয়া ইষ্টদেবীর অর্চ্চনার জন্য মালা গাঁথিতে ছিলাম, এমন সময়ে তাপস-বেশধারী জনৈক রাজ-নন্দন আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; এবং বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে আমাকে দেখিতে লাগিলেন; আমিও কিয়ৎকাল তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমি সহসা লজ্জানুভব করত মুখ অবনত করিলাম, তখন মনে মনে কি জানি কেমন একটু ভাবান্তর অনুভব করিলাম। ইঁহার পরিচয় জানিবার জন্য আমার অতিশয় কৌতূহল জন্মিল; মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম রাজকুমার সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন মুনিবালক সে স্থানে আগমন করিল ও আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—'ভদ্রে, এই পথে কি কুমার সুদর্শনকে যাইতে দেখিয়াছেন?' আমি বলিলাম—'আমি একজন তাপস-বেশধারী যুবককে এই পথে যাইতে দেখিয়াছি; আমি তাঁহার পরিচয় জানি না। তিনি কি ঋষিকুমার?' একটী বালক উত্তর করিল—'ইনিই অযোধ্যা-রাজকুমার সুদর্শন। ইনি যেমন রূপে ও গুণে, তেমনি ব্যবহারে এই আশ্রমের সকলকার প্রিয়; এমন কি আরণ্য পশুপক্ষীগুলিও ইঁহাকে কত ভালবাসে! আর গুরুজনগণের নিকট শ্রবণ করিয়াছি যে, ইনি ষড়ঙ্গ বেদ এবং ধনুর্ব্বিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। আত্মদর্শী সাধক বলিয়া কুলপতি ভরদ্বাজও ইঁহাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।' এই বলিয়া ঋষিকুমারগণ সেই পথে চলিয়া গেল।

আমি তখন কাতর-প্রাণে ভগবতীকে ডাকিতে লাগিলাম ও মনে মনে প্রার্থনা করিলাম 'মা' যদি এই দীন-হীন তনয়াকে কোনও বর দান তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে এই বর দিও যেন নৃপনন্দন সুদর্শনকে পতিত্বে বরণ করিতে পাই।' এই ভাবের অনুরূপ নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে আমি ভবানী-মন্দিরে প্রবেশ করিলাম ও দেবীর অর্চ্চনায় মনোঽভিনিবেশ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু আমার আর দেবীপদ অর্চ্চনা করা হইল না। দেবীর পদে অঞ্জলি দিতে সুদর্শনের পদে ও দেবীর গলায় মাল্য দিতে সুদর্শনের কণ্ঠে মাল্য দান করিলাম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দেবীর অর্চ্চনা হইল না ভাবিয়া অতিশয় কাতর-প্রাণে রোদন করিতে লাগিলাম। সহসা দেখিলাম দেবীমূর্ত্তি আর পাষাণ-প্রতিমা নাই, সে প্রতিমা যথার্থ জীবন্তরূপ ধারণ করিয়াছে; এবং সুস্পষ্ট ভাষায় মানবকণ্ঠে কথা কহিতেছে। দেবীপ্রতিমা স্নেহমধুর স্বরে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'রাজকুমারি, তুমি কুণ্ঠিত হইও না, আমি তোমার পূজা গ্রহণ করিয়াছি। বৎসে, সুদর্শনই তোমার পতি, আমার সমক্ষে তুমি ইহার

কণ্ঠে এই বরমাল্য অর্পণ কর।' এই বলিয়া দেবী এক ছড়া অম্লান-নির্ম্মাল্য-পুষ্পহার আমার হস্তে অর্পণ করিলেন, আমি সুদর্শনের কণ্ঠে পরাইয়া দিলাম। তিনি আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন। দেবী রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন--'বৎস, তুমি কাশীরাজ-নন্দিনী শশিকলাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর। এই ঘটনা তোমাদিগের স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইলেও ইহাকে সামান্য স্বপ্ন বিবেচনা করিও না। তোমাদিগের 'এই আধ্যাত্মিক পরিণয় হইয়া' গেল, অচিরেই সামাজিক বিধানে তোমাদিগের বিবাহ হইবে।' এই বলিতে বলিতেই আমার স্বপ্ন ভঙ্গ হইল।—বল দেখি সই, এ কি স্বপ্ন না সত্যের সত্য, মহাসত্য!! আর স্বপ্নেই হউক বা জাগরণেই হউক আমিই ত দেবীর সম্মুখে রাজকুমারের কণ্ঠে বরমাল্য সম্প্রদান করিয়াছি আর আমিও ত সেই আমিই আছি! এ স্বপ্ন হইলেও যে শত সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!! স্বপ্নে বা জাগরণে সতীরমণী কখনও একমাত্র পতি ব্যতিরেকে আর কাহাকেও বরণ করিতে পারে না! সই, এখন আমার উপায় কি? আমি কি করি, তাঁহাকে কোথায় পাই? এ দিকে পিতা স্বয়ংবরের উদ্যোগ করিতেছেন, পৃথিবীর সমস্ত নৃপতিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন; অচিরেই তাঁহারা রাজপুরে আগমন করিবেন। বল সখি, রমণীর প্রধান ধর্ম্ম সতীত্বে কালিমা লেপনপূর্ব্বক কোন্ মুখে ভর্ত্তাভিলাষিণী হইয়া সেই স্বয়ংবরসভায় উপনীত হইব? আবার দেখ, স্বয়ংবরসভায় গমন না করিলেও আহূত রাজগণ অবমানিত ও তিরস্কৃত বোধে—অসূয়াপরবশ হইয়া আমার জনকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন। পিতার এই সোনার রাজ্য ধ্বংস হইয়া যাইবে, প্রজাগণের বহুবিধ ক্লেশ উৎপন্ন হইবে। ওদিকে কোথায় ভরদ্বাজাশ্রম, কোথাই বা নৃপনন্দন সুদর্শন!! তিনিই বা আমার পাণিগ্রহণ করিবেন কেন? এ অবস্থায় চিরকুমারী হইয়া জীবন যাপন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। কিন্তু হায়, এই সমূহ স্বয়ংবরসময়ে কে আমার এই কাতর-ক্রন্দনে কর্ণপাত করিবে? এই স্বয়ংবর রোধ করাও এখন পিতার সাধ্যায়ত্ত নহে। তাই মা জগদম্বা ব্যতিরেকে আমাকে রক্ষা করিবার আর কে আছে? একদিকে সতীত্বের মর্য্যাদা, অপর দিকে পিতা ও রাজ্যবাসীদিগের কল্যাণ, এই উভয় সঙ্কটে সেই সঙ্কটহরা জগজ্জননী ব্যতিরেকে আর কে রক্ষা করিতে সক্ষম? আমার এমন কি সাধন-বল আছে যে জগন্মাতা এই অশরণ কুমারীর সহায়তা করিবেন!

সখী। রাজনন্দিনি, তোমার ব্যাকুল হইবার যথেষ্ট কারণ আছে, সত্য। মা জগদম্বা যে সতীর জীবন। তিনিই যে পতিনিন্দা-শ্রবণে দক্ষভবনে দেহত্যাগ

করিয়াছিলেন! তিনি কি সতীর মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন না? অবশ্যই করিবেন! আর স্বপ্নেই হউক কি জগরণেই হউক তিনিইত তোমাকে পতির সহিত মিলিত করিয়াছেন। তাঁহাতে আত্মসমর্পণ কর, সতীর প্রাণ, সতীত্বের মর্য্যাদা সতীই রক্ষা করিবেন!

শশিকলা। তুমি যাহা বলিলে তাহা যথার্থ, কিন্তু আমাদের মন মানে কই? দেবীর পদে আমার তেমন অটল ভক্তি বিশ্বাস কই? তাঁহাতে সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতে পারি কই বোন। তিনিই যে সকল কার্য্যের নিয়ন্ত্রী মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা নিরন্তর অনুভব করি কই? বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে ডাকি ও তাঁহাতে আত্মসর্পণ করিলাম ইহা মুখে বলিমাত্র, মন তাহা মানে কই? তবে গুরুজনের মুখে শুনিয়াছি যে সেই সর্ব্বাত্মিকা জননী সকল হৃদয়েই অন্তর্য্যামিনীরূপে বাস করেন। এই যা' ভরসা। আমার হৃদয়ও ত তাঁহার লীলাভূমি!

---

(২)

কাশীরাজ সুবাহু যেমন অখণ্ড প্রতাপে ও রাজগুণে বিভূষিত ছিলেন, তেমনই সত্যপরায়ণ ছিলেন। ফলতঃ কাশীরাজবংশের সত্যনিষ্ঠার কথা প্রবাদের ন্যায় লোকমুখে ঘোষিত হইত। "নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ" এই মহাবাক্য বহু প্রাচীন কাল হইতে এই রাজবংশের মূলমন্ত্রস্বরূপে চলিয়া আসিতেছে। প্রজাগণও রাজার অনুগামী হইয়া থাকে। এই রাজবংশের সত্যপ্রভাবে তাঁহাদের রাজ্য-মধ্যে প্রজামণ্ডলীর সকলেই কখনও সত্যের আশ্রয় ত্যাগ বা সত্যধর্ম্মের অমর্য্যাদা করে নাই। তাহাদিগের এই সত্য-পরায়ণতার ফলে এই রাজ্যে কখনও কোনও মহামারি দুর্ভিক্ষ্য বা অকালমৃত্যু প্রবেশ করিতে পারে নাই; রাজ্যের সর্ব্বত্রই পুণ্য-শ্রী নিত্য বিরাজিত। শশিকলা এই ধর্ম্ম-পরায়ণ নৃপতির একমাত্র দুহিতা।

শশিকলা রাজা ও রাণীর সমবেত পুণ্য-ফলের ন্যায় এই রাজপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীস্বরূপে বিরাজিতা ছিলেন। শশিকলা যেমন রূপে, তেমনি উদার চরিত্রে সত্যধর্ম্মের মূর্ত্তিমতী বিগ্রহ। সর্ব্বজীবে তাঁহার অগাধ প্রেম, গুরুজনে অপরিসীম ভক্তি ও জগতের মাতাপিতা ভবানী-শঙ্করের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগে সেই রাজ্য-সীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী তাপসাশ্রমেও তাঁহার অনুরূপ কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইত না। তাঁহার সত্যধর্ম্মপরিমার্জ্জিত বুদ্ধি অতুলনীয়।

রাজকুমারী যখন কৈশোরসীমা অতিক্রমপূর্ব্বক যৌবনে পদার্পণ করিতে-ছিলেন, তখন তাঁহার জনক অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজনন্দিনীকে

স্বয়ংবরা করিবার অভিপ্রায়ে কালোচিত প্রথানুসারে দেশে দেশে স্বয়ংবর-বার্ত্তা প্রচারিত করিলেন ও নৃপতিবৃন্দের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। বর্ষাধিক কাল পূর্ব্ব হইতেই স্বয়ংবরের নানাবিধ আবশ্যকীয় বিধিব্যবস্থা হইতে লাগিল।

রাজপুরীর অনতিদূরে সুদক্ষ শিল্পিগণ অভ্যাগত-নৃপতিগণের আবাসযোগ্য নানাবিধ কারুকার্য্য-খচিত তুঙ্গশৃঙ্গসমন্বিত বহু হর্ম্ম্য, নাট্যশালা, পুষ্পোদ্যান, সরোবর ও নানাবিধ স্তম্ভ-তোরণাদি সুশোভিত ক্রীড়াচত্বর ও উন্নত তরুরাজি-সমাকুল প্রশস্ত রাজপথাদি সমন্বিত স্বয়ংবর-সভা নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। অভ্যাগত নরপতিবর্গের সহচর ও সৈন্য-সামন্তগণের এবং যান-বাহনাদির জন্য স্থান নির্দ্ধারিত হইয়া তৎসমুদয় যথোপযুক্ত আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য বস্তুসম্ভারে পূর্ণিত হইতে লগিল। বস্তুতঃ এই রাজ্যমধ্যে এক বিরাট্ ব্যাপার সূচিত হইতে লাগিল।

স্বয়ংবর সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতে লাগিল ততই নানা দিগেদেশীয় রাজন্যগণের অনুচরবৃন্দ, দূত, বন্দী ও পরিচারকগণ তাহাদিগের যথানির্দ্দিষ্ট আবাসস্থলসমূহে সমবেত হইতে লাগিল ও রাজন্যগণের স্কন্ধাবারের ঘনঘটায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তভূমি কোলাহলময়ী হইয়া উঠিল। সর্ব্বত্র স্বয়ংবরের সমারোহ স্পষ্ট অনুভবযোগ্য রূপ ধারণ করিল। স্বয়ংবর সময়ের আর অধিক বিলম্ব নাই। মাসাধিক কাল মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে এমনি সময়ে একদা রাজনন্দিনী প্রভাত সময়ে স্বপ্নান্তে শয্যায় বসিয়া ব্যাকুলহৃদয়ে রোদন করিতেছিলেন। তদীয় সহচরী যথাসময়ে রাজকুমারীর মনোগতভাব ও স্বপ্নবিবরণ যথাযথরূপে মহিষীর নিকট বর্ণন করিল। মহিষী এই স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণে ক্ষণকাল স্তম্ভিতার ন্যায় থাকিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"সতীত্বই রমণীর জীবন, সতীত্বের বিনিময়ে জীবন রক্ষা অপেক্ষা জীবনের বিনিময়ে সতীত্ব রক্ষাই শ্রেয়ঃ। জীবের অনন্ত জীবনের তুলনায় একটা জন্ম অতিতুচ্ছ—নগণ্য। ছি !!" এই বলিয়া গজেন্দ্রগামিনী মৃদুমন্থর পাদবিক্ষেপে নৃপতির বিশ্রামকক্ষের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন।

নৃপতি তখন যথাবিহিত প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক সভামণ্ডপে গমনোপযোগী বেশে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। চিন্তাকুল নরেশভামিনী তখন ভাবনাব্যাকুল ম্লানবদনে যাত্রামঙ্গল হাস্যের অভিনয় করত নৃপতির সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। মহিষীর সযত্নকল্পিত হাস্যের অন্তরালে উৎকণ্ঠার কালিমাময় মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া

নৃপতি কহিলেন—"দেবি, তোমার সযত্ন-কল্পিত মাঙ্গল্য হাস্য অপেক্ষা তোমার হৃদয়নিহিত উৎকণ্ঠার মূর্ত্তি দর্শনেই আমার অধিক আগ্রহ। প্রিয়ে, বৃথা কল্পনা দ্বারা যথার্থ গোপন করিবার প্রয়োজন কি ?"

রাণী কহিলেন—"মহারাজ, দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। সত্যগোপন আমার অভিপ্রেত নহে, পরন্তু সমূহ সভামণ্ডপে গমনের প্রাক্কালে সেই উদ্বেগজনক সত্যের অবতারণা আমার অভিমত নহে বলিয়াই ক্ষণকালের নিমিত্ত উহা গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। গোপন করিলে অনিষ্ট ব্যতিরেকে কোনও ইষ্ট সাধনই হইবে না ” নৃপতির অনুরোধক্রমে শশিকলার স্বপ্নবৃত্তান্ত যথাশ্রুতরূপে বর্ণন করিয়া রাণী কহিলেন—"এক্ষণে উপায় কি মহারাজ ?" নৃপতি কহিলেন—"দেবি, জগদম্বার যাহা উচ্ছা তাহাই হইবে। ভবিতব্যনির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়। শাস্ত্রজ্ঞ অমাত্যগণ সহ লৌকিক বিচারে যে সিদ্ধান্ত স্থির হয় তাহার অনুগমন করাই যুক্তিসঙ্গত।"

রাণী। মহারাজ, মুখরার ন্যায় একটী কথা বলিতেছি—সতীরমণী একবার ব্যতীত দ্বিতীয় বার আত্মসমর্পণ করিতে পারে না—তাহা স্বপ্নেই হউক বা জাগরণেই হউক। সেই পরপদে উৎসর্গী-কৃত হৃদয়ে রমণী তাহার নিজস্ব কোনও অধিকারই রাখে না। ইহাই তাহার পরম গর্ব্ব, সে এই সতীত্বের গর্ব্ব রক্ষা করিতে জগতের যাবতীয় শ্রীসম্পদ্ এমন কি জীবন পর্য্যন্ত তুচ্ছ ধূলিমুষ্টির ন্যায় বিসর্জ্জন করিতে পারে! এই সতীত্বরত্ন রক্ষার নিমিত্ত রমণী গুরু, লঘু, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারবিরহিতা হয়। সতীত্বের সমক্ষে কুলকামিনীর আর কিছুই বরণীয় নাই।

রাজা। প্রিয়ে, ব্যাকুল হইও না, সতীর সম্মান রক্ষাই পুরুষের একমাত্র কর্ত্তব্য। যে সকল কলঙ্কী কাপুরুষ সতীর মর্য্যাদা রক্ষা না করে, সংসারে তাহারা বহুপ্রকার দুঃখভাজন হইয়া থাকে। জননী, ভগ্নী, ভার্য্যা ও তনয়ারূপিণী সতীগণের অনুকম্পায় সতীমর্য্যাদার কিয়ৎপরিমাণ মাহাত্ম্য উপলব্ধি হইয়াছে মনে করি। এই বলিয়া নৃপতি ঈষৎ হাস্যসহকারে রাণীর মুখাবলোকনপূর্ব্বক রাজসভায় যাত্রা করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক চৌধুরী।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। *

(১)

উঠ, জাগ হে সাধক! ধর সেই তান,
সৃষ্টির বিকাশ দিনে উঠিল যে গান--
বিশ্বে বিশ্বে চন্দ্র সূর্য্যে গ্রহ তারকায়,
অরণ্যে পর্ব্বত মাঝে, জলদের গায়,
নীলাকাশে অম্বুমাঝে অণুতে অণুতে
এখনও যে মহাগীতি উঠিছে মহীতে;
উঠ, জাগ, গাও সখা, গাও সেই গীতি,—
দূরে যা'ক মিথ্যা মোহ—যা'ক অবিরতি,
যা'ক ক্লান্তি অবসাদ, আত্মমলিনতা,
যা'ক দূরে আশা দ্বেষ কুহক খলতা,
নব রস আস্বাদনে, নব জাগরণে
জাগাও মহিমা তাঁর নবীন জীবনে।

(২)

বিস্তৃত করম-ক্ষেত্র—এই ধরাতল
পুষ্পাকীর্ণ নহে এ ত—শষ্প সুশীতল,
বন্ধুর অত্যুচ্চ উচ্চ বিপদসঙ্কুল,
পদে পদে বাধা বিঘ্ন, কত ভ্রান্তি ভুল।
যেখানে যে পথে তুমি করিবে গমন,
কণ্টকেতে বিদ্ধ তব হইবে চরণ!
কাম ক্রোধ লোভ আদি ইন্দ্রিয় সকল,
শত্রুরূপে পথে তারা হইবে প্রবল;

---

* শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের "সন্ন্যাসীর গীতি" পাঠে এবং অংশতঃ তাহার ভাবাবলম্বনে রচিত।—লেখক

আত্মীয় স্বজন বন্ধু পুত্র পরিবার,
এ যাত্রার সহযাত্রী কেহ নহে কার।
তাই বলি ভাই সখা সাধু সুধীগণ,
উঠ, জাগ, স্মর সদা সেই অশরণ!

(৩)

দুর্ভেদ্য মায়ার জালে, আঁধার অজ্ঞানে
নিয়ত আবদ্ধ তুমি আশার ছলনে,
কুহকে মায়ায় মজি, নব সুখ আশে,
পাসরি পরম সুখে বদ্ধ কামপাশে।
আমি তুমি ভেদাভেদ, সব এক মায়া,
একের সে বহু ভাব, এককের ছায়া;
দ্রষ্টা তুমি, ভোক্তা তুমি, তুমি নির্ব্বিকার,
মোহের বন্ধনে বল 'আমার আমার';
আন্দোলিত চন্দ্র যথা সরসীর নীরে,
এক তুমি বহুরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে।
তাই বলি উঠ সখা, ধর সেই গান,
দূরে যা'ক মিথ্যা 'আমি তুমি' ব্যবধান!
'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন'
সিদ্ধিলাভে মহামন্ত্র আছে চিরন্তন;—
অনাদি অমেয় যিনি চিন্তার অতীত,
বাক্য যাঁর বর্ণনায় নির্ব্বাক্‌ সতত;
তিনি এই চরাচরে অব্যক্ত রূপেতে,
দুগ্ধমধ্যে ঘৃতরূপে র'ন ভূতে ভূতে;
আপন হৃদয় মথি লভ আপনায়,
তুমি আমি ডুবে যা'ক অনন্ত 'আমায়'।
ইহা ভিন্ন অন্য পন্থা নাহি কিছু আর,
নিয়ত অন্তরে তিনি বেদ্য সবাকার;
তাই বলি উঠ, জাগ, সাধকপ্রধান,
অন্তরে অন্তরে তাঁর করগো সন্ধান!

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

(উপক্রমণিকা)

কিঞ্চিদধিক চারি শত বর্ষ অতীত হইতে চলিল, আমাদের শ্রীগৌড়মণ্ডল-ভূমিকে পবিত্র করিয়া মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ জন্ম গ্রহণ করিয়া যে অকৈতব প্রেম ভক্তির প্রচার করিলেন, সেই ধর্ম্মাবলম্বিগণই গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত। শান্তিপুরবাসী শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য ও অবধূত শ্রীমান্ নিত্যানন্দ প্রভুই এই ধর্ম্ম প্রচারের প্রধান সহায়ক। তৎপরে মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারে শক্তি-মান্ হইয়া শ্রীরূপ সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিবৃন্দ এই ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠন করেন। তাঁহাদের রচিত পুস্তকাবলীর ভিত্তি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ধর্ম্মই মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম। তাঁহাদের মতে—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয় স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা॥
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থপরং।
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভো র্মতমিদং তত্রাদরো নাপরঃ॥

ব্রজবধূগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে অনুরাগ সেই ভাবে উপাসনাই এই সম্প্র-দায়ের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং শ্রীমদ্ভাগবতই ইহার প্রমাণ।

বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে ডুবিয়া আমরা পুরাণে শ্রদ্ধা হারাইয়া বসিয়াছি। প্রক্ষিপ্তবাদের এক নূতন ধুয়া উঠিয়া আমাদের মস্তিষ্ককে কিঞ্চিৎ বিকৃত করিয়াছে। মহাপ্রভুর প্রচারিত—বিশেষতঃ "গাঁয়ের যুগী"র এ ধর্ম্ম সম্পূর্ণ আধুনিক, সুতরাং অপ্রামাণিক; তার পর ভাগবত সেত বোপদেবের লেখা—সুতরাং এই নব্য ধর্ম্মে আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। তবে বেদকে এই শ্রেণীর লোক অপ্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন না, কারণ পাশ্চাত্য মতেও বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্বে ঋক্‌বেদের ঋক্‌সমূহ সংকলিত হইয়াছিল। ম্যাক্সমূলর সাহেবেরই উক্তি যে—"ভারতবর্ষে কেন, আর্য্যদিগের ইতিহাসে ঋক্‌বেদের ঋক্‌সমূহ অপেক্ষা প্রাচীন ও আদিম আর কিছুরই প্রমাণ পাওয়া যায় না, ইহা নিশ্চিত। * আজ কাল পুরাণকেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কিঞ্চিৎ

* One thing is certain that there is nothing more antient and primitive not only in India but in the whole Aryan world than the hymns of the Rigveda (origin & growth of religion).

পুরাতন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেহ কেহ পুরাণসমূহকে খৃঃ পূর্ব্ব তিন শত বৎসরের পূর্ব্বে বলিয়া মনে করেন।

তাঁহাদের মতে যাহাই হউক—বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে বৈদিক ধর্ম্ম এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যমান আছে এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। হিন্দুরা এখনও প্রত্যহই ঋকের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুস্মরণে পবিত্র হইয়া থাকেন।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

ঋক্ ১। ২২। ২০

বৌদ্ধবিপ্লবের পর যখন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মমূলক ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সেই বিক্ষিপ্ততার ভিতর—সেই ধর্ম্মগ্লানির ভিতর ধর্ম্মের ঠিক সার সত্য অন্তঃসলিল হইলেও যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ধারা একেবারে লুপ্ত হয় নাই শঙ্করবিজয় গ্রন্থে তাহা বেশ জানা যায়—

ভক্তা ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিণঃ।

বৈখানসাঃ কর্ম্মহীনাঃ ষড়্ বিধাঃ বৈষ্ণবা মতাঃ॥

অবশ্য বৈদিক যুগের উপাসনা বর্ত্তমান সময়ের উপাসনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও যে তৎকালে বিষ্ণু উপাসনা প্রচলিত ছিল এবিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। পাঞ্চরাত্র-ধর্ম্ম, সাত্বত-ধর্ম্ম, ভাগবত-ধর্ম্ম বৈষ্ণব-ধর্ম্মেরই নামান্তর। মহাভারতে উপরিচর নামে এক রাজার যে বিষ্ণুভক্তির উল্লেখ আছে সেখানে "সাত্বতং বিধিমাস্থায়" এই কথাই উল্লিখিত আছে। শ্রীধর স্বামীও সাত্বতং বৈষ্ণবতন্ত্রং পঞ্চরাত্রাগমং" এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। রামানুজাচার্য্যের বহু পূর্ব্বেও বোধায়ন গুহদেব দ্রমিরাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের বৈষ্ণব সিদ্ধান্তমূলক টীকা প্রণয়ন করেন।

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাচীনত্ব আজ কাল অনেকে স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কারণ দুই একটী শিলালিপি ও তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রাচীনতার পোষকতা করিতেছে। * বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রাচীন হইলেও

* The inscription on a Garurastambha discovered in Beshnagar quite recently states that Heliodoras the son of Didu, a Bhagabata who came from Taxila in the reign of the great king Antalkidas set up that Garurastambha in honour of Basudeva

For this king Antalkidas various initial dates have been fixed which range from B. C 175 to B. C 135. This is the earliest known inscription mentioning Bisnu as Basudeva and from this we are in a position to ascert that the worship of Basudeva in temples in India cannot be later than the second century B. C.

শ্রীমদ্ভাগবতকে প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু যে ধর্ম্মপ্রচার করিলেন, সেই ধর্ম্মের বৈদিকত্ব স্বীকার করিতে অনেকে আপত্তি করেন। তাঁহাদের মতে শ্রীমদ্ভাগবত আধুনিক গ্রন্থ এবং বোপদেবের রচিত অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রন্থ। এ মত হিন্দুদিগের গ্রহণীয় নহে। এ গ্রন্থ যে বোপদেবের পূর্ব্বের অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে ১১৫০ সম্বতে লিখিত অর্থাৎ ১০৯৪ খৃঃ অব্দে লিখিত একখানি ভাগবত গ্রন্থ পুণানগরীর সরকারী পুস্তকাগারে রক্ষিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের সময়ে যে ভাগবত গ্রন্থ প্রচারিত ছিল এবং তিনি যে এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে একটী আপনাদের নিকট উল্লেখ করি ;—শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকাভক্ষণ-লীলা কেবল ভাগবতেই উল্লিখিত আছে এবং শঙ্করাচার্য্য এই ঘটনা অবলম্বনে কবিতা রচনা করিয়াছেন, সুতরাং সে সময়ে যে ভাগবত গ্রন্থ প্রচারিতছিল ইহা সুনিশ্চিত।

সুতরাং এই ভাগবত গ্রন্থ যে শুকদেব কর্ত্তৃক মহারাজ পরীক্ষিৎ-সমীপে পঠিত হয় নাই কেবল কাল্পনিক কথা মাত্র, ইহার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

হিন্দুদিগের সকল শাস্ত্রই বেদমূলক, ভাগবতও বেদমূলক। ভাগবতে লিখিত আছে—"নিগমকল্পতরোর্গলিতং" কাজেই বেদের অন্তর্নিহিত তত্ত্বই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে প্রকটিত আছে। উপনিষদ্ শাস্ত্রাদি আলোচনায় দেখা যায় যে ভগবান্ প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বেদসমূহ প্রদান করেন—

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ। শ্বেত ৬।১৮

শঙ্করাচার্য্যও এই মন্ত্রে একটী স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

যুগান্তেঽন্তর্হিতান্ বেদান্ ইতিহাসান্ মহর্ষয়ঃ।
লেভিরে তপসা পূর্ব্বং সমাদিষ্টা স্বয়ম্ভুবা॥

সুতরাং আমাদের যাহা কিছু তাহার মূল শ্রীভগবান্—তাঁহা হইতে সকল ধর্ম্মের অভ্যুত্থান। সেই ভগবান্ হইতেই শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে ঋষিগণ কর্ত্তৃক ভারতে ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এই পরম্পরাক্রমে প্রচারিত বিদ্যার বা জ্ঞানের প্রবাহকে সম্প্রদায় বলে। শ্রীধর স্বামী তাই তৃতীয় স্কন্ধের প্রথমেই বলিলেন—

"দ্বেধা হি শ্রীমদ্ভাগবতসম্প্রদায়প্রবৃত্তিঃ একতঃ
সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাৎ ব্রহ্ম নারদাদি-দ্বারেণ।"

শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ এই জ্ঞান প্রাপ্ত হন। নারদ আবার এই জ্ঞান ব্যাসকে প্রদান করেন—

নারদঃ প্রাহ মুনয়ে সরস্বত্যাস্তটে নৃপ ।

ধ্যায়তে ব্রহ্ম পরমং ব্যাসায়ামিততেজসে ॥ ২।৯।৪৩

ব্যাস আবার এই ভাগবত শুকদেবকে শ্রবণ করান, এই শুকমুখে পরীক্ষিৎ শ্রবণ করেন। এইরূপে এই ধারা প্রবাহিত হইল। তাই শ্রীধর স্বামীর টীকায় দেখিতে পাই "নিগমো বেদঃ স এব কল্পতরুঃ সর্ব্বপুরুষার্থোপায়ত্বাৎ তস্য ফলং ইদং ভাগবতং নাম তত্তু বৈকুণ্ঠগতং নারদেনানীয় মহ্যং দত্তং ময়া চ শুকস্য মুখে নিহিতং তচ্চ তন্মুখাৎ ভুবি গলিতং শিষ্যপ্রশিষ্যরূপপল্লবপরম্পরয়া শনৈরখণ্ডমেবাবতীর্ণং।" সুতরাং বেদরূপ কল্পতরুর ফলস্বরূপই এই শ্রীমদ্ভাগবত। মহাপ্রভু এই মহা গ্রন্থকেই প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। জীব গোস্বামী ভাগবত-সন্দর্ভে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের চারিটী সম্প্রদায় পুরাণসম্মত এবং বর্ত্তমানেও দৃষ্ট হয়।

অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।

শ্রীব্রহ্ম রুদ্র সনকো চত্বার ক্ষিতিপাবনঃ ॥

শ্রী ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারিটী সম্প্রদায় মধ্যে এক এক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করায় সেই সেই সম্প্রদায় তাঁহাদের নামে নামান্তরিত হইয়াছে।

রামানুজং শ্রীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।

শ্রীবিষ্ণু স্বামিনং রুদ্রো নিম্বাজিতাং চতুঃ সনঃ ॥

এইরূপে রামানুজ-সম্প্রদায়, মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় প্রভৃতি সম্প্রদায় সৃষ্টি হইয়াছে—সেই ভগবৎ-জ্ঞানই এই সকল মহাপুরুষদের হৃদয়ে সংক্রামিত হইলেও আধার-ভেদে দেশকালপাত্রানুযায়ী প্রয়োজন ও অধিকারী অনুসারে বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। তাই রামানুজের বিশিষ্ট দ্বৈতবাদও মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ। একবার যেন কেহ এরূপ না ভাবেন যে ইঁহারাই এই সকল মতের প্রবর্ত্তক বা ইঁহাদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই সকল মত প্রচারিত ছিল না। সে কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক এবং ভিত্তিহীন। তাঁহারা প্রত্যেকেই আপনার অভিমত দৃঢ়ীকরণার্থ প্রসিদ্ধ ও সারগর্ভ কতিপয় উপনিষৎবাক্য এবং ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শনের এবং শ্রীমদ্ভগবৎ গীতারূপ ভিত্তির উপর--শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভূতির সাহায্যে নিজ মতের সমর্থন করিয়াছেন।

এইরূপেই অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তবে এক এক মহাপুরুষের জন্ম যেন এক একবার বর্ষাগম। শঙ্করাচার্য্যের আগমনে অদ্বৈতবাদ যেমন পূর্ণতা প্রাপ্ত, আবার মধ্বাচার্য্যের আগমনে

দ্বৈতবাদ সেইরূপ উজ্জ্বল। মধ্বাচার্য্যের মত অচ্যুতপ্রজ্ঞ, প্রজ্ঞ, সত্যপ্রজ্ঞ প্রভৃতি গুরুপরম্পরা প্রচলিত থাকিলেও, তিনি বেদব্যাস কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত বদরীকাশ্রমে ব্যাসদেবের সহিত মধ্বাচার্য্যের সাক্ষাৎ হওয়ার পর তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এই মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এই প্রেমধর্ম্মের অঙ্কুর। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিলেন—　　জয় জয় মাধবপুরী কৃষ্ণ প্রেমপুর।

ভক্তি কল্পতরুর তেহো প্রথম অঙ্কুর॥ চৈতন্যচরিতামৃত।

বৃন্দাবন দাস বলিলেন—

ভক্তি রসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার।
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বার বার॥

এই মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরী এবং শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য। শ্রীমৎ নিত্যানন্দও মাধবেন্দ্র পুরীর প্রতি গুরুবুদ্ধিই করিতেন—

মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না কহয়॥

মাধবেন্দ্র পুরীর ভক্তি বা প্রেমের অপূর্ব্বত্ব বৈষ্ণব কবির অমৃত লেখনীতে বর্ণিত আছে। যে সকল বর্ণনা কেবল কথার কথা বলিয়া মনে হইত, পুরী মহাশয়ের জীবনে সে সব প্রত্যক্ষ—

নিরবধি দেহে রোমহর্ষ অশ্রু কম্প।
হুঙ্কার—গর্জ্জন মহাহাস্য স্তম্ভ ঘর্ম্ম।
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য।
আপনেও না জানেন কি করেন কার্য্য॥

*　　*　　*

মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেম অকথ্য কথন।
মেঘ দরশনে মূর্চ্ছা হয় সেই ক্ষণ॥

মাধবেন্দ্র পুরী গিরি পুরী ভারতী প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের দশ নামী সম্প্রদায় ভুক্ত। পুরী শব্দের অর্থ—

জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরী নাম্না স উচ্যতে॥

তাই পুরীর বাহ্যজ্ঞানশূন্য, চিত্ত পূর্ণতত্ত্ব শ্রীভগবানের চরণে স্থিত—সর্ব্বদাই সেই

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে রত। মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীভগবান্ রূপে অবতীর্ণ হইয়াও লৌকিক ভাবে যে পুরী-সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন, উক্ত সম্প্রদায়ান্তর্গত কেশব ভারতী মহাশয়ের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শঙ্কর-সম্প্রদায়ের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন, "বৈদান্তিক মায়াবাদী দণ্ডী শ্রীস্বরূপদামোদর ও মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য পরমানন্দ পুরী এই দুই জনকে নীলাচলে মর্ম্ম সহচর বলিয়া গ্রহণ করিয়া যে সম্প্রদায়ের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন, সেই শঙ্করাচার্য্যের প্রতি আধুনিক কোন কোন বৈষ্ণবাভিমানী শ্রদ্ধা ভক্তি স্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হন।

মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতধারা যেন শঙ্করের অদ্বৈতধারার সহিত মাধবেন্দ্র রূপ মহা প্রয়াগে মিলিত হইয়া জ্ঞানের সহিত প্রেমের মিলন সিদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু সেই ক্ষীণধারা যেন মহাপ্রভুর আগমনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, দ্বৈতাদ্বৈত মিলনে, আপাতত অনুকূল প্রতিকূলের সংমিশ্রণে, আপেক্ষিক বিরুদ্ধের মধ্যে অবিরোধের প্রচারে যেন এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যমূলক সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম প্রচারিত হইল। গভীর দার্শনিক তত্ত্বের সুমীমাংসা সাধন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব কল্লোল-কোলাহল নিরাকৃত করিয়া বেদান্তসিদ্ধান্তগুলিকে প্রেম-পুটিত করিয়া শঙ্করাচার্য্যের অদ্বয়জ্ঞান ও ব্রজেন্দ্রনন্দনের অভেদ জ্ঞাপন করিয়া, শক্তি ও শক্তিমানের, জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদ স্থাপন করিয়া মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ বেদ-সমুদ্র মন্থন করিয়া এক মহারত্ন উদ্ধার করিলেন—ইহারই নাম অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ। সে রত্ন - যাঁহারা চিনিলেন তাঁহারাই মজিলেন, আপনাকে ভুলিলেন, চৈতন্য-চরণে আসিয়া শরণ লইলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

আয়োজন।

ওগো বাজাগো শাঁক বাজা
আজ্‌কে ওরে আমার ঘরে
আস্‌ছেরে মোর রাজা॥
দে তুলেদে শতেক বাঁশী
শতেক সুরের নিবিড় হাসি,
পথে ঘাটে দে খুলে আজ
শানাই বংশী বাজা
আস্‌ছেরে মোর রাজা॥

ওরে রেখে দে তোর গৃহের কর্ম্ম
আস্‌ছেরে মোর রাজা
আজকে শুধু বুক ছিঁড়ে তোর
প্রাণের বাঁশী বাজা
জ্বেলে দে তোর শতেক বাতি,
নিবিড় গন্ধে উদাস দ্যুতি
ঘরখানি তোর আঁচল পাতি
স্বপ্ন দিয়ে সাজা,
বাজাগো শাঁক বাজা—

খুলে দেরে জাল্‌না দুয়ার,
বাইরে এসে দাঁড়া;
প্রাণের সকল তন্ত্রী আজি
দিয়ে উঠুক সাড়া;
ধর তারে আজ উচু করে,
মুগ্ধ গীতির গন্ধ ভারে,
আকাশ পাতাল বন্ধ ছিঁড়ে,
বাজারে আজ বাজা
আস্‌ছেরে মোর রাজা॥

আর কেন তুই মরিস্‌ ঘুরে
ব্যর্থ আয়োজনে,
দাঁড়ারে আজ আনত মুখে
দাঁড়ারে মর্ম্মকোণে,
সজল আঁখি যুক্ত হাতে,
রাখ্‌রে ভুঁয়ে প্রাণটী পেতে!
চরণধূলির পরশ মাথে
যদিরে দেয় রাজা;
বাজাগো শাঁক বাজা॥

আয়রে ছুটে আয়রে আজি
সকল বন্ধন খুলে,
সপ্ত সুরের ছন্দেরে তোর
মর্ম্মখানি তুলে॥
আলোক ছুলে তালে তালে,
মরণ পাড়ি উঠল ঠেলে,
বাজা আজ তোর সকল সুরে
বাজারে শাঁক বাজা,
আজকে ওরে প্রাণের দ্বারে
এসেছে মোর রাজা॥

শ্রীনরেন্।

নমস্কার।

জীব,
নমঃ শিব—
অনন্ত—
সেই শান্ত
প্রাণ-কান্ত
সে যে সেতু
ব্রহ্ম-মিলনে,
সে যে হেতু
সর্ব্ব কারণে,—
নমি তাঁয়
কিবা সৃজনে
কিবা পালনে
কিবা নাশনে।
হে ঈশ.
মহেশ

পরমেশ,
তুমি—
জড়-জগতে
নদী-পর্ব্বতে—
বন-বিহঙ্গে
পশু-পতঙ্গে,
গতি
প্রাণ-পতি ;
তিন ভুবনে
মর-জীবনে
জীব-মরণে
তুমি গতি—
প্রাণপতি ;
পূজনে—
যেথা মতি

সাধনে	প্রাণ-পতি।
যেথা রতি	সুধু নিবেদন করি
নেহারি	ভগবান্
গতি	এই আত্মায়
তোমারি ;	দুটী রাঙ্গা পায়
ধ্যানে,	ধর হে,—
কিম্বা জ্ঞানে,	রাখ হে,—
সমাধির	তব শরণে—
চির মিলনে,—	চির-মিলনে
তোমাতেই	"আসি" মরণে—
হেরি গতি	

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে

নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।

"শান্তি"

গঙ্গাতটে।

মা—তোমার কোলে বসিয়া, তোমার ওই সুমধুর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে হৃদয় আনন্দে ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তোমার ওই জলতরঙ্গে, ওই তর-তরবাহী স্রোতে এমন মধুর সঙ্গীত কেমন করিয়া উত্থিত হইতেছে মা! জল হইতে শব্দ হয়—শব্দ পাওয়া যায়। কোথায় জল আর কোথায় শব্দ!—আচ্ছা, তবে কি শব্দ হইতেও জল পাওয়া যায়? মা গো তোমাদের লীলায় তাহাও সম্ভব। আহা! সেই একদিন— কি জানি সে কোন্ মন্বন্তর—দেবতাগণের হৃদয়ে একটি নমস্কারের ভাব তোমার ওই স্রোতের মত প্রবাহিত হইল—সেই স্রোতে এক সুমধুর সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। দেবগণ তন্ময়! হৃদয়নিহিত মধুর বাণী শুনিতে শুনিতে তদ্গত। সেই স্বর্গীয় সুরে সুর মিলাইয়া অমর কবির অমর সঙ্গীত জগতের সম্মুখে এক অভিনব চিত্র অঙ্কিত করিলেন—

"এবং স্তবাদিযুক্তানাং দেবানাং তত্রপার্ব্বতী।

স্নাতুমভ্যাযযৌ তোয়ে জাহ্নব্যা নৃপনন্দন॥"

জল আসিল না বটে কিন্তু যাঁহার স্থূল মূর্ত্তি এই জাহ্নবী-বারি সেই দেবী সশরীরে আবির্ভূতা! শুধু তাহাই নহে, সেই জগন্মাতা স্নানব্যপদেশে দেবগণের সম্মুখে দর্শন দিয়া ওই পুণ্যপ্রবাহিনী জাহ্নবী-বারির ইঙ্গিত করিলেন। সেই দর্শন, সেই কলুষনাশিনীর ইঙ্গিত আজ দেবগণের সুমধুর মল্লার রাগিণী-প্রসূত সুশীতল মেঘ-জল অপেক্ষাও আশ্চর্য্য ও আদরণীয়।

বল মা জাহ্নবি, জগন্মাতা পার্ব্বতী কেন গঙ্গাস্নানের ব্যপদেশে আবির্ভূতা হইলেন? আমরা কোটী কোটী পাতকী শত সহস্র বার এই গঙ্গাতটে আসিয়া শত সহস্র বার নমস্কার করিব—দেহের পাপ হৃদয়ের পাপ প্রক্ষালন করিব; কিন্তু সেই বিষ্ণুমায়া মহাদেবী যে মুহূর্ত্তমধ্যে শত শত গঙ্গা সৃষ্টি ও শত শত নাশ করিতে পারেন—সেই বিশ্বজননীর কেন এই গঙ্গাস্নানের বেশ?—কেন এই অভিসিঞ্চনের ইচ্ছাময়ী মূর্ত্তি? ইহার অর্থ কি মা?—এ কোন্ সাধনার ইঙ্গিত মা? তবে কি মা যখন আমাদের হৃদয়ে সেই শুম্ভ ও নিশুম্ভের অত্যাচার দেখা দেয়, যখন অপরের অধিকারকে অবজ্ঞা করিয়া আপনাকে স্থাপনা করিতে ইচ্ছা হয়—যখন ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করিয়া অন্যকে পরাভব করত সত্যের অপলাপ—ন্যায়ের অপলাপ করিতে ইচ্ছা হয়—যখন এই পঞ্চভৌতিক দেহে, দেবতাগণের অধিকার ও অবস্থান এবং কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা-সূত্রে গ্রথিত মহান্ সত্যকে নমস্কার না করিয়া শ্রীভগবানের মহিমাকে পদ-দলিত করিয়া আপনাকে কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া স্থাপন করিয়া নীতির মর্য্যাদা অতিক্রম করিবার পুনঃপুনঃ দুর্নিবার প্রবৃত্তি হৃদয়কে কলুষিত করে, তখন কি মা—কলুষনাশিনী গঙ্গে, তোমার স্মরণ—তোমার পবিত্র নাম, তোমার চৈতন্যময়ী ধ্যান, সেই পাপকে বিনষ্ট করিবে?—হৃদয়ের মধ্যে সেই পার্ব্বতী দেহ-কোষবিনির্গতা—আমাদের হৃদয়-কোষে বিরাজিতা কৌষিকী কালিকাকে আবাহন করিবে? আবার স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট জীবের হৃদয়মধ্যে পুনরায় ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে? আত্মজ্ঞানের পারিজাতপরিমল প্রবাহিত হইবে? মা গো প্রসন্না হও, হৃদয়ের পাপ মোচন কর, তোমার ওই পবিত্র সঙ্গীত রূপ মহা-মন্ত্রের মধ্য দিয়া শুনি—

"সচ্চিদানন্দময়ং শিবোঽহং শিবোঽহং"

এ দেহ আমি নই, এ দেহ আমারও নয়—ইহা পঞ্চভূতের। এই দেহাভিমানী জীব কর্ত্তাও নয়, ভোক্তাও নয়—সে জীব উপাসক হইতে পারেন, কিন্তু উপাস্য নয়। আমার কার্য্যে, আমার অস্তিত্বে সেই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াভিমানী দেবগণের অস্তিত্ব ও অধিকারই সূচিত হইতেছে। আর আত্মার মধ্যে ও সেই

সেই দেবগণের মধ্যে তোমার সলিলাভ্যন্তরস্থ মনোরম কুলু-কুলু-ধ্বনির ন্যায়—তোমার ওই শ্রোতব্য গভীর সঙ্গীতের ন্যায় এক শক্তি বিরাজমানা ; তিনিই মহা-যোগিনী বিষ্ণুমায়া। মা গো, একবার মুখ তুলিয়া চাও মা, "গঙ্গা গঙ্গা" বলিয়া এই ভূতের রাজ্য ছাড়িয়া স্বর্গরাজ্যে যাই ; আবার স্বর্গরাজ্য ছাড়িয়া সেই বিষ্ণু-পাদপদ্মে মিলাইয়া যাই। এই ধরাধাম সেই মহান্ ঋষিবাক্যের অনুসরণ করিয়া মুহুর্ম্মুহু অনন্তকোটী জীবকণ্ঠ-বিনিঃসৃত মধুর সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত হউক—

"গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াৎ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্ব-পাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥"

আ-মরিমরি! এই নির্জন গঙ্গা-বক্ষে কি মধুর জলকল্লোল! যতই শ্রবণ করি ততই প্রাণ কেমন উদাস হইয়া যায়! মনের চাঞ্চল্য ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়াভিমুখী বৃত্তি যেন এক মধুর ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া আসে। কেবল একটী সজাগ আনন্দানুভূতি যেন এই জগৎকে মর-লীলায় পরপারে যাইবার জন্য "কুল কুল কুল" করিয়া অতি আকুল ভাবে আহ্বান করে। সেই আকুলতার মধ্যে কি প্রেম! কি আনন্দ! অতি বড় পাপীও তন্ময় হইয়া যায়! সেই তন্ময়তার মধ্যে, সেই আনন্দময় বিশালতার অনুভূতির মধ্যে, সেই ভগবৎ-লীলার পুণ্যময়ী কাহিনী যেন সুস্পষ্ট দৃষ্ট ও অনুভূত হইতে লাগিল। বিষ্ণু-প্রকৃতির তিনটী ধারা—লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা ;—তাঁহারা বৈকুণ্ঠবিহারিণী ও বিষ্ণুহৃদয়-বাসিনী। তাঁহারা লীলা হেতু সেই এক পরমপুরুষ বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য ও অবলম্বন করিয়া চঞ্চলা হইলেন। এই পুণ্যতোয়া গঙ্গা সেই প্রেমলীলার শেষ পরিণতি—সাক্ষাৎ বিষ্ণুপ্রেমস্বরূপিণী। মাগো যখন তুমি ত্রিভুবনপাবন হেতু প্রবাহ-আকার ধারণ করিয়া নদীরূপে বিষ্ণু-চৈতন্য হইতে পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া অবতরণ করিলে সেই দিন ধরণীদেবী বিপন্না হইলেন—ভয়ে কম্পিতা হইলেন। মাগো, তোমার এক প্রান্তে বিষ্ণু-পাদপদ্মে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের লয়, অন্য প্রান্তে তোর রূপে সমুদয় সৃষ্টির লয় আর মধ্যে যে বেগ—যে শক্তি সেই অনন্ত শক্তিসম্পন্ন বেগ কে ধারণ করিবে মা? ধরণী?—সেত তোমার সম্মুখে তৃণবৎ! তখন আসমুদ্রবিস্তৃতা ধরণী ভয়-বিকম্পিত হৃদয়ে দেখিলেন সেই পরম দেবতার চৈতন্যময়ী যোগনী শক্তি বিদ্যুৎপ্রভা বিস্তার করিয়া অতি বেগে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হইতেছেন। মাগো, তোমার সেই পূর্ব্বকাহিনী তোমার এই পুণ্য তরঙ্গে, তরঙ্গে তরঙ্গে গীত হইতেছে। পৃথিবীকে রক্ষার জন্য—সৃষ্টিকে বিষ্ণু-পাদপদ্মে মিলাইবার জন্য

সেই মহাযোগী মহেশ্বর শিরোজটায় তোমাকে ধারণ করিয়া বিষ্ণু-পাদপদ্ম-স্পর্শানন্দে গদগদ হইয়া যে গালবাদ্য ও করতাল-বাদ্য করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, মা আজিও তোমার তরঙ্গে তাহা স্পষ্ট শ্রুত ও হৃদয়ে অনুভূত হইতেছে। সেই ভোলানাথের "কল কল কল" করতল-বাদ্য, "ছল ছল ছল" নৃত্যশব্দ তোমার তরঙ্গে শুনিতে পাইতেছি। মা, তোমার ওই গভীর সঙ্গীতের গভীরতম প্রদেশে আর একটী অবিচ্ছিন্ন সঙ্গিত শুনিতেছি। তাহাতে সেই আত্মহারা শঙ্করের 'ববম্ ববম্ বম্' গালবাদ্য ও মধ্যে 'ডুমু ডুমু ডুমু' ডমরু-ধ্বনি মিশিয়া প্রলয়জলে শ্রুত ওঙ্কার-ধ্বনির ন্যায় এক মনোরম অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি। ওঙ্কার-ধ্বনি ব্রহ্মার অহঙ্কার নাশ করিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু-পাদপদ্মে লইয়া গেল। মা, এও যে সেই ওঙ্কার-ধ্বনি। ও ধ্বনি হৃদয়ঙ্গম করিলে কাহার না মনের মলিনতা দূর হয়? মা শঙ্কর-মৌলী-বিহারিণী গঙ্গে! তোমার ওই মধুর মন্ত্রে দীক্ষিত কর, তোমার ন্যায় সমুদয় হৃদয় ঢালিয়া দিয়া আমার প্রাণারাধ্যের দিকে নিশিদিন—শয়নে স্বপনে কিম্বা জাগরণে—কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্য দিয়া—স্বধর্ম্ম পালনের মধ্য দিয়া—এই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মধ্য দিয়া ছুটিয়া যাই। মা বিষ্ণু-পাদপদ্মতরঙ্গিণী গঙ্গে! আমার হৃদয়ে এস মা, অসিয়া আমাকে আমার প্রাণের সাগরের সহিত মিশাইয়া দাও, মা তোমার ওই পুণ্যবারি স্পর্শ করিয়া আমরা মর্ত্ত্যবাসী আমি মুক্ত কণ্ঠে তোমার মহিমা প্রচাব করি—

"সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥"

—দিশেহারা—

ভাগবতের উপদেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ভাগবতের ভগবান্—স্বরূপাভাষ।

নমো নারায়ণ, বিদ্যাস্বরূপিণী ভগবতী চৈতন্যময়ী দেবী ও ব্যাসদেবপ্রমুখ ঋষিকুলকে কায়, ইন্দ্রিয়, মন ও ব্যক্ত আমিটি দ্বারা নমস্কার করিয়া ভগবানের কথা বলিতে আরম্ভ করিলাম।—তন্নোধীয়ো প্রচোদয়াৎ ওম্।

ভাগবৎ যাঁহাকে ভগবৎ শব্দে ইঙ্গিত করেন তিনি যে শুদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব পূর্ব্বেই আমরা তাহার আভাস পাইয়াছি। মোহনাশের পর ব্রহ্মা শিশুরূপ নাট্যের অবস্থিত ভগবানকে—

ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধবোধং ১০।১৩।৬১

অদ্বয় ব্রহ্ম স্বগতাদি ভেদ শূন্য ঘন এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন যে ভগবান্ সদাই পরং ও অনন্তং সর্ব্বদাই প্রকাশ ভাবের পরিসমাপ্তি ও অতিগ বলিয়া তিনি পর কারণ প্রকাশ ভাব তাঁহার একপাদে মাত্র অবস্থিত। ব্রহ্মা দেখিলেন যে প্রকাশের মধ্যেও সেই পরাভাব অনন্তরূপে অক্ষুণ্ণ রহিয়া যায়। পিতৃ, দেবতা প্রভৃতি ব্যক্তের খেলার ভিতর দিয়া তাঁহাকে ধরিতে গেলে তাঁহার খেলার বিলাস অনন্তভাবে উৎকীর্ণ হইয়া উঠে। Light on the Path নামক গ্রন্থ এই জন্য বলা হইল It ever recedes you may enter the Light but can never touch the flame অর্থাৎ ব্যক্ত অনুসন্ধানে তুমি যতই অগ্রসর হইবে ততই দেখিবে যে ভগবান্ আরো আগে সরিয়া আছেন, তুমি তাঁহার বরণীয় ভর্গ বা চৈতন্যের ভিতর প্রবেশ করিতে পার কিন্তু ব্যক্ত আমিটি লইয়া তাঁহার স্বরূপে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ব্যক্ত অনন্ততা লইয়া বালকেরাই ভগবানের পরিমাণ করিতে যায়। যাঁহার বিভূতি গণনা করা ব্রহ্মারও অসাধ্য—যিনি বিষ্টভ্যাহং ইদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতং জগৎ—তাঁহাকে দৃশ্যরূপে, বস্তুরূপে, বা সাধনার ফলরূপে ধরিতে যাওয়া বালস্বভাবেই শোভা পায়। তিনি অগাধবোধ। বোধ অর্থে consciousness বা স্বরূপ জ্ঞানশক্তি। তিনি এই বোধের ভিতরে অগাধ ভাব বা পরা গতি। The transcendence ofcon sciousness.

সে অনেক দিনের কথা ব্রহ্মা প্রকট হইয়া বাহ্য বিশেষভাবে—মধু ও কৈতবে—আবৃত হইয়া পদ্মে উপবিষ্ট থাকিয়া বাহিরে তাঁহাকে খুঁজিতে গিয়াছিলেন। অবশেষে যখন হতাশ হইয়া নিবৃত্ত হইলেন, তখন বিরূঢ়বোধঃ বা বোধের ভিতর বিশেষরূপে প্রবেশ করিয়া ভগবান্‌কে স্বহৃদয়ে স্বপ্রকাশ দেখিতে পাইলেন।

স্বরূপ ভাবে ভগবান্‌কে জানিতে চাহিলে বাহিরে খুঁজিলে চলিবে না—ইহা বুঝা গেল। স্বরূপের অবরোধ হইলে বাহিরের খেলা ও খেলার বিলাস বিভূতির মধ্যে তাঁহার পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু স্বরূপজ্ঞান না থাকিলে সেই সেই চিহ্নের বা লিঙ্গের মধ্যে কিরূপ জীব তাহার আভাস পাইবে!

সেই জন্য তত্ত্বের ভিতর দিয়া নিবৃত্তিপরায়ণ বুদ্ধির সাহায্যে সত্তাধির ভিতর যে আত্মচৈতন্যের প্রকাশ হয় তাহার অভ্যন্তরে নিমগ্ন হইয়া অনুসন্ধান করিতে পারিলে হয়ত তাঁহার দর্শন লাভ ঘটিতে পারে। ইহাই শাস্ত্রের ভাষা। তাই ভাগবত বলিলেন যে, যে ভা এই বিশ্বে সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপার সংঘটিত হয়, যাহাতে ভগবান্ তীর্য্যক্, নর, সুর, প্রভৃতি ছোট ছোট সত্তার প্রকাশ করত তাহাদের সৃষ্টি, স্থিতি ও মর্য্যাদা সংরক্ষণ করেন তাহা ভগবানের ধর্ম্ম বা অবয়বীভাব।

স এবেদং জগদ্ধাতা ভগবান্ ধর্ম্মরূপধৃক্।
পুষ্ণাতি স্থাপয়ন্ বিশ্বং তির্য্যঙ্নরসুরাদিভিঃ ॥৪২
ততঃ কালাগ্নিরুদ্রাত্মা যৎসৃষ্টমিদমাত্মনঃ।
সংনিযচ্ছতি তৎকালে ঘনানীকমিবানিলঃ ॥ ৪৩।

ভাগ।২।১০।—

যদি বল অবতারের খেলা—সেওত এই ধর্ম্মরূপী ভাবেরই অভিব্যক্তি! সেওত বাহিরের খেলা মায়ার বিলাস!! ধর্ম্মের গ্লানি না হইলেত হয় না! তবে খেলা লইয়া তাহার পরমভাবকে ভুলিয়া মূঢ় হও কেন? মানুষী তনুকে আমার ভগবান্ বলিয়া কল্পনা করিলেইত পরাভাব হয় না। মানুষী তনু বুদ্ধিতে তার-পরাভাবটী হারাইয়া যায় বলিয়াইত তিনি বলিলেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষী তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তঃ মম ভূতমহেশ্বরম্॥ গীতা।

সেই জন্যইত যথার্থ বৈষ্ণব, ভগবানের ধর্ম্মভাবের খেলা বা পাণ্ডবনাথের কুরুক্ষেত্রলীলাকে স্বরূপ বা বৃন্দাবনের তুলনায় বাহ্য বলিয়া মনে করেন তাইত ভাগবত বলিলেন যে জগৎ বা জীবের জন্মাদির কারণ রূপে বা জগদ্ব্যাপারের ভিতর প্রকাশিত কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বের শৃঙ্খলার ভিতর যে ভগবৎবুদ্ধি জন্মায় তাহা প্রকৃত ভাবে সেই পরম পুরুষের তাৎপর্য্য নহে। এবং শাস্ত্রও ভগবান্‌কে এভাবে দেখাইতে চাহেন না।

ইত্থং ভাবেন কথিতো ভগবান্ ভগবত্তমঃ।
নেত্থং ভাবেন হি পরং দ্রষ্টুমর্হন্তি সূরয়ঃ ॥৪৪।
নাস্য কর্ম্মাণি জন্মাদৌ পরস্যানুবিধীয়তে।
কর্ত্তৃত্বপ্রতিষেধার্থং মায়য়া রোপিতং হি তৎ ॥৪৫

ভাগ ২।১০।

কর্ত্তৃত্বাপবাদেন দশমস্ত শুদ্ধিমাহ—ইত্থং ভাবেন সষ্টৃত্যাদি ভাবেন। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ স সম্ভূতঃ সো অকাময়তঃ বহুস্যাং প্রজায়েতি শ্রুত্যাৎ কথিতঃ। সুরয়স্ত পরং কেবলমেবং রূপেণৈব দ্রষ্টুং নার্হন্তি। তৎকিম্? যতঃ অস্য বিশ্বস্য জন্মাদৌ কর্ম্মণি পরমেশ্বরস্য ইত্থং ভাব অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বং নাস্তি। শ্রুত্যাণি তাৎপর্য্যেণ ন প্রতিপাদ্যতে, কিন্তু অনুবিধিয়তে অনুবর্ণ্যতে। কিমর্থং? কর্ত্তৃত্ব-প্রতিষেধার্থম্। হি যতঃ মায়য়া তথারোপিতং প্রকাশিতং।— শ্রীধরঃ।

(ক্রমশঃ)

অকিঞ্চনের ধন।

প্রভো, কবে আমার এ অশান্ত চিত্ত একটু শান্ত হবে। কবে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করে হৃদয়ের ধুক্‌ধুকুনি সমস্ত মিটে যাবে? কবে সবচেয়ে তোমাকেই বড় বলে বুঝব? ধনের কথা মনে করে, কাল্পনিক খ্যাতি ও বিবিধ ভোগ-লালসার চিন্তায় মন তো বেশ নিবিষ্ট হয়ে ডুবে থাকতে পাবে; প্রভো, কেবল তোমার চিন্তাতেই মন কেন তেমন নিবিড় ভাবে ডুবে থাক্‌তে পারে না? মৃত আত্মীয় পুত্র বন্ধু যাদের কখন আর দেখিতে পাইব না, তাদের জন্য কত ব্যাকুলতা অনুভব করি, দিনরাতধরে কত চিন্তা তাদের জন্য করি, কত অশ্রু ফেলি, কিন্তু তোমার জন্য কই চোখে তো জল আসে না? তুমি যে ধ্রুব সত্য, তোমাকে যে নিশ্চিত পাওয়া যায় তবু তোমাকে না ভেবে, যাদের ভেবেও লাভ নেই, পেয়েও লাভ নেই, তাদেরই জন্য হাহাকাব করে মর্‌চি! একি বিড়ম্বনা! তোমাকে চাওয়া এ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠিল না! কবে সব ছেড়ে তোমাকে ধরে থাকতে পারব? কবে সব প্রিয় জিনিষের মধ্যে তুমি প্রিয়তম হবে? মনের এ অবস্থা হওয়া কি অসম্ভব? আমি যোগ্য নই, তা তো জানি; আমার পূর্ব্ব কর্ম্ম যে আমার মস্ত বাধা তাতো বেশ টের পাচ্চি। স্রোতের প্রবল টানে যেমন তৃণ ভেসে যায়, সেই রকম প্রবৃত্তির টানে ভেসে যাচ্চি! কই তাদের কবল থেকে মুক্তি লাভের জন্য চেষ্টা করিলাম কৈ? তুমি যে বলেছ "বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা:" ইন্দ্রিয়সংযম বিনা স্থিতপ্রজ্ঞতা সাধন অসম্ভব। তা আর এ জন্মে হলো কৈ? বিষয়লালসায় সুখ নেই, তা দেখচি, তবু লালসাকে

থামিয়ে রাখতে পারচি না, বিষয়ের সঙ্গ ত্যাগ করতে পারচি না। একি লোলুপতা, একি বিষয়তৃষ্ণা !! এ তৃষ্ণা কি মিটিবে না ? আমার উপায় কি হবে, আমি তাই ভাবচি ! যদি তুমি কোন উপায় না কর, আমি তো কোন উপায় দেখচি না ! জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম, তুমি অনেক উপায় দয়া করে জীবের জন্য বলেছ ; কিন্তু এ সকল পন্থায়ও অযোগ্য লোক আছে, তা কি তুমি ভেবে দেখনি ? তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করেছ নাথ ? আমার আশ্রয় সম্বলও নাই। এমন অসহায়, এমন নিরাশ্রয় আর কেউ আছে কি ? প্রভু, যে বড় দরিদ্র তারই জন্য তো ধনীর সদাব্রত-গৃহের দ্বার সদা উন্মুক্ত। আমার মত যারা দরিদ্র, যারা পথের কাঙ্গাল, তাদের জন্য একবার তোমার দ্বার উন্মুক্ত কর ! 'শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণ' যে তুমি, সে নাম একবার সার্থক কর।

ধন নাই, এজন্য দুঃখ হয় না , দেশব্যাপী খ্যাতি নাই, এর জন্যও ভাবি না ; লোকোত্তর প্রতিভা নাই, এজন্যও পরিতাপ আসে না ; শরীরটাও সুস্থ নয়, এর জন্যও কিছু ভাবি না ;--কিন্তু তোমাকে কেন ভালবাসি না, তোমার প্রতি সে অগাধ বিশ্বাস হয় না কেন, এইজন্য আমার চোক ফেটে জল আসে, আমার উপর আমার ভীষণ কোপ হয়। সব হতে আমাকে বঞ্চিত করেছ, সে বেশ ! কিন্তু তোমার আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হতে যে চাই না। আমার কিছু যে নেই, এ ব্যবস্থা তো ভালই হয়েছে, কিন্তু মন কেন তা বুঝে না ? তুমি যা দাও নি, সেজন্য তার খেদ কেন হবে ?

অকিঞ্চনেরই ধন যে তুমি। আমাকে যে অকিঞ্চন করেছ, সে তো আমার পরম সৌভাগ্য, তোমাকে যে পাব তার পথ করে রেখেছ। কিন্তু হায়, মন আমার এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারল না ! সে তোমার ব্যবস্থাকে অমান্য করে আপনাকে আপনি বঞ্চিত করিল ! ভারতলক্ষ্মী কুন্তী বলেছিলেন "সম্পদে মঙ্গল নাই, কারণ কৌলীন্য, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যাবত্তা ও সৌভাগ্যমদে মত্ত হইয়া, মানব তোমার নামোচ্চারণ করিতেও পারে না। হরি ! তুমি অকিঞ্চনের ধন ; যাহার কিছু নাই তুমি তাহাকেই দর্শন দাও"। হায় ! হায় !! সেই অকিঞ্চন করে তুমি আমাকে পাঠালে, আমি তাতেও তোমাকে পেলাম না। তোমার কৃপা বুঝতে পারলাম না ! তাই রত্ন ফেলে দিয়ে কাচ ভিক্ষা করে বেড়াচ্চি ! দিন রাত কি চাহিতেছি, কি ভাবিতেছি ! তোমাকে তো চাহি না ! তুমি ধন্য, তুমি পরম দয়ালু, আমি তোমাকে ভুলেও ভাবি না, কিন্তু তুমি আমাকে স্মরণ করিতে ছাড় না !

কতবার যাই ভুলিয়া তোমায়
　　তুমি ত ভুলিতে দাও না,
শতবার করি অপরাধ পদে
　　গায়েতে তবু ত মাখ না।
আমি যত চাহি ছাড়িতে তোমায়
　　তুমি ত ছাড়িতে চাও না,
নয়ন হইতে আড়াল করিতে
　　কেন প্রভু মোরে পার না?

কবে আমার ভ্রম যাবে? কবে সব ফেলে তোমাকে চাওয়া হবে? কবে সর্ব্বস্ব যে তুমি তোমারি জন্য প্রাণের মধ্যে তীক্ষ্ণ বেদনা ফুটিয়া উঠিবে? আমি তো আমার মনকে কিছুতেই বুঝাতে পারলাম না! নিরুপায়ের উপায় তুমি, একবার এস, তোমার কৃপা-কটাক্ষপাতে হৃদয়ের সব ভার লঘু হয়ে যাক্। আমাকে বিষয় থেকে আকর্ষণ করে রাখ, তোমার "কৃষ্ণ" নাম সার্থক হ'ক! তুমি আমার মনোহরণ করিয়া লও, হরিনামে চিত্ত বিগলিত হইয়া যাক! জগজন-মনোমোহন, সকলের সর্ব্বস্বধন —আমারও তুমি তাই হও, তোমার "রাম" নামের জয় হ'ক! সব আশ্রয় ঘুচে গিয়ে তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয় হয়ে থাক! তুমি যে জীবের পরম সম্পদ্, তুমি যে জীবের পরমগতি, এ কথা তুমিই আমার মনে অঙ্কিত করে দাও! আমাকে অকিঞ্চন কর নাথ, যথার্থ কাঙ্গাল কর নাথ! এর ব্যর্থ অহঙ্কার ও অভিমান-মদ আমার আর ভাল লাগে না! আমাকে তোমার পাদপদ্মের ভিখারী কর, আমি আর কিছুই চাহি না! একি ব্যর্থ মোহ, একি মিথ্যা অভিমান!! আমি দীনের দীন, পথের কাঙ্গাল, কড়ার ভিখারী, আমি নিজেকে রাজা মনে করে বসে আছি! ওরে মূর্খ এক মুহূর্ত্ত যে স্থির হতে পারে না, যে বাসনার ঘূর্ণাবর্ত্তে কেবলি ঘুরপাক খাচ্চে, তার চেয়ে দরিদ্র,—তার চেয়ে অসহায় আর কে আছে? হায়! হায়! এ কথা তুমি বুঝতে পার না! তুমি কোন্ মুখে লোকের কাছে মান ভিক্ষা করতে যাও? ওরে কড়ার ভিখারী, ওরে মহা দরিদ্র, তুই আপনার মনের নেশায় ভোর! তোর অবস্থার কথা একবার ভেবে দেখলি না।

দয়াময়! করুণানিদান! এ যে মত্তপের মত উন্মত্ত, ইহাকে তুমি সংযত কর! তুমি না থামাইলে কে আর ইহাকে সংযত করিবে? প্রভো! যে তোমাকে 'প্রিয়' মনে করে, তার প্রিয় বস্তু বজায় থাকে, যে অন্য বস্তুকে প্রিয়

মনে করে, তাহার প্রিয় বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আমার তাহাই হ'ক! আমি যেন কিছুরই জন্য, কাহারও জন্য, আর ব্যাকুলতা প্রকাশ না করি! আমার সমস্ত ব্যাকুলতা প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় শত লোলজিহ্বার মত, তোমার চরণপানে প্রসারিত হউক। আমাকে নির্য্যাতন কর, আমাকে অপমান কর, আমার সমস্ত কাড়িয়া লও। সব আশা মোর ভাঙ্গিয়া পড়ুক, কেবল তোমার আশা যেন জাগিয়া থাকে।

প্রভু, সকলেরই কেন এই হ'ক না? সকল লোকেই তো তোমাকে না পেয়ে বিষের জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরচে! তুমি যে অমৃত সুধা, তুমি নাই তাই দাউ দাউ করে সকলের হৃদয়ে আমার মতনই আগুন জ্বলচে! প্রভু নেবাও, সে আগুন তুমি নেবাও! আর কাকে বলব? কার সামর্থ্য আছে এ কথা শুনতে! তুমি সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বশক্তিমান্, তুমি যদি দয়া না কর, তবে কার কাছে আর দাঁড়াব? তুমি বুঝিয়ে দাও যে

'ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব,
ত্বমেব বন্ধুঃ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব,
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব !!

তুমি মাতা, তুমি পিতা
সখা, বন্ধু সব তুমি,
তুমি বিদ্যা, তুমি ধন,
তুমি মোর অন্তর্য্যামী।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন মোর
হৃদয়ের রত্নহার,
তোমাকে বাসিব ভাল,
দাও এই অধিকার।
আর কিছু নাহি চাই,
শুধু পদে ভিক্ষা এই
দিবানিশি যেন তব
পদেতে প্রণত হই॥

ভূপেন্দ্রনাথ—

প্রার্থনা।

সব হ'তে মোরে বঞ্চিত করে
তোমার চরণে রেখ গো,
সব আশা প্রভু ভেঙ্গে যাক্ মোর
তব আশা যেন রহে গো ॥
সকল গর্ব্ব লুটাইয়া দাও
তোমার চরণ ধূলিতে,
অজ্ঞান মোহ সুপ্তি হইতে
তুলে লহ তব জ্যোতিতে ॥
অন্ধ নয়নে দেখাও তোমার
দীপ্ত মুখচন্দ্রমা,
বধির কর্ণ শুনুক তোমার
মোহন মধুর বন্দনা ॥
শিহরিত হ'ক অঙ্গ আমার
তোমার মধুর পরশে,
হৃদয় আমার সুন্দর তানে
গাহুক আকুল হরষে ॥
পাগলের মত ছুটে কেন যাই
তোমার চরণ হইতে,
জোর করে তুমি রাখ তারে ধরে
দিও না ছুটিয়া চলিতে ॥
রোগ শোক হ'তে দুষ্কৃতি হ'তে
আবরিয়া মোরে রেখেছ,
গ্লানি মোর, তব চরণ জ্যোতিতে
ধুইয়ে মুছায়ে দিয়েছ।
সার্থক আজি জীবন আমার
তোমার পূর্ণপ্রেমে গো,

তুমি যে আমার কত আপনার
জানি তা যে আমি জানি গো।

ভূপেন্দ্রনাথ—

ভালবাসা।

আমরা অনেক জিনিষকেই পছন্দ করি, ভালবাসি, সেটা আমার হ'ক, এ ইচ্ছা প্রকাশও করি, কিন্তু এই যে বস্তুটির প্রতি লোভ—ইহা আসক্তি হইলেও ইহা কথনই প্রেমশব্দবাচ্য নহে। মনে কর, সরোবরবক্ষে সুন্দর কমল ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে একটি মৃদু অথচ স্নিগ্ধকর গন্ধ গন্ধবহের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়গ্রামকে তৃপ্তিদান করিতেছে! এই যে ইহার নয়ন-জুড়ানো শোভা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর সুগন্ধলাভের জন্য মনের যে লালসা, তাহা পদ্মের প্রতি ঠিক সাত্বিক ভালবাসা নয়! বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগে যে আকর্ষণ বা তৃপ্তি অনুভব করি, তাহা রাজসিক! পুত্রের সৌভাগ্যে যে সুখানুভব করি, বা দয়িতার স্পর্শে যে আনন্দ অনুভব করি, তাহাও ইন্দ্রিয় তৃপ্তিমাত্র। খ্যাতি অর্জ্জন, অর্থস্থান প্রীতিও ঐ শ্রেণীর প্রীতি। ইহার উপর না উঠিলে সাত্বিক প্রীতির উদয় হয় না! সাত্বিকী প্রীতি তখনই হয়, যখন উহাতে ইন্দ্রিয়বৃত্তির লালসা চরিতার্থ কোন ব্যাকুলতা থাকে না, পরন্তু যাহাকে দেখিয়া যাহা শুনিলে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় প্রীতির উদয় হয়, এক আত্মহারা কামগন্ধহীন আনন্দ হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, আমার বলিতে যাহা কিছু সমস্তই যখন কাহারও চরণতলে লুটাইয়া দিতে ইচ্ছা করে—তাহাই আসল ভালবাসা, নিখুঁত প্রেম! 'সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা'! ইহাকে সেবা করিয়া, ইহাকে ভালবাসিয়া কিছু যে লাভ করিব, এরূপ আশা যখন হৃদয়ে কণামাত্রও থাকে না, না সেবা করিয়া না ভালবাসিয়া থাকিতে পারি না, তাই ভালবাসি—এই যে বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মিকা সহজ ও সরল ভাব তাহাই প্রকৃত "ভালবাসা"। সরোবরে পদ্মটি ফুটিয়া আছে, তাহার শোভা ও গন্ধ তো ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিবেই, কিন্তু যাহার আকর্ষণ ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিমাত্রেই পর্য্যবসিত নহে, সেই ফুলের গন্ধ শোভায় যেন কাহারও স্মৃতিকে জাগাইয়া দেয় এবং তাঁহার চরণপদ্মের জন্য মনের ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠে। এ ব্যাকুলতা কিন্তু সে বস্তুকে পাইবার জন্য নহে, শুধু

পদ্মের শোভন দৃশ্য ও গন্ধের মধ্যেও ব্যাকুলতা আবদ্ধ নহে, পদ্মের প্রতি তাহার অনুরাগ এই জন্য যে সে তাঁহার স্মৃতিকে জাগাইয়া দেয়। সুতরাং এই যে পদ্মের প্রতি অনুরাগ ইহাই সাত্ত্বিক অনুরাগ। যে ভালবাসা ইন্দ্রিয়দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া আর অগ্রসর হইতে পারে না, তাহা মোহকরী রাজসী প্রীতি। ইহাতে প্রেমের স্ফুরণ হয় না! প্রেম যে আপনহারা—সেখানে অহংএর মাথা উঁচু করিবার জো নাই! কিছু পুঁজি করিয়া কিছু লাভ করিয়া কাহাকেও আপনার করিয়া প্রেমের বিকাশ হয় না, আপনাকে লুটাইয়া দিয়া, বিস্মৃত হইয়াই প্রেমের পূর্ণতা! যেখানে অহং আছে, সেখানে ভোগেচ্ছা আছে, সুতরাং বিশুদ্ধ প্রেম সেখানে জন্মিতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের লালসা এবং তাহার চরিতার্থতার আবেগ সেখানে প্রবল, সেখানে পবিত্র প্রেমের উদ্ভব অসম্ভব! নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তির ইচ্ছা প্রেম নহে, উহা প্রেমের বিকার মাত্র। সুতরাং সাধারণতঃ নরনারীর মধ্যে যে মিলনেচ্ছা, তাহা প্রেম নামে আখ্যাত হইতে পারে না। ধন-কামীর ধনের প্রতি যে উৎকট লালসা, তাহাও ঐ শ্রেণীর নীচ ইন্দ্রিয়লালসামাত্র—তাহা প্রেম নহে! কামীর যে কামিনীর প্রতি আসক্তি তাহা দেহসম্বন্ধ লইয়া, তাহা কখন দেহকে ছাড়াইয়া উঠে না! যদি অচিন্তনীয় ভাগ্যবশে ভালবাসা দেহ সম্বন্ধে ছাড়াইয়া উঠে, নিজেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা আদৌ না হয়, অথচ পরস্পরের প্রতি যে একান্ত অনুরাগ, নিত্য নূতন ও বর্দ্ধমান বেগে বাড়িয়া উঠে এবং কোন সীমাকে না পায়—তবে তাহাই আসল প্রেম নামে অভিহিত হইতে পারে! ইহাই আত্মার সহিত আত্মায়, চেতনের সহিত চেতনের মিলনেচ্ছা—ইহাই বিশুদ্ধ প্রীতি, সাত্ত্বিকী ভালবাসা বা যথার্থ প্রেম!

প্রীতি ভালবাসা ও প্রেম স্বরূপতঃ সবই এক, তবে স্থানভেদে ও গুরুত্ব ভেদে নামের ভিন্নতা মাত্র।

জন্মজন্মার্জিত বহু তপস্যার ফলে আমাদের হৃদ্‌রোগ উন্মূলিত হইয়া ভগদ্ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়। তিনি যে "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ শ্রেয়ো বিত্তাৎ"—এ আমরা বহু সৌভাগ্যে বুঝিতে পারি! কবে সে সৌভাগ্য আসিবে জানি না, যখন সকলকে ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহাকে প্রিয়তম প্রাণসখা বলিয়া হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিব। কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি যখন আমাদের অনুরাগের সঞ্চার হয়, তখন তাহাকে দেখিতে, তাহার কথা শুনিতে, তাহাকে স্পর্শ করিতে মনের একটি প্রবল আগ্রহ উপস্থিত হয়—ইহারই নাম ভালবাসা, বৈষ্ণবেরা ইহাকে অনুরাগ বলেন! পরে সেই আগ্রহ বাড়িতে বাড়িতে এতদূরে গিয়া পৌঁছে, যে

তাহাকে না পাইলে আর আমার চলে না, সমস্তই যেন শূন্য বোধ হয়—মনের এই অত্যধিক অনুরাগকেই আসক্তি বলে! পরে যখন এই ভালবাসা জমাট বাঁধিয়া যায়, একটি অনন্তস্পর্শী আকুলতা আসিয়া মনঃপ্রাণকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, যখন নিজের উপর আর নিজের শাসন থাকে না, সমস্ত বিশ্বভুবনে প্রেমময়ের স্পর্শ অনুভূত হইতে থাকে—তখন আনন্দবিহ্বল ভক্ত গাহিয়া উঠেন—

"কি কহব রে সখি আনন্দ ওর
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেয়
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল ॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই ॥
শীতের ওড়নী পিয়া গীরিষের বা
বরিষায় ছত্র পিয়া দরিয়ায় না ॥

প্রেমিক ভক্ত ক্ষণিকের বিরহও আর সহ্য করিতে পারেন না! নিত্য নব হরষে তাঁহার হৃদয় অধীর উন্মত্ত! তিনি ভগবানকে সমস্ত সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত! আর কিছুরই জন্য তাঁর চিত্ত পড়িয়া থাকে না, জগতের ধন-জন-মান-প্রতিষ্ঠা কিছুই আর তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না! তিনি তখন প্রেমময়কে পাইয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন! "ওহে নাথ কি বলিব আর? তনু মন ধন তুমি পরাণ আমার ॥ গরবিত ভয়ে দিনু তিনাঞ্জলি দান! জাতি কুল শীল তুমি লাজ অভিমান! তুমি সে ভূষণ মোর হিয়ে মণিহার তোমা বিনু এই মোর দেহ লাগে ভার। তোমার চরণ লাগি সব তেয়াগিনু। শীতল চরণ পাঞা শরণ লইনু ॥ একুলে ওকুলে মুঞি দিনু তিনাঞ্জলি। রাখিছ চরণে মোরে আপনার বলি ॥"

ভাগবতেও গোপাঙ্গনাদের উক্তি এই :—

"চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু।
যন্নির্ব্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্,
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা।"

ভাবুকের এই প্রগাঢ় ভাব, এই অগাধ অনুরাগকেই প্রেম বলে! অবশ্য এ ভাব সকলের প্রথমেই আসে না। গোপীদিগেরও আসে নাই! দীর্ঘ দিন

সকামভাবে কৃষ্ণোপাসনা করিতে করিতে তবে মনে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের সঞ্চার হয়, কামাত্মক রজোগুণ আপনাপনি বিলুপ্ত হইতে থাকে, এইরূপে ধীরে ধীরে হৃদ্‌রোগ নষ্ট হয়, তৎপরে অকারণ অহেতুক ভগবৎপ্রীতির সঞ্চার হয়! জীবনে প্রেমের জোয়ার আসে! নবযৌবনের উদ্দামে যুবতীর যেমন কান্তানুরাগের সঞ্চার হয়, সেইরূপ এক অনির্ব্বচনীয় বিশুদ্ধ আকাঙ্ক্ষায় প্রবল আবেগে অতীন্দ্রিয় অব্যক্ত পরমাত্মার প্রতি জীবের পবল আকর্ষণ জন্মে। সে প্রেমের কূলভাঙ্গা ভীষণ স্রোতে তাহার ধন-জন মান প্রতিষ্ঠার গর্ব্ব ভাসিয়া যায়—দেহ জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়। সে তখন সব ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার মিলনপথের অভিসারিণী হয়। এইরূপে তাহার জন্ম জীবন সঞ্চার হয়॥

সাহিত্যসম্মেলন।

সভাপতির অভিভাষণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তাঁহাদের মন্তব্যের তাৎপর্য্য এই যে "যেমন প্রবল রঘুবংশ বিদ্যমান থাকিতে জানকীকে হরণ করা কেবল রাবণেরই সাধ্য, সেইরূপ মধুর রঘুবংশ কাব্য বিদ্যমান থাকিতে জানকীহরণ কাব্য বিরচন করা কেবল কুমারদাসেরই যোগ্য।"

তাঁহাদের শেষপর্ণ মন্তব্য শ্রবণ করিয়া বিক্রমাদিত্য বিষণ্ণ হইলেন। তিনি লঙ্কেশ্বরকে কবিসম্মান প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া, তাঁহাকে যথোচিত রাজসম্মান পদান করিবার জন্য জানকীহরণ কাব্য একটী হস্তীর পৃষ্ঠে রাখিয়া নগরপ্রদক্ষিণ করাইলেন। যখন হস্তী ঐ কাব্য বহন করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতেছিল, তখন কবি কালিদাস উহা দেখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁহাকে উহা দেখান হইল। তিনি জানকীহরণ কাব্যের পথম শ্লোক পাঠ করিয়াই হর্ষোৎফুল্ল হইলেন। প্রথম শ্লোকটী এই :—

আসীদবন্ধ্যামতিভোগভাবাদ্
দিবোঽবতীর্ণা নগরীব দিব্যা।
ক্ষত্রানলস্থানশমী সমৃদ্ধ্যা
পুরামযোধ্যেতি পুরী পরার্ধ্যা॥

(জানকীহরণ ১।১)।

"নগরসমূহের মধ্যে অযোধ্যাপুরী শ্রেষ্ঠ। অগ্নি যেমন শমীবৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া থাকে, ক্ষত্রিয় তেজঃ সেইরূপ এই নগরীকে আশ্রয় করিয়া আছে। এই দিব্য নগরী বহুভোগ্য দ্রব্যের ভারেই যেন স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে।"

জানকীহরণকাব্য পাঠ করিয়া কালিদাস এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি স্বয়ং ঐ কাব্য মস্তকে করিয়া হস্তীর সঙ্গে সঙ্গে নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বাগ্দেবীর বরেণ্য পুত্র কালিদাস লঙ্কেশ্বরকে সাধারণের সমক্ষে কবি-সম্মান প্রদান করিয়াছেন, এই সংবাদ অনতিবিলম্বে লঙ্কায় পঁহুছিল। রাজা কুমারদাস কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক কালিদাসকে লঙ্কায় * আহ্বান করিলেন। কালিদাস অনেক দিন লঙ্কায় অবস্থান করিয়া ৫২৪ খৃঃ অব্দে মাতর নগরে কালিন্দী নদী ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গমস্থলে দেহত্যাগ করেন। রাজা কুমার-দাস আন্তরিক শ্রদ্ধাভরে কালিদাসের চিতাভূমিতে আত্মবিসর্জ্জন করেন। এই কিংবদন্তী লঙ্কায় সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত পরাক্রমবাহুচরিত্রনামক সিংহলী পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত কবিতা উদ্ধৃত হইল :—

বেহের দসটক্ পুরা করবা দস অটক্ মহ বব্ বন্দী।
বসর একদা বিসব্ অবিসেস্ মহগুবম্ তে মঙ্গল যেন্দী॥
অজর কিবিয়র পিণিন্ জনকীহরণ অাঁ মহকব্ কন্দী।
কুমরদস্ রদ কালিদস্ নম্ কিবিন্দু হট সিয় দিব্ পিন্দী॥

(পরাক্রমবাহুচরিত্র)।

"অষ্টাদশ বিহার ও অষ্টাদশ বৃহৎ বাপী নির্ম্মাণ করিয়া একই বৎসরে যিনি বিবাহ, অভিষেক ও শ্রমণ কর্ম্ম এই ত্রিবিধ মঙ্গল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই আচার্য্য কবিকার পুণ্যের ফলে জানকীহরণ মহাকাব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। রাজা কুমারদাস কালিদাসনামক কবীন্দ্রের নিমিত্ত স্বকীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"

উল্লিখিত শ্লোকে যে সকল সিংহলী শব্দ আছে তাহার অর্থ নিম্নে প্রদর্শন করিলাম। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে সিংহলী ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ মাত্র।

---

* লঙ্কায় বিদ্যালঙ্কার বিহারের অধ্যক্ষ ধর্ম্মারামনামক মহাস্থবির জানকীহরণ কাব্য প্রকাশিত করিয়াছেন। ৺হরিদাস শাস্ত্রী মহাশয়ও ইহার সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন।

সিংহলী শব্দ	অর্থ
বেহের	বিহার
দস	দশ
অটক্	আট
পুরা	পূর্ণ
করবা	করিয়া
দস	দশ
অটক্	আট
মহ	মহা
বব্	বাপী
বন্দী	বাঁধিয়াছিল
বসর	বৎসর
একদা	একদা
বিসব্	বিবাহ
অবিসেস্	অভিষেক
মহণুবম্	শ্রবণকর্ম্ম
তে	তিন
মগুল	মঙ্গল
যেন্দী	যুক্ত
অজর	আচার্য্য
কবিয়র	কবিকার
পিণিন্	পুণ্যের
জনকী	জানকী
হরণ	হরণ
র্দা	আদি
মহ	মহা
কব্	কাব্য
কন্দী	করিয়াছিল
কুমরদস্	কুমারদাস
রদ	রাজা

কালিদস্	কালিদাস
নম্	নাম
কিবিন্দু	কবীন্দ্র
হট	অর্থ
সিয়	স্বীয়
দিব্	জীবন
পিন্দী	পূজিল, উৎসর্গ করিল।

বালি, সুমাত্রা ও যবদ্বীপে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচার ছিল।

যবদ্বীপে সংস্কৃত। রামায়ণ, মহাভারত, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বহু সংস্কৃত গ্রন্থ এখনও যবদ্বীপে প্রাচীন সাহিত্যরূপে পঠিত হইয়া থাকে। ঐ দ্বীপে রামায়ণের নাম "রাম কবি," মহাভারতের নাম "ব্রাতযুধ" বা ভারতযুদ্ধ এবং নীতিশাস্ত্রের নাম "নীতিশাস্ত্র কবি"। ব্রাতযুধ বা ভারত যুদ্ধ ৭১৯ শ্লোকে পরিসমাপ্ত। ইহাতে দ্বাদশ প্রকার ছন্দের ব্যবহার আছে। এই গ্রন্থ রোমান্ অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপে বসন্ততিলক ছন্দে লিখিত একটী শ্লোক উহা হইতে উদ্ধৃত করিলাম :—

অঙ্গ ক্রোধ কৃষ্ণ মংগদেক্ স করিং পহ্মন্
মোংগাগিং (ন) তব্ সির বিবুং কদি কাল মর্চ্চুঃ।
মিন্ তো ন কন্ ক্রম নিরন্ তুহু বিষ্ণুমূর্ত্তিঃ
লীলা ত্রিবিক্রম মহাবাকিকং ত্রিলোকে ॥ ৭৫ ॥ (ব্রাতযুধ)

"কৃষ্ণ ক্রোধে অভিভূত হইয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কম্পিত হইল। তিনি ক্ষণকাল মূর্ত্তিমান্ কলিকালের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন। তিনি আর ধীরে ধীরে কথা বলিলেন না, উচ্চৈঃ পাদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি যথার্থই বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, বোধ হইল যেন তিনি ত্রিলোক অধিকার করিয়া ত্রিবিক্রম লীলা প্রকাশ করিতেছেন।"

সংস্কৃত ভাষা বালি, সুমাত্রা, যাবা প্রভৃতি দ্বীপে প্রবেশ করিবার পর কত যুগ চলিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব ও ভাষাবিপ্লবে ঐ সকল দ্বীপের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও রামকবিতা ও ভারতযুদ্ধ লোকস্মৃতির অতীত হয় নাই। এখনও আরবিক, পারস্য ও ওলন্দাজ ভাষার মধ্য দিয়া সংস্কৃতের দুই চারিটী ধ্বনি বিকৃতভাবে আমাদিগের নিকট পঁহুছিয়াছে

এবং এখনও আমরা মহাসমুদ্রের পরপারে দীর্ঘপ্রবাসগত ভ্রাতৃবৃন্দের সন্ধান পাইতেছি।

খ্রীষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে আরবগণ সংস্কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন, এবং বাগ্‌দাদের খালিফগণ ভারত হইতে অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতায় জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত আরবিক ভাষায় অনূদিত করেন। সংস্কৃত বীজগণিত এবং পাটীগণিতের গ্রন্থও আরবিব ভাষায় অনূদিত হয় এবং খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে উহা আরব হইতে ইউরোপে প্রবেশ করে। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে সুশ্রুত ও চরক নামধয়ে দুইখানি সংস্কৃত চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ আরবিক ভাষায় অনুবাদিত হয়। সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের গ্রন্থও আরবিক এবং পারসীক ভাষায় প্রাবিষ্ট হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আল্‌বিরুণীনামক একজন মুসলমান লেখক পতঞ্জলির যোগসূত্র ও কপিলের সাংখ্যদর্শন আরবিক ভাষায় অনুবাদিত করেন। সাংখ্য ও যোগের গ্রন্থ এসিয়া মাইনরে প্রবিষ্ট হইয়া Gnosticism এবং sufi দর্শনের পরিপুষ্টি করিয়াছিল। পূর্ব্বকালে ভগবদ্গীতা ও উপনিষদ্ পারসীক ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। উহা পাঠ করিয়া এখনও অনেকে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন।

বাগ্‌দাদে সংস্কৃতের আদর।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইউরোপে প্রবেশ করে। ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের প্ররোচনায় চার্লস্ উইল্‌কিন্‌স্ বারাণসীতে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়াম্ জোন্স কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ এসিয়াটিক সোসাইটী অব্ বেঙ্গল নামক সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে অভিজ্ঞান শকুন্তলের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তদনন্তর মনুসংহিতা ও ঋতুসংহার মুদ্রিত হয়। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে আলেক্‌জাণ্ডার হ্যামিল্‌টন্‌নামক একজন ইংরেজ ফরাসীদেশে কারারুদ্ধ হইয়া অবস্থান কালে কতিপয় ফরাসী ও স্লিগেল্ প্রভৃতি কতিপয় জার্ম্মান পণ্ডিতকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেন। তাহার পর ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, অষ্ট্রীয়া, ফ্রান্‌স, রুসিয়া, ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স প্রভৃতি দেশে সংস্কৃত ভাষার বহুল প্রচার হয়। অধুনা অক্‌সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন, বার্লিন্, ভিয়েনা, পেট্রোগ্রাড, হার্ব্বার্ড প্রভৃতি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্য পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইউরোপে সংস্কৃতের গৌরব।

সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক্ মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য অনেক সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত হইতে বুঝা গেল সংস্কৃত ভাষা এক সময়ে ভাষা-সমূহের মধ্যে সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিল। যদিও ইহার বিজয়তুরঙ্গের গতি কোথায়ও রুদ্ধ হয় নাই, তথাপি সংস্কৃত ভাষার কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না—একথা বলিতে পারি না। যখন সংস্কৃতের প্রসার হইতে থাকে, তখন এক দিকে তৎকাল-প্রচলিত দেশজ বা কথিত ভাষাসমূহের সহিত উহার বিরোধ ও অপর দিকে পালি, প্রাকৃত এবং গাথা নামধেয় তিনটী লিখিত ভাষা উহার প্রবল প্রতিপক্ষ হইয়াছিল।

পালি ভাষার প্রবর্ত্তক গৌতম বুদ্ধ ও প্রাকৃত ভাষার প্রবর্ত্তক মহাবীরস্বামী বৌদ্ধ পালি সাহিত্য। উভয়েই খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহারা যথা-ক্রমে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পালি ও প্রাকৃত ভাষার প্রচার-সাধন করেন। পালিগ্রন্থে একটী প্রবাদ উল্লিখিত আছে যে গৌতম বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—"দেখ, জম্বুদ্বীপে দামিল (তামিল), অন্ধক (তেলেগু) প্রভৃতি যে অষ্টাদশ ভাষা প্রচলিত আছে, কালসহকারে উহারা সকলেই রূপান্তরিত হইয়া যাইবে সুতরাং ঐ সকল ভাষায় নিবদ্ধ আমার উপদেশ-মালাও বিলয়প্রাপ্ত হইবে; তোমাদের মধ্যে এমন কি কেহ আছেন যিনি কোমল অথচ অপরিবর্ত্তনীয় ভাষাবিশেষের উদ্ভাবন করিয়া উহাতে আমার উপদেশাবলী নিবদ্ধ করিতে পারেন?" বুদ্ধদেবের ইঙ্গিতে মহাকাত্যায়ন নামক তাঁহার অন্যতম প্রধান শিষ্য প্রথম পালিব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, এবং ঐ ব্যাকরণের নিয়মে পরিচালিত পালিভাষায় বুদ্ধের উপদেশমালা প্রচারিত হয়। এই পালি-ভাষার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। বুদ্ধগয়ায় ষড়্‌বর্ষ তপস্যার পর যখন বুদ্ধদেব বুঝিলেন যে তৃষ্ণাই সংসারবন্ধনের কারণ, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—

অনেক জাতি সংসারং
সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো
দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং॥

গহকারক দিট্‌ঠোহসি
পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা
গহকূটং বিসংকিতং।
বিসংখারগতং চিত্তং
তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা॥ (ধম্মপদ জরাবগ্‌গ ৮—৯)।

"আমি এই দেহরূপ গৃহের নির্ম্মাণকারিণী তৃষ্ণার অন্বেষণ করিতে করিতে অনেক বার পৃথিবীতে পরিভ্রমণ ও নানা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি। হায়, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করা কি দুঃখময়! হে গৃহনির্ম্মাত্রি, আজ আমি তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি। তুমি পুনরায় আর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। গৃহের স্তম্ভ ও উহার পার্শ্বদণ্ডনিচয় আমি সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন করিয়াছি। আমার বাসনা-বিমুক্ত-চিত্ত তৃষ্ণার ক্ষয়সাধন করিয়াছে।"

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাইলাম সংস্কৃত "গৃহ" শব্দের স্থলে পালিতে "গহ", "দৃষ্ট" স্থলে "দিট্‌ঠ", "করিষ্যসি" স্থলে "কাহসি", "সর্ব্ব" স্থলে "সব্ব", "সংস্কার" স্থলে "সংখার" এবং "তৃষ্ণা" স্থলে "তণ্‌হা" ইত্যাদি কোমল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

বুদ্ধদেব যেমন সংস্কৃত ভাষায় সংযুক্ত বর্ণের বাহুল্য ও স্নিগ্ধতার অভাব দেখিয়া কোমল পালি ভাষার প্রচার করিয়াছিলেন। মহাবীর স্বামীও সেই-রূপ বালক, স্ত্রী, বৃদ্ধ ও মূর্খগণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত মৃদুমসৃণ প্রাকৃত ভাষার প্রবর্ত্তন করেন।*

জৈন প্রাকৃত স হিত্য

মহাবীরপ্রবর্ত্তিত প্রাকৃত ভাষার উদাহরণস্বরূপে জৈন শাস্ত্রের পণ্‌হা বাগরণ (প্রশ্নব্যাকরণ) নামক দশম অঙ্গ হইতে নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত হইল:—

পংচ-বিহো পন্নত্তো জিণেহিং ইহ অণ্‌হও
অণাদীবো হিংসা-মোসমদত্তং অবংভ পরিগ্‌গহং চেব॥ (পণ্‌হা বাগরণ ২)।

"এই শাস্ত্রে জিনগণ নিরূপণ করিয়াছেন যে অনাদি আশ্রব (পাপ) পঞ্চবিধ, যথা—হিংসা, মৃষাবাদ, অদত্তাদান (চৌর্য্য), অব্রহ্মচর্য্য ও পরিগ্রহ"।

---

* একথা জৈন গ্রন্থে স্পষ্টই লিখিত আছে, যথা—

মুত্তূণ দিট্‌ঠিবায়ং কালিয়া উক্কালিয়ংগ সিদ্ধংতং।
থী বাল-বায়ণত্থং পাইয়া মুইয়ং জিনবরেহিং॥

"জিনবর দৃষ্টিবাদ ব্যতীত অঙ্গ ও উপাঙ্গ বিশিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহ স্ত্রী, বালক বৃদ্ধ ও মূর্খগণের সুবিধার জন্য প্রাকৃত ভাষার প্রকাশ করিয়াছেন"।

উদ্ধৃত বাক্যে সংস্কৃত "বিধ" স্থলে প্রাকৃত "বিহ", "প্রজ্ঞপ্ত" স্থলে "পন্নত্ত", "আশ্রব" স্থলে "অণ্হও", "মৃষা" স্থলে "মোস", "অব্রহ্ম" স্থলে "অবংভ" এবং "পরিগ্রহ" স্থলে "পরিগ্গহ" ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রন্থের 'পণ্হা বাগরণ" এই প্রাকৃত নাম সংস্কৃতে পরিবর্ত্তিত হইলে "প্রশ্ন ব্যাকরণ" হইবে।

অপর যে ভাষা সংস্কৃত প্রচারের পক্ষে অন্তরায় হইয়াছিল উহার নাম "গাথা" ভাষা। এই ভাষার কোন ব্যাকরণ নাই অথচ ইহা সুমার্জিত ও প্রাঞ্জল। নিম্নে গাথা ভাষার একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর যখন বুদ্ধদেব রাজগৃহে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন মহারাজ বিম্বিসার তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

গাথা ভাষা

পরম প্রমুদিতোঽস্মি দর্শনাত্তে
অবচিষু স মাগধরাজ বোধিসত্ত্বম্।
ভব হি মম সহায়ু সব রাজ্যং
অহু তব দাস্যে প্রভূতং ভুঙ্ক্ষ কামান্॥
মা চ পুনর্বনে বসাহি শূন্যে
মা ভুয়ু তৃণেষু বসাহি ভূমিবাসং।
পরম সুকুমারু তুভ্য কায়ঃ
ইহ মম রাজ্যি বসাহি ভুঙ্ক্ষু কামান্॥

"আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি পরম প্রমুদিত হইয়াছি। আপনি আমার সহকারী হউন। আমি আপনাকে সমগ্র রাজ্য দান করিতেছি। আপনি প্রভূত কাব্য বস্তু ভোগ করুন"।

উদ্ধৃত গাথায় "মাধব রাজ" এই কথাটীতে কোন বিভক্তি নাই অথচ ইহা কর্ত্তৃকারক রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার ক্রিয়াপদ "অবচিষু" সংস্কৃতও নহে, পালিও নহে, অধিকন্তু বহুবচনান্ত বলিয়া বোধ হয়। ইহা যথার্থতঃ একবচনান্ত ও ইহার অর্থ "বলিয়াছিলেন"। সংস্কৃত "সহায়" স্থলে গাথায় "সহায়ু", "সর্ব্ব", স্থলে "সব", "অহং" স্থলে "অহু", "বস" স্থলে "বসাহি", "ভূয়ঃ" স্থলে "ভুয়ু", "সুকুমার" স্থলে "সুকুমারু", "তব" স্থলে "তুভ্য", এবং "রাজ্যে" "রাজ্যি", ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল ব্যাকরণদুষ্ট ও ব্যাকরণবহির্ভূতপদ সত্ত্বেও শ্লোকটী মধুর ও সহজবোধ্য হইয়াছে। যাঁহারা গাথা ভাষা ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা ব্যাকরণের বিরোধী সুতরাং সংস্কৃত ভাষার পরম শত্রু। (ক্রমশঃ)

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৫ম ভাগ।	ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩২৩।	৫ম সংখ্যা।
২০শ বর্ষ।		৬ষ্ঠ সংখ্যা।

গোপন প্রেম।

সখা!

কখন পশিলে হৃদয়ে আমার,
জানিতে তা' মোরে দাওনি;
গোপনে আমায় ভাল যে বেসেছ
বুঝিতে আমি তা' পারিনি॥

হৃদয়ের মাঝে আসন তোমার
পাতা আছে, তা' যে দেখিনি,
বিনা আহ্বানে বসেছ সেখানে
ডাকিতে আমায় হয়নি॥

তুমি যে আমার এত কাছে থাক
হৃদয়-নিভৃত মন্দিরে,
ঘুম-ঘোর মোর কেটে গেল আজি
তোমার চরণ-মঞ্জিরে॥

দেখিনু তোমার অপরূপ রূপ
দেখিনু তোমার হাসিটি,
কত যে সহজে সব হ'তে কেড়ে
চুপে চুপে নিলে প্রাণটি॥

হৃদয়ের রাজা হৃদয়-আসনে
বসে আছ দিন-যামিনী,
পরশে তোমার, হৃদি শতদল
শিহরে উঠিল আপনি॥
ওগো মোর সখা ওগো চির সাথী,
ওগো দয়াময় ব্যথিতের ব্যথী,—
দুনয়নে ঝরে করুণার লোর,
প্রভু প্রাণেশ্বর এত কৃপা তোর।
নহি আমি একা হৃদয়ের সখা
হৃদয়কমলে বসিয়ে,
দেখি মোর ব্যথা পাও মনোব্যথা
ব্যথা দিতে আস মুছায়ে॥
দাও প্রভু দাও শকতি আমার
তোমার চরণে প্রণমি,
তোমার চরণপরশে এ প্রাণ
ধন্য হইবে এখনি।

বৈয়াসিকন্যায়মালা।

প্রথমাধ্যায়—তৃতীয় পাদ।

প্রথমাধিকরণ।

সূত্রং প্রধানং ভোক্তেশোহ্যভ্বাগ্ন্যায়তনং ভবেৎ।
শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধিভ্যাং ভোক্তৃত্বাচ্চেশ্বরেতরঃ॥
নাস্ত্যেপক্ষাবাত্মশব্দান্নভোক্তামুক্তগম্যতঃ।
ব্রহ্মপ্রকরণাদীশঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিতস্তথা॥১॥

অনুবাদ।—“যস্মিন্‌দ্যৌঃ পৃথিবী” ইত্যাদি বাক্যে দ্যুলোক এবং পৃথিবীর আয়তন (আধার) সূত্রাত্মা প্রধান, ভোক্তা (জীব) অথবা ঈশ্বর, এই সন্দেহে পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন দ্যুলোক এবং পৃথিবীর আয়তন সূত্রাত্মা প্রধান কিংবা জীব

হইবে, ঈশ্বর নহে। কারণ * "বায়ুনা বৈ গৌতমসূত্রেণ অয়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ" এই শ্রুতি দ্যুলোক ও ভূলোকের আয়তন সূত্রাত্মাকে বলিতেছেন। এবং সাংখ্য স্মৃতি প্রধানকে দ্যুলোক ভূলোকের আয়তন বলিতেছেন।† "তমেবৈকং জানথাত্মানং" এই শ্রুতি ভোক্তাকে (জীবকে) দ্যুলোক ভূলোকের আয়তন বলিতেছেন। অতএব সূত্রাত্মা, প্রধান, অথবা জীব ইহার মধ্যেই কেহ দ্যুলোক এবং ভূলোকের আয়তন হইবে।

সিদ্ধান্তী বলিতেছেন প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ, সূত্রাত্মা এবং প্রধান, দ্যুলোক ভূলোকের আয়তন বলিতে পার না। কারণ ' যস্মিন্ দ্যৌঃ" এই বাক্যে আত্মশব্দ বলা হইয়াছে; আত্মশব্দ সূত্রাত্মা বা প্রধানে প্রয়োগ করা যায় না। এবং ভোক্তা (জীব) ও দ্যুলোক ভূলোক প্রভৃতির আয়তন নহে, কারণ মুক্তপুরুষ দ্যুলোক ও ভূলোকের আয়তনকে প্রাপ্ত হয়, ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন। মুক্ত পুরুষের জীব প্রাপ্তি হইতে পারে না। এই শ্রুতি ব্রহ্মপ্রকরণে বলা হইয়াছে এবং এই শ্রুতি-প্রতিপাদ্য দ্যুলোক ও ভূলোকের আয়তনকে সর্ব্বজ্ঞ বলা হইয়াছে, অতএব ঈশ্বরই এই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য দ্যুলোক ভূলোকের আধার।

তাৎপর্য্য—মুণ্ডক উপনিষদ্ বলিয়াছেন, "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষং ওতং মনঃ সহপ্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ তমেবৈকং জানথাত্মানমন্যাবাচোবিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ" যাহাতে স্বর্গ পৃথিবী অন্তরীক্ষলোক (আকাশ) এবং সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত মন রহিয়াছে অর্থাৎ ইহাদের যে আধার সেই আত্মাকে জান, কারণ সেই আত্মা মুক্তির সেতুস্বরূপ, অন্য সকল বাক্য ত্যাগ কর। এই শ্রুতি যাহাকে সকল জগ-তের আধার বলিয়াছেন সেই সর্ব্বজগতের আধার কি এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়ায় সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—সকল জগতের আধার ঈশ্বর; সূত্রাত্মা প্রধান কি জীব নহে। কারণ এই শ্রুতি সকল জগতের আধারকে আত্মা বলিয়াছেন, সূত্রাত্মা, প্রধান কি জীব ইহাদিগকে কোথাও আত্মা বলা হয় নাই। এবং মুক্তপুরুষ সেই সর্ব্বজগতের আধারকে প্রাপ্ত হয় ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন। অতএব ঈশ্বরই সর্ব্বজগতের আধার।

দ্বিতীয়াধিকরণ।

ভূমাপ্রাণঃ পরেশোবা প্রশ্নপ্রত্যুক্তিবর্জ্জনাৎ।
অনুবর্ত্যাতিবাদিত্বং ভূমোক্তেশ্চাসুরেব সঃ॥

---

* "বায়ুনা বৈ গৌতম অয়ঞ্চ পরশ্চ লোকঃ হে গৌতম! বায়ু দ্বারাই এই লোক (ভূলোক) এবং পরলোক (স্বর্গলোক) পূর্ণ, অর্থাৎ বায়ুর মধ্যেই এই সকল লোক আছে।

† "তমেবৈকং জানথাত্মানং" সেই এক আত্মাকে জান।

বিচ্ছিন্নৈষদ্বিতিপ্রাণং সত্যস্তোপক্রমাত্তথা।
মহোপক্রম আত্মোক্তেরীশোঽয়ং দ্বৈতবারণাৎ॥

অনুবাদ।—ছান্দোগ্যে সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছেন "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা" যে স্থানে অন্য কিছু দেখিবার থাকে না, অন্য কিছু শুনিবার থাকে না, অন্য কিছু জানিবার থাকে না, তাহাকেই 'ভূমা' বলে। এই ভূমা কি প্রাণ অথবা পরমেশ্বর এই সন্দেহ। পূর্ব্বে যে সকল নামাদি তত্ত্ব বলা হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক স্থলেই নারদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 'ইহার পর আর আছে?' সনৎকুমারও বলিয়াছেন 'আছে।' প্রাণের পর আর সেইরূপ বলেন নাই, অতএব মনে হয় পাণই ভূমা; ইহা পূর্ব্বপক্ষ।

"এষ তু বা অতি বদতি যঃ সত্যেনাতিবদতি" যে পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান বলিতে পারে, সেই অতিবাদী; কিন্তু প্রাণবিদ্ অতিবাদী নহে। "তরতি শোকমাত্মবিদ্", আত্মবিদ্ সকল শোক অতিক্রম করে, এই শ্রুতি পরমাত্মাই বেদ্য অর্থাৎ জানিবার বিষয় ইহা বলিয়াছেন এবং "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" যে স্থানে অন্য কাহাকেও দেখা যায় না, সেই ভূমা। এইরূপে দ্বৈত নিষেধ করিয়া ভূমার লক্ষণ বলিয়াছেন, এতএব ঈশ্বরই ভূমা ইহা সিদ্ধান্ত।

তাৎপর্য্য—নানাবিদ্যায় পারদর্শী নারদ সনৎকুমারের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'ভগবন্ এই সকল বিদ্যা জানিয়াও আমি কেবল শব্দার্থমাত্রই জানি, অতএব আমি নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছি, আপনি আমাকে এই শোক-সাগর হইতে উদ্ধার করুন।' তখন সনৎকুমার, নারদ প্রকৃত অধিকারী কি না তাহা বুঝিবার জন্য নাম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বলিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত 'নারদ তাহার পর কি' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু প্রাণ উপদেশের পর আর জিজ্ঞাসা করেন নাই। নারদ মনে করিয়াছিলেন প্রাণই সর্ব্বাত্মা, ইহার পর আর কিছু নাই। অতএব এই স্থলে সন্দেহ হইয়াছে যে পবিশেষে যে 'ভূমা'র উপদেশ করিয়াছেন, তাহা প্রাণেরই উপদেশ, অথবা তদতিরিক্ত আত্মার উপদেশ, এই অধিকরণ এইরূপ সন্দেহের নিরাকরণ করিতেছেন। "এষতু বা অতিবদতি যঃ সত্যেনাতি বদতি।" সনৎকুমার যোগ্য শিষ্যকে বঞ্চনা করা উচিত নহে, ইহা মনে করিয়া বলিলেন, যে প্রকৃত সত্য বলে সেই অতিবাদী (যথার্থবাদী) কিন্তু প্রাণবাদী অতিবাদী নহে। অতএব তুমি সেই প্রকৃত সত্য ভূমাকে জিজ্ঞাসা কর। তাহার পর নারদ বলিলেন, সেই প্রকৃত সত্য কি তাহাই আমাকে বলুন। তাহার পর সনৎকুমার বলিলেন, "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা" যে স্থানে অন্য কিছু

দেখা যায় না, অন্য কিছু শুনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না সেই ভূমা, অতএব এই ভূমাই ব্রহ্ম, প্রাণ নহে ; কারণ এই বাক্যে সকল দ্বৈত নিষেধ করা হইয়াছে এবং উপক্রমে 'প্রকৃত সত্য বলিব' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা এবং দ্বৈত নিষেধ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হয় এই ভূমা ব্রহ্ম, প্রাণাদি নহে।

তৃতীয়াধিকরণ।

অক্ষরং প্রণবঃ কিংবা ব্রহ্মলোকেঽক্ষরাভিধা।
বর্ণে প্রসিদ্ধা তেনাত্র প্রণবঃ স্যাদুপাস্তয়ে ॥
অব্যাকৃতাধারতোক্তেঃ সর্ব্বধর্ম্মনিষেধতঃ।
শাসনাদ্দৃষ্টৃতাদেশ্চ ব্রহ্মৈবাক্ষরমুচ্যতে ॥

অনুবাদ।—বৃহদারণ্যকে পঞ্চমাধ্যায়ে গার্গীকে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি," হে গার্গি। এই অক্ষরের উপদেশ ব্রাহ্মণগণ করিয়া থাকেন। এই অক্ষরশব্দের অর্থ প্রণব অথবা ব্রহ্ম ইহা সন্দেহ। বর্ণে অক্ষর শব্দ প্রসিদ্ধ, অতএব উপাসনার জন্য প্রণবের উপদেশ করিয়াছেন ইহাই যুক্ত, এই পূর্ব্বপক্ষ। "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গি আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ," হে গার্গি! এই অক্ষরে আকাশ (অব্যাকৃত জগৎ) ওতপ্রোতভাবে আছে অর্থাৎ অব্যক্ত জগতের আধার অক্ষরকে বলা হইয়াছে। এবং "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বং" সেই অক্ষর স্থূল নহে, অণু নহে, হ্রস্ব নহে, এই প্রকারে সকল ধর্ম্মের নিষেধ করা হইয়াছে। "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রাশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" এই অক্ষরের শাসনাধীন সূর্য্য চন্দ্র প্রবর্ত্তিত হইতেছে। এই শ্রুতি দ্বারা সেই অক্ষর জগতের শাসনকর্ত্তা ইহা বলা হইয়াছে। "তদ্বা এতদক্ষরং গার্গি অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ," হে গার্গি! এই অক্ষর দর্শনের অবিষয় (তাহাকে দেখা যায় না) তথাপি সকলের দ্রষ্টা এবং শ্রবণের অবিষয় কিন্তু সকলের শ্রোতা, এই শ্রুতি অক্ষর প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণের অবিষয় ইহা বলিয়াছেন। এই সকল শ্রুতি অব্যাকৃত সকল জগতের আধার অক্ষর ইত্যাদি যাহা যাহা বলিয়াছেন সেই সকল প্রণবে উপপন্ন হয় না :অতএব "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি" এই বাক্যেঅক্ষরশব্দ বাচ্য ব্রহ্ম, প্রণব নহে ; ইহা সিদ্ধান্ত। এই অধিকরণ সুগম বলিয়া আর তাৎপর্য্য দেওয়া হইল না।

চতুর্থাধিকরণ।

ত্রিমাত্র প্রণবে ধ্যেয়মপরং ব্রহ্ম বাপরং।
ব্রহ্মলোকফলোক্ত্যাদেরপরং ব্রহ্ম গম্যতে ॥

ঈক্ষিতব্যো জীবঘনাৎ পরস্তৎপ্রত্যভিজ্ঞয়া।

ভবেদ্ধ্যেয়ং পরংব্রহ্ম ক্রমমুক্তিঃ করিষ্যতি॥

অনুবাদ।—প্রশ্নোপনিষদ্ বলিয়াছেন "যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোম্ ইত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরংপুরুষমভিধ্যায়ীত" যে ওম্ এই ত্রিমাত্র অক্ষর (অ, উ, ম,) দ্বারা পরমপুরুষের ধ্যান করে, এই বাক্যে ধ্যেয়বস্তু।হিরণ্যগর্ভরূপ অপরব্রহ্ম অথবা পরব্রহ্ম, "স সামভিরুন্নীয়তে ব্রহ্মলোকং" সে সাম (সামগান) দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় ; এইরূপ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বলিয়াছেন। অতএব অপরব্রহ্মই এই স্থলে ধ্যেয়বস্তু, অপরব্রহ্মও অন্য সকল অপেক্ষায় পর বলিয়া তাহাতেও পরশব্দ যুক্ত হয়। এই পূর্ব্বপক্ষ।

"স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে." যে উপাসনা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় সে এই জীবসমষ্টিরূপ হইতে উৎকৃষ্ট হিরণ্যগর্ভ হইতেও উৎকৃষ্ট সকল প্রাণীর হৃদয়ে বর্ত্তমান পরমাত্মাকে দেখিতে পায়। ধ্যান দ্বারা সেই পরমাত্মাকে দেখিতে পায় সেই পরমাত্মাই ধ্যানের বিষয় বলিতে হইবে। এক বিষয়ক ধ্যান করিলে অন্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ কখনই হইতে পারে না। "ব্রহ্মলোকং" ইহা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি মাত্রই ফল তাহা নহে, এইরূপে ক্রম মুক্তির সম্ভাবনা দেখাইয়াছেন। অতএব পরব্রহ্মই এই স্থলে ধ্যানের বিষয় ইহাই সিদ্ধান্ত।

তাৎপর্য্য—দেবলোক ইন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক এই ভাবে ক্রমশঃ যে মুক্তি হয় তাহাকে ক্রমমুক্তি বলে। জীবঘন শব্দের অর্থ জীবসমষ্টি।

অ, উ, ম, এই তিন মাত্রা একত্র করিয়া 'ওম্' এই পদ হয় বলিয়া ইহাকে ত্রিমাত্র বলা হয়।

পূর্ব্বে অনুভূত বস্তুর দর্শনে সেই এই বস্তু :এইরূপ যে জ্ঞান হয় তাহাকে প্রত্যভিজ্ঞা বলে, যথা সেই এই নদী, সেই এই আমার পুত্র ইত্যাদি। স্মরণ আর প্রত্যভিজ্ঞার প্রভেদ এই—প্রত্যভিজ্ঞা অনুভূত বস্তু বর্ত্তমান না থাকিলে হয় না। কিন্তু স্মরণ অনুভূত বস্তু বিদ্যমান না থাকিলেও হয়, যেমন—'আমর পুত্র গৃহে আছে' পূর্ব্বানুভূত পুত্রকে নিকটে না দেখিলেও এইরূপ স্মরণ হয়।। প্রত্যভিজ্ঞা অনুভূত বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর না হইলে হয় না। এই অধিকরণে 'পরং পুরুষং অভিধ্যায়ীত" এই বাক্য দ্বারা যে পরম পুরুষের ধ্যান করার বিধান করা হইয়াছে, উপসংহারে "পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে" এই বাক্য দ্বারা তাহারই প্রত্যভিজ্ঞা করা হইয়াছে, অতএব পরব্রহ্মই ধ্যানের বিষয়।

শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

অতিথি।

দুয়ার খোল, দুয়ার খোল,
অতিথ্ এল দ্বারে,
তাড়াতাড়ি জেলে বাতি
বরে নাও হে তারে।
এমনি করে এসেছিল—
অনেক গভীর রাতে,—
অনেক মলয় বায়,—
অনেক দুখের সাথে।
আঘাত করে গেল কবার
দিলে নাকো সাড়া,
এবার বুঝি শেষের মত
ভাঙ্‌তে চাচ্ছে কারা।
ভাঙ্গো কারা, ভাঙ্গো কারা,
অতিথে নাও ঘরে।
এবার গেলে আস্‌বে না আর
অভিমানের ভরে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

আধ্যাত্মিক জীবন ও তাহা লাভের উপায়।*

(১)

আধ্যাত্মিক জীবন ও তল্লাভের উপায়ের অর্থ সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিতে যাইলে সর্ব্বপ্রথমে 'আধ্যাত্মিক' কথাটীর অর্থ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন; কেননা ধার্ম্মিকসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ বাক্যটীর অর্থ লইয়া অনেক গোলযোগ আছে।

---

* শ্রীমতী আনি বেসান্তের The Meaning and Method of Spiritual Life এর অনুবাদ।—লেখক।

আমরা সর্ব্বদাই 'আত্মা' ও 'চৈতন্তের' কথা শুনিতে পাই—যেন এই দুইটী বাক্যই একার্থবোধক। মানবমাত্রেই 'দেহ' ও 'আত্মা' অথবা 'দেহ' ও 'চৈতন্য' বিশিষ্ট। অনেকেরই ধারণা যেন 'চৈতন্ত' ও 'আত্মা'—এই দুইটী বাক্যের পৃথক্ ও নির্দ্দিষ্ট অর্থ নাই। যদি চৈতন্ত ও আত্মা এই দুইটী বাক্যের অর্থ আমরা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারি, তাহা হইলে 'আধ্যাত্মিক জীবনের' অর্থ সম্বন্ধে বস্তুতঃই অনেক গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু থিয়োসফিষ্ট সম্প্রদায় বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে মনুষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া তাহাকে দুই অংশে বিশ্লেষণ করিয়াছেন—অন্তর্নিহিত চৈতন্য ও উপাধি। তবে সাধারণতঃ যেরূপ ভাবে চৈতন্য শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে, থিয়োসফিষ্ট চৈতন্য বলিতে সেরূপ বুঝেন না; তাঁহার চৈতন্ত নির্গুণ, নিরুপাধি অখণ্ড —পরমাত্মা। এই পূর্ণত্ব, এই নিরবচ্ছিন্নত্ব, এই একত্বই তাঁহার চৈতন্তের বিশিষ্ট ধর্ম্ম; ইহা সর্ব্বথা ভেদরহিত, সর্ব্বথা এক। তদ্ব্যতীত যাহা কিছু, সবই বহু। যখন আমরা আধ্যাত্মিক জগৎ ছাড়িয়া ব্যবহারিক জগতে অবতীর্ণ হই, তখন দেখি সর্ব্বত্রই ভেদবিশিষ্ট ও বহু।

এই ব্যবহারিক জগৎ এবং মনুষ্য প্রকৃতির সম্যক্ আলোচনা করিলে যাহা দেখিতে পাই তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সাধারণতঃ যাহাকে আমরা আত্মা বলিয়া থাকি, তাহা এই সকল ভেদ বিচ্ছেদের হেতুভূত—জীবাত্মা। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বা ব্যবহারিক জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অহং জ্ঞানও পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। ইহাই আমাদের আমিত্ব। এই অহং জ্ঞান হইতেই মনুষ্যহৃদয়ের ব্যক্তিগত অস্তিত্ব লাভালাভ ধনৈশ্বর্য্য প্রভৃতির সম্বন্ধে পৃথক্ অনুভূতি বা ভেদবুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। এই আমিত্বজ্ঞান মনুষ্যের সহজ, এবং ইহা অন্তর্নিহিত চৈতন্যের ন্যায় অংশীভূত, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্ ধর্ম্মান্বিত,—আধ্যাত্মিকতার প্রবল পরিপন্থী। কেননা, এই অহংবুদ্ধি হইতেই আমি এবং তুমির উৎপত্তি। কিন্তু আত্মবুদ্ধিতে উহাদের লয়; অহং, বহু, চৈতন্য বা পরমাত্মা—এক।

আধ্যাত্মিকাতেই ধর্ম্ম-রহস্যনিচয় নিহিত; কারণ সাধারণ মানবের নিকট ইহা গভীর প্রহেলিকাময়,—সে ভাবিতেই পারে না যে যাহাকে সে নিতান্ত আপন বলিয়া জানে তাহা কাহারও নিজস্ব নহে, সংসারে তাহার আপন পর নাই,—সে অনন্ত অব্যক্ত অখণ্ড। খৃষ্টীয় ধর্ম্মে যে atonement বা প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখ হইয়াছে তাহাই অধ্যাত্মজীবন সম্বন্ধে প্রযুজ্য; মানব যতক্ষণ

আপনাকে ভেদদৃষ্টিতে দেখিবে, যতক্ষণ তাহার 'আমি', 'আমার', 'তুমি', 'তোমার' ধারণা থাকিবে, ততক্ষণ সে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের atonement এর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না। পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বত্রই একরূপ, সুতরাং উহা যে কোন আকারে, যে কোন আধারে প্রকাশিত হইতে পারে—এই মূল তত্ত্বেই খৃষ্টীয় প্রায়শ্চিত্তবাদের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু প্রকৃত মানব এই রহস্যের মর্ম্ম গ্রহণে অক্ষম এবং আশৈশব মনুষ্যমাত্রকেই পৃথক্ পৃথক্ দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া এই খৃষ্টীয় ধর্ম্মোক্ত প্রায়শ্চিত্তবাদের বিপরীতার্থ করিয়াছে; বস্তুতঃ এই প্রায়শ্চিত্তের অর্থ একের অন্য সকলের পাপভার গ্রহণ করা নহে। সকলের মধ্যেই যখন সেই একমাত্র অবিচ্ছিন্ন পরমাত্মা বিরাজমান, তখন কে কাহার পাপভার গ্রহণ করিবে ?

সুতরাং যে অন্তর্নিহিত চৈতন্য মানবকে ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে আনয়ন করে, যাহা তাহাকে একপক্ষে পরমেশ্বর এবং অন্যপক্ষে সমগ্র জীবজগতের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে আবদ্ধ রাখে, ইহাই মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষ্যীভূত পরমাত্মা। অতি প্রাচীন উপনিষদে এইরূপ বর্ণিত আছে যে সমস্ত বিশ্ব ঈশ্বরের সত্তা দ্বারা আচ্ছাদিত, এবং তৎপরে যে মানব সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতস্থ অদ্বয় সত্তার সন্ধান পাইয়াছেন তাহার কথা বলিতে বলিতে সেই উপনিষৎ আনন্দের আবেগে বলিয়া উঠিয়াছেন—তত্র কো মহঃ, কঃ শোকঃ; একত্বমনুপশ্যতঃ ?

"হইলে অদ্বৈত জ্ঞানোদয়,
কোথা মোহ কোথা শোক রয় ?"

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই জ্ঞান আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রমাণ এবং এই জ্ঞান লাভের উপায় অধ্যাত্ম জীবনের বিকাশ। এই অন্তর্নিহিত চৈতন্যকে আমরা যে সকল নামে অভিহিত করি, তাহাতে কিছু আসে যায় না। এই সকল নাম সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত এবং সংস্কৃত ভাষা বহু সহস্র বর্ষ ধরিয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষানুভূতির ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্নরূপ নামকরণ করিয়া আসিতেছে; কিন্তু এই এক অখণ্ড সত্তার অনুভূতি যে আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক তাহা সংস্কৃতে স্বীকৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে গীতায় একটী সুন্দর উপদেশ আছে ;—

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি,
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥"

"যোগে সমাহিত চিত্ত এবং সর্ব্ব বিষয়ে সমদর্শী সেই যোগে আত্মাকে

সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখেন এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন।" এরূপ দৃষ্টি যাঁহার নাই তিনি সবই অন্ধকারময় দেখেন। পার্থক্যজ্ঞান বিবর্ত্তবিকাশের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু মূলতঃ ইহা—একটী মহা ভ্রম। বৃক্ষের সহিত শাখার যেরূপ প্রভেদ, আত্মা ভিন্ন পদার্থের সহিত আত্মারও সেইরূপ প্রভেদ। বৃক্ষের জীবনীশক্তি সমস্ত শাখায় সংক্রামিত হইয়া সমস্ত বৃক্ষটীকে একত্বেই পর্য্যবশিত করে। এইরূপ একত্ব জ্ঞানই অধ্যাত্মচৈতন্য।

এই একত্বই খৃষ্ট ধর্ম্মে যিশুখৃষ্টরূপে মূর্ত্তিমান। যিশুখৃষ্টের প্রথম জীবনে যখন তিনি স্বর্গীয় পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন তখন স্পষ্টই সূচিত হইয়াছে যে শিশু এবং তাঁহার স্বর্গীয় পিতার মধ্যে কোনও ভেদ নাই। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থায় তিনি স্পষ্টরূপে বলিতেছেন—আমি এবং আমার স্বর্গীয় পিতা একই। বস্তুতঃ এই একাত্মবোধই প্রচারিত ধর্ম্মের মূল ভিত্তি এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র সকলের শক্তি। খৃষ্টানের কথায় বলিতে গেলে, যখন মনুষ্যে যিশুখৃষ্টের আবির্ভাব হয়, তখনই তাহার অধ্যাত্ম জীবনের বিকাশ হয়। মহাত্মা পলের (St. paul) পত্রাবলীর কোন কোন স্থানে এই ভাব স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। তৎকালে দীক্ষিত খৃষ্টানের সংখ্যা বর্ত্তমান কালের তুলনায় মুষ্টিমেয় ছিল—তিনি তাহাদিগকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"তোমরা অধ্যাত্মসুখান্বেষী নহ—ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র।" ইহার কারণও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন—"আমি শুনিতেছি তোমাদের মধ্যে ভেদভাব বর্ত্তমান নাই—সবই এক।" খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে এবং পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থে অধ্যাত্মজীবনের দ্বিতীয় স্তর বিকাশের কথাই পরিস্ফুট আছে। এইরূপ কথিত আছে যখন প্রলয় উপস্থিত হইবে তখন, যাহা কিছু পুত্রে (খৃষ্টে) সংগৃহীত হইয়াছে তাহা সবই পিতায় (ঈশ্বরে) পরিসমাপ্ত হইবে এবং চরমে সর্ব্বময় ঈশ্বরই বিরাজিত থাকিবেন। এইরূপে প্রথমে যে পিতা পুত্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবধানের সৃষ্টি করা হইয়াছিল, তাহা সেই সর্ব্বময়ের অখণ্ড সত্তায় লয়প্রাপ্ত হইবে। বস্তুতঃ উপনিষৎ, ভগবদ্গীতা বা নিউটেষ্টমেণ্টেই—সর্ব্বত্রই এই একত্বেরই প্রতিধ্বনি—আধ্যাত্মিকতার একইরূপ ব্যাখ্যা।

সংসারে ভেদজ্ঞানের পরিপোষক কারণের যতই বাহুল্য হউক না কেন, এই অভেদানুভূতি মনুষ্যের সাধ্যাতীত নহে; কারণ তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অখণ্ড চৈতন্য নিত্য বিদ্যমান। মনুষ্য জীবনের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু প্রাণময়, তাহা এই নিত্য শুদ্ধ সত্ত্বের অভিব্যক্তি। কোন সম্প্রদায় আপনা-

দিগকে স্বভাবতঃ পবিত্র ও ঈশ্বরানুগৃহীত বলিয়া মনে করে, কোন সম্প্রদায় বা আপনাদিগকে পাপী বা স্বভাবতঃ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভাবিয়া ম্রিয়মাণ হয়;—ইহা উপেক্ষার বিষয় নহে। মনুষ্য স্বভাবতঃ দুষ্প্রবৃত্তির দাস অথবা ঈশ্বরদ্রোহী এইরূপ ধারণার প্রচার তাহার ঐহিক ও পারমার্থিক উন্নতির পথে ভীষণতম অন্তরায়-স্বরূপ। ইহা মনুষ্যজীবনকে বিষময় করে এবং তাহার ললাটদেশ দুষ্প্রক্ষাল্য কলঙ্কলেপে বিমলিন করিয়া তুলে। যদি আমরা অতি নিকৃষ্ট অধঃপতিত মানবকে তাহার অন্তর্নিহিত মহত্বের প্রভা দেখাইয়া মনুষ্যত্বের পথে পুনরানয়ন করিতে চাই। যদি আমরা তাহাকে গভীর পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার লাভ করিবার বাসনা করি, তাহা হইলে তাহাকে পাপী বলিয়া সম্বোধন করিলে চলিবে না, তাহার পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত অথবা অনুতাপ করিতে বলিলে কোন ফল হইবে না। তাহাকে দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে হইবে যে, সে কোন দিনই পাপের ক্রীতদাস বা দুষ্কৃতের সহচর হইতে পারে না, তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে যে সদা সম্পূর্ণ সর্ব্বাভিভবকারী শুদ্ধ চৈতন্য বিরাজমান, তাহার প্রভাবে পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। কারণ আমরা তাহাকে এইরূপে যতই আশ্বাসিত করিতে থাকিবে, ততই তাহার মনুষ্যত্ব, তাহার অন্তর্নিহিত চৈতন্য —যাহা এতদিন অজ্ঞানের মোহে আচ্ছন্ন ছিল—ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিবে। এই জন্য ধর্ম্মপ্রচারকের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য তাহার শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বপ্রযত্নে এই মহান্ ভাবের উদ্দীপনা করা।

স্বীকার করিলাম পূর্ণ চৈতন্য মানবমাত্রেরই অন্তর্নিহিত, এবং উহাই তাহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি; এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই কি উপায়ে উহার বিকাশ হইতে পারে? প্রথম উপায় এইমাত্র বিবৃত হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে মানবকে তাহার এই আধ্যাত্মিক প্রকৃতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আস্থাবান করিতে হইবে, তাহাকে বুঝাইতে হইবে সে যে স্বভাবতঃই পাপী, উত্তরাধিকারসূত্রে মহাপাপের গুরুভারগ্রস্ত— ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। মনুষ্যের সহজাত পাপ যদি কিছু থাকে, সে তাহার অজ্ঞান; আর তাহাই যদি তাহার পাপ হয়, তাহা হইলে মনুষ্যমাত্রেই সে পাপে পাপী। কিন্তু ইহা প্রকৃত নহে। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও জ্ঞানবৃদ্ধির ফলে অজ্ঞতা আপনিই দূর হইয়া থাকে। এইখানেই অধ্যাত্মজীবনের সূত্রপাত, এবং সম্পূর্ণানুভূতিতে তাহার চরম পরিণতি। যে পন্থার অনুসরণে মানবের কর্ম্মজীবনে তাহার প্রকৃতিগত মহত্বের পূর্ণ-বিকাশ হয়, তাহাই অধ্যাত্মজীবন লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। পাশ্চাত্যধর্ম্মসম্প্রদায় এই মতের বিপরীত মত বিস্তার করিয়া আসিতেছেন; এ

বিষয়ে অবহিত হওয়া তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ মানবের যখন একবার বিশ্বাস হয় যে তাহার অন্তরে ঈশ্বরের অম্লান জ্যোতি বিরাজমান, তখন সে কার্য্যে সেই অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের পরিচয় দিতে সর্ব্বদা সমুৎসুক হয়।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে অধ্যাত্মজীবন লাভের এই উপায় সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না। যাহাদের মনোবৃত্তি সাতিশয় অপরিণত, তাহাদের প্রথম কর্ত্তব্য সেই প্রাচীন উপদেশ—"মন্দকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও।" কোন উপনিষদে আত্ম-সাক্ষাৎকার বা ঈশ্বরলাভের বিভিন্ন উপায়গুলির মধ্যে এই মন্দ কার্য্য হইতে নিবৃত্তিকে পরমস্থান দেওয়া হইয়াছে। অধ্যাত্ম-জীবনলাভের এই প্রথম সোপান। তাহার পরের কর্ত্তব্য ও সৎকার্য্য সম্পাদন এই দুইটী উপদেশ সাধারণ হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। অপিচ ইহাদের পালনেই অসৎকে চিরতরে বিতাড়িত করিয়া সতের আশ্রয় পাওয়া যায়; আর তাহা না হইলে অধ্যাত্মজীবনের বিকাশ হয় না। ইহারও পরবর্ত্তী স্তর সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, যে মানব আলস্য-পরায়ণ স্থূলবুদ্ধি ও ভক্তিহীন, সে কখন আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয় না। অপিচ ইহাও কথিত হইয়াছে যে কেবল জ্ঞানেই বা ভক্তিতেই আত্ম-সাক্ষাৎকার হয় না—হয় উভয়ের সম্মিলনে। বস্তুতঃ এই দুইয়ের সাহায্যে অধ্যাত্মমার্গে উন্নীত হওয়া যায়। (ক্রমশঃ।)

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

স্বপন।

আছি ঘুমে অচেতন পড়িয়া,
মোরে ভুলায়ে কতই আদরে সোহাগে
কে যেন রয়েছে ধরিয়া;
সদা স্বপনের মাঝে ছায়ার মতন
বেড়াই ঘুরিয়া ফিরিয়া,
ভবে কতবার আসি কতবার যাই
বাসনার রথে চড়িয়া।
যেন কাহার ইচ্ছাটী পূরিতে
কার লীলার সহায় করিতে
সাজি রাজা মহারাজ পথের কাঙ্গাল
গাছের তলায় পড়িয়া।

সদা　কে যেন চেতন করুণা নিধান
　　　　নিজগুণে দয়া করিয়া
মোরে　করায় চেতন থাকিয়া নিকটে
　　　　সুকোমল করে ধরিয়া।
আমি　মোহ-আবরণ ঠেলিয়া
চাই　চকিত-নয়ন মেলিয়া
যায়　হেরিয়া তাহার মধুর মূরতি
　　　　পুলকে পরাণ ভরিয়া।
হায়　নিমেষে হারায় কোথায় লুকায়
　　　　ক্ষীণ স্মৃতি বুকে ধরিয়া।
পুনঃ　নিদের আবেশ স্বপনের খেলা
　　　　কতদূরে পড়ি সরিয়া।
কত　অসার আমোদে মিশিয়া
যাই　নিজসুখ-স্রোতে ভাসিয়া
যেন　কার ইশারায় উনমত প্রায়—
　　　　নাচি মোহজালে পড়িয়া
ভাবি　স্বপনের কথা স্বপনেতে, খেলি
　　　　মায়ার পুতুল গড়িয়া
জাগে　কতশত ভাব স্বপনের মাঝে
　　　　বেড়াই কখনও উড়িয়া
দূর　স্বপনে সত্য মিলিয়া
মোরে　ধাঁধায় কুহকে ছলিয়া
তবু　থেকে থেকে প্রাণ শিহরে সেই সে
　　　　মধুর মূরতি স্মরিয়া।

শ্রী প্রসন্নকুমার দাস ভক্তিবিনোদ বি, এ,

মাএর খেলা।

মাগো বিশ্বজুড়ে খেলার ঘরটী খেলিস কত খেলা
আমি যেদিক পানে চেয়ে দেখি সবই মায়ার মেলা।
তোর প্রকাণ্ড সে মায়ার ঝুলি হরেক জিনিস পোরা
কত মায়ার পুতুল দলে দলে নাচ্‌ছে বিশ্ব জোড়া।
তুই আড়াল থেকে মায়ার সুতয় দেখাস পুতুলবাজী
নাচে গরিব, দুখী, রাজা, উজীর, কভু পাতসা সাজি।
তুই পাকা বাজীকরের মেয়ে জেনেছি মা খাঁটি
তোর ভিল্‌কি দেখায় জনম, মরণ, দুইটী হাওয়ার কাটি।
কার হৃদয় হ'তে মাণিক ছিঁড়ে পরাস অন্য কারে
মাগো একি খেলা তিলেক পরে আছাড় মারিস তারে।
কারে খেলাস্ ভাল, একে একে উঠ্‌ছে ঘুঁটী পেকে
কার পাকা ঘুঁটী কাঁচি দিয়ে হাসিস্ আড়াল থেকে।
তোর আশা নামে মেয়েটী তার বড়ই রূপের ছটা
সেযে ভবিষ্যতের দুয়ার চেপে বসে করে ঘটা
তার ম্যাজিক আয়না মন্দচেপে সবই দেখায় ভাল
সে যে নিবিড় বনে ঘোর আঁধারে দেখায় সুখের আলো।
সদা অসম্ভবের সম্ভাবনা জানায় কানে কানে
তবে বিপদ্ কালে বাচায় কভু আশান ঢেলে প্রাণে।
তার মনের মতন সরস কথায় সদাই ভুলে থাকি
শেষে হিসাব করে দেখি মাগো সবই যেন ফাঁকি।
তোর বুঝতে নারি, ছেলে-খেলা খেলিস্ কিসের লেগে
তুই কেন ভাঙ্গিস্ কেন গড়িস্ সাজান ঘর ভেঙ্গে।
তোরে কথনও দেখি দয়াময়ী কথনও পাষাণ হিয়ে
কেন অসময়ে কেড়েনিস ধন নিজের ইচ্ছায় দিয়ে।
তুই পাগল সঙ্গে থাকিস্ বলে পাগলামীটি সার
তুই দিবি যদি নিবি কেন এ কোন্ তোর বিচার।

ওগো বুঝেছি দিস পরখ নিতে খেলার মাঝে ফেলে
সদা মাকে ভুলে মায়ার সনে খেলছে কেমন ছেলে।
নিজে কর্ত্তা সেজে বুক ফুলিয়ে বেড়ায় ডেমাক্ করে
সদা নিত্যধনে ভুলে মাগো অনিত্যেরে ধরে।
তাতো তোরই মায়া তোরই দয়া, তুইত অভয় দিবি
তোর দয়া হলে সোহাগ ক'রে তুইত কোলে নিবি।
ওগো আশা যাওয়া ঘুঁচিয়ে দেমা! কেঁদে ডাকি তোরে
যেন জনম-মরণ-কাটি দুটী ছুঁয়াস্ না আর মোরে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস ভক্তিবিনোদ বি, এ।

ভারত।

(১)

কার গরিমায় পূর্ব্ব গগন রাঙ্গিয়ে তুলিছে ধরা
জ্বল্ জ্বল্ এক শ্যামল ক্ষেত্রে তপন কিরীটী পরা;
দুগ্ধ ধবল স্বপন বালার অরুণ প্রতিচ্ছায়া
(সে যে) মোদের দেশের স্নিগ্ধ শীতল অরূপ স্বর্গ ছায়া॥

(২)

অসীম বিশ্ব স্ফাটিক স্বচ্ছ নীল বিভ্রমে আঁকা
মায়া আস্তর উন্মাদনায় আকাশ কাহার ঢাকা;
কাহার স্নিগ্ধ শ্যামল ক্ষেত্রে ফুটে উঠে রূপরাণি
সে যে মোদের দেশের প্রীতির অর্ঘ্য শ্যাম-উপহারখানি॥

(৩)

কোথায় এমন কুঞ্জ বিথিকা বিহগকণ্ঠে ভরা
উল্লাস-কল উৎসবময়ী মায়ার কণ্ঠে ঘেরা,
কাহার দেশের ফুল্লকুসুমে উচ্ছল রূপ দেখে,
গুঞ্জিত অলি কুণ্ঠা বিরহি দশা পায় ঝাঁকে ঝাঁকে॥

(৪)

কাহার দেশের সম্বিত-হারা উত্তাল জল দলে,
আর্য্য ঋষির অযুত মন্ত্র আজও গাহিয়া চলে ;
কার সে স্ফুরিত বেদের স্তোত্র স্মরণ সরণী পারে
মন্ত্রিত করি সুপ্ত ধরণী উঠেছিল কোন্ দ্বারে ?

(৫)

তুমি মা ধন্য চরণে যাঁহার লুটিছে উতোল ভঙ্গে
ভীম পিঙ্গল ফেনিল সিন্ধু উগারি প্রলয় রঙ্গে ;
শিয়রে যাঁহার কঠোর মূর্ত্তি অদ্রি রয়েছে স্থির,
মহাভারতের মহাকীর্ত্তির স্ফীত গর্ব্বিত শির ॥

(৬)

কীর্ত্তি যাঁহার সাগব লঙ্ঘি প্রাচ্যের পরপারে
স্নিগ্ধ সরল আলোকরশ্মি ঢেলেছিল শতধারে ;
গৌরব যাঁর প্রতীচের শিরে আজও রয়েছে গাথা
কর্ম্ম-ভক্তি জ্ঞানের মার্গে মৃত্যুর পার-কথা ॥

(৭)

মৃত্যুমথন ভস্ম আহরি অমর তরুর ছায়ে
বসিয়াছে কোন জাতির পুত্র সোঽহং-ধর্ম্ম গেয়ে ;
সন্ন্যাসী কার রাজার পুত্র লভিল চরম সিদ্ধি
প্রচার করিল নীতির মর্ম্ম সত্য অমর ঋদ্ধি ॥

(৮)

কার সে দেশের কুঞ্জ-কাননে মোহনিয়া রূপছাঁদে
আপনি—বিশ্ব রচয়িতা আসি পড়েছিলা প্রেমফাঁদে ;
ভকত সঙ্গে গেয়েছিল আসি ভগবত তাঁর গীতা
এই এ দেশের শিরার রক্তে আজও রয়েছে গাথা ॥

(৯)

এই এ দেশের পণ্ডিত শিশু নাচিল ভকত সঙ্গে
ভগবদ্ভ্রমে চুমেছিল পাতা, ধূলি মেখেছিল অঙ্গে ;
ছুলেছে নিমাই অসীমের মাঝে এই সব ধূলি হ'তে
স্বর্গদুয়ার রেখে গেছে বাঁধে পীরিতি চরণ পাতে ॥

(১০)

কুণ্ঠা কিসের, দ্বন্দ্ব কিসের, আমরা যাঁদের বংশধর
তাঁরাই মথিয়ে ক্ষীরোদ সাগর লভেছে অমর স্বর্গদ্বার;
আজও আরবি স্মৃতির বর্ম্মে যে দিনের সেই গর্ব্বগান,
শুনাব জগতে মোদের অতীত কতই উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠান॥

শ্রীনরেশভূষণ দত্ত।

মধ্যপথে।

কোন্ সুদূর অতীতে—কোন্ স্মরণাতীত কালে সংসার-রঙ্গমঞ্চে মানবের প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা কে বলিবে? সংহিতা বা পুরাণকার মনুষ্য সৃষ্টির যে ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, এই বিজ্ঞানবিভোর বিংশ শতাব্দী তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহে। বর্ত্তমান যুগে আমরা যেরূপ শিক্ষা-দীক্ষা পাইতেছি, তাহাতে পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ ব্যতীত কোন ব্যক্তির যাথার্থ্যে বিশ্বাস করিতে পারি না। এই বিবর্ত্তনবাদের যুগে কে বিশ্বাস করিবে, যে প্রজাপতির অসীম ক্ষমতাবলে আদিম মানব সহজাত শিক্ষাসভ্যতায় মণ্ডিত হইয়া সহসা অবনীবক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছিল? কে মানিয়া লইবে যে জ্ঞানবৃক্ষের ফল-ভক্ষণে আদম ও হবা সহজাত জ্ঞান হারাইয়াছিল?

আমাদের এই প্রাচীন শাস্ত্রগুলিকে মানবসমাজের সর্ব্বপ্রাচীন কাব্যাদর্শ বলিয়া সম্মান করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাদিগের বর্ণনার সত্যতায় বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু সর্ব্বানুসন্ধিৎসু বিজ্ঞান ত চুপ করিয়া থাকিতে পারে না; মনুষ্য-সৃষ্টির রহস্য নিরূপণ তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। সে বলিতেছে যে ক্রমোন্নতিই সৃষ্টির মূলসূত্র; এই ক্রমোন্নতির ফলে জড়পরমাণু হইতে উদ্ভিদ্, উদ্ভিদ্ হইতে জীব এবং সর্ব্বশেষে মানবের বিকাশ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ব্রহ্মা, তাঁহার মানসপুত্রগণ বা অন্য কাহারও হাত নাই।

বেশ কথা;—এই ক্রমোন্নতিবাদকেই আপাততঃ সৃষ্টিরহস্যের প্রথম স্বতঃ-সিদ্ধ ধরা যাউক! সূক্ষ্মতমের ঘনসন্নিবেশে স্থূলের আবির্ভাব বা ক্রমোন্নতির ফলে নিকৃষ্ট জড় পরমাণুর চৈতন্যময় উৎকৃষ্ট জীবে পরিণতি;—যাহাই সৃষ্টিতত্ত্বের মূল

হউক না কেন, তাহাতে বড় আসে যায় না। সূক্ষ্মতম হইতে স্থূলের বিকাশে সৃষ্টি স্থূলের এবং সূক্ষ্মতম অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তনই লয় বা জগতের সুপ্তাবস্থা—এই মতও ক্রমোন্নতিবাদের পরিপোষক:বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। হউক—কিন্তু ইহাতে সৃষ্টি-রহস্যের সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় কৈ? ক্রমোন্নতিই যদি সৃষ্টির বিধি বা পদ্ধতি হয়, তাহা হইলে অবশ্য নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টের বিকাশেই সৃষ্টির সফলতা বং সার্থকতা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট লইয়াই যত সমস্যা। চরম নিকৃষ্টতা বা চরম উৎকর্ষই যদি এই নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট শব্দের প্রতিপাদ্য হয়, তাহা হইলে ত এ সমস্যার সমাধান নিতান্তই অসম্ভব। কারণ কবে সৃষ্টি কার্য্য প্রথম আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা নির্ণীত হইবার উপায় না থাকিলেও এ কথা বৈজ্ঞানিক বা অবৈজ্ঞানিক, পণ্ডিত বা নিরক্ষর, আস্তিক বা নাস্তিক সকলেই স্বীকার করিবেন যে সান্ত মানবের পক্ষে সৃষ্টিকাল অনন্তই বলিতে হইবে। পুরাণ যাহাই বলুন, কোরাণ যাহাই বলুন, বাইবেল যাহাই বলুন—কোন শিক্ষিত ব্যক্তিই মানিতে চাহিবে না যে পৃথিবীর বয়স দু দশ হাজার বা দু দশ কোটী বৎসর মাত্র। ভূতত্ত্ববিৎ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে সমগ্র পৃথিবীর ত কথাই নাই, এক একটী স্তর গঠিত হইতেই দুই চারি কোটী বৎসর অতীত হইয়াছে। তাহার পরে ইহাত পৃথিবীর কথা; পৃথিবীত এই অনন্ত বিস্তৃত সীমাশূন্য জগতের একটী ক্ষুদ্র বিন্দুমাত্র। তবে কেহ যদি বলিতে চাহেন, পৃথিবী যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন সমগ্র জগতের সৃষ্টিকার্য্য যে একই সময়ে আরব্ধ হয় নাই তাহা কে বলিল? ইহার উত্তরে বৈজ্ঞানিক ও জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ দৃঢ়ভাবে বলিবেন যে এ কথা পাগলের প্রলাপ মাত্র। বহু গ্রহ-নক্ষত্র জ্যোতিষ্কাদি নির্ব্বাপিত অবস্থায় শূন্যে বিরাজিত রহিয়াছে; কত কোটী বৎসর পূর্ব্বে যে তাহারা গতজীবন অর্থাৎ নিষ্প্রভ ও উত্তাপহীন হইয়াছে, তাহারই ইয়ত্তা :অসম্ভব; কে বলিবে কবে তাহারা স্রষ্টার হস্তচ্যুত হইয়া তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল? তবেই স্বীকার করিতে হইবে যে সৃষ্টি যদি অনাদি অনন্ত নাই হয়, সৃষ্টিব্যাপার যদি প্রকৃতই সময়দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে যে দিনে বা যে সময়ে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, সে দিন বা সে সময়ের দূরত্ব মনুষ্যের ধারণাতীত; তাহার পর কত বৎসর, কত শতাব্দী কত যুগ যে চলিয়া গিয়াছে মনুষ্যের পরিকল্পিত সংখ্যাসমূহ দ্বারা তাহার পরিমাণ হইতে পারে না।

এক্ষণে, ক্রমোন্নতিই যদি সৃষ্টিকার্য্যের পধান সাধন হয় তবে ইহাও স্বীকার্য্য

যে সৃষ্টির সেই প্রথম প্রভাত হইতেই এই ক্রমোন্নতিবিধায়িনী শক্তির কার্য্য নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে; এবং তাহারই ফলে সৃষ্টিকার্য্য বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। বেশ কথা -এই দীর্ঘ, অতি সুদীর্ঘকালব্যাপী ক্রমোন্নতির ফলে যাহা হইতেছে, তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু কি দেখিতেছি? যাহা দেখিতেছি তাহাই কি ক্রমোন্নতির চরম পরিণতি? বর্ত্তমান যুগের মনুষ্যসৃষ্টিতেই কি ক্রমোন্নতি-শক্তির পর্য্যবসান হইয়াছে? তাহাই যদি হয় তবে এ ক্রমোন্নতির অর্থ কি? নিকৃষ্টতম হইতে উৎকৃষ্টতমের বিকাশ কি এই বর্ত্তমান যুগের মানব? মানবসৃষ্টিতেই যদি সৃষ্টিকার্য্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে তবে ক্রমোন্নতিবাদের প্রতি আর শ্রদ্ধা থাকে না। এই ক্ষুদ্রশক্তি রুদ্ধদৃষ্টি সর্ব্বদা দুঃখ দৈন্য আকাঙ্ক্ষা-নিপীড়িত মানব কখন চরম উৎকর্ষের আদর্শ হইতে পারে না।

যদি বলা যায়, মানবের বর্ত্তমান অবস্থা তাহার উৎকর্ষের চরমবিকাশ নহে; তাহার সম্মুখে 'অনন্তকাল, অনন্ত উন্নতি পড়িয়া রহিয়াছে; তাহাকে ক্রমোন্নতির পথে সৃষ্টির শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে হইবে;—যদি এইরূপই বলা হয় তাহা হইলে সেই একই সমস্যা একই রহস্য থাকিয়া যায়। গীতার সেই চরম কথা মনে পড়িয়া যায়—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥

(হে ভারত, জীব সকলের আদি ও অন্ত উভয়ই অপরিজ্ঞাত, কেবল মধ্য ভাগ অর্থাৎ পার্থিব অস্তিত্ব মাত্র ব্যক্ত; সুতরাং সে বিষয়ে বৃথা পরিদেবনার প্রয়োজন কি?) গীতায় এই কথা যে অর্থে উক্ত হইয়াছে তাহার যুক্তিমত্তা এ স্থলে বিচার্য্য নহে; শ্লোকটী স্বাধীনভাবে অর্থাৎ পূর্ব্বাপর সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পাঠ করিলে যে অর্থ প্রতীতি হয়, এ স্থলে আমরা তাহারই কথা বলিতেছি। যখন 'আগাগোড়া' কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না তখন মাঝখানের সামান্য একটুখানি লইয়া মিছা গণ্ডগোল করায় লাভ কি? ক্ষেত্র অনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া গেলেই হইল!—শ্লোকটীর অর্থ সাধারণ ভাবে এইরূপই হয়; এবং মনুষ্যসমাজের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে মনুষ্য জ্ঞানবিজ্ঞানে যতই না কেন অগ্রগামী হউক, সে বর্ত্তমানে কার্য্যতঃ ইহাই করিতেছে। মাঝের এইটুকু লইয়াই যত আশা, যত আকাঙ্ক্ষা—এই ভীষণ সংগ্রাম।

যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥

দিন দিন অসংখ্য লোক যমমন্দিরে যাইতেছে ;—এই যমমন্দির বা পারলৌকিক জীবনের সন্ধান লইতে কয়জন মানব সচেষ্ট? তাহারা এই মাঝখানের এইটুকু লইয়াই ব্যস্ত—পার্থিব অস্তিত্বকেই স্থির, চিরস্থায়ী, অসীম স্থির করিয়া পার্থিব সুখান্বেষণে লালায়িত। সংসারে প্রবেশমুখে মনোমোহন চাকচিক্য দেখিয়া উৎফুল্ল জীব এরূপ অভিভূত হয় যে পশ্চাতে ফিরিবার অবকাশ বা প্রবৃত্তি তাহার থাকে না ;—আদির সন্ধান লওয়া আর ঘটিয়া উঠে না। নাই উঠুক,—যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য 'পরিদেবনা'য় আর লাভ কি? বেশ, কিন্তু যে কোন মুহূর্ত্তে এই মদিরাময় সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার অবসরও মিলিবে না—ইহা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও ত ভবিষ্যতের যবনিকা উত্তোলিত করিয়া পাথিব জীবনের পরপারে দৃষ্টি করিবার আগ্রহ তাহার হয় না। সে ত এই মধ্যমাত্র লইয়াই আত্মহারা—তন্ময়!

তাই বলিতেছিলাম এই ক্রমোন্নতিবাদ কি? ক্রমোন্নতির ক্রিয়া কি কেবল ভৌতিক শরীর নির্ম্মাণের উৎকর্ষবিধানে পর্য্যবসিত? আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধন কি ইহার সাধ্যাতীত? তাহা যদি হয় ত মানব জীবশ্রেষ্ঠ হইয়াও প্রকৃত উৎকর্ষ করিবে কিরূপে? তাহাকে ত অনন্তকাল এই মধ্যপথেই ছুটাছুটি করিয়া মরিতে হইবে! তাহার বুদ্ধি, তাহার অধ্যবসায়, তাহার অভিজ্ঞতা সকলই ত নিরর্থক হইবে! কিন্তু তাহাই কি স্রষ্টার অভিপ্রেত? না—কখনই নহে! কারণ তাহা যদি হইত তাহা হইলে এই উন্মাদকর জীবন-সংগ্রামের মধ্যে থাকিয়াও তাহার মনে কি এক অব্যক্ত বেদনা থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া উঠিত না। কোন্ সুদূর অতীতকাল হইতে মানবের মনে এই অব্যক্ত বেদনার অস্ফুট সঞ্চার হইয়াছে তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু ইহার যথেষ্ট নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বপ্রাচীন জাতির ইতিহাসের প্রারম্ভেই এই অব্যক্তবেদনার সঞ্চার সূচিত হইয়াছে; এবং তাহার নিবারণকল্পে, তাহার স্বরূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টার নিদর্শন আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাদের বেদ উপনিষৎ প্রভৃতিই এই নিদর্শন। অন্যান্য জাতির ধর্ম্মমতের ভিত্তিতেও এই বেদনার অনুভূতি এবং তাহা দূরীকরণের যথাসাধ্য প্রয়াস। কিন্তু ক্রমোন্নতি এই আগ্রহ এই প্রয়াসের পরিপুষ্টিকল্পে কোন সাহায্য করিয়াছে

বলিয়া বোধ হয় না। পরন্তু বর্ত্তমানে মানবসমাজের গতিবিধি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বরং ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই মধ্যপথেই কি মানবের অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ রহিবে? তাহার কি কোন নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থান নাই? নাই বা কিরূপে?—যে চলিয়া যায় তাহার অবশ্যই একটা গন্তব্য স্থান আছে। আমাদেরও আছে—অবশ্য আছে; এবং আমরা সকলেই—যে যে ভাবে হউক সেই স্থানেই যাইতেছি। কিন্তু অন্ধের মত লক্ষ্যহীনভাবে চলিয়াছি! ইহাই বিড়ম্বনার চরম। হায়, গর্ব্বান্ধ মানব! তুমি আপনাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠসম্পদ্ আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হও না; কিন্তু তুমি এমনই অজ্ঞ, এমনই অপদার্থ যে তুচ্ছ ক্রীড়নক-প্রিয় শিশুর ন্যায় এই স্বল্পবিস্তর মধ্যপথের অচিরস্থায়ী শোভায় আত্মহারা—আপনার গন্তব্য স্থানের প্রতি লক্ষ্য হারাইয়াছ! কেন এ দুর্ম্মতি—কি জন্য এ দুর্গতি? আমাদের বোধ হয় অনাবশ্যক সুখলিপ্সা এবং সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতাই ইহার একমাত্র কারণ। বর্ত্তমানে বৈভববিলাসের আবর্ত্তে পড়িয়া বিভ্রান্ত মানব লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে; আত্মসর্ব্বস্ব পাশ্চত্য সভ্যতার কুহকে পড়িয়া চির-মুমুক্ষু ভারত-সন্তানেরও আজ কি দুর্দ্দশা! তাই বলিতেছিলাম এই মধ্যপথে আর কতকাল পড়িয়া থাকিব? এ মোহনিদ্রা কত দিনে ভাঙ্গিবে? কত দিনে আবার অমৃতের পুত্রগণ আনন্দবিহ্বলকণ্ঠে গাহিয়া উঠিবে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥ *

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র প্রধান বি, এ

দৃশ্য।

রয়েছে দাঁড়ায়ে আজি হে মহারাজন্
চির-কাঙ্গালের বেশে অনন্ত গগন,
তোমার অক্ষয় কক্ষে করিতে বিশ্রাম
উদার আলোক-ক্ষেত্রে পাতি পুষ্পদাম।

---

* আমি অন্ধকারের পরপারে, এই আদিত্যবৎ উজ্জ্বল মহান্ পুরুষকে দেখিয়াছি। এই পুরুষেরই স্বরূপ অবগত হইয়া জীব মৃত্যু হইতে মুক্ত হয়েন। ইঁহাকে জানা ভিন্ন পরমপদ প্রাপ্তির আর দ্বিতীয় পথ নাই।

ঊর্দ্ধ হ'তে মহা ঊর্দ্ধে প্রতি রেণু ল'য়ে
স্বচ্ছল আনন্দধারা যেতেছে বহিয়ে
উচ্ছ্বসিত আবেগের কলকণ্ঠ সনে—
গুঞ্জরণ-মুখরিত মধু-কুঞ্জবনে।
এ গৌরব-দীপ্তিময় সৌম্যরাগ পরে,
তোমার বিধান দণ্ড খরখড়্গ ধরে,
অব্যক্ত বেদনাধারা ঢালিছে পুলকে
শিহরি প্রলয়-রশ্মি হাসিছে চৌদিকে।
এ মলা রুচির লিপ্ত বিস্ফুলিঙ্গ লেখা
মঙ্গল-আসনে মাখি অরুণের রেখা
নীরবে নিতেছে তুলি নিয়তি আলোকে
পিচ্ছিল তিমির হ'তে ; প্রতি বুকে বুকে
নিখিল অভয়-মন্ত্রে আনন্দ মর্ম্মর
জাগায়ে তুলেছ তব রহস্য অপার।

শ্রীন—

আর্য্য-ললনা।

১।—উমা।

ভারতবর্ষের উত্তরসীমান্তে হিমগিরি বিরাজিত। ইহার চিরতুষারাবৃত গগনস্পর্শী শৃঙ্গরাজি, নানাবর্ণবিচিত্র পুষ্প ও ফলভারাবনত শ্যামল তরুকুল-সুশোভিত কটিদেশ ও ভূরিশস্য-সম্পদ্‌শালিনী পাদদেশ যেন শান্তি, সুখ ও ভোগের মূর্ত্তিমান্ আদর্শের ন্যায় শোভা পাইতেছে। বহুশিখর-সমন্বিত গিরিবরের দেবডঙ্কা, কাঞ্চনজঙ্ঘা ও গৌরিশঙ্কর শৃঙ্গই উচ্চতায় এবং সৌন্দর্য্যমাহাত্ম্যে সকলের শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বাপর সমুদ্রাবগাহি ভুজসমন্বিত হিমালয়ের বিশাল অবয়বের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় যেন এক ত্রিচূড়মুকুটপরিহিত বিরাট্ পুরুষ আসমুদ্র বাহুদ্বয় প্রসারণপূর্ব্বক পূর্ব্ব ও পশ্চিমোপকূলরূপ চরণদ্বয় বিস্তার করত শিশুতনয়ার ন্যায়, ক্রীড়াপরায়ণা ভারতকে অঙ্কে ধারণ করিয়া, ঈষৎ অবনমিত

বদনে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন। ফলতঃ একটুকু অনুধাবনপূর্ব্বক দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে হিমালয়ের অস্তিত্বই ভারতের প্রাকৃতিক, লৌকিক, সামাজিক ও সর্ব্ববিধ সুখশান্তির আস্পদ। বিশ্বসৃষ্টির প্রাকাল হইতেই ভারত হিমালয়ের পদানত। তাই হিমালয়ের সহিত ভারতের ও ভারতের সহিত হিমালয়ের সম্বন্ধ সর্ব্বতোভাবে বিজড়িত ; সুতরাং জ্ঞানে, ধর্ম্মে, ইতিহাসে ও প্রাকৃতিক ঘটনাপরম্পরায় হিমগিরি ভারতের সহিত সুসংশ্লিষ্ট।

অতি পূর্ব্বকালে যখন পৃথিবীর সৃষ্টি নূতন আরম্ভ হইয়াছিল তখন ধরিত্রীর অপর পৃষ্ঠস্থ আন্দিস পর্ব্বতমালা ভূতধাত্রীর মেরুদণ্ডস্বরূপে বিরাজমান থাকিলেও বক্ষপঞ্জরের মধ্যাস্থির ন্যায় হিমবান্ ধরণীর হৃদয়রূপিণী ভারতকে স্বীয় অঙ্কাধারে আসীন রাখিয়া যাবতীয় গিরিকুলের প্রধান স্বরূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন।

হিন্দুর শাস্ত্রপূত চক্ষে সমস্ত পদার্থই চৈতন্যময়। স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত পদার্থই কোনও না কোনও চৈতন্য-কেন্দ্রের অভিব্যক্তি বলিয়াই উহা তত্তৎ চৈতন্যকেন্দ্রের দেহরূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানবিৎ ডাক্তার জগদীশ-চন্দ্র বসু মহাশয়ের অভিনব আবিষ্কারের ফলে যখন যাবতীয় ধাতব পদার্থের মধ্যেই প্রাণ-শক্তির খেলা প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন ঋষিদিগের ধ্যানপূত সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যে যে সকল বস্তুর অন্তরালেই চৈতন্যের অস্তিত্ব প্রতিভাত হইত তাহাতে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। অপিচ পুরাণাদির বর্ণনা অভিনিবেশপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্ব্বপ্রকার পদার্থের অন্তর্নিহিত চৈতন্যই দেবতা বা তাহাদিগের অংশরূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে শক্তি বিশাল বিশ্বদেহে একটী প্রাকৃতিক নিয়ম বা দেবতারূপে সংজ্ঞিত তাহাই বিশিষ্ট জীবদেহের এক একটী শক্তি-সংজ্ঞায় অভিহিত ; এবং এই বিরাট্ বিশ্বশক্তিই বিশিষ্ট কেন্দ্রীভূত শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাই পুরাণাদি বর্ণিত দেবতাদিগকে —তাহাদিগের রূপবর্ণনানুসারে—আমাদের ন্যায় করচরণ-সম্পন্ন স্থূল মানবরূপে গ্রহণ না করিয়া তাহাদিগের তথা-কথিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি চৈতন্যের এক একটী বিলাসভাবে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে "দেবতার বেলা লীলাখেলা ; দোষ কেবল মানুষের বেলা" কথাটির উৎপত্তি অসম্ভব হইয়া পরে। অপিচ অরূপ চৈতন্যের রূপ-বর্ণনা কেবল স্থূলভাবাপন্ন স্বল্প মেধাবীর বোধসৌকর্য্যার্থেই বিহিত হইয়াছে।

হিমালয় পর্ব্বতের অধীশ্বরই পুরাণবর্ণিত গিরিরাজ, গিরিরাজ হিমবান্ সমগ্র

গিরিপ্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন। ঋষি, মুনি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, চারণ ও যক্ষগণ তদীয় বিশাল সাম্রাজ্যের নানাপ্রদেশে বাস করিত। গিরিরাজ সকলকেই যথোচিত যত্নে প্রতিপালন করিতেন। অদ্যাপিও ঋষি দেবতা ও যক্ষগন্ধর্ব্বাদি তাঁহার আধিপত্যে নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছেন। কখনও কোনও সত্ত্বসম্পন্ন ভাগ্যবান্ মানব তাঁহাদিগের দর্শনলাভ করিয়া থাকেন।

মেরুগিরির যেইদিক্ ধ্যানপরায়ণ যোগীর ন্যায় সপ্তর্ষিমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী ধ্রুবলোকের অভিমুখী হইয়া রহিয়াছে তাহার নাম সুমেরু। সুমেরুর বিশেষত্বনিচয় ও তাহার চিরতুষারভূষিত প্রাকৃতিক শোভাসম্পদের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাকে ধরণীর শীর্ষস্থানীয় বলিয়া বর্ণনা করা অসঙ্গত নহে। গিরিরাজ হিমবান্‌ই সেই সুমেরু-রাজতনয়ার ভর্ত্তা হইবার উপযুক্ত পাত্র। সুমেরুরাজনন্দিনী, গিরিরাজ-মহিষী মেনকার মুনিজনসুলভ সুসংযতহৃদয়রাজ্যবাসী সকলের প্রীতি ও কল্যাণ সাধনে তৎপর। তদীয় পবিত্র চরিত্রগুণে তিনি মুনিগণেরও মাননীয়া ছিলেন। গিরিরাজের একমাত্র পুত্র মৈনাক প্রাপ্তবয়স্ক হইলেও বহুকাল পর্য্যন্ত কোনও সন্তান জন্মগ্রহণ না করাতে কন্যাসন্তানাভিলাষী গিরিরাজদম্পতি জগন্মাতার আরাধনা কবিতে লাগিলেন, সর্ব্বজীবেই সেই চৈতন্যময়ীর আধার জানিয়া দেবতা, ঋষি ও সর্ব্বজীবের তৃপ্তিবিধানের নিমিত্ত যথাবিহিত যজ্ঞ তপ ব্রতাদি আচরণ করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষ, প্রজা সৃজনে অভিনিবিষ্ট হইয়া স্বীয় পত্নী প্রসূতির গর্ভে বিশ্বের নানাবিধ ভাবরাশির আধারভূতা নক্ষত্রকুমারীগণের জন্মদান করিয়া তাহাদিগকে বিশ্বের মানসপ্রতিম শশাঙ্কে পরিণীত করিলেন। কিন্তু ইহাতেও বিশ্ব ঠিক সৃষ্ট হইল না দেখিয়া স্বীয় শক্তির দ্বারা জগৎপ্রসূতির স্থূলাবয়ব সৃজন করত সতীরূপিণী নিজ দুহিতাকে শুদ্ধ অহঙ্কার-মূর্ত্তি মহাদেবে সম্প্রদান করিলেন। শিব সতীসঙ্গে পরমানন্দে অবস্থিত হইলেন, বিশ্বে তাহার আবির্ভাব হইল না। সেই নিমিত্ত বিশ্বস্রষ্টাগণের যজ্ঞক্ষেত্রে দক্ষ শিবের অবমাননা করিলেন। সতী শিবের অবমাননাবশতঃ দক্ষের শিববিরহিত বার্হস্পত্য যজ্ঞে স্বীয় স্থূল-কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। বাহ্যজ্ঞানহীন শঙ্কর সতীর চিন্ময়রূপে নিমগ্ন থাকিলেও সতীর স্থূলদেহ বহন করত প্রাকৃতিক প্রলয়ে নিদ্রাগত, তমসাচ্ছন্ন জগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কল্পাবসানে, নবীন জগতের জাগরণসময়ে চক্রপাণি নারায়ণ স্বীয় বৈষ্ণবীমায়া প্রভাবে সতীদেহ বহু অংশে বিচ্ছিন্ন করত ধরণীর বহুক্ষেত্রে বিন্যস্ত করিলেন। সতীদেহাংশলব্ধস্থান-সমূহ

পৃথিবীর মহাতীর্থে পরিণত হইল। এই সকল মহাপীঠনিচয় বক্ষে ধারণ করিয়াই ধূলার ধরণী জগতের আধারভূতা ক্ষিতিরূপে গরীয়সী হইলেন। বিশ্বের মহাকাল রাত্রিতে, মহাপ্রলয়ের মহাশ্মশানে সতীর প্রাকৃত কলেবর লইয়া একমাত্র শঙ্কর জাগরিত রহিলেন। সেই কালনিশির অবসান আগত দেখিয়া তিনি সতীদেহ-বিরহিত হইয়া আত্মস্থ হইলেন।

এদিকে নবজাগরিত বিশ্বের, অচল রাজ্যের কোনও প্রশান্ত দেবদারুদ্রুম-শোভিত মালভূমিতে শঙ্কর আত্মযোগে সমাহিত হইলেন। বিশ্বাত্মা, বিশ্বাদ্য ও বিশ্ববীজ মহাদেব আত্মযোগ অবলম্বন করিলে ঋষি ও দেবতাগণও তাঁহার সহিত অন্তর্ম্মুখী হইয়া বহিঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিরহিত হইতে লাগিল। মহাদেব বিশ্বাত্মা—বিশ্বের আত্মা—সকল জীবের আত্মা বা বিশেষ 'আমি' ভাবটী তাঁহার সহিত সমতানে আত্মস্থ হইতে দেখিয়া লোকপিতা চতুরানন—যিনি পরব্রহ্মের মানসরূপে আখ্যাত—দেবতা ও ঋষিগণ সমভিব্যাহারে কৈলাসোপকণ্ঠে আগমন-পূর্ব্বক চৈতন্যময়ীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। পরমাত্মা শঙ্করকে বহির্ম্মুখী করিয়া লীলার বিলাসে লগ্ন রাখিতে না পারিলে সৃষ্টি সংরক্ষিত হয় না; আর চৈতন্যময়ী মহামায়া ব্যতিরেকে তাঁহার সহিত লীলাক্ষমাই বা কে? দেবতাগণের প্রতি প্রসন্না হইয়া দেবী অন্তরীক্ষে প্রকটিতা হইয়া তাঁহাদিগকে অভয়দানপূর্ব্বক নগাধিরাজ-নন্দিনীরূপে হিমালয়ে আবির্ভূতা হইবার অভিমত প্রকাশ করিলেন।

এ সময়ে ঐকান্তিক প্রার্থনাপরায়ণ গিরিরাজের মানসক্ষেত্রে মহামায়ার আবির্ভাব হইল; গিরিরাজমহিষীর হৃদয়েও জগন্মাতা প্রকটিতা হইলেন। একদা গিরিরাজমহিষী হিমবানকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মহারাজ, আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিলাম:—দেখিলাম জগজ্জননী যেন বালিকারূপে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিলেন 'মা, আমি যে তোমার মেয়ে; আমাকে কোলে কর মা'!" এই সংবাদ শ্রবণে গিরিরাজ পরমানন্দ লাভ করিলেন। অচিরেই কন্যারূপিণী জগদম্বা মেনকার জরায়ু-শয্যা পরিত্যাগ করত নগরাজভবনে আবির্ভূতা হইলেন।

আজ জগৎপালিনী নারায়ণী কন্যারূপে মেরুরাজ-নন্দিনীর অঙ্কে শায়িতা। ধরিত্রীর হৃদয়স্বরূপ ভারতক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাস্বরূপ হিমালয়পুরে, মেরু-তনয়ার অঙ্কে সৃষ্টিসংরক্ষণের জন্য চৈতন্যময়ী জগন্মাতা নারায়ণী আবির্ভূতা! চৈতন্যময়ী মহামায়া কেন্দ্রীভূতা হইয়া ধরিত্রীর অঙ্কে অধিষ্ঠিতা হইলেন, আজ জগন্মাতাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া ধরণীর ধরিত্রী নামের স্বার্থকতা সম্পাদিত হইল।

আনন্দময়ীর আবির্ভাবে সমগ্র জগৎ সুপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, দিক্ সকল নবোদ্ভাসিত বালার্ককিরণ-রঞ্জিত নানাবর্ণে বিচিত্রিত জলদপতাকায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। গিরিরাজভবন তনয়ার জন্মোৎসবে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। স্থানে স্থানে ঋষিগণের গ্রামত্রয়সংবাদিনী প্রণবরাগপুটিত বেদধ্বনি, চারণগণের স্তুতি গান, সুকণ্ঠ গন্ধর্ব্বগণের তাল-মান-লয়-সমন্বিত সঙ্গীত ও নৃত্যপরায়ণ অপ্সরাগণের নূপুর ও বাদিত্র ঝঙ্কারে গিরিরাজপুর মুখরিত ও গিরিতনয়ার দর্শনাভিলাষি দেবদেবীগণের নানাবিধ যান ও বিমানাদির স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষে দিগঙ্গন কোলাহলময় হইয়া উঠিল। অন্তঃপুরচারিণী ঋষিপত্নীগণের মাঙ্গল্য আশীর্ব্বাদ, হুলুধ্বনি ও মরালগামিনী দেবীগণের নূপুরসিঞ্জিত মৃদু পাদক্ষেপে চিরস্থির গিরিরাজপুর অন্তরে বাহিরে আনন্দের হিল্লোলিত নিত্য নিকেতন শোভা ধারণ করিল। অপরিসীম লাবণ্যময়ী গিরিরাজতনয়ার রূপ দর্শনে কাহারও দর্শনলালসা তৃপ্ত হইল না; পরন্তু উহা কেবল উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিতই হইতে লাগিল। সকলেই সেই অপরূপ রূপের খনি গিরিরাজনন্দিনীকে নিত্য নিত্য অভিনব রূপের লাবণ্যছটায় বিমণ্ডিত দর্শন করিতে লাগিল।

ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই জগজ্জননী প্রাকৃত বালিকার আচরণ করিলেও তদীয় প্রসূতি সহসা তাঁহাকে সামান্যভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তাই তনয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াই আকারান্ত প্রণবধ্বনির ন্যায় যে শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ জ্ঞানে তাঁহাকে ওঙ্কারের প্রত্যক্ষমূর্ত্তি ভাবিয়া তন্ময় হইলেন। এবং বাহ্যসংজ্ঞাবিরহিতা হইয়া মূৰ্চ্ছিতার ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। পরে সচেতন হইয়া তনয়ার বাহ্যরূপ দর্শনে তাঁহার প্রতি প্রীতিবশতঃ তাঁহাকে 'উমা' নামে অভিহিত করিলেন। 'উ' শব্দের একটি অর্থ তপস্যা ও 'মা' নিষেধ বাচক বাক্য। তনয়া জন্মমাত্র একাক্ষর ব্রহ্মনাম প্রণব উচ্চারণ করিতেছেন দেখিয়া জননী যেন তাঁহাকে "উমা" বাক্যে তপশ্চরণে নিষেধ করিলেন—

* * * *

উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা
পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম॥

কবিবর কালিদাস তাঁহার অমৃতনিস্যন্দিনী ভাষায় উমার নামকরণপদ্ধতি এই প্রকারে বিবৃত করিয়াছেন। অপিচ উপনিষদ্ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে উমা শব্দে একাক্ষর ব্রহ্মনাম প্রণবেরই লক্ষণা দৃষ্ট হয়। প্রণবের তিনটী মাত্রা অ, উ এবং ম। অকার আদি স্বর; সকল স্বরই ইহার বিভিন্ন মাত্রায় রূপান্তর মাত্র।

সকল ব্যঞ্জনাই অকারযোগে প্রকাশিত হয় বলিয়াই অকার সর্ব্বপ্রকাশক। ব্রহ্মচৈতন্যে সর্ব্বাদি ও সর্ব্ব প্রকাশক মাত্রা তাই অকারে ইঙ্গিত। উকার শক্তিমাত্রাযোগে অকারেরই রূপান্তর। ইহাতে প্রকাশের বিশিষ্টতা বিজ্ঞাপিত, ইহা আদি বা আরম্ভ নাই, প্রকাশ বা স্থিতি আছে এবং ইহা লয়ের অভিমুখী। 'ম্' বা অনুনাসিক স্বর লয়মাত্রা জ্ঞাপক উহাতে বিশেষ প্রকাশ মাত্রা আকার যোগে উমাশব্দ নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং সম্পূর্ণ 'উমা' শব্দটী শক্তিস্বরূপিণী পরব্রহ্মময়ীকেই বিশিষ্ট নাম রূপের ভিতর দিয়া ইঙ্গিত করে। ফলতঃ যিনি অবাঙ্মনসগম্যা, বিশিষ্ট জগতে তাঁহাকে দেখিতে হইলে উমা শব্দের প্রতিপাদ্য রূপ ব্যতীত দেখিবার সাধ্য নাই।

গিরিরাজ ও তদীয় মহিষীর বাৎসল্য পুঞ্জীভূত হইয়াই যেন উমার বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার অপরূপলাবণ্যময়ী কলেবরেব অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করত তাহাতে নানাপ্রকার লালনশোভার অভিনিবেশ করিতে লাগিল। উমা যখন সমবয়স্কা সখীগণে পরিবৃতা থাকিয়া ক্রীড়াপুত্তলিকার বাৎসল্যাদি বহুবিধ সাংসারিক ভাবের অভিনয় করিতেন, তদ্দর্শনে সকলেরই প্রাণ পুলকপ্রবাহে পরিতৃপ্ত ও আপ্যায়িত হইত। সেই বালিকার হৃদয়সুপ্ত মাতৃভাব তাঁহার সর্ব্বজীবপোষিণী জগন্মাতৃত্বের ইঙ্গিত করিত। নারীরূপে যে তাঁহারই মাতৃভাব সমগ্র জগতে বিতত রহিয়াছে। জগতের যাবতীয় স্ত্রীমূর্ত্তি যে তাঁহারই রূপ! বঙ্গরমণি, তোমরা যে মায়ের জাতি, তাহা বিস্মৃত হইও না, বঙ্গের গৃহে গৃহে কুমারীরূপে তোমাদেরই উমামূর্ত্তির অর্চ্চনা হইয়া থাকে! হায় দুর্ভাগ্য বঙ্গসমাজ, তোমরা উমা, অম্বিকাদিরূপে নারীমূর্ত্তিতে জগদম্বার অর্চ্চনা ত্যাগ করিয়া, দুটা মুখের কথায়, একটু নাটুকে নম্রতার অভিনয় দেখাইয়া রমণীকে কি সম্মান করিবে? যে বঙ্গগৃহে রমণী কৌমারে গৌরী, উমা, শঙ্করী, সধবা অবস্থায় অম্বিকা ও বৈধব্যে বিমলারূপে সর্ব্বাবস্থায় সমর্চ্চিতা, একটু ভোগবিলাসের পূতিগন্ধময়ী উপচারে তাঁহার কি অর্চ্চনা করিবে? জননি বঙ্গরমণি, মা তোমরা স্বধর্ম্মনিরত সাধু বাঙ্গালীর ঘরে আজও কৌমারে ব্রতপরায়ণা গৌরীরূপে, যৌবনে অন্নপূর্ণারূপে, বার্দ্ধক্যে সন্তানগণপরিবৃতা ষষ্ঠীরূপে সুপূজিতা হইয়া আসিতেছ; মা, তোমার সেই মণিকাঞ্চনবিভূষিত মাহার্ঘ্য পঙ্কজমালার পরিবর্ত্তে সামান্য বিলাসভোগের চটক্‌মাখান ডাকের সাজ কি তোমাদিগের শোভা পায়!! হীনরুচিপরায়ণা বর্ব্বর রমণীরাই ঐ প্রকার চ'কঝলসান কাচের সাজ ভালবাসে। ভদ্র উহাকে অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া যায়।

ক্রীড়াপরায়ণা বালিকা উমা প্রস্রবণকূলে ভ্রমণ করিতে করিতে নানাবিধ কানন কুসুমে বিভূষিতাঙ্গ হইয়া আপনাকে বনদুর্গা নামে অভিহিত করিতেন। কখনও বা নির্ঝরসৈকত প্রাপ্ত উজ্জ্বল কপোতডিম্বাকার উপলখণ্ডে :বাণলিঙ্গ মহেশ্বর কল্পনা করত বন্যকুসুমসম্ভারে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার ধ্যানে তন্ময় হইয়া যাইতেন। পরম তাপস মুনিগণও তাঁহার সেই সমাধি দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। হিমালয়সানুদেশে মন্দাকিনী নির্ঝরসন্নিহিত কাননভূমি তাঁহার ক্রীড়াচত্বর ও বন্য পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণিনিচয় তাঁহার ক্রীড়া সহচর ছিল। উমারত্ন লাভে পশুরাজ তাহার হিংস্র স্বভাব বিস্মৃত হইয়াছিল। উমার ক্রীড়া-ক্ষেত্রে মৃগেন্দ্রের অঙ্ক উপাধানে কুরঙ্গ সুখে নিদ্রা যাইত, নকুল ও বিষধর পরস্পরের দেহালিঙ্গন করত নৃত্য করিত। উমা যখন ভুজঙ্গভূষণবিভূষিত দেহে, শিখণ্ডবিমণ্ডিতশিরে সিংহপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সখীগণসমভিব্যাহারে পশুকুলের সহিত ক্রীড়া করিতেন, সেই অপ্রাকৃত সুমধুর লীলাকৌতুক দর্শন করিবার অভিলাষে পর্ব্বতনিবাসী সিদ্ধ-মুনিগণ নিয়ত ব্যাকুল থাকিলেও কদাচিৎ কোন ভাগ্যবানেরই তাহা নয়নগোচর হইত। কখন কখন বনভ্রমণক্লান্ত উমাকে স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া পশুরাজ নগেন্দ্রমন্দিরে লইয়া আসিত। তদ্দর্শনে পুরবাসিগণ বিস্মিতচিত্তে ভাবিত—"এ বালিকা কে? পূর্ব্বজন্মে ইনি নিশ্চয়ই কোন তপঃপরায়ণা মহাযোগিনী ছিলেন; কিংবা স্বয়ং শঙ্করগৃহিণী জগদম্বাই সুকৃতিমান্ মহারাজের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নতুবা হিংস্র বন্য পশুকুল ইঁহার এত বশীভূত হইবে কেন?" তাহা না হইবে কেন? তিনি যে চৈতন্যময়ী, সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপে যে তিনিই বিহার করিতেছেন! তাঁহার তুষ্টিতেই জগৎ তুষ্ট, তাঁহার তৃপ্তিতেই জগৎ তৃপ্ত! ফলতঃ গিরিরাজপুরে এমন কোনও জনপ্রাণী নাই যাঁহারা উমাতে অনুরক্ত নহে। এমন কি মৃন্ময় পুত্তলিকাও তদীয় করস্পর্শে জীবন্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। এইরূপ বাৎসল্য-প্রেমের আদানপ্রদানের মধ্যে উমা ক্রমশঃ শৈশবসীমা অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি নারদ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত মহাপুরুষ। তিনি তন্ময়তাপ্রাপ্ত হইয়া নিয়তই ভগবানে বিহার করিতেছেন। তিনি কখনও ভগবান্ হইতে ক্ষণকালের জন্যও বিচ্ছিন্ন হয়েন না। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে ঋষিগণ ভগবানের ভাবস্বরূপ অর্থাৎ ভগবানের ভাব যখন প্রকৃতির ক্ষেত্রে জীবের সমক্ষে প্রকটিত হয় তখন

প্রাকৃত জীব তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত স্থূলতর করিয়া ঋষিরূপে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়, অন্যথা বিশ্ব প্রকৃতির অতীত ও পর সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম ভগবদ্ভাব প্রাকৃত জীবের ধারণার অতীত। তাই যে জীব যে প্রকারের সাধক তাহার নিকট ভগবদ্ভাব তাদৃশ নামাঙ্কিত হইয়া ঋষিরূপে প্রকটিত হয়। নারদঋষি ভগবানের দ্বন্দ্ব—বা জীব ও ব্রহ্মে—মিলন ভাবের অভিব্যক্তরূপ। তাই সচরাচর পুরাণাদিতে নারদঋষিকে দ্বন্দ্ব ও কলহপ্রিয় দেখিতে পাওয়া যায়। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে জীব যখন ভগবানে মিলনোৎসুক হয় তখন তাহার সহিত সংসারের দ্রব্যক্রিয়া ও ভাবাদির সহিত কলহ উপস্থিত হয়। কাজেই যেখানে নারদের আগমন, সংসারে সেখানেই কলহ—সেখানেই ভাঙ্গা চুরা। আবার যেখানে ভগবানের সহিত জীবের বা পুরুষের সহিত প্রকৃতির মিলন সেখানেই দ্বন্দ্বপ্রিয় নারদঋষিকে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ যেখানে জীবে ভগবানে মিলন সেখানেই জীবে ও সংসারে বিচ্ছেদ—সেখানেই ঋষি নারদ আর যেখানে জীবে ও সংসারে মিলন সেখানে কেহ বড় সেই ঋষিটিকে নারদরূপে দেখিতে পান না; তাই বলিয়া সংসারের মিলনক্ষেত্রে সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃ ভগবদ্ভাবের কোনও অস্তিত্ব নাই বলিতে হইবে কি? না! সেখানে প্রকৃতির ক্ষেত্র সেখানে চৈতন্যময়ী কামেশ্বরী, কামজননী কামরূপা স্বয়ং রাজরাজেশ্বরীরূপে স্বয়ং বিরাজিতা থাকিয়া জীবকে বাসনারূপ অঙ্কুশাকর্ষণে আকৃষ্ট করত সম্মোহনাস্ত্রে অভিভূত করিয়া বিষয়ভোগে সর্ব্বৈব ব্রহ্ম বা সর্ব্বৈব আত্মারসে পরিপুষ্ট করিয়া তুলেন। তাই আমরা ভব-ভবানীর মিলনাভিনয়ের একাঙ্কে যেমন নারদঋষিকে দেখিতে পাই, আবার তাহারই অপরাঙ্কে সম্মোহনাস্ত্রযোজিত-কোদণ্ডধৃক্ মদনকেও দেখি। উমা-মহেশ্বরের লীলারঙ্গমঞ্চে উভয়েরই অভিনয়-মাধুর্য্য কান্তগুণে গৌরবান্বিত। চৈতন্যময়ী পরমা প্রকৃতি যেমন লীলাভিনয়ে সংসার সাজাইয়া নানারঙ্গের অভিনয়ে জীবকে মোহপাশে বদ্ধ করত সুখ-দুঃখাদি নানা প্রকারের ক্লেশাভিনয় করেন, তিনিই আবার বিশ্বাতীত পরা-প্রকৃতিরূপে অবাঙ্মনসাধিগম্যা সচ্চিদানন্দস্বরূপা ব্রহ্মময়ীরূপাধিষ্ঠিতা।

তাই গিরিনন্দিনী উমার যখন সাত বৎসর বয়ঃক্রম তখন একদা যদৃচ্ছাগামী পরম উদার দেবর্ষি নারদ শিব-সতীবিরহিত কৈলাসভবনে উপনীত হইয়া শ্রীহীন পুরদর্শনে চিত্তসংযমপূর্ব্বক ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। ধ্যানাধিগম্য পরম পুরুষের বিহারমূর্ত্তি শশিশেখরকে ধ্যানমগ্ন ও কুমারীরূপিণী জগন্মাতাকে গৌরী-রূপে নগেন্দ্রনগরে দর্শন করত তদীয় কলিকাজননীর বালিকালীলা প্রত্যক্ষের

স্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে গিরিরাজপুরে উপনীত হইলেন। তথায় গঙ্গাদ্বার প্রস্রবণের অনতিদূরে কন্দুকক্রীড়াপরায়ণা কাত্যায়নীর পার্ব্বতী-মূর্ত্তি অবলোকন করত আনন্দগদগদ ঋষিবর সাষ্টাঙ্গবিধানে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। পার্ব্বতী স্নেহকোপিত কুটিল বাক্যে কহিলেন—"বৃদ্ধ তাপস, তুমি কি বয়সের দোষে বিষয়বুদ্ধি হারাইয়াছ, যে আমাকে প্রণাম করিলে?"

নারদ। হাঁ বাছা তাই বটে; তুই বেটী যে জন্মদোষে বুদ্ধির হাঁড়ি হয়ে বসে আছিস্ তা'ত জানতে পারি নাই!

উমা। বটে! তুমি আমার জন্মের দোষ বল্লে! জান আমি কে? লোকে আমাকে গিরিরাজের মেয়ে বলে জানে, তা' জান ত? আমি এখনই বাবাকে বলে দিচ্ছি যে তুমি আমার জন্মের দোষ বলেছ; আর প্রণাম করে আমার অকল্যাণ করেছ! ভাল, বাবার কাছে চল; আমি তোমায় প্রণাম করব তবে ছাড়ব!

নারদ। তা' করিস্; আর যা বল্‌তে হয় বলিস্; আমি তোর বাবার রাজ্যে বাস করি না, তাতে আমার ভারি ভয়! বেটী তোর গোষ্ঠীতে কোন্ কালে কার জন্ম হয়েছিল? বল্‌তে পারিস্ তোর বাবাদের জন্ম আগে কি তোর জন্ম আগে হয়েছে? খুকী সেজে বুড়ীর ঢঙে বলা হচ্ছে "অকল্যাণ হবে!" বেটী কল্যাণীর কল্যাণী! চল তোর বাবার কাছে। আমাকে বুড়া বল্লি, জানিস্ আমি কে? আমি ঘটক! তোর জন্য এমন বুড়া বর আন্‌ব যে তার বড় আর কেউ হ'তে নাই।

এই প্রকার কৌতুকালাপে প্রীতিকোপিতা উমা সখীগণসমভিব্যাহারে দেবর্ষিকে সঙ্গে লইয়া হিমরাজসমীপে উপনীতা হইলেন। গিরিরাজ দেবর্ষিকে দর্শন করত ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ও পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয়াদি দ্বারা তাঁহার যথাবিহিত অর্চ্চনা করিলেন। ঋষিপ্রবর সুখোপবিষ্ট হইলে স্বয়ং আসন গ্রহণপূর্ব্বক পরস্পরে অনাময় প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পার্ব্বতী পিতার দক্ষিণস্কন্ধে বাহুবিন্যাস করিয়া দণ্ডায়মানা রহিলেন। গিরিরাজ উমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "মা তুমি দেবর্ষিকে প্রণাম কর নাই; তুমি ইঁহাকে প্রণাম কর!" দেবী তাহাই করিলেন। মহর্ষি ঈষৎ হাস্যসহকারে গিরিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ, আপনার এই বালিকাটীর বয়ঃক্রম কত?"

গিরি। এই ত সপ্তমবর্ষ অতিক্রম করিয়া মা আমার অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে।

নারদ। মহারাজ ব্যবহারশাস্ত্রে কথিত আছে—

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।
প্রদাতব্যা বরায় চ কুলশীলগুণান্বিতে॥

ইঁহার রূপ গুণ ও লক্ষণাদি দর্শনে ইঁহাকে জগতের আদর্শ সতী জগদম্বার মূর্ত্তি বলিয়াই বোধ হইতেছে। ভবিতব্যের নির্ব্বন্ধ সর্ব্বত্র অপরিহার্য্য হইলেও সাংসারিক ব্যাপারে গৃহীদিগের কতকগুলি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আছে। এই বয়স হইতেই ইঁহাকে যথাযোগ্য ব্রত নিয়মাদি শিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য

গিরি। দেবর্ষি, আপনি আমার হৃদ্গত ভাবেরই উল্লেখ করিলেন। আমিও উমার শিক্ষা সম্বন্ধেই ভাবিত হইয়াছিলাম। তাহাতে আপনার মত বিজ্ঞজনের আগমন আমার শুভাদৃষ্টের সূচনা করিতেছে। আপনি ত্রিকালজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ, লোকত্রয়ে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। সুতরাং কৃপাপূর্ব্বক ইহার যথোচিত ব্রতনিয়মাদির ব্যবস্থা উপদেশ করত আমাদিগকে কৃতার্থ করুন।

নারদ। কুমারীগণের পক্ষে অভিলষিত পতিকামনায় শিবারাধনাই প্রশস্ত ব্রত। পরন্তু একমাত্র শঙ্করারাধনা ব্যতিরেকে কেহই পরম শ্রেয়ঃ পথারোহণের অধিকারী হইতে পারে না। কারণ অন্তরাত্মারূপে তিনিই সর্ব্বত্র অধিষ্ঠিত তাঁহার তৃপ্তিতেই সকলে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। সুতরাং সেই শঙ্করের তৃপ্তিই সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধির প্রধান সোপান। তিনিই যে বিশ্বাত্মা ও বিশ্ববীজ— বীজে যেমন বৃক্ষের সত্তা প্রচ্ছন্নভাবে সন্নিবেশিত থাকে তেমনি তাঁহাতেই সৃষ্টির পূর্ব্বে ও পরে বিশ্ব অবস্থিত থাকে। পরিদৃশ্যমান বিশ্ব তাঁহারই অঙ্গের বিভূতি স্বরূপ। সেই শঙ্কর সতীদেহবিশ্লিষ্ট হইয়া অধুনা আপনার পুরের অদূরবর্ত্তী কেদারখণ্ডে তপস্যায় নিযুক্ত আছেন। আপনি ইঁহাকে সেই আত্মযোগী মহাদেবের সেবায় নিয়োজিত করুন।

পার্ব্বতী নারদের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় পুলকিতা হইলেন এবং বালিকা-সুলভ আগ্রহসহকারে বারম্বার পিতার নিকট শিবার্চ্চনের অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পিতাও যথাসময়ে তাঁহাকে শিবারাধনায় নিযুক্ত করিলেন।

নৈমিষারণ্যসন্নিহিত কেদারখণ্ডে দেবাদিদেব তপশ্চর্য্যায় নিরত। দেব-দারুদ্রুম-কুঞ্জের অন্তর্ব্বর্ত্তী শ্রীবৃক্ষমূলে, কুশাসনোপরি বস্ত্রমণ্ডিত অজিনাসনে, বীরাসনবদ্ধ মহেশ্বর অন্তশ্চর বায়ু সকলের নিরোধপূর্ব্বক প্রাণকে ভ্রূমধ্যে সম্যক্

আবেশিত করিয়া হৃদয়ে মনের নিরোধ করত আত্মগত রহিয়াছেন। বহির্ব্বিশ্বের সহিত তাঁহার সম্পর্ক রহিত। যোগকুঞ্জদ্বারে চিত্রার্পিতের ন্যায় হেমবেত্রধারী নন্দী ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলি স্থাপনপূর্ব্বক ইঙ্গিতে সমস্ত জীবের কোলাহলরোধের আদেশ প্রচার করিতেছেন। কাহারই নন্দীর আদেশ উপেক্ষা করিবার সাধ বা সাহস নাই। বস্তুতঃ মহাদেবের তপস্যাকুঞ্জ স্থৈর্য্যের গাম্ভীর্য্যে সেই চিরস্থির তাপসেরই অনুরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

এদিকে জনকাদেশলব্ধ গৌরী দুইটীমাত্র সহচরীসহ আসিয়া প্রত্যহ সেই যোগমগ্ন তাপসের অঙ্গসেবা ও পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ পার্ব্বতীর অনুরাগপূর্ণ সেবায় শশাঙ্কশেখরের ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি-সমূহ প্রফুল্লতা প্রাপ্ত হইয়াই যেন পরম উৎসাহ সহকারে অন্তর্ম্মুখী হইয়া ঘনতম আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। পরমাত্মা শিবই যে উমার পতি, উমা তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেন। সেই স্বতঃসিদ্ধ মহাযোগিনীর পক্ষে জন্মান্তর গ্রহণ একই দিবসের বিভিন্ন মুহূর্ত্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও লোকাচারসংরক্ষিণী উমা আদর্শরমণীর কর্ত্তব্যপালনে কখনও অবহেলা করিতেন না। শঙ্কর-সেবাই যে উমার একমাত্র ব্রত ও সকল সুখের নিদান উমার হৃদয় উল্লাসভরে তাহা বিজ্ঞাপিত করিলেও বাহ্যভাবে দেবী তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাবশতঃ তাহার রসাস্বাদে বঞ্চিত ছিলেন। এক্ষণে অন্তরে বাহিরে পতিসেবানন্দলাভে সতী অচিরেই তাহাতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন। শিব-সেবায় আনন্দপ্রবাহে পৌগণ্ড ও কৈশোর সীমা অতিক্রম করিয়া উমা যে কবে নব-যৌবনে পদার্পণ করিলেন তাহা তিনি বুঝিতেও পারেন নাই। ফলতঃ বহিরঙ্গ-দর্শনে আত্মপরিচয় লাভ করিতে হইলে উমা তাঁহার এই দেহ দর্শনে নিজকে চিনিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। এই সময়ে তাঁহার পঞ্চতপা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার এই অন্তরঙ্গ সাধন সখীগণেরও অবিদিত ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পার্ব্বতীর তপস্যাকৃশতনুও যৌবনের পূর্ণতালাভে বঞ্চিত রহিল না। বস্তুতঃ যৌবনসুলভ চাঞ্চল্যের স্থলে তাঁহার অনন্যসাধারণ স্থৈর্য্যের গাম্ভীর্য্য ও অন্তর্নিহিত যোগাগ্নি পরিশোধিত তেজঃপরিশোভিত দেহ যে কি অপরিমেয় লাবণ্য-জ্যোতিতে বিভূষিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত।

শিবধ্যান-জ্ঞান-পরায়ণা উমা একদা শিব-সন্নিধানে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহার বোধ হইল যেন তিনি পঞ্চপূতবহ্নি প্রজ্বালিত করত তাহার অভ্যন্তরে উপবেশনপূর্ব্বক মহাদেবের ধ্যানে নিমগ্না রহিয়াছেন। কত

মাস কত বর্ষ যে চলিয়া গিয়াছে তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই—তিনি যেন কালের অতীত নিত্য বর্ত্তমান রাজ্যে অবস্থিত আছেন—সহসা তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইলে তিনি যেন জনৈক অবধূত-বেশধারী পুরুষকে নিকটে দেখিতে পাইলেন। সেই পুরুষ যেন তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন "সুমুখি, কিজন্য তোমার এই অলোক-সামান্য বরতনু ও নব-যৌবনোদ্ভাসিত রূপরাশি কঠোর তপঃসাধনে ব্যয়িত করিতেছ? ভোগের জন্যইত এই ভোগায়তন দেহ সৃষ্ট হইয়াছে। তাহা এই প্রকারে অপচয় করা কখনও বিধেয় নহে।" তিনি তাঁহার বাক্যের সদুত্তর প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন "মহাত্মন্, আপনি যাহা কহিলেন তাহা যথার্থ; ভোগের নিমিত্তই এই ভোগায়তন দেহ সৃষ্ট; কিন্তু যিনি ইহার ভোক্তা তাঁহার সেবায় নিয়োগ করিতে না পারিলে সকলই বিফল হইয়া যায়। তাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিবার নিমিত্তই আমার তপস্যা। আশীর্ব্বাদ করুন যেন অচিরেই আমার সেই পরম দেবতা—আমার দেহ, কায়, মন ও বুদ্ধির অধীশ্বর—মহা-যোগেশ্বর শিব আমাকে তাঁহার পদাশ্রয় দানে কৃতার্থ করেন।" তখন সেই ছদ্ম-অবধূত শঙ্কর স্বরূপ প্রকটিত করিয়া কহিলেন "দেবি, তুমি শিবের সহিত নিরন্তর অভিন্নভাবে বিরাজিত আছ; তুমিই শিবের একমাত্র গ্রহণীয়া। বাহ্যব্যবহারে, লোকাচার-সিদ্ধির নিমিত্ত নিজকে শিব হইতে পৃথক্ কল্পনা করিলেও উহা কল্পনাই। যাহা হউক, তুমি সত্বর গিরিরাজসদনে গমন কর। অচিরেই শঙ্কর তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন।" দেহ ও দেহীর ন্যায়, বাক্য ও অর্থের ন্যায় পার্ব্বতী-পরমেশ্বর নিরন্তর সম্মিলিত থাকিলেও দেবী যখন দেহ ধারণ করত লৌকিক লীলায় নিরত থাকেন তখন কেবল জগজ্জনের প্রতি অনুকম্পাপ্রযুক্তই লোকশিক্ষার্থ এই সকল লৌকিক লীলার অভিনয় করিয়া থাকেন। ধ্যানান্তে সচকিতা পার্ব্বতী দিবাবসান হইয়াছে দেখিয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সখীগণসমভিব্যাহারে পিতৃভবনে প্রতিগমন করিলেন। পার্ব্বতী পর দিবস প্রত্যাগমনপূর্ব্বক শিবালয়ের ভাবান্তর প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার কিছুই বুঝিলেন না।

সতীবিরহিত শঙ্কর যখন তাঁহার বহির্দৃষ্টি সংযত করিয়া আত্মযোগ অবলম্বন করিতেছিলেন তখন রুদ্রতেজের সঙ্কোচ-নিবন্ধন লোকপালকগণ অতিশয় হীনবল হইয়া পড়িলেন। এই অবসরে আসুরিক শক্তি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। তারকাসুর তখন দেববল পর্য্যুদস্ত করত বিশ্বকে স্বায়ত্ত করিয়া লইল। দেবগণ তখন অনন্যোপায় হইয়া তুরাসাহসমভিব্যাহারে প্রজাপতির শরণাপন্ন হইলেন

ও তারক-সংহারের উপায় বিধানের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। কমলযোনি কহিলেন "হে বাসব, শঙ্কর বা শঙ্করাত্মজ ব্যতিরেকে এই আসুর শক্তি সংহনন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। শঙ্করতেজোদ্ভব স্কন্দ কর্ত্তৃকই ইহার নিধন হইবে। অতএব যাহাতে শঙ্করের সমাধিভঙ্গ হয় ও তিনি গিরিরাজনন্দিনীর প্রতি অনুরক্ত হয়েন সত্বর তাহার ব্যবস্থা কর। তমোঘন শঙ্করকে বহির্ম্মুখী করিতে হইলে হরনয়নানলে কন্দর্পকে আত্মাহুতি প্রদান করিতে হইবে। শিবজ্ঞাপুষ্ট হইয়া কাম তৎপ্রসাদে অনঙ্গ হইবে। সর্ব্বভূতে সূক্ষ্মতর কামের আকর্ষণ অনুভব করিয়া বহির্ম্মুখী আসুরী শক্তি ছিন্ন ও হীনবল হইয়া পড়িবে।"

দেববৃন্দ কমলযোনির আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহাদেবের সমাধি ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত অচিরেই বসন্তসহ রতি দ্বিতীয় মন্মথকে তদীয় আশ্রমোদ্দেশে প্রেরণ করিলেন।

নব বসন্তালিঙ্গনে তখন হিমগিরির উপত্যকাসমূহ অপরূপ শোভায় সুশোভিত হইয়া উঠিল। অচলরাজ হিমগিরির শষ্পসমাবৃত পাষাণকলেবরও যেন বসন্তস্পর্শে মুহুর্মুহু শিহরিত হইয়া, হরিতে হিরণে নানা বর্ণের অতুল সমাবেশ অভিনয় করিতে লাগিল। নব মুকুলিতা গুল্মলতিকাগণের পুষ্পপরিমলাভিলাষী মধুকরকুলের গঞ্জন ও চূতমুকুলাস্বাদকষায়কণ্ঠ কোকিলকুলের কুহুরবে শিবের শান্ত গম্ভীর তপঃক্ষেত্র সহসা কোলাহলময় অবলোকন করত বেত্রবান নন্দী কোনও ক্রমেই তাহার শান্তিবিধান করিতে না পারিয়া ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। মানবকুমারী মলয়ার প্রীতিপূর্ণ উষ্ণ নিশ্বাসবায়ু হিমগিরির তুষারশীতল পাষাণকায়াতেও স্বেদ সঞ্চার করিল দেখিয়া, মন্দাকিনী নির্ঝর সলিল কল্লোলরবে হাসিয়া উঠিল ও নির্ঝরবালা শ্লথ পাদক্ষেপ দ্রুত করিয়া উপলপ্রান্ত হইতে উপলান্তরে নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া সুরতরঙ্গিণীর সুনীল বপু আলিঙ্গনে আত্মবিস্মৃতা হইলেন। মলয় সমীরণ গিরিকন্দরে প্রবেশপূর্ব্বক কীচকরন্ধ্রে অধরারোপণপূর্ব্বক সুমধুর বংশীবাদন করিতে লাগিল। সেই প্রাণোন্মাদক মোহন বংশীরব-মোহিতা কিন্নর ও অপ্সরদম্পতিগণ যথাতথা যুগলে যুগলে নৃত্য করিতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ মুরজমন্দির-মৃদঙ্গ-মন্দ্রে কালোচিত সুমধুর সঙ্গীতে তান ধরিল। মৃদুকল্লোলনাদিনী মন্দাকিনী-প্রস্রবণ নীরে জলকেলি-পরায়ণ বারণযূথপতিকরধৃত কমলপত্রের আতপত্র দ্বারা মৃদুবৃংহিত হুলুধ্বনি সহকারে প্রমোদচকিত অভিনন্দিত করিলে কেলিকৌতুকপরায়ণা গজরাজবধূ গণ্ডূষমাত্র পঙ্কজরেণুগন্ধি সলিলসিঞ্চনে নাগরাজের অভ্যুদয় করিল। আনন্দোন্মত্ত

রথাঙ্গনামা অর্দ্ধোপভুক্ত মৃণালখণ্ড দ্বারা বধূর সম্ভাষণ করিলে, আনন্দ-মদোন্মত্তা গদভাষিণী চক্রবাকবধূ অভিরাম গ্রীবাভঙ্গিবিলাসে বিষথণ্ডবিভ্রমে পিয়ের চঞ্চুবদনে চুম্বন করিয়া ফেলিল। কমলপত্রপুটে মধুপানমত্ত, গুঞ্জন-পরায়ণা ভ্রমরদম্পতি উড্ডীন নৃত্য করিতে লাগিল। জল, স্থল, নভোমণ্ডল সর্ব্বতঃ মুখরিত, নানাবর্ণবিচিত্রিত কুসুমরাজির বর্ণচ্ছটায় দিগঙ্গন দ্যোতিত ও মলয় মারুতের সুখোষ্ণ মৃদুলস্পর্শে বনস্থলী পুলকিত হইয়া উঠিল। এই পুলকপ্রবাহে তদ্বননিবাসী সিদ্ধমুনিগণেরও প্রাণের অন্তরালে কি এক অভিনব সুখপ্রবাহ বহিতে লাগিল।

সেই আশ্রম-কাননপ্রদেশে বসিয়া যখন অকালবসন্তার্চ্চিতা বিশ্বপ্রকৃতি তদীয় রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধাদির আঢ্যতম বিলাসসম্ভারে বিভূষিত হইয়া সমাধি-মগ্ন মহেশ্বরের অভিনন্দনার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন—সেই সময়ে ফুল্লকুসুমদাম-বিভূষিতা হৈমবতী সখীগণসমভিব্যাহারে পূজোপকরণ গ্রহণ করত মহাদেবের তপঃকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। বসন্তবিজৃম্ভিত প্রাকৃতিক উল্লাসোদ্বেলিত গৌরী-হৃদয় কুঞ্জান্তরাসীন শান্ত, স্থির, শিবমূর্ত্তি দর্শনে এক অভিনব প্রসন্নতা লাভ করত অহৈতুকী প্রীতিপ্রবাহে শঙ্করাভিমুখে প্রবাহিত হইল। গৌরী শঙ্করকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার আসনসমীপবর্ত্তিনী হইলেন, তখন অনতিদূরবর্ত্তী পিয়ালদ্রুমমূলে, আকর্ণপূরিত সন্ধানে সম্মোহনাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক অবনত বামজানু মকরকেতন মহাদেবের হৃদয় লক্ষ্য করত শরসন্ধানের অবসর প্রতীক্ষা করিতে-ছিলেন। যখন গৌরী যোগমগ্ন শশাঙ্ক-শেখরের সমীপে পূজোপকরণ সংরক্ষণ করত তদীয় পাদবন্দনাভিলাষে গললগ্নীকৃতবাসে প্রায় অর্দ্ধাবনতা হইয়া-ছিলেন—যখন কি-জানি-কেন কি উল্লাসভরে বিমানবিহারী দেবতা-গন্ধর্ব্বকুল, সিদ্ধ ঋষিসঙ্ঘ সহসা হর জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল ও কাননবাসী পশু পক্ষী অপ্সর কিন্নরগণের হর্ষধ্বনির সহিত সমগ্র গুল্মলতাসহ বনস্পতিকুল ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল ও ধরিত্রীদেবী সহসা শিহরিয়া উঠিলেন—ঠিক সেই সময়ে মকরকেতন-মুক্ত শায়ক শঙ্করশরীর স্পর্শ করিল। শিব শিহরিয়া উঠিলেন, উমা ভূমিষ্ঠ প্রণতা হইলেন।

ত্রিপুরসংহনন সময়ে হর-শর যেমন একাঘাতেই পুরত্রয় যুগপৎ ভেদ করিয়া-ছিল, কন্দর্পও সেই প্রকার দেহ, কাম, মন ও বুদ্ধিকোষের অভ্যন্তরবর্ত্তী শুদ্ধ অহঙ্কারতত্ত্বাধিষ্ঠিত হরচৈতন্যকে সম্মোহনাস্ত্রের একাঘাতেই বহিঃপ্রকোষ্ঠে আনয়ন করিল। সেই প্রজ্ঞালোচন হরচৈতন্য জ্ঞাননেত্রপথে বহির্গত হইয়াই

মূর্ত্তিমান কন্দর্পকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইল। সেই একাগ্র প্রখর প্রজ্ঞাদৃষ্টির আত্ম-জ্ঞানোদ্ভাসিত দুর্দ্ধর্ষ তেজোরাশি প্রলয়কালীন বহ্নিশিখার ন্যায় কন্দর্পদেহ সমন্তাৎ আচ্ছন্ন করত ভস্মীভূত করিল। দগ্ধীভূত ধূপশলাকার সৌগন্ধসদৃশ কাম, হর-চৈতন্যসঙ্গপ্রসাদে অনঙ্গ হইয়া বিশ্বময় ব্যাপৃত হইয়া পড়িল ও তদীয় অঙ্গ ধূপভস্মের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত রহিল। অন্তরীক্ষবিহারী দেবগণ সেই বিশ্ববিধ্বংসী হরনয়নানল বড়বামুখে সমুদ্রে সন্নিবেশিত করিলেন।

এদিকে স্মরহর শঙ্কর নয়নোন্মীলনপূর্ব্বক আভূমিপ্রণতা উমাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্মিতপ্রসন্ন দৃষ্টিতে অভিনন্দন করত কহিলেন "কল্যাণি, তোমার জয় হউক। অগ্নির সহিত জ্যোতির ন্যায় অভিলষিত পতির সহিত সুসংশ্লিষ্ট দাম্পত্য সুখের অধিকারিণী হও।" মহেশ্বরের আশীর্ব্বাদলব্ধা পার্ব্বতী সানন্দহৃদয়ে তাঁহার পাদদ্বয় বন্দনপূর্ব্বক স্মিত-প্রসন্ন-বিনম্রবদনে তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন ও মহাদেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক নানাবিধ উপচারে তাঁহার সেবা করিলেন। বহু দিবসান্তে সুশীতল সলিলে স্নান, সুমিষ্ট পায়সান্ন ভোজন ও কর্পূরসুবাসিত সুশীতল গঙ্গোদক পানে যোগেশ্বরের দেহবৃত্তিসমূহ পরম পরিতোষ লাভ করিল। উমা মহেশ্বরের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সখীগণসমভিব্যাহারে পিত্রালয়ে প্রতিগমন করিলেন। শঙ্করও নন্দী সমভিব্যাহারে কৈলাসভবনে প্রতিগমন করিলেন।

সতীবিরহিত কৈলাসপুরী প্রতি পাদক্ষেপে শঙ্করের স্মৃতিপটে সতীকে প্রতি-ফলিত করিতে লাগিল। এই অবসরে দেবতা ও ঋষিগণের মুখপাত্র স্বরূপ দেবর্ষি নারদ শিবসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক গিরিরাজ-নন্দিনীরূপে সতীর জন্ম-কাহিনী কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। শম্ভু নগাধিরাজনন্দিনীর পাণিগ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

গিরিরাজপুরে আজ মহামহোৎসব। উল্লাসে ভূধররাজের অচল পুর যেন সচল হইয়া উঠিয়াছে। নানাবিধ সঙ্গীত ও বাদিত্র রবের সহিত পুরবাসিনীগণের মাঙ্গল্য শঙ্খ ও কলকোলাহলময়ী হুলুধ্বনি ও সিদ্ধগণের বেদগানে দিক্‌সকল মুখরিত। সপল্লব-পূর্ণকুম্ভসমন্বিত কদলীতরুশ্রেণী ও নানাবর্ণ বিচিত্রিত পুষ্প-পতাকাসমাকুল তোরণরাজিশোভিত রাজপথসমূহ আজ নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাগণের প্রমোদচঞ্চল গতিতে জীবন্ত শোভা ধারণ করিয়াছে। তাহাতে চন্দনসলিলসিক্ত, পাংশুসঙ্গবিরহিত সুগন্ধপবন মন্দগতিতে

প্রবাহিত ও মন্দাকিনী-নির্ঝরশীকরস্পর্শে শীতলতা প্রাপ্ত হইয়া স্থাবর ও জঙ্গমগণের দেহে ও মনে আনন্দের উৎস প্রবাহিত করিতেছে। সকলেই সর্ব্বেন্দ্রিয়-মানস-পরিতৃপ্ত আনন্দপূর্ণহৃদয়ে সেই চিরপ্রাচীন অথচ চির-নবীন আত্মস্বরূপ বরবেশধারী গিরিজামাতার আগমন প্রতীক্ষায় এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাকুল-স্থৈর্য্যের লীলাভিনয়ে, পরমপুরুষের সঙ্গাভিলাষি যোগিগণের শুদ্ধ একাগ্রচিত্ত-বৃত্তির ন্যায়, উৎসুক হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে বিশিষ্ট বিলাসবিহীন বহুত্ব যেন একত্বে কেন্দ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

রাজপ্রাসাদের বহিঃপ্রাঙ্গণে অমাত্য-বন্ধুগণবেষ্টিত গিরিরাজ গুরুজনদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া বরাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছেন। বরবেশধারী মহেশ্বরের অভ্যুদয়ের জন্য ঋত্বিক্ শ্রোত্রিয় ও স্নাতকগণ কুশহস্তে দণ্ডায়মান, ঋষি ও মুনিগণ স্থাণুর ন্যায় অচল প্রশান্তভাবে অবস্থিত।

পুরবাসিনী বর্ষিয়সীগণ লোকাচারবিহিত নানাবিধ মঙ্গলাচরণে নিরতা। সহচরীগণ মঙ্গলসলিলাভিস্নাতা বিশুদ্ধগাত্রী পার্ব্বতীকে পত্যাগমনযোগ্য নানাবিধ দৈবসম্পদ্-সুসম বসনভূষণে সজ্জিত করিতে করিতে মাঝে মাঝে তাহার অলৌকিক রূপচ্ছটায় বিমোহিত হইতেছে; তাহারা যেন দেবীর অনন্য-সাধারণ শ্রীসম্পদের মধ্যে এমনই একটী পরজ্যোতি দ্যোতিত দেখিতেছে যে তাহাতে তাহাদিগের প্রাকৃতজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। ঋষিপত্নীগণ ও দেবীগণ তাঁহাদের স্ব স্ব শ্রেষ্ঠতম সম্পদুপহারে গিরিকুমারীকে ভূষিত করিয়াও যেন তৃপ্ত হইতে পারিতেছেন না; কি যেন অপূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে। মূর্ত্তিমতী পরাবিদ্যা উমার রূপগুণ ও সৌভাগ্য সম্পদের নিকট তাঁহাদের সকল সম্পদ্ অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেলেও উমার সাহচর্য্যে যেন সকলেরই ভেদভাব ছিন্ন হইয়া এক অভেদ পূর্ণতায় ডগমগ হইয়া উঠিতেছে। সর্ব্বোপরি উমার পতি-অনুরাগপুলকিত দেহ, মন, চিত্ত সমতানতা প্রাপ্ত হইয়া যে কি এক অনির্ব্বচনীয় প্রভায় ভূষিত হইয়াছে তদ্দর্শনে সকলেই স্তম্ভিতা। এমন কি ত্রিলোকবিখ্যাত সতীশিরোমণিগণও তাঁহার অসামান্য সতীত্বগৌরবে স্ব স্ব ক্ষুণ্ণতা পরিপূর্ণ করিয়া পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন। কেবলমাত্র বসনভূষণপ্রিয় প্রমোদাগণও সেইভাব উপলব্ধি করত ভোগ ও বিলাসস্পৃহা পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক সতীত্বের উজ্জ্বল রমণীয়তায় আকৃষ্ট হইয়া স্ব স্ব পতিগণের প্রতি অনুরাগনিবন্ধন পরম-পতির পদানুসন্ধিত হইয়া পার্ব্বতীর পূর্ণতায় আপনাদিগকে পূর্ণানুভব করিতে-ছেন। বস্তুতঃ আদর্শ সতী রমণীগণের এমনই অসাধারণ প্রভাব যে তাঁহাদের

নামমাত্র স্মরণেই চিত্ত-মন পরিশোধিত হইয়া যায় ; তাহাদিগের সেবা ও সাহচর্য্যের মহিমা যে কি, তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। জগৎগুর্ব্বী উমা যেন দক্ষিণামূর্ত্তি গুরুশক্তির ন্যায় জগতের সর্ব্বহৃদয়ে সতীত্বের উচ্চতম গৌরবমহিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রকৃতির পরপারে মায়াতীত কৈলাসেশ্বরের অভিমুখে প্রাকৃতিক জীবকুলের ঐকান্তিক অনুরাগ প্রবাহিত করিবার নিমিত্তই গিরিরাজপুরে জন্ম উপলক্ষ্য করিয়া মৌনভাষায় সতীমাহাত্ম্যব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সহসা গগনমার্গে দেবদুন্দুভিনিনাদে গৌরীনাথের গিরিপুরে আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হইল। দেবডঙ্কা শিখরের শুভ্র তুষারময় কলেবরে জ্যোতিষ্মান্ গিরিপুরের শৈবী জ্যোতি প্রতিফলিত হইয়া ত্রিভুবন দ্যোতিত করিয়া তুলিল। সেই অতি প্রাকৃতিক মায়াতীত জ্যোতিরশ্মি-বিভূষিত গিরিরাজভবন মহাযোগীর ন্যায় চিত্তমুগ্ধকর রূপে পরিশোভিত হইল।

বরাগমন সংবাদে কৌতূহলপরায়ণা পুরবাসিনী পরিচারিকাগণের কেহ বা বহির্দ্বারে আগমন করিল, অনেকেই প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিল, কেহ কেহ বা গবাক্ষপথে দৃষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক পরমপুরুষের দর্শনে আপনাদিগকে কৃতার্থ করিতে লাগিল। প্রকৃতিগণের নয়নোৎপলপ্রভা দৃষ্টিপথাবলম্বনে মহাদেবের বরবপু স্পর্শ করিয়া তদীয় রূপানুবিম্বরূপ নির্ম্মাল্যে প্রসাদে যোষিৎগণের চিত্তক্ষেত্রে পরমাত্মার রূপলালসা জাগরিত করিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সেই পরম পুরুষকে স্ব স্ব অভিলষিতের ন্যায় অবলোকন করিয়া আত্মানন্দে পূর্ণিত হইয়া উঠিল।

কোনও প্রধানা গিরিরাজমহিষীকে কহিলেন, "মা, অসামান্যরূপবান্ হইলেও বর যেন বৃদ্ধের ন্যায় বোধ হইল। শুনিয়াছি শিব নাকি পিতামহেরও জ্যেষ্ঠ, তোমার গৌরী যে কাঁচা মেয়ে?" মেনকা তাহার এই কুটীল সমালোচনায় কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণা হইলেন। তাহা বুঝিতে পারিয়া গৌরী বিজয়ার প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। গৌরীর ইঙ্গিতে বিজয়ার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইল ও দক্ষযজ্ঞব্যাপারে শিবনিন্দা ব্যাপার আলোচনা করিতে করিতে ত্বরিত পদে রাজমহিষীর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া কহিলেন—তুমি যে বসে আছ মা? চল, বর বরণ করতে চল না?

মেনকা। এঁরা বলছেন শিব নাকি বুড়ো?

বিজয়া। সেকি! এমন কথা তোমায় কে বল্লে মা?

মেনকা। পুরবাসিনীরা প্রায় সবাই'ত তা'কে দেখেছে—কেহবা ছাতে উঠে, কেহবা জানালা দিয়ে দেখেছে।

বিজয়া। মরি আমার কপাল! ওগো দূরে থেকে তাঁকে লোকে অমনই দেখে থাকে। যা'র যা'র নিজের বয়স দিয়ে তাঁর বয়স অনুমান করে। তাঁর কি ছাই বয়স আছে? কাল তাঁর বাড়ীর ত্রিসীমানায়ও যায় না! যেতে পারে না! সে যে চির-কিশোর! কাঁচা; তোমার গৌরীর মত কাঁচা।

মেনকা। সকলে দূর থেকে দেখেছে তুই কাছে গিয়ে দেখে এলি কখন?

বিজয়া। তোমারও যেমন ভোলা মন! গৌরীর সঙ্গে শিবালয়ে কে যেত মা! শিব যে শান্ত, যে সুন্দর তার কি আর দ্বিতীয় আছে? চল তুমি নিজেই দেখবে এখন! ঐ যে কঞ্চুকী তোমায় নিতেই আস্‌ছেন।

অপত্যবৎসলা মেনকা পুরবাসিনীগণসহ আসিয়া জামাতা বরণ করিলেন। শিব দর্শনে অপত্যস্নেহে তাঁহার হৃদয় সিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি শঙ্করকে সুকুমার শিশুর ন্যায় অনুভব করিলেন। তখন বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল—বর কেমন দেখলে মা?

আনন্দগদ্‌গদ বচনে মহিষী কহিলেন—তাইত মা, আমি লোকের কথায় ভুলেছিলাম! আহা বাছা আমার চিরজীবী হ'ক! আমার যেমন কাঁচা গৌরী, আমার তেমন কাঁচা হর! মা, ভগবান্ উঁহাদের কল্যাণ করুন।

অনন্তর যথাবিহিত প্রাজাপত্যবিধানে শিব দুর্গার উদ্বাহ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গেল। সকল ঋষি ও দেবপত্নীগণ হর-গৌরীর মিলনবাসরে আজ একাসনোপবিষ্ট পার্ব্বতী-পরমেশ্বরকে আশীর্ব্বাদ করিতে সমাগতা। এই নিভৃত বাসর। এই বাসরে এক পরমপুরুষ ব্যতিরেকে অপর 'পুরুষ' কাহারও আসিবার অধিকার নাই। বিশেষতঃ সেই এক পরম পুরুষ ব্যতিরেকে আর পুরুষই বা কে? সবইত প্রকৃতি বা—প্রকৃতির বিকৃতি! দেবীর সাজান খেলায় পুরুষরূপ! শিব-শিবার মিলনমূর্ত্তির পদে যাহার যাহা আদ্যতম সম্পদ্‌দ্রব্য, কিম্বা বা ভাবময় পরম বিশিষ্টতা তদ্দ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। লোকমাতাগণের নয়নোৎপলাচ্চিত বনিতাসখ শশাঙ্কশেখর, পরম শোভা ধারণ করিলেন। এই অপূর্ব্ব মিলন দর্শনের নিমিত্ত দেবতা ও ঋষিগণ স্ব স্ব প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া ভব-ভবানীর অর্চ্চনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

প্রকৃতি পুরুষের সেই মহা মিলনক্ষেত্রে সেই বাসরমন্দিরের দূরতম প্রান্তে নববৈধব্যকাতরক্ষুণ্ণা কামবধূকে দর্শন করিয়া, আশুতোষ প্রসন্ননয়নে তাঁহার

দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ভবের ভ্রূভঙ্গির ভাষা একমাত্র ভবানীই জানেন' তাই তিনি কামবধূকে আপনার আসনসমীপে আগমন করিতে ইঙ্গিত করিলেন। কামবধূকে সমীপবর্ত্তিনী দেখিয়া দেবাদিদেব সস্নেহে মধুর বাক্যে কহিলেন, "বধূ তুমি বৃথা ক্ষুণ্ণা হইতেছ! তোমার দৃষ্টির খর্ব্বত্বাবশতঃই তুমি অনঙ্গকে দেখিতে পাইতেছ না ও কন্দর্পকে আমার কোপানলে ধ্বংস মনে করিতেছ; ফলতঃ ত্রিভুবন ধ্বংস হইলেও তাহার ধ্বংস কখনও সম্ভব নহে। কাম আমার প্রসাদ লাভেই অনঙ্গ হইয়াছে, তুমিও আমার প্রসাদে সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ কর। দেখ কাম কত উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রকৃতির সর্ব্বস্তরই কামের লীলা-ভূমি, দেবি তুমি এখন হইতে অনঙ্গকে সর্ব্বভাবে সেবা কর। অনন্তর দ্বাপরের অবসান সময়ে কাম পুনর্ব্বার বিশ্বের সর্ব্বস্তর হইতে আপনাকে সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণাত্মজরূপে মূর্তিমান হইবে; তুমি তখন বিপরীত পর্য্যায়ে তাহাতে উপরতা হইয়া ব্রজগোপীসঙ্গিনী শ্রীরাধা সতীকে পরম রাসমণ্ডলে আনয়নপূর্ব্বক পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের সহিত আহ্লাদি শ্রীরাধার লীলাবিলাসে পরিতৃপ্তা হইয়া পরধাম প্রাপ্ত হইবে।" শঙ্করের প্রীতিপূর্ণ বাক্যে ক্ষুণ্ণা রতি আশ্বস্তা ও উৎফুল্লা হইল। গিরিরাজপুরে কামবধূর আনন্দে হর-গৌরীর মিলনানন্দ পরিপূর্ণ হইল। নবীন বিশ্বে নব কল্পারম্ভ সূচিত হইল। তাই প্রতি বর্ষে আর্য্য হিন্দুগণ সপ্তম্যাদি কল্পারম্ভ করিয়া জগৎ-জননীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। সিন্ধুতে ও বিন্দুতে জলতত্ত্বের সাম্যের ন্যায় ব্যক্ত বিশ্বদেহে ও ব্যক্তিদেহে প্রাকৃতিক খেলা একই বিধানে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। তাই জীবের দেহরূপ গিরিপুরে জৈবী প্রকৃতি গৌরীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া "অহং"রূপী পুরুষের সহিত সম্মিলিত হউক; সেই মিলনমন্দিরে প্রাকৃত কামের নিধনক্ষুণ্ণা পরারতি মন্মথমদনের অনঙ্গরূপে সমাসক্তচিত্তে অহং এর শিঙ্গায় "সোহহং" এর তান তুলিয়া পরম পুরুষোত্তমের নিভৃত নিকুঞ্জ অভিসার করুক।

আস্তাং মানসতুষ্টয়ে সুকৃতিনাং নীতির্নবোঢ়েব বঃ।
কল্যাণং কুরুতাং জনস্য ভগবাংশ্চন্দ্রার্দ্ধ চূড়ামণিঃ॥
ওঁ তৎসৎ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ॥

ভাগবতের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অর্থাৎ, দ্বিতীয়ের দশম অধ্যায়ে সৃষ্টিবিষয়ে যে ভগবানের কর্ত্তৃত্বের কথা বলা হইল তাহার বা সেই কর্তৃত্বাপবাদের শুদ্ধির জন্য শ্রীব্যাসদেব শ্লোক দুইটির প্রয়োগ করিলেন। "এই ভাবে অর্থাৎ জগৎস্রষ্টাদিভাবে যথা শ্রুতিতে আছে তাহা হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়," "তিনি ইচ্ছা করিলেন বহু প্রজাদিতে প্রকাশিত হইব" ইত্যাদি শ্রুতি। যাঁহারা সুরি তাঁহারা পর ভগবান্‌কে কেবল এই ভাবে দেখেন না। কেন? এই বিশ্বের জন্মাদি ব্যাপারে কর্ত্তৃত্বাদিভাব বাস্তবিক ভগবানের নাই। উহা তাঁহার ভাব-বিলাস বা স্বভাবের বিবর্ত্তমাত্র। শ্রুতিগণও তাৎপর্য্যভাবে সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার বর্ণনা করেন না। তবে সৃষ্টিব্যাপারের ভিতরে অণু বা সূত্ররূপে সমভাবে অবস্থিত যে ভবাবধি আছে তাহাই দেখাইবার জন্য কর্ত্তৃত্ব ভাবের প্রতিষেধের জন্য শাস্ত্রের উক্তি। যেমন এক ছড়া মালার দানাগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যদি কাহাকেও তাহা গণিতে বলা যায়, তাহা হইলে সে যেমন মালার দানা গণিতে যাইয়া মাল্যের আশ্রয় বা আধাররূপ সূত্র দেখিতে পায় ইহাও তদ্রূপ। এই কর্ত্তৃত্ব ও সৃষ্ট্যাদি ভাণ মায়া দ্বারা আরোপিত। মায়া বা ব্যক্তভাবে প্রকটিত ভগবচ্চৈতন্যই দেবী। তিনি যেন বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার সমস্যা এই যে তাঁহার অধিষ্ঠানভূত ভগবানকে আঁকিতে বড় সাধ হইল। তা'ত হইবারই কথা! হৃদয়সর্ব্বস্বের সেবাইত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য! তাই তিনি তুলি হাতে করিয়া যতই নানাবর্ণের সাহায্যে আপন হৃদয়ফলকে তুলিকাঘাত করিতেছেন, ততই গল্পের মাতালের ন্যায় ঘড়ির শব্দ কেবল টং এক টং এক করিয়া দ্বাদশ বার এক বাজাই শুনিল ও বুঝিল অথচ বারটা বাজা বুঝিতে পারিল না; আমরা ভেদার্থক অহঙ্কারের মোহে সেই লীলাবিলাসের খেলায় দেবতা মনুষ্য প্রভৃতি অনন্ত বিশিষ্ট ভাব দেখিতে পাইলাম—মায়ের বিচ্ছিন্ন তুলিকাঘাতগুলিই দেখিলাম কিন্তু অঙ্কিত চিত্রখানি দেখিতে পাইলাম না। ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া শ্রীমতী যশোদা কর্ত্তৃক ভগবানের বন্ধনব্যাপার পাঠ করিয়া নন্দজায়াকে স্বেদখিন্নকলেবরা দর্শন করিলাম, দেখিলাম যতই রজ্জু বা মাপকাটি আনয়ন করা হউক না কেন তবুও দুই অঙ্গুলি কম হইয়া যায়। বিশেষের মোহে

ঐ দুই অঙ্গুলিকে সেবা ও ভজন এই দুই নাম নির্দ্দেশ করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু ভাগবত ঐ ব্যাপারে ভগবান্ যে জ্ঞান-ক্রিয়ার ফল বা পরিমাণ নহেন, তিনি যে বিশিষ্ট জ্ঞানের অবাধ্য তুরীয় পরমপদ, সে আসল কথাটি কিছুতেই প্রবেশ করিল না। সুতরাং সেই অবাধ্য বালকরূপী ব্রহ্মের অভিসন্ধিশূন্য মায়া ও বিভূতিবিলাস লইয়া অত মাথাঘামানি কেন? যেমন অঙ্কশাস্ত্রে প্রতিপাদ্য বিষয়ে মূল ভাবটী বোধগত হইলেই বিশিষ্ট অঙ্ক কষিলে সেই ভাবেরই গাঢ়তা জন্মে। কিন্তু মূলভাব না বুঝিলে লক্ষ লক্ষ অঙ্কদ্বারাও প্রকৃত তথ্যের অববোধ হয় না সেইরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপটী কথঞ্চিৎরূপেও হৃদয়ে না পশিলে বিভূতিবিস্তার ও লীলা মাহাত্ম্য লইয়া বহু আলোচনাতেও তাঁহার মানুষী ভাব বা অবয়বী ভাবই দেখিতে পাইব। স্বরূপ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না।

আর একটী কথা। কথাটী এক্ষেত্রে অবান্তর হইলেও তৎসমাধানে আমাদের মূল সমাধানটী তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ আলোকিত হইতে পারে। কথাটি এই যে শাস্ত্রোক্ত সৃষ্টি ও তাহার ক্রম কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি প্রতিপাদনের জন্য নহে। কর্ত্তৃত্ব জ্ঞানের প্রতিষেধের জন্য মায়াকর্ত্তৃক আরোপিত। বড় বিষম কথা, যে কর্ত্তৃত্বজ্ঞান লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে যান ও ইংরাজি ভাবে শিক্ষিত এদেশের অকালকুষ্মাণ্ডগণ তাহাদের অনুসরণ করেন তাহাইত উড়িয়া যায়। স্বমত সংস্থাপনে সতত কলহ করিতে প্রস্তুত আধুনিক বৈষ্ণবগণের পরিণামবাদও বানের জলে ভাসিয়া যায়। এখন কথা এই "সৃষ্টিতত্ত্ব মায়াকর্ত্তৃক আরোপিত হইল কেন? মায়া! ও মায়ার এইরূপ প্রবৃত্তিই বা কেন? ভগবদিচ্ছা শক্তির নামই মায়া। তবে ইচ্ছাটীও তাঁহার বাহিরের পদার্থ। উহা স্বরূপগত ইচ্ছা নহে। প্রকাশের ইচ্ছা—খেলার ইচ্ছা। মায়া গুণময়ী আর ভগবান্ গুণাতীত। ভগবানেরই চৈতন্যের একটী ভাবকে মায়া বলে। মায়ার দুইটী বিভাগ আছে,—বিদ্যা ও অবিদ্যা। বৃহদারণ্যকোপনিষদে আচার্য্য বলিয়াছেন, যে সর্ব্বাত্মিকা ভাবের নাম বিদ্যা ও যাহাতে অসর্ব্ববুদ্ধিজন্মায় তাহার নাম অবিদ্যা। অসর্ব্ব কথাটি লইয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ বড় বিপন্ন হয়েন, অতএব তাঁহাদের সাহায্যার্থে আমরা অসর্ব্ব কথাটিকে বিশেষাত্মিকা নামে অভিহিত করিলাম। ভগবানের যে ভাবে তিনি বোধশূন্য, যাহাতে আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তুলনা নাই ও গতি নাই, যাহা কেবল এক ও দ্বিতীয় শূন্য অদ্বিতীয়, তাহাই প্রকৃত বিশেষ বা

পুরুষোত্তম ভাব। পৃথিবীর পর অপ, অপের পর অগ্নি ও এইরূপে ক্রমশঃ স্মৃতি সংস্কার প্রভৃতি একটু শেষ থাকিয়া যায়। প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে অবিদ্যাভাবে এই শেষটুকু কিছুতেই মারা যায় না। জীবের স্মৃতি কর্ম্ম, স্মৃতি সংস্কার তাহার পর ব্রহ্মার স্মৃতি ও সংস্কার ছাড়িয়া গেলে তবুও একটু শেষ থাকে। এই শেষ ভাবটীকে কেহ কেহ Precosmic Idiation বা ভূতপূর্ব্ব সৃষ্টি সংস্কার বীজ বলিয়া অভিহিত করেন। এই শেষকে পুরাণ কি আশ্চর্য্য কৌশলে অনন্ত বা শেষ সর্পরূপে বিবৃত করিয়াছেন। সর্প শক্তি ভাবের ব্যঞ্জক, এবং যে সংস্কারটী প্রসুপ্ত হইলেও সহস্রশীর্ষ ধারণ করত প্রকাশ হইতে পারে অনন্ত শক্তিকেই অনন্ত বা শেষ নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতি তখন দ্রব হইয়া একার্ণব সমুদ্র বা Homgeniety রূপে অবস্থিতা। প্রকৃতির উপরে সমস্ত বিশ্বের অবয়বী ভাবের বিকাশ বা বিলাস ভাবটী শেষরূপে অবস্থিতা থাকে। এই শেষের আর একটী নাম ভোগ। ভোগ শব্দে শরীরও বুঝায়। আবার শ্রীব্যাসদেব ভোগশব্দে দ্রষ্টার অতিরিক্ত দৃশ্যজ্ঞানকেও অভিহিত করিয়াছেন। "দৃশ্যস্য যা উপলব্ধিঃ সা ভোগঃ"—পাতঞ্জলব্যাসভাষ্য। সুতরাং শেষ সর্প অর্থে আমরা আত্মাতিরিক্ত সংস্কারের মাত্রা কিছু বুঝিতে পারি। সমগ্র সৃষ্টি লীন হইলে ভগবান্ এই ভোগীর উপর শয়ান থাকেন। কিন্তু পাছে কেহ তাঁহাতে তাঁহার স্বরূপ চৈতন্যের অদ্বিতীয়তার হানি শঙ্কা করেন তাই শাস্ত্র এই চিত্র-খানি অঙ্কিত করিয়া বিশেষরূপে বলিয়া দিলেন যে ভগবান্ তখন "সুপ্ত" বা স্বীয় তুরীয় অদ্বিতীয় ভাবে উপ্ত বা অবস্থিত। সেই চৈতন্যে সৃষ্টির বিভ্রম নাই। উহা জগদ্ভাবদ্বারা অস্পৃষ্ট। তিনি পুরুষ তাই শয়ান। অবশেষে অমৃত বলিয়া সুপ্ত। যদি কেহ তাঁহার স্বরূপ অনুসন্ধান করিতে চাহ তবে এই ব্যক্ত বিশেষ সমূহের ঘন, একরূপ শেষ ভাবের মধ্যদিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে। তত্ত্বসমুদয় একে একে লীন হইয়া গেলে বিশেষ কিছু ধরিবার থাকে না বটে কিন্তু নির্ভীক, ভগবদ্জ্ঞানে নিমগ্নচিত্ত সাধক ঐ লয়ের খেলার অভ্যন্তরে একটী গতি বা স্রোত দেখিতে পান। পৃথিবী বল, বায়ু বল, আকাশ বল, সকল তত্ত্বই সেই স্রোতে একে একে ডুবিয়া যাইতেছে। পরে দেখা গেল যে এই বহুরূপাত্মক জগৎটী একটী ঘন সংস্কার মাত্রাতে ডুবিয়া গেল। কিন্তু তাহাতেই গতির শেষ হইল না। পাছে আমাদের চিত্তের লয় হয় বলিয়া ঐ বীজাত্মক শেষ ভাবটীকে শয্যারূপে দেখিতে ইঙ্গিত প্রদানপূর্ব্বক তাহাও পরিত্যাগ করত শ্রীবিগ্রহকে দেখিতে শাস্ত্র উপদেশ দিলেন। এই পর্য্যন্ত

প্রাকৃতিক জ্ঞানটুকু সাধকের সহায়তা করিতে পারে। প্রাকৃতিক ঐ শেষ ভাব ও তাহার উপরে শয়ান কি এক 'বিগ্রহ পর্য্যন্ত ইঙ্গিত করিতে পারে। সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির পথ আর বেশী যায় না।

তার পর যে সাধক আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, যিনি সাধক অবস্থায় বাহিরের বস্তু, শক্তি ও এমন কি দেহটীকেও অহং-বোধাত্মক চৈতন্তে লীন করিয়া সর্ব্বভাবের আকর্ষক ও আধার আমিকে দেখিতে শিখিয়াছেন—যাঁহার আমি ভোগদৃষ্টি লইয়া থাকে না—যিনি আমিতে সব ও সবেতেই আমি দেখিতে পান, সেই সাধকের ভিতর এক চৈতন্ত জাগিয়া উঠে। সেই চৈতন্তটীর সর্ব্ব নিম্নস্থ বিলাসটীকে অহং বলে। এবং সেই অহংএর ভিতর দিয়া উদিত হইয়া সেই চৈতন্তটী সর্ব্বদাই 'স'এতে প্রতিষ্ঠিত, যেন কতকটা মোচার মত (like a cone) তলার দিকে অহং ভাবে সর্ব্বাত্মিকা জ্ঞানটী ধরিয়া উপরে উত্থিত হইয়া 'স'এতে প্রতিষ্ঠিত ; সেই স ও অহং পৃথক্ নহে, সবটাই 'স' ও সবটাই অহং। মোচার নিম্ন দিকে ছেদ করিলে একটী বড় বৃত্ত পাওয়া যায় উহাই সর্ব্বাত্মিকা জ্ঞানের আধার অহং। ঐ বৃত্তচৈতন্তই শেষ ঘন হইয়া শেষ কালে বিন্দুরূপে "স"এ উত্থিত হইয়াছে। ইহাই বেদান্তের "সোহহং" মহাপ্রভুর "তটস্থ ক্ষেত্রজ্ঞ চৈতন্ত।

পুরুষকে খুঁজিতে গেলে অহংএর ভিতর দিয়া খুঁজিতে হয়, প্রকৃতিকে খুঁজিতে গেলে সর্ব্বভাবের অভ্যন্তরে খুঁজিতে হয়। অহং ভাবটী যেখানে যাইয়া বিন্দুরূপে অবসান হয় তাহাই পুরুষ। আর যে জ্ঞানে সর্ব্বভাবটী 'আত্মা' হইয়া যায়—যে জ্ঞানের সাহায্যে ভিতর বাহিরে ব্যক্ত ক্ষেত্রে সর্ব্ব বস্তুই ব্যষ্টি রূপে ও ব্যক্ত ভাবটী সমষ্টি রূপে আমি হইয়া যায়। তাহাই যথার্থ প্রকৃতির বিজ্ঞান। প্রকৃতি দেবী বলেন, "বাপু ছোট আমি লইয়া অত তৃপ্তি কিসের ? আমার খোলা ছোট আমিটুকু দেখাবার জন্ত নয়।" সবটাই আমি বা সর্ব্বাত্মিক জ্ঞান যাহাতে তত্ত্বরূপ খোলা ও শক্তিরূপ আঁটি নাই,—যে জ্ঞানটী গালে ফেলিয়া দিলে সবটাই ঘন একরস হইয়া যায় তাহাই মায়ার শিক্ষা। এই ফলটীই নাকি শুকদেব নিজে আস্বাদন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ইহাকেই ভাগবত শাস্ত্র বলে। তোমরা ফল খাও বটে, কিন্তু তাহার আঁশগুলি কামরূপে দাঁতে লাগিয়া থাকে। ভেদজ্ঞানের খোসাটী ফেলিয়া দিতে হয়। আর ভোগ্য বস্তুর স্বরূপটি তোমার ছিন্ন বুদ্ধির নিকট শক্ত হইয়া থাকে বলিয়া উহা না ফেলিয়া দিলে হয় না। গিরিকে মহামায়া বলিয়া ভাবিতে গেলে

কেমন একটা বাধে। ছেলেটীকে সর্ব্বভূতস্থ ভগবানের পদটিই বলিয়া ভাবিলে ভালবাসার মোহের সুখটী আস্বাদন করিতে পায় না। তাই না ভাগবৎ বলিলেন যে আঁটী ফেলে নাই বলিয়া জার-বুদ্ধিতে অনুগতা গোপীগণ ভগবানকে পাইয়াছিল, দ্বেষ্য ভাবে তন্ময় হইয়াও কংশ শিশুপাল তাঁহার অঙ্গজ্যোতি বা চৈতন্যে মিশিতে পারিয়াছিল। যদি ভোগ্যবস্তু সবটা লইতে পার—তাহার সুখকরত্ব, তাহার কামাগ্নির ইন্ধনস্বরূপত্ব তাহার ভিতর মহাসংযমকারী আদিত্যতনয়ের মৃত্যু ভাবটীও যদি একরূপে গ্রহণ করিতে সক্ষম হও, যদি এত খেলার মধ্যেও ক্ষণেকের জন্য প্রকৃতির অতিগ, শ্যামজ্যোতি, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম গতির পরিসমাপ্তিরূপ ভগবান্‌কে দেখিতে সক্ষম হও, তবেই তুমি ভাগবতে ভাগবৎ বুঝিবার অধিকারী। তার উপর সর্ব্বজীবে কৃষ্ণাধিষ্ঠান দেখিয়া জীবের স্বরূপ প্রাপ্তিতে প্রাণ যদি কাতর হয় ও সেই কাতরপ্রাণে যদি কালাচাঁদের বাঁশী শুনিতে পাও, যদি শ্রীমতীর ন্যায় পুরুষোত্তমের নিকট সেই বংশীশিক্ষার রহস্য বুঝিয়া থাক—যদি বুঝিয়া থাক যে সেই বংশীর 'সা' রবে সমগ্র বিশ্বে কি এক আকুল পিপাসা জাগিয়া উঠে, যদি 'র'র ভিতর দিয়া বস্তুর বাহ্য রূপ ধ্বংস হইয়া কিরূপে সেই আকুল গতি ক্লীং বীজে মেশে তাহা বুঝিয়া থাক তবেই ভাগবতের আচার্য্য হইতে তোমার অধিকার হইয়াছে।

শ্রীভগবান্—মায়া।

মায়া শব্দে ভাগবৎ বলিলেন—

> সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তি সদসদাত্মিকা।
> মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥
>
> ভাগ ৩।৫।২৫।

অর্থাৎ মায়া, শুদ্ধ ভগবান্ বা দ্রষ্টার শক্তি! দ্রষ্টার শক্তি বলিয়া ও বাহিরের কিছুই নাই বলিয়া উহা চৈতন্যময়ী শক্তি। তবে এই চৈতন্যশক্তি সদসদাত্মিকা। সদসদাত্মিকা শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী বলিলেন—সা বৈ দ্রষ্টৃদৃশ্যানুসন্ধানরূপা। সদসদাত্মিকা কার্য্যকারণরূপা। যদ্বা সৎ দৃশ্যম্, অসৎ অদৃশ্যম্ আত্মস্বরূপং, তয়োরাত্মা যস্যাঃ। তস্যাস্তদুভয়ানুসন্ধানরূপত্বাৎ। অর্থাৎ এই মায়াদেবী দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের অনুসন্ধানরূপা। এইটীই ভগবানের সহিত মায়ার সম্বন্ধ। তিনি সদসদাত্মিকা অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ এই উভয় ভাবের আত্মস্বরূপা। এই দুইটী কথা এখন বুঝিতে হইবে। অনুরূপে বা সূক্ষ্ম ভাবে দুইটী

বস্তুকে মিলাইয়া দেওয়া বা সন্ধিত করাকে অনুসন্ধান বলে। দৃশ্য জগদ্ভাবগুলি তত্ত্বে লীন হয়। তত্ত্বনিচয় সর্ব্বাত্মিকা ও সামান্য ভাব। পৃথিবী তত্ত্বে সমস্ত বিশেষ ভেদাত্মক বস্তুসমূহকে লীন করা যায়। আবার পৃথিবী জলে, জল অগ্নিতে, এই পর্য্যায়ে ক্রমশঃ লীন হয়। পুরুষের বিশেষ ভাবটীকে অঙ্কন করিবার নিমিত্ত এক একটী তত্ত্ব আপনাকে বহুনামরূপে বিন্যস্ত করত অনন্ত ভাবে বিকশিত হয়। পৃথিবীতত্ত্ব শব্দে আশ্রয় বা আধার বোধরূপ জ্ঞান বুঝায়। উহা জড় মাটীমাত্র নহে। যাহা ব্যক্ত জগতের মধ্যে অন্যান্য বৃত্তি বা তত্ত্বের আধার বা আশ্রয় তাহাকেই পৃথিবী বলা হয়। সমস্ত বিশেষাত্মক বস্তু ও শক্তিগুলি পৃথ্বীর সর্ব্বাশ্রয়ত্বে বিশেষ ভাবে লীন হইয়া পুনরায় তাহা হইতে বাহির হয়। এই পৃথিবীতত্ত্বকে কারণ ও বিশেষ ভাবকে কার্য্য বলে। মায়ার একটী খেলা এই যে তিনি এতদ্রূপে পৃথিবী, অপ প্রভৃতি তত্ত্বভাবে বিকাশ বা সংস্থা (Series) ভাবগুলিকে কারণ ভাবে লীন করিয়া রাখেন এবং সেই কারণ হইতে পুনরায় প্রকট করেন। পৃথিবীরূপ তত্ত্বে ব্যক্ত বিশেষগুলি অনুসন্ধিত হইয়া থাকে ও ব্যক্ত বিশেষগুলির তলায় তলায় তাহাদের আশ্রয় বা আধার ভাবে পৃথ্বী তত্ত্বটী অনুসন্ধিত হইয়া থাকে। তারপর পৃথিবী তত্ত্ব, তাহার খেলা সমুদয় আপনাতে লীন করিয়া জলতত্ত্বে লীন হয়। জলতত্ত্ব তদীয় ব্যক্ত খেলাসমূহকে স্বীয় জলতত্ত্বে লীন করিয়া স্বয়ং অগ্নিতত্ত্বে লীন হয়। এইরূপে ব্যক্ত ভাবসমষ্টি প্রকৃতিতে লীন হয়। এই গেল ব্যক্তের অনুসন্ধানরূপ খেলা।

কথাটী আর একটু সূক্ষ্ম ভাবে বুঝা আবশ্যক। অগ্নিতে জল উত্তপ্ত করিলে সেই জলের ভিতরে যে একটী গতি দৃষ্ট হয় তাহা সকলেই জানেন। অগ্নির মূল শক্তিটী জলের ভিতর উত্তাপরূপে থাকে বটে অথচ তাহার কিয়দংশ জলের অণু-সমূহের মধ্যে গতি (motion) রূপে পরিণত হয়। সেই প্রকার পৃথিবী তত্ত্বটী যে, অগ্নির সাহায্যে, গতিরূপে পরিণত হইয়া বাহ্য বস্তু সকলের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়রূপ বিলাসে পরিণত হয় তাহাকে ভাগবত শ্রীভগবানের ঈক্ষণশক্তি নামে অভিহিত করেন। ভগবচ্চৈতন্যের উত্তাপ যেন পৃথ্বীতত্ত্বের অণ্ডটীকে ফুটাইয়া তুলিয়া জগৎ প্রকাশ করে। প্রকাশের সময় ভগবচ্চৈতন্যের মাত্রাটী পৃথ্বীতত্ত্বে লীন বা latent হইয়া যায় ; এবং সেই latent heat বা লীন উত্তাপশক্তি পৃথিবীর অণুপরমাণুর ভিতর প্রেরকশক্তিরূপে খেলিয়া পৃথিবীকে যেন চৈতন্যময় ও :জীবনময় করিয়া তুলে। তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জড় অণুর

ভিতরেও জীবন ও চিৎ শক্তির বীজ—মন্দান্ধকারে দৃষ্ট বস্তুর ন্যায়—একটু একটু দেখিতে পাইতেছেন। ইহাই তাহাদের physical basis of life and consciousness. এই বীজরূপ চিৎশক্তি না থাকিলে অন্নের দ্বারা শরীর পুষ্ট ও অভিব্যক্ত হইতে পারিত না। ইহাই অন্নের ভিতর পুরুষের কলা বা উপনিষদোক্ত "অন্নময়ঃ পুরুষঃ"। (ময় শব্দ প্রচুর্য্যার্থে ; প্রচুর—যত চাও তত) জলকে বরফ করিতে হইলে জলের ভিতরে লীন উত্তাপটী বাহির করিতে হয়। পৃথিবীর খেলাগুলি যখন পৃথিবী তত্ত্বে লীন হয় তখনও তদ্রূপ পৃথ্বীতত্ত্বের অণুপ্রাণন শক্তি-ভগবৎশক্তিটী—বাহিরে ফুটিয়া উঠে ; এমন কি ঐরূপ লীন করিতে না পারিলে ভগবৎশক্তিকে চিনিতে পারা যায় না। তার পর সমগ্র পৃথিবী তত্ত্বটী যখন অপে লীন হয় তখনই ভগবৎশক্তি মাত্রাটীকে স্বতন্ত্ররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শক্তিমাত্রাটীকে শাস্ত্রে তন্মাত্রা বলে। পৃথিবী তত্ত্বে ভগবানের সর্ব্বাশ্রয়ত্ব ভাবটী সামান্যরূপে আছে। তন্মাত্রে "পুণ্যগন্ধ পৃথিব্যাঞ্চ" গন্ধরূপ বিশেষ ভাবটী ফুটিয়া উঠে। ভাগবতোক্ত সাংখ্য ও সাধারণ সাংখ্যের এই প্রভেদ যে সাধারণ সাংখ্যের মতে অপ হইতে পৃথিবী ও পৃথিবী হইতে তাহার বিকাশগুলি স্বাভাবিক অর্থাৎ আপনা-আপনি হয়। পুরুষের বিশেষ ভাব বা পুরুষোত্তমকে বাদ দিয়া দেখার নিমিত্তই সাংখ্য ভগবানের বিশেষ খেলাটি দেখিতে পায় না। অনেকে মনে করেন যে জল হইতে কীট ও কীটাণুগুলি আপনা-আপনি জন্মায় কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিশেষ দৃষ্টিতে ইহাই সিদ্ধ হইয়াছে যে বিশেষ জাতীয় সূক্ষ্ম জীবাণু Micro-organism গুলি খেলে বলিয়াই জলের এই রূপান্তর হয়। পাশ্চাত্য জড় বিজ্ঞান যেমন বলেন যে বিশেষ শক্তির খেলা না হইলে কোন বস্তুরই গতি বা রূপান্তর হয় না ; তদ্রূপ বেদান্ত ও ভাগবতের মতে, অপ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি ও বিকৃতি হইতে গেলে প্রতি স্তরেই ভগবানের ঈক্ষণ-রূপ বিশেষ শক্তি থাকা চাই। প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে নিম্নতর ভূতাদির যে ক্রম বর্ণিত হয় তাহার প্রত্যেক স্তরেই ভগবানের বিশেষ ভাবের খেলা আছে। উহা প্রকৃতির সামান্য, সর্ব্বাত্মিকা ভাব নহে। সূক্ষ্মতর ও নিম্নস্থ তত্ত্বের তুলনায়, অবিশেষ তত্ত্বের তুলনায়, বিশেষ ব্যক্ত স্থূলতর তত্ত্বের প্রকাশকে উৎপত্তি বলে। উপর হইতে ফুটে (উৎ উর্দ্ধাৎ+পদ+তি) বলিয়াই; উহা—উর্দ্ধমূলমধঃশাখ—উৎপত্তি। আর নিঃশেষিতরূপে উপরে মিশিয়া যাওয়ার নাম নিবৃত্তি।" তত্ত্ব তাহার অভ্যন্তরস্থ

পুরুষের বিশেষ ভাবটীকে যেরূপে গর্ত্তস্থ ভ্রূণের ন্যায়, অঙ্কিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিয়া প্রসব বা প্রকাশ করে তাহার বিশিষ্ট স্তরগুলিকে বিকার (বিশেষীকরণ) বলে।

তত্ত্বের সামান্য ভাবের মধ্য দিয়া তন্মাত্রের বিশেষ ভাবটী অঙ্কনই বিকারের মূল প্রবৃত্তি। আবার বিকারগুলি মূলতত্ত্বে লীন হইলে তাহার ফলে তন্মাত্রের ভাবটী বিশেষরূপে ফুটিয়া উঠে। তবে একটী কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বিকারগুলির লয় একটা উচ্চ ভাব লইয়া করা আবশ্যক। আমাদের স্থূল জীবন ও তাহার ঘটনাবলী লইয়া এই বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

স্থূল জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী কি এক করিয়া দেখা যায়? জীবন মৃত্যু কাম ক্রোধ, হাসি খেলার যে অনন্ত বিকাশ হইতেছে তাহার ভিতরে কি কোনও মূল তত্ত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়? এ বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যাবতীয় ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া প্রথমে কতকগুলি মূল নিয়ম বা শৃঙ্খলার জ্ঞান জন্মে। আমার কার্য্যগুলি একটি সর্ব্বাত্মক ভাবের পরিচয় দেয়। সকল জীবই আহার করে আমিও করি। এইরূপে সমস্ত কার্য্যের বিশেষ ভাবগুলি কতিপয় সর্ব্বজনীন তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রাকৃতিক কোনও ব্যাপারের ভিতর বিশেষ ভাবের চিহ্ন দেখা যায় না, অথচ প্রত্যেক জীবই একইরূপে জন্মিয়া, একইরূপে কার্য্য করিয়া, একইরূপে মরিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধির পরিপুষ্ট করে। তারপর ঘটনানিচয় লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, তাহারা অনন্ত ভাবের আশ্রয়স্বরূপ। ভোজন-ব্যাপারটী পশুর সহিত সামান্য হইলেও উহা একরূপ নহে। ভোজন ব্যাপারে পশুর একটা আসক্তি মাত্র দেখা যায়; কিন্তু মানবের ভোজনের মধ্যে অনন্ত ভাবের, কামের, মনের ও সময়ে সময়ে বুদ্ধির মেলাও ফুটিয়া উঠে। ভোজন ব্যাপার এইরূপে অনন্ত ভাবের আশ্রয় হইবার সামর্থ্য আছে; ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ। পক্ষান্তরে দেখিতে গেলে বুঝা যায় যে, সুস্বাদু ফলের জ্ঞান মনে উদয় হইলে তাহা হইতে কামনার উৎপত্তি হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেই ফলটি ভোজন করা হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কত মানসিক কল্পনা, কত বাসনার বিকাশ প্রভৃতি জাগিতে থাকে। ইহাতেও বুঝা যায় যে, ভোজনরূপ স্থূল ব্যাপারটি অনন্ত ভাবের আশ্রয়। হিন্দুশাস্ত্র মতে ভোজনের ভিতরে যে এই সকল খেলা হয় তাহা প্রাকৃতিক ও সামান্য। সামান্য বলিয়াই অসংখ্য ভাবরাশিকে আশ্রয় করিয়া আছে। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান ভোজন সম্বন্ধে যত নিয়মই আবিষ্কার করুন না কেন, তদ্দ্বারা কামের ও মনের খেলা

সমূহের নিবৃত্তি হইবে না। মানব যতই উন্নত হউক না কেন, ভোজন-ব্যাপার সংশ্লিষ্ট সমগ্র ব্যাপার বুঝিতে পারিবে না।

সেইজন্য নিবৃত্তিপরায়ণ হিন্দুশাস্ত্র এই উপদেশ দিলেন যে ভোজন ব্যাপারটীতে অভিব্যক্ত যে 'আমি' আছে, তাঁহাকেই দেখ। সেই আমিটি কত বড় ও স্থির দেখ, সেই আমিটী একদিকে বিশ্বের অনন্ত খাদ্য বস্তু প্রভৃতি রূপে ও অপরদিকে ভোক্তা 'আমি' রূপে আপনাকে বিন্যস্ত করত, উভয় ভাবকেই কত প্রকারে সংযুক্ত করিয়া কত প্রকার দৈহিক, মানসিক সুখ, তৃপ্তি, পুষ্টি, প্রভৃতি ভাবরাশি জাগরিত করিয়া এক বড় আমির ইঙ্গিত করিতেছে। ভোজনের এত প্রবৃত্তি, এত লালসা; খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এত গবেষণা ও অনুসন্ধান—এক কথায় এত খেলা,—সেই বড়'আমি'টীকে জানিলেই শান্ত হইয়া যায়। লালসা বা ভাবনার বশে খাইলে'ত সেই আমিকে চিনিতে পারা যায় না। তা'ই হিন্দু, দৈহিক ও মানসিক পবিত্রতা আনয়নপূর্ব্বক কামনা, মনন প্রভৃতি খেলাগুলিকে সংযত করিয়া শুদ্ধ ও সংযতচিত্তে আহার ব্যাপারটীকে a grave experiment and experience বিবেচনা করিয়া আহার করিতে বসেন, ও সেইভাবে আহার করিতে যাইয়া দেখিতে পারেন যে তাহার ভিতরে একটী বড় আমি খেলিতেছে। আমিটী খেলেন বলিয়া একই অন্ন হইতে কাহারও বা শারীরিক বল, কাহারও বা বাসনার বিলাস, কাহারও বা মানসিক জ্ঞান ও কচিৎ বড় আমির আভাস ফুটিয়া উঠে। সেই আমির নাম বৈশ্বানর। বিশ্ব ও নরকে লইয়া খেলিয়া তাহা হইতে কাম, মোহ, সুখ, তৃপ্তি ও এমন কি ভগবদ্বিজ্ঞানের ভাবগুলি পর্য্যন্ত জাগাইয়া তুলে—"বিশ্বেষাং নরাণাং অনেকধা সুখাদি আনয়নাৎ বিশ্বানরঃ। বিশ্বানর এব ইতি বৈশ্বানরঃ।—(মাণ্ডুক্য; শাঙ্কর ভাষ্য) তাই হিন্দু আহারের সময়—"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা" ভাবটী আনিবার চেষ্টা করেন।

এই দেখ ভোজনতত্ত্বের অনন্ত ব্যাপারগুলি যাই সংহৃত হইয়া লীন হইল, অমনি তাহা হইতে পুরুষ মাত্রা জাগিয়া উঠিল। এই প্রকারে ধারণা ও ধ্যানের সাহায্যে যাই সমস্ত বৃত্তিগুলিকে লীন করিতে পারিবে—যখন বাস্তবিকই 'ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ'—যখন বিশিষ্ট যোগক্রিয়া দ্বারা তোমার যোগী হইবার ও বড় হইবার বাসনাটী পরিতৃপ্ত হইয়া যাইয়া, তুমি ক্রিয়ার পরাবস্থার দিকে লক্ষ্য করিতে পারিবে, তখনই দেখিতে পাইবে যে তোমার স্থূল আমিটী পড়িয়া যাইয়া তাহার শ্মশান বা লয়ক্ষেত্র হইতে কি এক মহান্ বড় আমির ভাব ফুটিয়া

উঠিয়াছে। এইরূপ পুরুষ-কলা গুলিকে 'তন্মাত্র' বলে। এই কলা-দর্শনই ভগবানের পদচিহ্ন অন্বেষণ। তত্ত্বরূপে তাঁহার ভাবটী সর্ব্বভাবের আশ্রয় হয়। প্রকৃতি ব্যক্তভাবে খেলিলে এই সামান্য ভাব ব্যতিরেকে অন্য কোনও ভাবেরই স্ফুরণ হয় না। সদ্‌গুরুর সাহায্যে প্রকৃত বুদ্ধি লাভ হইলে, তখন প্রাকৃতিক ব্যাপারের ভিতরে ভগবানের তত্ত্বরূপটী সামান্যভাবে জানিতে পারা যায়। কিন্তু খেলার লয় ব্যতিরেকে শ্রীভগবানের বিশেষমূর্ত্তি জাগে না। তত্ত্বে প্রথমে সামান্য ভাব ও তৎপরে একটী মহান্ একতার বুদ্ধি জাগে; সেই একতায় সমগ্র জগৎ ঘনীভূত থাকে। নিরোধে পুরুষবুদ্ধি জাগিয়া উঠিলে, তখন অদ্বিতীয় বস্তুর উপলব্ধি হয়। এই অদ্বিতীয় বুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়াই ভাগবতে শ্রীধর স্বামী বলিলেন "মায়া দ্রষ্টৃদৃশ্যানুসন্ধানরূপা" সুতরাং মায়ার খেলা দুইটী। যখন মায়াদেবী পুরুষকে অবলম্বন করিয়া খেলেন, তখন তাঁহার নাম "দ্রষ্টৃদৃশ্যানুসন্ধানরূপা" আর যখন প্রকৃতির ভিতর দিয়া খেলেন তখন তিনি কার্য্য কারণ ও কর্ত্তৃত্ব এই তিনটী ভাবের ভিতর দিয়া একটী মহান্ একতা সূচনা করেন— "কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে প্রকৃতিঃ হেতুরুচ্যতে।"

সুতরাং মায়াদেবীর দুইটী মূর্ত্তি বুঝা গেল। প্রাকৃতিক মূর্ত্তিতে ভগবৎ চৈতন্যময়ী মায়া বা "বৈশারদীমতি" তদীয় প্রাণনাথ চৈতন্যময়ের একতারূপটী কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বের তুলিকাপাতে অঙ্কিত করেন। আমরা ভাবি যে "বুঝি আমি" উহা করে। মায়া দেখান যে কারণটীই (numenon) অনন্ত কার্য্য (phenomenen) রূপে ব্যক্ত হয় এবং ঐ দুইটী ভাবই একটী কর্ত্তৃত্ব বোধরূপ কেন্দ্রে লীন হয়। যেমন আমার ধনাগমের প্রবৃত্তি হইল ও সেই প্রবৃত্তি হইতে আমি কত রকমের ব্যবসা করিলাম, ধনী হইলাম; কিন্তু সুখ পাইলাম না, শান্ত ও স্থির "আমি"টী ফুটিল না। তখন আমিই দেখিলাম যে এটা বাহিরের খেলা। বৈরাগ্য আসিল, ধ্যানের পথে চলিতে গেলাম। আমিটী যদি বাস্তবিকই কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে কখনও কি কর্ত্তৃত্বের ভাণ, দুঃখভোগের সাহায্যে বা জ্ঞানোদয়ে পড়িয়া যাইত? কই আরত ধনাগমে কর্ত্তৃত্ব ভাণ আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না।

অতএব বুঝা গেল যে ঐ কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধিটী 'আমি'র স্বরূপ নহে। উহা "আগন্তুক মাত্র" (accidental co-eficient)। কর্ত্তৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে কারণ ও কার্য্যের অবসান হয়। আমিটীকে বড় একটী ক্ষেত্রের (plain) ন্যায় বোধ হইল, কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বরূপ উর্ম্মিমালা সেই ক্ষেত্র বা সাগর বক্ষে কত খেলিয়া

আবার মিশিয়া গেল। দেখা গেল উহা আমির বিশেষ ভাব নহে। স্বরূপতঃ বিশেষ ত নহেই, ব্যক্ত ভাবেরও বিশেষ নহে। কারণ সকল জীবই এইরূপে কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বের উর্ম্মিমালা উত্তোলন করিয়া প্রতিনিয়ত খেলিতেছে, আবার তাহাদের ভিতরেও এক এক ভাবের খেলা শান্ত হইয়া যাইতেছে। যাহা 'সর্ব্বের' তাহা, কখনও আমির নিজস্ব নহে। গ্রীষ্মকালে মার্ত্তণ্ড-তাপতপ্ত সকল জীবই বৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা করে। বৃষ্টি হইল; কিন্তু সামান্য বুদ্ধিমান কেহও কি এই ব্যাপারের কর্ত্তৃত্বটী আমিতে আরোপ করে? তবে কেন ভাই সাধনা জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে সর্ব্বাত্মিকা মহামায়াকে দেখিতে না পাইয়া, শুদ্ধ 'আমি' জ্ঞানটী হারাইয়া, আগন্তুক কর্ত্তৃত্ব-মাত্রায় হাসিতে কাঁদিতে থাক? যাহা সর্ব্বাত্মক যাহা সকলের আমিকেই আশ্রয় করিয়া খেলে। এবং যাহা দ্বারা সকলের ভিতরেই শুদ্ধ আমি জ্ঞানটী ফুটিয়া উঠে, তাহা ত তোমার আমির স্বরূপ নহে। উহা শ্রীভগবানের প্রকৃতি। যাঁর জিনিস তাঁহাকে ফিরাইয়া দেও। ধার করিয়া পরের সোনা পরার অপেক্ষা বরং রাংতা পরা ভাল।

ইহাই সাংখ্যজ্ঞান। ইহাই কৃতান্ত, অর্থাৎ কৃতভাবেব অন্ত ও কর্ত্তৃত্বের প্রতিষেধক। যদি বল যে এত কর্ত্তৃত্বের রাশি দ্বারা কি শুধু আমারই "আমি-বিবেক" জাগে? হাঁ, তাহা সত্য কথা। এত জীবকুল সমস্ত ধ্বংস হইলেও প্রকৃতির অবসান হয় না। তিনিত এই ছোট আমিগুলির জন্য খেলেন না! যে আমির জন্য তিনি খেলেন, সেই আমি হইতেই কখনও জ্ঞান, কখনও স্মৃতি, কখনও বা মোহ উৎপন্ন হয়। যে শ্রীমূর্ত্তিতে শ্রীরাধা জাতি, কুল, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিশেষের মোহ ত্যাগ করিতে পারিলেন, তাহা হইতেই ত কংসের ভয়, অর্জ্জুনের বিস্ময়, ভীষ্মের কর্ত্তব্যপরায়ণতা! কর্ত্তৃত্ব তাঁহার স্বরূপ হইলে এরূপ বিভিন্ন ফল হইতে পারিত না।

কর্ত্তৃত্বের প্রতিষেধের কথা ভাবিতে গেলে, আজকালের মানুষ চমকাইয়া উঠেন। বাস্তবিক আমাদের জীবনে এমন কোনও ব্যাপার নাই যাহাতে আমরা বাস্তবিক কর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিতে পারি। হাত নাড়িতে ইচ্ছা হইল, হাত নড়িল, ইহাতেও কি কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত হয়? প্রকৃত কর্ত্তৃত্বে, কর্ত্তা অন্যের নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে ক্ষমবান্ হয়েন। আমার আমিটি চৈতন্য পদার্থ, সে কি করিয়া নিরপেক্ষভাবে জড়ের উপরে কার্য্য করিবে? তাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও আমার ইচ্ছা ও স্থূল হস্ত চালনার মধ্যে আরো কতকগুলি তথ্য স্বীকার করেন। তন্মধ্যে শরীরস্থ স্নায়ুমণ্ডলী ও তাহাদের কেন্দ্রগুলি, স্নায়ুর

সহিত পেশীসমূহের পরস্পর পরিণতি সম্বন্ধ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। এই সকলের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যে তাহারা বাহ্য কল-কব্জার মত একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-কারণ ভাবে সম্বদ্ধ। এই সম্বন্ধকে যোগশাস্ত্রে পর্য্যায় বলে। চৈতন্যকে এই পর্য্যায়ের অধীন হইয়া ইচ্ছার ফললাভ করিতে হয়। আমাদের দেশের দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শনের গতির বিশেষ প্রভেদ আছে। আমাদের দর্শনের গতি এই যে সমস্ত স্থূল সূক্ষ্ম বা কারণ-গত পর্য্যায়ের ফল দেখাইয়া, আমি হইতে কর্ত্তৃত্বের ভাণ অপসারিত করে। বৃত্তিসমূহ আমিকে লইয়া হয় বটে, কিন্তু তাহাতে "আমি"র প্রতিবিম্ব মাত্র থাকে, কর্ত্তৃত্বাদি থাকে না। কল টিপিলেই যেমন্ কার্য্য হয়; একটা অবিশেষ শক্তি কলের অংশনিচয়ের শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ মনন হইলেই সেই শক্তিটী কামের ভিতর দিয়া স্নায়ু-নিচয়ের সাহায্যে বাহ্য কার্য্যে পরিণত হইতে চাহে। শুধু তাহাই নহে! বিপরীত কল বা শৃঙ্খলাও আছে। বিশিষ্ট বস্তুর সহিত কার্য্য করিতে করিতে তাহার কাম, মানসিক ভাব ও অন্যান্য সূক্ষ্ম ফল প্রসূত হয়।

কেহ বলিবেন যখন আমার ইচ্ছারূপ Leverটী না টানিলে কল চলে না, তখন নিশ্চয়ই আমার কর্ত্তৃত্ব থাকিয়া যায়। কিন্তু হিন্দু দার্শনিকগণ বলেন যে এই খেলার ইচ্ছাটিও প্রাকৃতিক। যথার্থ পুরুষকে বুঝিতে হইলে এই ইচ্ছার মূলশক্তি সংকল্পকেও প্রাকৃতিক বলিয়া ত্যাগ করিতে হয়। ইচ্ছা অর্থে আমির অপরিপূর্ণতা ও দ্বৈত ভাব বুঝায়। সুতরাং উহা স্বয়ংসিদ্ধ, প্রকৃত পুরুষরূপ আমির ধর্ম্ম নহে। কেহ বলিবেন যে এইরূপে সমস্তই কলকব্জার মত প্রাকৃতিক হইয়া গেলে আমাদের জীবন শূন্য ও নীরস হইয়া যাইবে। তাহার উত্তরে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমাদের দেশীয় তন্তুবায়কে বস্ত্র বয়নের প্রত্যেক কার্য্যই স্বয়ং করিতে হইত। উহা এখন কলের সাহায্যে সংসাধিত হয়, তাহাকে তেমন করিতে হয় না। তাই বলিয়া কি আমাদের জীবন শূন্য হইয়া গিয়াছে; না কলের সাহায্যে মানব প্রচুর পরিমাণে বস্ত্রাদি পাইতে সক্ষম হইতেছে ও এই কার্য্যে তাহার চিন্তাকে প্রতিনিয়ত সংযোজিত রাখিতে হয় না বলিয়া উচ্চতর চিন্তার সময় ও অবকাশ পাইতেছে? ইহা বুঝিয়াই সাংখ্য-প্রণেতা সমস্ত প্রাকৃতিক বিলাসটিকে কলের খেলা বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন। আর কোনও প্রাকৃতিক বিকাশের জন্য আমিটীকে খাটাইতে হইবে না; প্রাকৃতিক খেলা বলিয়াই বাহিরের চিন্তা ও বাহিরের ভাবনা আর "আমি"কে ব্যাকুল করিতে পারিবে না। মানব যাই এক একটী

খেলাকে প্রাকৃতিক বলিয়া চিনিতে পারিবে, অমনি আপনা আপনি সেই খেলাতে বিরক্ত হইয়া তাহা ত্যাগ করত উচ্চতর স্তরে 'আমি'র পদস্থাপন করিবে। যে ব্যক্তি কামনার খেলাগুলিকে সর্ব্বজনীন নিয়ম ও শৃঙ্খলার পদ্ধতি বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, সে আর কখনও কামনার খেলায় লিপ্ত হইবে না। অথচ বিশেষ ভাবের আমিও চাই। কারণ 'আমি' সামান্ত ভাবে থাকিতে পারে না। কাযেই তখন আমি জ্ঞানটী মনে স্থির করিয়া, তাহার খেলার বিশেষত্ব খুঁজিতে হয়। তারপর যখন মনও প্রাকৃতিক হইয়া যায়, তখন বুদ্ধিকে আশ্রয় করিতে হয়। এইরূপে জীব নিত্যই পুরুষের দিকে প্রধাবিত হইতেছে। আরব্যোপন্যাসের স্বপ্নদৃষ্ট রাজকন্যার প্রেমে পড়িয়া রাজপুত্রকে যেমন নানাদেশ পর্য্যটন করিতে হইল, ও অবশেষে রাজকন্যার সম্মিলনে ভ্রমণের শান্তি হইল ;—তদ্রূপ অহঙ্কার তত্ত্বেরও উপরে স্বপ্নদৃষ্ট কি এক পর-পুরুষের স্বাদমাধুরী আমাদের প্রাণে বিশেষের তৃষ্ণা উদ্বোধিত করিয়া দিয়াছে তাহারই অনুসন্ধানে "বলাদিব নিয়োজিত" হইয়া আমরা মহঃ, স্বঃ, ভুবঃ প্রভৃতি লোক ও লোকান্তরের মধ্য দিয়া, পৃথিবীর বিশেষাত্মক বস্তু-সমূহকে গ্রহণ করি। মনে হইল আহা বাঁচা গেল। যে মিষ্ট রস খুঁজিতেছিলাম, তাহা আম্রেই আছে। যেরূপ প্রাণের কোথায় লাগিয়া আছে তাহা বুঝি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও রমণী-বিলাসে পাওয়া গেল। কিন্তু কৈ—

লাখ জনম হম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

রসও পাওয়া গেল, রূপও দেখা গেল ; কিন্তু তৃপ্তি কোথায় ? গতির বিরাম কোথায় ? তাহার'ত বিশ্রাম নাই! আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই! রমণী বড় জোর মন পর্য্যন্ত না হয় বুদ্ধির কোণ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে, অহঙ্কারে মিশিতে পারে না ত ; তাহা হইলেই যে 'আমি' হইয়া যায়। তাহার ভিতরে যে আঁটিটী আছে, তাহা'ত বুঝা যায় না। আমরাও ত সেই আঁটিটী রাখিয়াই ভোগ করিতে চাই। আঁটিকে জানিতে পারিলেই, যে সবটা আমি হইয়া যাইবে। তাহাতে'ত মজা নাই! আমাদের জ্ঞানে এই প্রকার আঁটি বা বীজ থাকিয়া যায়, বলিয়াই আমাদিগকে পুনঃপুনঃ সেই একই খেলা খেলিতে হয়। বেশীর ভাগ না হয় দেশী ছাড়িয়া বিলাতি, বোম্বাই, ল্যাংড়া প্রভৃতি নূতন নূতন ভাবে উপভোগ করিতে যাইয়া, আঁটি পর্য্যন্ত যাইয়াই ক্ষান্ত হই। সুতরাং আকুল পিয়াসায় নিবৃত্তি নাই! সংসার যন্ত্রের বিরাম নাই! গতাগতির অবসান নাই!

এই আঁটি রাখিয়া ভোগ করা বা অহঙ্কার তত্ত্বের মধ্যে ভেদজ্ঞান রাখায়

নামই সবীজ সমাধি। আঁটিটীও হজম করিতে হইবে। যদি ভক্ত হও তবেই তাহা পারিবে। আঁটি শুদ্ধ খাইতে গেলে হনুমানের মত গলায় লাগিতে পারে। ঐ দেখ দাস-পাল প্রমুখ সাধকগণ বৈষ্ণব বিজ্ঞানের ফল খাইতে যাইয়া মুক্তি-জ্ঞানের আঁটিটী গলায় লাগিয়া ছটফট করিতেছেন। ভগবতী জগদম্বা যদি প্রসন্না হন, তাহা হইলেই আর আঁটির ভয় থাকে না। তখন দেখিবে যে আর বাহিরের বিশেষের বীজ নাই, সমস্ত খেলাটাই শ্রীভগবানের প্রকৃতির লীলা। আমার প্রকৃতি যেমন আমাকেই দেখায়, তাঁহার প্রকৃতি তেমন তাঁহাকেই দেখান ; আঁটিও রাখেন্ না খোসাও রাখেন্ না ; এত বড় বিশ্বটাকে বেমালুম হজম করিয়া পরপুরুষে সঙ্গতা হইয়া থাকেন। কাজেই তোমারও কর্তৃত্ব থাকে না,— ভগবানেরও কর্তৃত্ব থাকে না। তখন সমস্ত দৃশ্য, সেই সাক্ষী দ্রষ্টাতে, তাঁহারই অনুরূপে মিশিয়া যায়। তাই বুঝি কাশীতে শিব ও বৈকুণ্ঠে সবাই নারায়ণ।

মায়া শ্রীভগবানের চৈতন্য, যখন প্রকৃত স্বরূপে খেলেন তখন একমাত্র অদ্বিতীয়, বিশেষ ভগবানকেই দেখান। তাঁহার এই খেলার নামই বিদ্যাতত্ত্ব। তবে অবিদ্যা কেন ? মায়াসাধ্বী ও সর্ব্বদা ভগবানের অনুরূপা। ভালবাসার সোহাগ তিনিই জানেন। নরনারীর মিলনে যেমন কখনও মিলন, কখনও বিরহ, প্রভৃতি দশাসমূহ আছে, এবং তদ্দ্বারা যেমন মিলনের ঘন একত্বের রসটী আরো ঘনতর হইয়াই অভিব্যক্ত হয়, ইহাও যেন তদ্রূপ। মায়া অভিসন্ধিশূন্যা, পরার্থ-পরা ; তবুও যেন একটু সোহাগের বিলাস দেখাইবার প্রবৃত্তি তাঁহাতে আছে। ভগবান অনন্ত। তাঁহার অনন্তত্ব বিদ্যাভাবে বুঝিতে গেলে কি বুঝায় ?—যত কিছু বিশেষ ও ব্যক্তভাব লইয়া তাঁহার কাছে আস না কেন, সকলই বি-শেষ হইয়া—বোধশূন্য, বাহ্যভাবের লেশশূন্য হইয়া—তাঁহাতেই মিশিয়া যায়। যেমন পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি ভাবগুলিও স্থিতপ্রজ্ঞ জীবের আমিতে মিশে, ইহাও তদ্রূপ। কাজেই এই অনন্ত ভাবের খেলাটী মায়াদেবীর স্বরূপ বিদ্যাভাবের ভিতর দিয়াই হয়। তাই বুঝি শ্রীভগবানের রাসলীলাতেও ব্রহ্মাদি প্রাকৃত দেবগণেরও পবেশের অধিকার নাই। ও যে ভিতরের খেলা! বাহিরের ভাষায় ভাগবতে অঙ্কিত হইলেও, উহা কেবল আমাদের বুদ্ধির অনুকূল করিবার জন্য! কাজেই "রেমে" বলিলেই যেন পরিমার্জ্জিতরুচি পাঠক চমকাইয়া উঠিবেন না। অবিদ্যাভাবে দেখিলে—বাহিরের ভাষায় দেখিলে—ব্যক্তভাবের সংস্কার লইয়া দেখিলে—অনন্ত জীব, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ পর্য্যায়ের (Series) মধ্য দিয়া দেখিতে হয়। এই সকল ব্যক্ত অনন্ত ভাবসমূহে ভগবানেরই প্রতিবিম্ব দেখিতে

হয়। এই অনন্ত জীবাদির অনন্ত জগতের সহিত ও পরস্পরের মধ্যে অনন্ত ভাবের সম্বন্ধ ও ঘাতপ্রতিঘাতে, যদি কেহ জানিতে পারে যে তাহার অনন্ত জন্ম হইয়াছে ও হইবে, তবেই সে বাধ্য হইয়া খেলার অনন্তত্ব পরিত্যাগ করত ভাবের অনন্তত্বের আশ্রয় লইতে চাহে। ইহাই জন্মজন্মান্তর-তত্ত্বের প্রকৃত শিক্ষা। আমি হাতী কি ঘোড়া ছিলাম, জানিবার ইচ্ছাটী তত্ত্বজ্ঞান-বিমুখ অন্ধজ্ঞানের খেলা। তত্ত্ব শব্দে অবিশেষ ভাবই বুঝায়। ভগবানের অনন্তত্ব দেখাইবার জন্ত কর্ম্মের খেলা। বস্তুগত একতা না থাকিলে কি কেহ কাহারও উৎকর্ষ অপকর্ষ বা ভালমন্দ করিতে পারে? এই ঘন একত্ব আছে বলিয়াই কোনও বিশিষ্ট বস্তু অন্য:বস্তুর উপরে ক্রিয়া করিতে সমর্থ। তাইত অন্ন আহারে পুষ্টি, বাহিরের বস্তু লইয়া তুষ্টি ও অবশেষে ইষ্টসিদ্ধি পর্য্যন্ত লাভ হয়। যাহাকে তোমরা অবিদ্যা বল, তাহার খেলার ভিতরেও দেখ সেই একেরই প্রতিষ্ঠা ও উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। সত্যকথা বলিতে কি? বাস্তবিকই কি অবিদ্যা-রূপের খেলাতে আছে? তাহা হইলে ত নিবৃত্তি হইত না! অঙ্কের যোগ তত্ত্ব শিখিতে গেলে যেন অনেকগুলি অঙ্ক কষিতে হয়, এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে আর অঙ্ক কষার আবশ্যক থাকে না। তখন যেমন মনে হয়, যে উহার বিপরীত ভাবটা যে তাহা মিথ্যা ও নিরর্থক; এবং ইহা স্মরণ করিতেও হাসি পায় যে কেমনে ইহার উল্টা বুঝিয়াছিলাম ও কেমনেই বা দুই আর দুই করিয়া কত অঙ্গুলি গণনা করিয়া চারি গণনা করিয়াছিলাম! মহামায়ার অবিদ্যা ভাবও যে সেই প্রকার! তিনি যে বিদ্যাভাবের বা একত্বের সূচনার জন্যই, সেইভাবে খেলিতেছেন; যোগাঙ্কলব্ধ চারটী'ত ঘন এক, বিশিষ্ট একত্ববাচক সংখ্যা! তুমি তোমার বিশিষ্ট ভেদাত্মক একতা ভাব লইয়া আছ বলিয়া, তোমাকে অঙ্গুলি সাহায্যে বার বার অর্থাৎ কালের ক্ষেত্রে গণিতে হয়। চারিটা গরু গণিয়া স্থির করিতে গেলেও একটী শাদা ও অপরটী কালো প্রভৃতি এই সকল বাহিরের বিশিষ্টতাগুলি ত্যাগ করিতে হয়। ইহাতে কি ইহাই বুঝা যায় না যে:ভেদভাবাপন্ন বিশেষ দ্রষ্টা "আমি"র অনুরূপ হইয়াই মহাযোগিনী মহামায়া খেলেন, ও ঐ খেলাকেই তুমি অবিদ্যা নামে অভিহিত কর। তুমি সেই ভগবানেরই অংশ এবং ভগবতী তাঁহার অনুরূপা বলিয়াই তোমার মত হইয়া তাঁহার খেলা! কারণ তাহা না হইলে :তুমি ত একত্ব দেখিতে পারিবে না! তাই বুঝি শাস্ত্রে মহামায়ার অবিদ্যা খেলাকে জীব ও তাহার অনুকূল বলিয়া 'জৈবিক' নামে অভিহিত করা হয়।

আমরা মায়ার কথা বলিতে যাইয়া আপাততঃ অবান্তর ভাবে অনেক কথা

বলিয়াছি। এক্ষণে মায়ার দুইটী ভাব বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব ও প্রথমে মায়ার কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্ব-হেতু ভাবটী বুঝিয়া, পরে দ্রষ্টৃদৃশ্যানুসন্ধানরূপ ভাবটী বুঝিতে চেষ্টা করিব।

কার্য্য-কারণাত্মক ভাবের অর্থ কি? মায়া একই সূত্রে কার্য্য, কারণ ও কর্ত্তৃত্ব এই ত্রিধা বোধ ফুটাইয়া দেন। প্রকাশিত ও ফলভাবটিকে কার্য্য বলে। প্রেরক শক্তিকে কারণ নামে অভিহিত করা হয়। দেখা গেল যে 'রাম' ধন লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করা অতীব দুরূহ। তাহার চেষ্টার কারণ লোভ হইতে পারে, কর্ত্তব্য বুদ্ধি হইতে পারে অথবা অন্যান্য কোনও প্রবৃত্তিও হইতে পারে। সুতরাং ইহা বুঝা যায় যে 'কারণ' ভাবটী কার্য্য অপেক্ষা স্থূলতর ও বিস্তৃত। মনে কর রাম কর্ত্তব্য বুদ্ধি হইতেই ধনাগমের চেষ্টা করে। এখন এই কর্ত্তব্য বুদ্ধিটিও কেবল ধনাগমেই নিঃশেষিত হয় না; অনন্তভাবে, অনন্তকার্য্যে উহার প্রকাশ হয়। সুতরাং কার্য্য দেখিয়া কারণের সবটা বুঝা যায় না; উহার সামান্য ভাবটি অনুমিত হইতে পারে মাত্র। ধনাগম প্রবৃত্তিও মূল কারণ নহে। যেহেতু ঐ বুদ্ধির মূলেও ধনের ব্যবহার্য্যতা ও উপকারিতা বুদ্ধি আছে, ও রামের অহঙ্কারপ্রণোদিত কর্ত্তব্যবুদ্ধি নিহিত থাকে। ধনের উপকারিতা বুদ্ধিও একভাবে থাকে না। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের সহিত মানবের বস্তুনিচয়ের সহিত নিজের সম্বন্ধবোধ যত পরিস্ফুট হইতে থাকিবে, বিশিষ্ট বস্তু বোধও তদনুরূপ পরিণত হইবে। এই বুদ্ধিটিও কার্য্য স্বরূপ, উহার অন্তরালেও আরো সূক্ষ্মতর কারণ আছে। ধনের প্রবৃত্তিতে, মানব ধনের 'সবটা' গ্রহণ করিতে চাহে। ইহাতেও ফলের অনন্ততা আছে। তারপর কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি। এ বুদ্ধিও একভাবে থাকে না। যখন কোনও (কলের) যন্ত্রের কার্য্য হয়, তখন কেহ ঐ কার্য্যের উৎপাদিনী শক্তি আপনাতে আরোপ করে না; সকলেই জানে যে কলই উহার কারণ। সে ক্ষেত্রে মানব স্থূল ত্যজিয়া সূক্ষ্মরূপে যন্ত্র চালাইবার শক্তিটী বা যন্ত্রকে বুঝিবার বুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থাকে। মানব যে স্তরে নিয়ম দেখিতে পায় না, সেই স্তরে থাকিয়াই আপনাতে কর্ত্তৃত্বের ভাণ আরোপ করে। যেখানে নিয়ম দেখিতে পায়, তাহা তাহার পক্ষে প্রাকৃতিক; আর তার উপরের অবিজ্ঞাত তত্ত্বে আমির কর্ত্তৃত্ব বোধ সংরক্ষিত করে। এইরূপে অনন্ত কর্ত্তৃত্ববোধের কেন্দ্র বিতত হইয়া রহিয়াছে।

তারপর দেখ, ফল বা ব্যক্ত কার্য্যসমূহ পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে। একটী বৃত্তি অপর বৃত্তি সমূহকে রঞ্জিত করিয়া দেয়। বৃত্তির খেলা হইতে অনন্ত প্রবৃত্তি

বা কামভাব পরিপুষ্ট হয়। কামের প্রবৃত্তিগুলি মানসিক বিশিষ্ট জ্ঞান (Idea) উৎপন্ন করে; এবং ঐ জ্ঞানগুলি পরস্পর এরূপে মিশিয়া থাকে যে একটিকে উদ্ধার করিতে গেলে, মানসিক অনন্তভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। সুতরাং কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বরূপাত্মিকা মায়ার খেলার ভিতরে দাঁড়াইবার স্থান নাই। স্থিরভাব না থাকাতে, প্রকৃত জ্ঞানেরও অবকাশ নাই। কোন্ বস্তুর কি গুণ বা শক্তি, তাহাও যথার্থরূপে নির্দ্ধারণ করিবার সাধ্য নাই।

এই খেলার ভিতরে থাকিয়া সাংখ্যশাস্ত্র বলিলেন যে, ওরূপভাবে চেষ্টা করিলে কিছুই বুঝিতে পারিবে না। প্রকৃতি সকল ভাবেই বহু জন্য-ভাবের প্রসবকর্ত্রী। বরং আকাশের নক্ষত্র ও সমুদ্রের তরঙ্গের গণনা করা যায়, কিন্তু জন্য-ভাবগুলির সীমা বা সংখ্যা করা যায় না। যাহাকে যুগধর্ম্ম বলে তাহাতে বাহ্য স্থূল বস্তুরও ধর্ম্ম বিপর্য্যয় হয়। মানবের শরীর ও তাহার গঠন প্রভৃতিরও এত বিপর্য্যয় হইয়াছে যে সত্যযুগের মানবদেহ দেখিলেও আমরা চিনিতে পারি না। তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া না করিলে খেলার নিবৃত্তি হইবে না। স্থূল ভাবরাশির মূলে বাসনাময় অপতত্ত্ব আছে। উহা বাসনা নহে। তবে বাসনার মূল-প্রবৃত্তি উহা হইতে উদ্ভূত। এইরূপে উচ্চ ও উচ্চতর তত্ত্বগুলি বুঝিতে হয়। কিন্তু তাহাতেও'ত খেলা বুঝা যায় না। রাম ক্রোধবশে শ্যামকে হত্যা করিল। সুতরাং ক্রোধকেই কারণ স্থির করিয়া বিচারক তাহাকে শাস্তি দিলেন। কিন্তু ক্রোধ হইলেই কি মানুষে মানুষ খুন করে? তবে রামের ক্ষেত্রে ক্রোধ এবম্ভূত ফল কেন প্রসব করিল, তাহা কে বলিতে পারে? তার পর যে ভাবে যে উপায়ে শ্যামকে হত্যা করিল তৎসমুদয়ইবা কোথা হইতে আসিল? মটর-গাড়ী চড়িয়া ডাকাতি সংসাধিত হইবার বহুপূর্ব্বে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস-লেখকগণ মটর-গাড়ীর এই ব্যবহার গল্পচ্ছলে লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা কি কিয়ৎপরিমাণেও প্রকৃত মটর-ডাকাতির কারণ নহেন।

অব্যবস্থিতচিত্ত লিখকগণ মনে করেন যাহা তাহা লিখিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিলেই হইল। কিন্তু চিন্তাশক্তি যে সর্ব্বাত্মিকা ও অনন্ত-বিশেষ-প্রসবধর্ম্মিণী ইহা সম্যক্ জ্ঞাত থাকিলে বোধ হয় কেহই পুরাণের কিম্বা তাদৃশ পন্থানুসরণ ব্যতিরেকে অন্য প্রকারের উপন্যাস লিখিতে সাহস করিতেন না। সে যাহা হউক, তত্ত্বের জ্ঞানটী সামান্য জাতীয়। সেইজন্যই বুঝি সাংখ্যমতে প্রকৃতিকে জানা যায় না। তাঁহাকে দেখা যায়, চিনা যায়। যে তাঁহাকে দেখিতে ও চিনিতে পারে, তিনি অবগুণ্ঠনবতী হইয়া দ্রষ্টা পুরুষের সম্মুখ হইতে অপসৃত হন। কিন্তু তিনি যে

বিশেষ বিকার-সমূহ প্রসব করিলেন, তাহার তথ্য বিশেষভাবে বলা যায় না। সুতরাং তত্ত্বের ভিতর দিয়া গেলেও 'সর্ব্বজ্ঞতা' লাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু মানব 'সর্ব্ববিৎ' হইতে পারে না। একজন ভক্ত বিষ খাইতে যাইয়া ভগবৎকৃপায় উহা অমৃত হইল বলিয়া, অপর ভক্তের পক্ষেও যে উহা অমৃতই হইবে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তাহা বিশেষরূপে বলিতে পারেন না। ভগবৎকৃপায় ঐ ভক্তের যে কোনও বিশেষ অপকার হইবে না, তত্ত্বজ্ঞ-হিসাবে এইটুকু মাত্রই বলা যাইতে পারে। অতএব হে বৈজ্ঞানিক ও যোগী, তোমরা যে বিশেষ কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলা জান বলিয়া অভিমান করতেছ, তাহার বাস্তবিক কোনও সত্তা আছে কি? সর্ব্ব পদার্থেই যখন সর্ব্ব-ভাবে রহিয়াছে তখন কোন্ বস্তু বা কোন্ শক্তিটীকে কারণ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবে? মায়ার নেত্রে এই শৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তত্ত্বজ্ঞানী হইলে হয়ত সেই শৃঙ্খলার মধ্যে সামান্যভাবে সত্যের উপলব্ধি হইতে পারে; কিন্তু তাহার উপরে বিশেষ জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে না। সামান্য ভাবে মাধ্যাকর্ষণ সত্য হইলেও কুম্ভকযোগীর পক্ষে তাহার বিপরীত ফল হইতে পারে। প্রাকৃতিক বিলাসক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিয়া যতই যাহা বুঝনা কেন, কোনও বস্তুরই স্বরূপ বুঝিতে পারিবে না। তাহার বহিস্থ শক্তি, তাহার প্রবণতাদি কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া, তাহাতে একটা কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বের শৃঙ্খলা বোধও জন্মিতে পারে; কিন্তু উহার পরম বিশেষ ভাবটী বুঝিতে পারিবে না।

তারপর কার্য্যসমূহ কিভাবে কারণে থাকে, তাহা কি বিশেষ করিয়া জান? কর্ত্তাতে কার্য্য ও কারণ কিরূপে লীন হয় ও পরে কিরূপে প্রকটিত হইবে, তাহা কি বলিতে পার? এত বিশেষ বিশেষ কার্য্যসমূহ কারণের ক্ষেত্রে যাইয়া একেবারে চিহ্ন পর্য্যন্ত ত্যাগে বিলুপ্ত হইয়া যায়। কারণনিচয় কর্ত্তাতে মিশিয়া স্ব-ভাব বর্জ্জন করত ডুবিয়া যায়। পুনরায় আবার কেমনে প্রকাশ হয়, তাহাইবা কিরূপ? ব্রহ্মা যথাপূর্ব্ব সৃজন করেন বলিয়া তোমরা কি ভাবিয়া থাক যে এবারের সর্ব্ব মানব পশু বৃক্ষ অট্টালিকাদি সম্বলিত কলিকাতা পূর্ব্বকল্পের কলিকাতা; এবং পূর্ব্বকল্পের ঠিক এরূপ সময়ে ইরোপে এরূপ মহা সমরই প্রজ্বলিত হইয়াছিল? পাছে কেহ তাহা মনে করে বলিয়া পুরাণ শাস্ত্রে ব্রহ্মার অষ্টাদশ ষোড়শ বদনাদির বর্ণনা করা হয়। ব্রহ্মার সামান্য তত্ত্বভাবেই এই সকল বিশেষ ব্রহ্মার মিলন।

অতএব বুঝা গেল যে যেদিক্ দিয়াই দেখ না কেন মায়ার কার্য্য-কারণ কর্ত্তৃত্বাত্মক খেলার সামান্য ভাবটীই বুঝা যায়। তাহার ভিতরে যে বিশেষ ভাব

রহিয়াছে তাহা মায়ার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক জ্ঞানের সাহায্যে কিছুতেই বুঝা যায় না। শ্রীভগবান্ বৃন্দাবনলীলায় ব্রহ্মার মোহনাশকল্পে বেচারার ব্রহ্মার সৃষ্ট "পার্থিব একটী বৎসর বেমালুম চুরি করিয়া ফেলিলেন, অথচ ব্রহ্মাদি কেহই তাহা বুঝিতে পারিলেন না। একমাত্র বলদেবের মনে কেমন কেমন লাগিতেছিল। ব্রহ্মার সৃষ্ট গোপশিশু গোবৎসগণ মায়াযবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিলে ভগবান্ তদীয় বিশেষ ভাব ও শক্তি প্রকট করিয়া যে বেণুবীণাশৃঙ্গদণ্ডাদি সমন্বিত সালঙ্কার গোপবালকগণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে একটু বিশেষত্ব ছিল। বলদেব দেখিলেন যে পূর্ব্বে নন্দাদি গোপ ও ব্রজগোপীগণ ভগবানকে যে বিশেষ প্রেমের চক্ষে দর্শন করিতেন সেইভাবেই ভগবৎসৃষ্ট গোপ ও গোবৎসকুল দেখিতে লাগিলেন। তাই বলদেব বলিলেন—

কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি।
ব্রজস্য সাত্মনে স্তোকেষ্বপূর্ব্বং প্রেমবৰ্দ্ধতে॥ ৩৬॥
কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥ ৩৭॥

ভাগবৎ (১০।১৩।)

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

গাঁজার দম।

(সত্য ঘটনা)

কয়েক বৎসর হইল আমার চোক্ ফোটে। তার আগে ভাবিতাম যে হিন্দু তীর্থসন্নিবেশটী মানব-কল্পিত। দূরদেশে,—যেখানে যাইতে গেলে কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না এইরূপ স্থানে অধ্যাত্মবিদ্যার শিক্ষাকল্পে সাধুগণ তীর্থের কল্পনা করিয়াছেন। বোধ হয় আমার মত অনেকেই এই ভাবটী গ্রহণ করেন। তীর্থে যে প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবৎসত্ত্বার প্রকাশ হয় একথা অনেকেই মানিতে চাহিবেন না। তাঁহাদের মতটী ফিরাইবার জন্য এই প্রকৃত ঘটনার আখ্যায়িকার অবতারণা করা হয় নাই। কথায় বলে 'মন না মতি'। মত ফিরিতে বেশী দেরী লাগে না।

আর একটা কথা বলে রাখা আবশ্যক। বহুদিন পূর্ব্বে আর একবার বৈদ্যনাথে

গিয়াছিলাম। তখন জীবনটী পাশ্চাত্যদর্শনের নাস্তিকবাদ অবলম্বন করিয়া বহিতেছিল; দেবতা প্রভৃতিতে বিশ্বাস ছিল না। কেবল পাঁচজন বন্ধুর উপরোধে যাওয়া। মন্দিরের প্রকাণ্ড চত্বরে ঢুকিতে গেলে যে সিংহ-দরজা আছে, তথায় উপস্থিত হইয়া পাণ্ডা মহাশয় আমাদিগকে জুতা খুলিতে বলিলেন। সকলেই খুলিল। কিন্তু আমার দার্শনিক মস্তিষ্কে কথাটা ভাল লাগিল না। ভগবান্ ত সর্ব্বত্রই আছেন, জুতাতেও আছেন, তবে তাহা পরিত্যাগ করিব কেন? আর যদি নেহাৎ বল, তবে মহাদেবের মন্দিরে ঢুকিবার আগে খুলিলেই চলিবে। যা'হক্ পাণ্ডাগণ রাজী হল না, আমারও মন্দিরে যাওয়া হল না।

তার পর নানা কারণে 'বদ্‌লে গেল মতটা' ও বাস্তবিকই 'ঘুরতে ঘুরতে পড়ে গেলাম থিয়সফির গর্ত্তে'। একটু ধ্যান ধারণা অভ্যাস করিতে লাগিলাম। তার মাঝে একদিন হঠাৎ মনে হল যে জুতা খোলার অছিলা করে দেবাদিদেবকে দর্শন না করে ফিরে আসাটা বড়ই অপরাধ হয়েছে। জুতা বা টুপি খোলাটা যে সাময়িক অহংকার-ত্যাগের বাহ্য ব্যঞ্জনা, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। তাইত সাহেবরাও গির্জ্জায় টুপি খোলে। মাথাটা না নওয়াইলে, আর উপারের ভাব ফুটে না। যে কার্য্য দিয়া ভিতরের সংস্কারটী প্রশমিত হয় তাহা ভিন্ন দেশে ভিন্ন হইলেও, তথ্যটী এক। যাক্ শিবের গান গাইতে ধান ভান্‌তে আরম্ভ করেছিলাম।

বৈদ্যনাথে যে কি আছ তাহার কোনই সংস্কার ছিল না। কেবল এক মহাদেব আছেন এইটুকুই জানা ছিল। কালপূর্ণ হইলে কয়েকটী বন্ধুর সহিত পুনরায় বৈদ্যনাথ যাত্রা করিলাম। তাহার মধ্যে কেহ বা Week-end outing এর জন্য, কেহ বা স্বভাবের শোভা দর্শনের জন্য সঙ্গী হইয়াছিলেন। জানি না কেন, বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময়—"ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো" এই কথাটী হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীত ধ্বনিত হইতে লাগিল। দেখিলাম Expressএর চাকাগুলি সেই সুরেই বাজে; দেখিলাম বৃক্ষগুলি সেই শিব ভাবটী পূর্ণ প্রকাশ করিতে না পারিয়া, স্থবির হইয়া গিয়াছে, কেবল উর্দ্ধ-গতিতেই তাহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষার একটু ব্যঞ্জনা দেখা যায়। প্রত্যেক মানবই সেই সুরে উর্দ্ধ অভিসারিণী প্রবৃত্তিটীর অনুশীলন করিতে পারে না কেন, তাহার উত্তর দিতেছে। সকলেই প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছে যে অন্তরে কি এক শিবতম রসের প্রবাহ রহিয়াছে। সকলেই তাহাই চায়,—যাহা একবার পাইলে আর যাইবে না। তবে কামনার মোহে, ভেদবুদ্ধির মন্দান্ধকারে কোন্‌টা ধরিতে

কোন্‌টা ধরিয়া ফেলে, তাই জীবনে এত কৈফিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়। কার্য্য সামর্থ থাকিতেও, কার্য্য না হইলে কৈফিয়ত দিতে হয়।

দূর ছাই, আবার দার্শনিক কচ্‌কচানি। ট্রেণটী ভোর বেলা আমাদের বৈদ্যনাথধামে নামাইয়া দিল। হরেন ভায়ার লোক পাঠাইবার কথা ছিল; কিন্তু ভুলক্রমে তাহা হয় নাই। তখনও বেশ অন্ধকার ছিল। সুতরাং তাহার বাসাটী ঠিক করিতে পারা গেল না। সময় কাটাইবার জন্য আমরা সমোট-কুলী সহ ঘুরিতে আরম্ভ করিলাম। পরে দেখিলাম যে অন্ধকারে আমরা মন্দিরেরি চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম। এইরূপে দায়ে পড়ে প্রদক্ষিণ করা হয়ে গেল।

বাসায় গিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, সন্ধ্যা করিতে বসিলাম। আমাদের প্রাতঃকৃত্যত' সন্ধ্যা নয়; এক পেয়েলা চা, শৌচাদি গমন, একবার দাড়িটী কামান ইত্যাদি। তাই বলিলাম প্রাতঃকৃত্য করিয়া, সন্ধ্যা করিতে বসিলাম।

বন্ধুগণ আকাশগঙ্গা প্রভৃতিতে অবগাহন করিলেন, আমার ভাগ্যে কূপ-গঙ্গাই ঘটিল।

একি! সন্ধ্যা করিতে বসিয়া একি! স্বাভাবিক জীবনের ভাবটী, ওই যে কি বল তার Polarity টী উল্টাইয়া গেল। দেখিলাম এক পরিপূর্ণ আনন্দময় চিন্ময় সত্ত্বা আপনার ক্ষেত্রে ঢল্ ঢল্ করিয়া তরঙ্গায়িত হইতেছে। সবই স্থির, সবই ঘন আনন্দময়রূপে পরিসমাপ্ত। অহঙ্কার নাই, ক্রিয়া নাই, দেশ নাই, কাল নাই। সেই ঘন সত্ত্বার ভিতর গুরুদেবের অভিব্যক্তি হইল। তিনি যেন আশীর্ব্বাদ করিলেন।

গাহিলাম—

"প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বৈদ্যনাথং
জগন্নাথ নাথনাথং সদানন্দভাজাং।"

তারপর মাথায় হাটিলাম কি পায়ে হাটিলাম, বলিতে পারি না। মনে হইল যে হৃদয়-চৈতন্যের অধিষ্ঠাতার কাছে যাইতেছি। মনে হইল যে অহঙ্কার থাকিলেই মানুষ খাড়া হইয়া চলে; এ মহা-চৈতন্যের অভিব্যক্তিতে সাষ্টাঙ্গে ধরিত্রী ও সর্ব্বভূতকে নমস্কার করিয়াই যাওয়া উচিত। "মধুমৎ পার্থিবং রজঃ"। সেই মধু-স্রোতে পৃথিবী তত্ত্বও মধুময় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে করিতে—যাহাকে তোমরা দণ্ডীখাটা বল—কতটা সেইরূপ ভাবেই,—দেহটী মন্দিরের দিকে চলিতে লাগিল। প্রাণ আর যাবে

কোথায়; সে যে ধরা পড়িয়াছে। সে যে স্থির শাশ্বতের স্পর্শে শান্ত ও স্থির হইয়া গিয়াছে। অনেকে অনেক কথা বলিয়াছিল শুনিলাম। কিন্তু কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া কথাগুলি যে সব শিবময় হইয়া গেল। অন্য অর্থ বুঝিতে পারি নাই। ২।১টী বন্ধুও নাকি আমার ভাবে বড় লজ্জা বোধ করিতেছিলেন। এইরূপে মন্দির-প্রাঙ্গণে আসা গেল। পাণ্ডা দেবাদিদেবের মন্দিরের দিকে লইয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু প্রাণের ভিতর গুরুদেবের মধুর ধ্বনি বাজিয়া উঠিল। শুনিলাম—"বৎস, প্রত্যেক তীর্থে ভগবানের এক একটী ভাব আছে। এখানে হৃদয়-চৈতন্যে প্রতিভাত স্বরূপটী সংরক্ষিত হইতেছে। এই ভাবটী সংরক্ষণ জন্য পার্শ্বদেবতাবর্গের অধিষ্ঠান। এই ব্যূহাধিষ্ঠিত দেবগণের করুণা না পাইলে প্রকৃত দেবদর্শন হয় না।" সুতরাং পাণ্ডার কথা না শুনিয়া অগ্রেই সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিতে করিতে পার্শ্বদেবতাঅভিমুখে যাত্রা করিলাম। তখন চোখে আর কিছু দেখা যায় না। ঘন রসের আনন্দময় নির্ঝরে বাহ্যবস্তুজ্ঞান তিরোহিতপ্রায়। একটী মন্দিরে পৌঁছিলাম; পৌঁছিবামাত্রই আপনা আপনি হৃদয় হইতে বাজিয়া উঠিল—

"নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।"

আনন্দময়ীর আনন্দময় সত্তায় প্রকৃত জ্ঞানের বেলাভূমি ভাসাইয়া দিয়া চলিল। দেখিলাম আনন্দময়ী লীলা-বিলাস বিলীন করিয়া, আনন্দময়ে মিশিবার জন্য যাইতেছেন। ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ছোট ছোট স্রোতগুলি মহামায়ার সহিত সমরসতা লাভ করিয়া খেলা বন্ধ করিয়া—তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিল। "যদ্বৎ নদ্যোঃ সমরসতয়া সাগরত্বং হ্যবাপ্তা"। বৃত্তি আর নাই। বৃত্তি আর বাহিরে না আসিয়া, সেই শিবতম সত্ত্বে অবস্থান করিতেছে।

একবার চমক ভাঙ্গিল। দেখি বন্ধুগণ ও পাণ্ডা মহাশয় আমায় কতকগুলি ফুল দিয়া বলিতেছেন—বল—"সর্ব্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমস্তু তে।" এর আগে চোখে কিছু দেখি নাই। জানি না কেন, অঞ্জলিটী লইয়া শুইয়া পড়িলাম, ও স্বীয় হৃদয়ে তাহা প্রদান করিলাম। জগন্মাতার আশীর্ব্বাদে এক আশ্চর্য্য শক্তির উদ্ভেদ হইল। প্রত্যেক মানবের হৃদ্গত ভাবটী পর্য্যন্ত আমার নিকট দৃশ্যরূপে প্রতীত হইতে লাগিল। এইভাবে ব্যূহদেবতাগুলির আশীর্ব্বাদ লাভ হইলে, বিধিমত মন্দির প্রদক্ষিণ করত, বাবার মন্দিরে শরীরটীকে লইয়া যাওয়া হইল। বন্ধুবর্গের মধ্যে সকলেই কেহ ১৲, কেহ ২৲ টাকার পূজা-

সন্তার সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিলেন। আমি কেবল রিক্তহস্ত; কেবল ভাবিতেছিলাম যে "পৃথিবীতত্ত্বে তোমার পুণ্যগন্ধ রূপ প্রথম ব্যঞ্জনা সঞ্চয় করা হয় নাই; বাসনার ভিতর সেই একীকরণ ও পিণ্ডীকরণরূপ একত্ব শক্তির অনুভব হয় নাই। আমাদের বাসনাত' ভোগেই পরিসমাপ্ত। তবে কি লইয়া আজ তোমার দ্বারে উপস্থিত হইব। তোমার উপযোগীও কিছুই নাই। যাহা আছে, তাহাও যে দানব-ভাবদুষ্ট ভেদভাবশীল অহঙ্কার। এটা কি লইবে?"

মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে একটী কোণে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। কেবল যাত্রীগণের পদরজ ও মহাদেবের স্নান-জলের সহিত মিলিত হইয়া যে কর্দ্দম তৈয়ারী হইতেছিল, তাহাই সকলের অজ্ঞাতে লইয়া সর্ব্বদেহে মাখিতেছিলাম ও ভাবিতেছিলাম যে, 'এর চেয়ে বেশী অধিকারও আমার নাই।' মন্দিরে গিয়া নূতন কিছু ফুটিল না। ভিতরে 'বাঁধা-রোস্‌নাই' বাসা হইতেই জ্বালিত হইয়াছিল। তাহাই যেন এক সৌম্য সৌম্যতর সৌম্যেভ্যঃ অতি সুন্দরীভাবে ঘন হইয়া ফুটিয়া উঠিল। আর মুখে কেবল 'ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ।' কোন মূর্ত্তিটুর্ত্তি দেখি নাই। তবে আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠিতা চিরকুমারী মা আনন্দময়ী ঘন আনন্দময়ের সহিত কিরূপে মিশিয়া খেলিতেছিলেন, তাহা কথায় বর্ণনা হয় না। নেশা না করিলে কি কেহ নেশার মর্ম্ম বুঝে। সে চৈতন্যময়ের খেলা যে কিরূপ তাহার ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য দুই একটী ঘটনা মাত্র বলি। * * * কলিকাতার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহিণী মন্দিরে প্রবেশ করিলেন; সমস্ত শরীর হইতে দম্ভ ফুটিয়া উঠিতেছে; বসনটী এরূপভাবে পরিধান করা হইয়াছে যাহাতে স্বর্ণ ও হীরকমণ্ডিত 'অনন্ত, বালা' প্রভৃতির জৌলশটী সকলেই দেখিতে পায়। দক্ষিণ হস্তে স্বামী বেচারার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতেছেন। বেচারা বলির মেষের ন্যায় বাঙ্‌নিষ্পত্তিহীন। তা' ত হবেই, যে কাচ্‌পোকায় ধরিয়াছে। মনে হল যে, "এরা তোমার কাছে কেন? এ ত তোমায় চায় না। ভিতর হইতে ধ্বনিত হইল—

"সর্ব্বস্য চাহং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ
মত্তঃ জ্ঞানং স্মৃতি অপহোনঞ্চ।"

"ঐ দেখ আমার মোহরূপে আকৃষ্ট হইয়া, সন্তানগণের মঙ্গলকামনায়, দম্ভ দর্প প্রভৃতি সকলই পরিত্যাগ করিয়া রমণী এত সাধের আমিটীকে ছাড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে।"

বুঝিলাম মানুষ যদি কাহারও জন্ত, যে কোনও ভাবে, আপনাকে ভাসাইতে পারে, সেই মুহূর্ত্তে তাহার ভিতর প্রাণনাথের একটু বিলাস হয়।

* * * *

একটী আশী বৎসরের বৃদ্ধাকে লইয়া রাব্‌ড়ী-পুষ্ট বিশাল-দেহ পাণ্ডা মহাশয় প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে টলমল করিয়া আসিতেছে। ভিড় ছিল বলিয়াই পড়িয়া যায় নাই। বৃদ্ধাকে শ্রীলিঙ্গের নিকট বসাইয়া পাণ্ডা বলিলেন, "মাগী বল—ধ্যায়িত্যং মহিষং রজতগিরিনিভং—দে জল্ দে।"

শাস্ত্রচর্চ্চায় পরিপুষ্ট বুদ্ধিটী বড়ই ক্লিষ্ট হইল। ভাবিলাম—"এত ভুল মন্ত্রে কি কিছু হয়?" কিন্তু বৃদ্ধার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখি,—নির্ম্মল একাগ্র ভক্তিতে তাহার হৃদয়টী ভাসিয়া যাইতেছে। পাণ্ডা "বাবাকে স্পর্শ কর" বলিয়া বৃদ্ধার কম্পিত হস্তটী লইয়া শ্রীলিঙ্গ স্পর্শ করাইল। একি!! বৃদ্ধা সমাধিস্থা! হৃদয়ে মহাদেব শিবান্বিত হইয়া সস্মিত বদনে সকরুণ দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছেন। বৃদ্ধাকে আর নাড়া যায় না, শরীরটা কাঠ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতে প্রবলকায় পাণ্ডাদের কি আসে যায়? একটী ঝাঁকুনি দিয়া বলিল—"মাগি ওঠ্ ওঠ্ চল্ চল্।" তখন বৃদ্ধার দুই আঁখি দিয়া অবিরত প্রেমের ধারা বহিতেছিল, কথা কহিতে পারিতেছিল না; অতি কষ্টে বলিল—'বাবা আমি কি দেখিলাম? কি দেখিলাম?" আমি থাকিতে পারিলাম না। বৃদ্ধাকে কোলে করিয়া বাহিরে আনিলাম, বলিলাম, "মা তুমি ঠিক্ দেখিয়াছ।" ভাবিলাম রাগ, দ্বেষ ও প্রেম প্রবৃত্তি যে কোনও বৃত্তি আসুক্, তাহাতে কিছু আসে যায় না। তিনি যে পরিপূর্ণ তাই সকল বৃত্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছেন। সকল জীবের হৃদয়ের মধ্য দিয়া, যাহাকে তোমরা কামনার জাল বল,—তাহার ভিতর দিয়াও ফুটিয়া উঠিতেছেন। গুরুদেবের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা স্পর্শ হইলেই তখন দেখিতে পাওয়া যায়।

মন্দিরের বাহিরে আসিলাম, দুই জন ঢুলী বৃহৎ ঢাকে কাঠি দিয়া আমাদের চারিদিকে নাচিতে লাগিল ও গাহিল—

"মন্ মন্ কামনা পুরা করো
ভোলা বাবা বাবা ভোলা"

মাটিতে শুইয়া পড়িলাম। হৃদয় বলিয়া উঠিল—"তথাস্তু।"

কি গাঁজা খাইয়াছিলাম জানি না; পাঠক মহাশয়দিগের নিকট যদি সে গাঁজা থাকে, তবে দুই এক ছিলিম পাঠাইয়া দিবেন।

কস্যচিৎ নিউরোটিকস্য।

ক্ষীরগ্রামে-যোগাদ্যা।

তীর্থ-সেবী হিন্দুযাত্রীগণের নিকট ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থনিচয় মানসপটে বেশ অঙ্কিত আছে। পুরী, দ্বারকা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার ইত্যাদি তীর্থের নাম কে না জানে? কিন্তু আমাদের ঘরের নিকট সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিও যে তীর্থবহুলা, সে কথা আমরা অনেকেই অবগত নহি। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত সকলেরই দ্রষ্টব্য বহু তীর্থস্থান আমাদের এই বঙ্গদেশের ভিতর। আজ শারদীয়া মহাপূজার দিন শঙ্খ, ঘণ্টা, হুলুধ্বনির মধ্যে মায়ের আগমনে আনন্দ উৎসবের মাঝখানে ক্ষীরগ্রামের দেবী যুগাদ্যার তীর্থপট আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

এই তীর্থে গমন করিতে বঙ্গদেশের যাত্রীগণ অনায়াসে পারেন—ইহাতে ব্যয়বাহুল্য নাই—পথশ্রমের ক্লান্তি নাই—আহারের অস্বাচ্ছন্দ্য নাই,—কেবল চাই হৃদয়ের একটু অনুরাগ ও সেই অনুরাগানুকারী দুই এক দিনের জন্য কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ।

বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া একটী প্রাচীন স্থান—মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের দীক্ষার স্থান—কেশব ভারতীর ভজনের স্থান। এক্ষণে এই কাটোয়া দিয়া কলিকাতা হইতে বারহারোয়া একটি রেলওয়ে লাইন খুলিয়াছে—ও কাটোয়া বর্দ্ধমান আর একটি ক্ষুদ্র রেলপথও প্রসারিত হইয়াছে। এই শেষোক্ত রেলওয়ে লাইনের উপরেই ক্ষীরগ্রাম ষ্টেশন অবস্থিত। কাটোয়া ও ক্ষীরগ্রামের মধ্যে কৈচর ষ্টেশন; ক্ষীরগ্রাম ও কৈচর এই দুই ষ্টেশন হইতেই ক্ষীরগ্রাম প্রায় সমান দূরবর্ত্তী—আনুমানিক ১৷৷০ মাইল ২ মাইল হইবে। ষ্টেশনে প্রায় গো-গাড়ী পাওয়া যায়; তবে তাহারা যাত্রীগণের নিকট অপরিচিত দেখিয়া অনেক বেশী ভাড়া আদায় করিয়া থাকে। এই সামান্য দূরবর্ত্তী পথের জন্য যাওয়ার সময় আমাদের ১৷৷০ টাকা ভাড়া লাগিয়াছিল।

আসিবার সময় কৈচর ষ্টেশনে আসি, ও তথাকার পরিচিত লোকে গাড়ীভাড়া করিয়া দেন বলিয়া মাত্র ৷৷০ আনা ব্যয় হয়। যদি সঙ্গে জিনিসপত্র না থাকে গাড়ীভাড়ার কোন আবশ্যক হয় না। আমরা আসিবার সময় গল্প করিতে করিতে এ দূরত্ব বুঝিতেও পারি নাই! মুটেও পাওয়া যায়—ষ্টেশনে না

পাওয়া গেলে ক্ষীরগ্রামের নিকটেই নিগনগ্রাম হইতে সংগ্রহ করা বিশেষ কঠিন নয়।

ভারতবর্ষীয় পীঠস্থানের বৃত্তান্ত যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা জানেন যে দেবী ভগবতীর দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ এই স্থানে পতিত হওয়ায় ইহা মহাপীঠ।

ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরবঃ ক্ষীরকণ্ঠকঃ।
যোগাদ্যা সা মহাদেবী দক্ষাঙ্গুষ্ঠপাদ নমঃ॥ —পীঠমালা।

ক্ষীরগ্রামে ডানিপার অঙ্গুষ্ঠ বৈভব
যোগাদ্যা দেবতা ক্ষীরকণ্ঠক ভৈরব। (অন্নদামঙ্গল)

কালীঘাট, চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা পভৃতি তীর্থস্থান যাঁহারা দর্শন করিতে যান, আমাদের নিকটবর্ত্তী এই পীঠস্থানটিতে তাঁহাদের যাওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতেই দেবীর বিশেষ পূজা হয়; ঐ দিনে অতি প্রত্যূষে দেবীর প্রস্তরময়ী মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি "ক্ষীরদীঘি" নামক পুষ্করিণী হইতে উত্তোলন করিয়া নিকটবর্ত্তী একটি বেদীঘরে স্থাপিত করা হয়, এবং নিশাবসানে ঐ মূর্ত্তি পুনরায় জলমধ্যে নিমজ্জিত করা হয়। সুতরাং ঐ সংক্রান্তি দিবস ভিন্ন মায়ের ঐ মূর্ত্তি সন্দর্শনের উপায় নাই। সংক্রান্তির পূর্ব্বদিনে গ্রামে পৌঁছিলে মূর্ত্তি উত্তোলনটি বেশ দেখা যায়।

সেদিন ক্ষীরগ্রামবাসী দ্বারে দ্বারে মঙ্গলঘট ও কদলীবৃক্ষ রোপণ করিয়া যোগনিদ্রাঙ্কিতা মহামায়ার দর্শনাশায় অপেক্ষা করেন—নরনারী বালকবৃন্দ যুবক যুবতীর আনন্দ-কোলাহলে গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠে—আজ যেন সকলেই মায়ের আগমনের জন্য সকল যাতনা ভুলিয়াছে—রোগ শোক ভুলিয়াছে—আত্ম পর ভুলিয়াছে। আজ বৈশাখের দারুণ রৌদ্র তাঁহাদের লক্ষ্যের মধ্যে নহে; পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিগণ আনন্দ মগ্ন হইয়া দলে দলে ঢক্কানিনাদের সহিত তালে তালে নাচিতে নাচিতে মায়ের দর্শনাশায় এই গ্রামে আসিতেছে—এ এক অভিনব দৃশ্য—পল্লীবাসীর আনন্দ অভিব্যক্তির এক নূতন চিত্র। বিলাস-বৈভব নাই, আছে সরল ভাবের ব্যঞ্জনা। বাহ্য সভ্যতার সহিত কপটতার বুদ্ধিমূলক সুসভ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় গৃহস্থাশ্রমের অবলম্বনীয় এবং আশ্রয়নীয় আতিথ্যসৎকার। গ্রামবাসী সকলেই সেই জনকোলাহলের ভিতরও আগন্তুক যাত্রীগণের সম্বর্দ্ধনার জন্য যেন হাত বাড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের অট্টালিকা নাই, কুটির আছে;—কপটতা নাই, সরলতা আছে;—বাহ্য চাক্‌চিক্য নাই,—আন্তরিকতা আছে।

নূতন স্থানে যাইতেছি, আমরা সহরবাসী,—আমরা সহজে কাহাকেও গৃহে আশ্রয় দিই না, কাজেই সেইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যাইতেছি। আরও বহুলোক সেই যোগাদ্যা-দর্শনে গমন করিতেছে। একটি ব্রাহ্মণযুবক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গ্রামে আমার পরিচিত কেহ আছেন কি না, আমি তদুত্তরে বলিলাম "না"; তিনি বলিলেন "তবে আমাদের বাটিতেই থাকিবেন।" আমি তাঁহার আন্তরিকতা দেখিয়া "তাহাই হইবে" বলিলাম—আমি স্থূলকায়, কাজেই তাঁহার অপেক্ষা ধীরগামী। সুতরাং তিনিও ধীরগমন করিয়া আমার সঙ্গে চলিলেন।

ক্ষীরদীঘির পারেই পক্ককেশ এবং দীর্ঘ শ্মশ্রু এক ব্যক্তিকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ-যুবক প্রণাম করিলেন, ও আমরা যে তাঁহার অতিথি হইয়াছি এ সংবাদ প্রদান করিলেন। তিনিও বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে একটী ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং আমাদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইঁহার নাম ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, এবং অবস্থাতেও গ্রামের মধ্যে মন্দ নহেন। দেখিলাম, পরিচিত অপরিচিত প্রায় শত লোকের উপর ইঁহার বাড়ীতে ভোজন করিতেছে। শুনিলাম সেদিন গ্রামবাসিগণের অবারিত দ্বার। বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই দারুণ গ্রীষ্মে পাদুকা-ছত্র-বিহীন হইয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে উত্তপ্ত মৃত্তিকার উপর দিয়া আমাদিগকে প্রতিমা দর্শন করাইতে লইয়া গেলেন; এবং তাঁহাকে দেখিয়া আমার মনে হইল যেন ব্রহ্মতেজে দীপ্তদেহ জরার করস্পর্শের মধ্যেও হীনতেজ হয় না, মনের উপর ক্লান্তি বা অব-সাদও ছায়াপাত করিতে সাহস পায় না।

এই দেবী সম্বন্ধে যাহা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহাকে অবলম্বন করিয়া এই গ্রামবাসী বাঞ্ছারাম বিদ্যারত্ন মহাশয় একখানি যোগাদ্যা-বন্দনা বলিয়া পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন, তাহার মোটামুটি কথা পাঠকগণের সমীপে উল্লেখ করি।

লঙ্কাধিপতি রাবণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহীরাবণের গৃহে ভদ্রকালী নামে পূজিত হইতেন। মহীরাবণ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে বধ করিবার জন্য তাঁহাকে পাতালে লইয়া গেল। হনুমান মহীরাবণকে বধ করিয়া দেবী ভদ্রকালীকে আনয়ন করিয়া এই মহাপীঠে স্থাপন করেন।

তখন হরিদত্ত নামে ঐ স্থানে এক রাজা ছিলেন। দেবী স্বপ্নে তাঁহাকে আদেশ করিলেন—

"তোমারে সদয় আমি দেবী ভদ্রকালী
মোর পূজা কর নিত্য দিয়া নরবলী।"

রাজা সাত পুত্র সাত দিনে বলি দিয়া দেবীর পূজা করিলেন; তৎপরে প্রত্যহ ঘরে ঘরে এক একটী করিয়া নরবলীর পালা করিয়াছিলেন। অবশেষে পূজারী ব্রাহ্মণের পালা আসিল; ব্রাহ্মণের এক পুত্র—তিনি স্ত্রী পুত্র লইয়া রাত্রে পলায়ন করিলেন। তখন দেবী ব্রাহ্মণীর বেশে পথ আগুলিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলেন—"ব্রাহ্মণ! এত রাত্রে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতেছ কেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন—আমি যোগাদ্যার ভয়ে পলাইতেছি। তখন ছদ্মবেশধারিণী দেবী বলিলেন—

"যার ভয়ে পলাইছ সেই দেবী আমি।"

তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন—"এ কথা প্রত্যয় হয় না।" তখন সেই দেবী—

ভকত বৎসলা মাতা দেবী কাত্যায়নী।
হইলেন বিপ্র-অগ্রে মহিষমর্দ্দিনী॥

সেই দিন হইতে এই বাধ্যতামূলক নরবলী বন্ধ হয়—

বৎসর অন্তর নর আপনি আসিবে।
মহা পূজার দিনে তারে বলিদান দিবে॥

গ্রামবাসিগণ বলিলেন যে, ক্ষীর গ্রামে ইংরাজ-রাজত্বের কালে নরবলিদান একেবারে বন্ধ হইয়াছে। রাজার সাত পুত্র পরে পুনরুজ্জীবিত হয়। এ সকল অলৌকিক ঘটনা বিশ্বাস না করুন, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা যে অতি প্রাচীনকাল হইতে পীঠরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন ইহা সত্য। আর একটী প্রবাদ যে দেবী যোগাদ্যা ভানুদত্ত নামে এক শাঁখারীর নিকট "ধামাচে" নামক পুষ্করিণীর পাড়ে শাঁখা পরিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি এই পুষ্করিণীতেই নিমজ্জিত থাকিতেন। অধুনা সে পুষ্করিণী শুকাইয়া গিয়াছে এবং মাঠে পরিণত হইবার উপক্রম। এক দিন উক্ত শাঁখারীকে ডাকিয়া দেবী বলিলেন—

দেবী বলেন তুই বাট শঙ্খ লব আমি।
ইহার উচিত মূল্য কত লবে তুমি॥

সেই শাঁখারী বলিল, 'তুমি একা এখানে বসিয়াছ তোমাকে শাঁখা পরাইতে শঙ্কা হইতেছে আর টাকাইবা কে দিবে'? দেবী বলেন, 'আমি পূজারী ব্রাহ্মণের কন্যা—গম্ভীরার কোলঙ্গীতে পাঁচ্‌টাকা আছে, তুমি তাঁহার কাছে টাকা লওগে'। দেবীকে শাঁখা পরাইয়া পূজারীর নিকট আসিয়া শাঁখারী টাকা চাহিলেই ব্রাহ্মণ বলিল, আমার ত কন্যা নাই। তখন শাঁখারী বলিল যে, 'গম্ভীরার কোলঙ্গীতে টাকা আছে দাও'। ব্রাহ্মণ টাকা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন, তখন বুঝিতে বাকী

থাকিল না; ব্রাহ্মণ শাঁখারীকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘাটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

যদি দরশন মাগো না দিবে আমারে।
ব্রহ্মহত্যা হব আমি তোমার উপরে॥

তখন দেবী জল হইতে হস্ত উত্তোলন করিয়া শাঁখা দেখাইলেন—এখন পর্য্যন্ত সেই শাঁখারীর বংশধরগণ মহাপূজার দিনে শাঁখা লইয়া আসে। তাঁহাদের বাটী বর্দ্ধমান জেলা, কড়ুই গ্রাম।

এই গ্রামে দেবীর আদেশ বলিয়া কতকগুলি বিধিনিষেধ প্রচলিত আছে। গ্রামবাসিগণ বেদবাক্যের ন্যায় এখন পর্য্যন্ত সেগুলি মান্য করিয়া থাকেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য কতকগুলি নিম্নে লিখিলাম।

(১) সমস্ত বৈশাখ হিংসা না করিবে মাটী (২) শলিতা না পাকাইবে (৩) অন্নে না দিবে কাটি। (৪) কুম্ভকার ও কলুজাতির এ গ্রামে বাস নিষিদ্ধ (৫) বৈশাখ মাসে স্ত্রী পুরুষে একত্র শয়ন করিবে না। (৬) পূর্ণগর্ভা নারীকে বৈশাখ মাসে স্থানান্তরে রাখিবে। (৭) ছত্র ও পাদুকা ব্যবহার এ মাসে করিবে না। (৮) ধান ভানিবে না। (৯) উত্তর দুয়ারী ঘরে বাস করিবে না ইত্যাদি।

বর্ত্তমান সময়ে দেবীর যে মন্দির আছে তাহাতে কোন মূর্ত্তি নাই, তবে দেবীর পূজা যথারীতি হইয়া থাকে। বর্দ্ধমানের মহারাজার ব্যয়ে এই কার্য্য সমাধা হয়। চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা আছে, এবং সেজন্য ব্রাহ্মণদিগকে জমির বন্দোবস্ত করা আছে। দেবীর যে মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি জলমধ্যে নিমজ্জিত থাকে, তাঁহার পূজা সেই মহাপূজার দিন পুষ্করিণীর পাড়ে হইয়া থাকে। বলিদানের ঘটা কিছু বেশী; মূর্ত্তির সম্মুখে কেবল একটি মহিষ বলি দেওয়া হয়। আর সকল বলিদান পুষ্করিণীর পাড়ে। এই সময় এই গ্রামে একটি মেলা বসিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেশের দোকানই বেশী। এবার কলিকাতা হইতে বরফের আমদানীও হইয়াছিল। শুনিলাম মেলা কিয়দ্দিবসব্যাপী থাকে, তাহাতে বাসনের দোকান ও মণিহারীর দোকানের খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে।

এই স্থানের যে প্রাচীন মূর্ত্তি ছিল তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া যায়, পরে সেইমূর্ত্তির অনুরূপ বিগ্রহ বর্দ্ধমান জেলার দাঁইহাট নিবাসী প্রসিদ্ধ প্রস্তরশিল্পী, ৺নবীনচন্দ্র ভাস্কর বর্ত্তমান মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এ মূর্ত্তিটিও এরূপ সুন্দর ও এরূপ মনোহারী যে দেখিলেই মূর্ত্তির গঠনপ্রণালীর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আমাদের শাস্ত্রে মহিষমর্দ্দিনীর যেরূপ গঠনপ্রণালী বর্ণিত আছে

তাহার সহিত পূর্ব্ব মূর্ত্তির ঠিক অনুরূপতা রাখিয়া প্রস্তরের ভিতর দিয়া যে সেই ভাবটুকু ফুটাইয়া তোলা, একি সহজ কার্য্য! শুনিয়াছি যে নবীন ভাস্কর এই মূর্ত্তি সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। যেন তাঁহার চতুর্দ্দিকেই এই মূর্ত্তি জীবন্তরূপে প্রতিভাত। সেই জটাজুটসমাযুক্তা সর্ব্বা-বরণ-ভূষিতা মহিষমর্দ্দিনীই তখন তাঁহার একমাত্র দৃশ্যবস্তু,—সর্ব্বত্র তাঁহার ঐ মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি। বালারুণের স্বর্ণজ্যোতির মধ্যে, মধ্যাহ্নের তেজঃপুঞ্জের মধ্যে, অস্তাচলশায়িত তপনে সেই একই মূর্ত্তি। নিদ্রায়—জাগরণে—সর্ব্বদাই সেই "লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং" যেন বৈচিত্রময় জগতের বিবিধ বিচিত্রতার মধ্যে, সেই নিত্য মূর্ত্তি স্বয়ং জাগ্রত হইয়া শিল্পীর চিত্তকে সেই এক ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাঁহাকে যন্ত্ররূপে চালিত করিয়া আপনি আপনার শক্তিতে অভিব্যক্ত হইলেন। ভাস্করও বুঝিতে পারিল না যে, কাহার শক্তিতে এ মূর্ত্তির পূর্ণতা হইল, কাহার শক্তিতে এ মূর্ত্তির এ সৌন্দর্য্য প্রকটিত হইল।

হিন্দুদিগের এই মূর্ত্তি-রহস্যের অন্তরালে যে তত্ত্ব নিহিত আছে তাহার আলোচনা করিলে এবং যথাযথভাবে ধ্যান করিলে, ভগবৎকৃপা মানবজীবনে প্রতিভাত হইয়া জীবকে কৃতার্থ করিতে সক্ষম হয়।

মহিষাসুরমর্দ্দিনী এই মূর্ত্তিটী আশ্বিন মাসে বঙ্গের ঘরে ঘরে পূজিত হইয়া থাকেন। দেবীভাগবতে মহিষাসুর রক্তবীজের পুত্র, চণ্ডীতেও মহিষাসুরের উল্লেখ আছে। এই দশভুজা মূর্ত্তি কালিকা-পুরাণের অন্তর্গত। উপাখ্যানটী এই—রম্ভ নামক জনৈক অসুর বহুকাল পর্য্যন্ত মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাহার প্রসন্নতা লাভ করে, মহাদেব তাহাকে বরদানে উদ্যত হইলে রম্ভাসুর বলিল—

মম জন্মত্রয়ে পুত্রো ভবান্ ভবতু শঙ্কর।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং জেতা চ ত্রিদিবৌকসাং॥

মহাদেবও 'তথাস্তু' বলিয়া বরদান করিলেন—রম্ভাসুরের পুত্রই মহিষাসুর। এক সময়ে মায়াবী অসুর কাত্যায়ন মুনির শিষ্যবৃন্দের তপোবিঘ্নের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাকে মুনি এই অভিশাপ প্রদান করেন যে "স্ত্রীজাতির হস্তে তোমার মৃত্যু ঘটুক।" মহিষাসুর তিনবার জন্মগ্রহণ করে, দেবীও উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গারূপে তাহাকে নিহত করেন।

মহিষাসুর এক সময়ে হিমালয়শৈলে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখে যে দেবী

ভগবতী ভদ্রকালীরূপে তাহার শিরশ্ছেদ করেন, তখন সে দেবীর আরাধনা করে—দেবীও সন্তুষ্ট হইয়া বরপ্রদান করেন—

কিন্তু ত্বয়ি ময়া যুদ্ধে নিহতে মহিষাসুর।
নৈব ত্যক্ষসি মৎপাদং সততং নাত্র সংশয়ঃ॥
মম প্রবর্ত্ততে পূজা যত্র যত্র চ তত্রঃতে।
পূজ্যশ্চিন্তশ্চ তত্রৈব কায়া্যত্ব দানব॥

এই আখ্যায়িকাবলেই মহিষমর্দ্দিনীর এইরূপ পূজা প্রচলিত হইয়াছে। কালিকা-পুরাণে এই মূর্ত্তির যে ধ্যান বর্ণিত আছে সেই ধ্যানেই যোগাদ্যাদেবীর পূজা হইয়া থাকে—ঐ ধ্যানে বর্ণিত ত্রিশূল খড়্গ চক্র তীক্ষ্ণবাণ ও শক্তি দক্ষিণদিকের পঞ্চহস্তে বিরাজিত, খেটক পূর্ণচাপ পাশ অঙ্কুশ এবং ঘণ্টা বাম পঞ্চহস্তে শোভিত। মূর্ত্তিটী ঠিক ধ্যানানুযায়ী গঠিত।

অনেকের বিশ্বাস শক্তিপূজা তন্ত্রপ্রবর্ত্তনের পর এবং তান্ত্রশাস্ত্র অত্যন্ত আধুনিক। এ মত হিন্দুরা স্বীকার করেন না। বৈদিকযুগেও শক্তি উপাসনা প্রচলিত ছিল, তাহাই ক্রমে প্রসারিত হইয়া বীজ হইতে ক্রমে বৃক্ষরূপ তান্ত্রশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। দেবীসূক্ত অশ্বাসূক্ত বেদের অন্তর্গত। প্রবাদ আছে বশিষ্ঠ ঋষি তারাদেবীর উপাসনা করিতেন, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র শক্তি আরাধনার বলে "জয়া-বিজয়া" বিদ্যায় সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র মহিষমর্দ্দিনী দুর্গাদেবীর পূজা করেন।

এসব ঐতিহাসিক কথা প্রাচীনত্বের মীমাংসা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এই মহিষাসুরবধের সহিত আমাদের কি সম্পর্ক—কবে কোন্ অতীতকালে এই মহিষাসুর বধ হইয়া গিয়াছে—এখনও সে স্মৃতি লইয়া উৎসবের প্রয়োজন কি, পূজার প্রয়োজন কি, সে সম্বন্ধে আমি গুরুমুখে যতটুকু শুনিয়াছি আপনাদের সম্মুখে প্রকাশ করিতেছি।

তাঁহার নিকট শুনিয়াছি সুষুম্নাপথে তিনটী গ্রন্থি আছে—১। ব্রহ্মগ্রন্থি ২। বিষ্ণুগ্রন্থি ৩। শিবগ্রন্থি;—এই গ্রন্থির ছেদন হইলে চৈতন্যের জীব ও জগৎ-রূপে পরিণতি বন্ধ হইয়া যায়। নির্গ্রন্থ না হইলে মুক্ত হয় না, যতদিন এই গ্রন্থি থাকিবে ততদিন বদ্ধ থাকিতে হইবে। মহিষাসুর বিষ্ণুগ্রন্থির মোহ। বৈষ্ণব-শক্তির প্রধান ভাবকে বিশিষ্টতা দ্বারা কবলিত করিলে, অর্থাৎ বিষ্ণুশক্তিকে ভেদাত্মক বিশিষ্টতা বশে প্রয়োগ করিলে, সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তিকে কামনার বশ করিলে, সেই ভেদাত্মক কামনার ফলে প্রতিনিয়ত মহিষাসুরের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

অসুরেরা ভেদভাবে স্থিত এবং অহঙ্কারবশে—

ঈশ্বরোঽহং অহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।

ইত্যাদি অভিমানে বিমোহিত হইয়া অবয়বের নিদানভূত দেবতাগণের স্বাতন্ত্র্য সহ্য করিতে পারে না। ভগবানই যে অবয়বী তাহা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া তাহারা স্বদেহে ও পরদেহে শ্রীভগবানের "সর্ব্বভূতাস্থিবাত্মা" ভাবের দ্বেষ করিয়া থাকে।

মমাত্মা পরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূরকাঃ।

আমরাও ঠিক তাই করিতেছি, এই মোহের বশে আমরা আমাদিগকে ভগবানের নিমিত্তমাত্র না বুঝিয়া অবয়বের মোহে মুগ্ধ ;—অবয়বের মোহই মহিষাসুর। গুরুদেব বলেন যে বিশিষ্টরূপের কোন এক প্রকারে আমরা বদ্ধ—এই মোহ মহিষের ন্যায় বিবেকবর্জ্জিত ও অবুদ্ধিপণোদিত। তাহা না হইলে আমরা ত শাস্ত্র পাঠ করিতেছি—কতবার শুনিয়াছি যে তিনি সর্ব্বঘটেই বিরাজমান, তবে এ ঘট সংরক্ষণের এত প্রয়াস কেন? জন্মান্তরে কি ছিলাম আবার কি হইব এই জমাখরচের হিসাব নিকাশ কেন? এই অবয়বী বুদ্ধি বা মোহের বিনাশকারিণী মহামায়ার শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন আর দ্বিতীয় পন্থা কৈ? তিনি কৃপা করিয়া এই মহিষাসুরকে চরণে স্থান দিলে যখন শ্রীভগবানে উপরত হইবে তখনই—"এই আমি" তদীয় মহিমায় মহীয়ান্ হইয়া অসুরত্ব ঘুচিয়া যাইবে, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতির উদ্ধার সাধন হইবে। তাই বলি মা—

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে চিদানন্দনন্দস্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

—সুরেন্দ্র—

মায়ার গণ্ডী।

"আমি"র মধ্যে "তুমি"র বসত
"তুমি"র মাঝে "আমি,"
মায়ার গণ্ডী 'বেড়ে তাইথে
তফাৎ "আমি" "তুমি"।

"তুমি"র খেলা　তুমি খেলাও
　　আমি কর্ত্তা ভাবি,
আমার কিছু　নয়ত তবু
　　আমার ব'লে দাবি।
মুছিয়ে দিলে　মায়ার গণ্ডী
　　মিলন দু'জনায়,
শান্ত সরল　প্রেমের ভাবটা
　　উথলে উঠে তায়।
অবিশ্বাসে　মায়ার জুলুম
　　ধোঁকায় ভুলিয়ে রাখে,
অনেক সুখের　উজ্জল ছবি
　　শেষে বিষম পাকে।
তোমার ধনে　আমার ব'লে
　　কতই কাঁদি হাসি,
ভাবনা মিছে　জুটিয়ে নিয়ে
　　পরি মায়ার ফাঁসি।
কে কার পুত্র　কে কার পিতা
　　সবই মায়ার খেলা,
এখনও দেখি　মায়ার স্বপন
　　ঐ চলে যায় বেলা।
অসার ধনে　নিত্য জ্ঞেয়ানে
　　মহানন্দে থাক,
অসারে সার　সারে অসার
　　কেমন মজার ফাঁকি।
ভবে মায়ার　দোকান পেতে
　　কতই গাহাক জুটে,
হিসাব করে　দেখি এখন
　　আমি বেলার মুটে।
ছুজন কুজন　তোষামুদে
　　পাঁচটি ভূতে জুটে,

আমার দফায় কচ্ছে রফা
ব্যাপার খাচ্ছে লুটে।
লাভের মধ্যে কামনা-জালে
জড়িয়ে পড়ি আমি,
তার ফলেত আসা যাওয়া
মজা দেখ্‌চ তুমি।
মায়ার ভাবনা যতই ভাবি
ততই ধরে এঁটে,
ততই নেশা উঠ্‌ছে জমে
মিছে ম'লাম খেটে।
মাঝে মাঝে রূপটী তোমার
(ঐ) উকি মারে প্রাণে,
খেল্‌তে মন আর চায় না, তবে
খেলি নেশার টানে।
লুকিয়ে প'লে আঁধার হিয়ে
বড়ই ব্যথা পায়,
মুছে দাও নাথ! মায়ার গণ্ডী
লুটিয়ে পড়ি পায়।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস ভক্তিবিনোদ বি, এ।

অভিমান।

বাঁচিয়া থাকিতে যদি
সে স্বাদ কিছু পেলামই না,
"চরমে চরণ পাব"
এ কথায় মনঃ ভুলিবে না।
মুক্তি মোর এখনই চাই
একথা তো বল্‌চি না,

তুমি সদা থাক্‌বে কাছে,
সে দাবীও কর্‌ছি না।
যদি প্রভু, জানাব না
প্রাণের জ্বালা তোমার কাছে,
অন্তর-বেদনা মম
শুনিতে তবে কে মোর আছে ?
তুমি যদি নিজে জ্বাল
সে দীপ কভু নিবিবে না,
আমার জ্বালা আলোর মত
বায়ুভরে কাঁপিবে না।
সেই কথাটি তোমার কাছে
জানতে বড় হয় বাসনা,
এবার আমার ঘরের আলো
জ্বালাবে কি জ্বালাবে না ?
বিষয় হলো বিষের মত
তোমায় ভাল লাগিল না,
(আমার) দুদিক্ গেল দীনবন্ধু
প্রাণের আশা মিটিল না।
জীবন-প্রদীপ আসছে নিবে
উস্‌কাতে কেউ রহিল না,
কেমন করে নামাব ভার
উপায় কিছু বলিলে না।
জীবন-তরি ভাসায়ে দিনু
হাল তো তুমি ধরিলে না,
একা আমি সিন্ধুমাঝে
ডুবছি বসে দেখলে না।
তোমার ভালবাসা সখা !
গ্যাছে এবার গ্যাছে জানা,
দোহাই তোমার ! "সখা" বলে
আর আমাকে ভাঁড়িও না।

"বন্ধু" বলে আদর করে
আর আমাকে ডাকিও না,
যা আছে কপালে হবে
তোমার আশা করিব না।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ—

সপ্তমী।

প্রতিষ্ঠা।

সুদীর্ঘ বরষ গত -হেরি এ প্রভাতে
প্রকৃতির চারু অঙ্কে নবীন স্পন্দন,
শ্রান্তদেহে রক্তধারা পুলকসংঘাতে
প্রবাহিত, মহাবিশ্ব আনন্দে মগন।
অনুতাপ, আর্ত্তনাদ, নিরাশ-নিশ্বাস,
হৃদিভরা অবসাদ, অনন্ত-যাতনা,
নিষ্মম প্রারব্ধ লাগি ভীষণ সন্ত্রাস
দূরগত—ম্রিয়মাণ অসার কল্পনা।
ভক্তহৃদি মম্মে মর্ম্মে অপূর্ব্ব বিধানে,
ঝঙ্কারে প্রণবরাগে বিরাট্ সাধনা ;
বিনিদ্রিত কত শত নির্ব্বিঘ্ন পরাণে,
জাগি উঠে শক্তিমন্ত্র—নব উদ্দীপনা।
অর্ব্বুদ সন্তান মাঝে, নিখিল ভুবনে,
উদ্ভাসিত জননীর অমৃত সুষমা,
উন্মুক্ত পরাণে সবে নব আবাহনে ;
প্রতিষ্ঠা করহ মার চিন্ময়ী প্রতিমা।

অষ্টমী।

বলিদান।

যোগমায়া মহাশক্তি বিশ্ব-বিমোহিনী সাজে --
বিরাজে অভয়ারূপে সন্তপ্ত সন্তান মাঝে।
চৈতন্যময়ীর পদে দিয়া বিল্ব-শতদল,
পরিহরি দুর্ব্বলতা হৃদিস্থিত অমঙ্গল,
অনন্ত অযুতকণ্ঠে উদ্বেলিত মুক্ত প্রাণে;
প্রকম্পিত কর বিশ্ব মাতৃনাম উচ্চারণে।
এসেছে করুণাময়ী—তাই নব উদ্বোধন,
লও পুনঃ ত্যাগ-ব্রত, ধ্যান, পূজা, নিয়মন,
মহান্ কর্ত্তব্যজ্ঞান, অদম্য পুরুষকার,
সার ধর্ম্ম সত্য, আর নিষ্কাম কর্ম্মের ভার।
অনিত্য অহম্‌জ্ঞান শরীর ইন্দ্রিয়চয়,
নিত্য শুদ্ধ সত্ত্বমাঝে নিমিষে হউক লয়।
বীরাষ্টমী—মহাপূজা--পুণ্যময় সন্ধিক্ষণে—
বলি দাও স্বার্থ-সাধ মহাশক্তি-শ্রীচরণে।

নবমী।

প্রার্থনা।

সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে ত্রিগুণে জগৎ প্রাণ—
গভীর সমাধি যোগে হয় যাঁর প্রণিধান;
দলিত, বিধ্বস্ত, স্তব্ধ, নিদ্রিত সন্তান তরে,
অবতীর্ণা মূর্ত্তিমতী আজি এ বঙ্গের ঘরে।
দাও মাগো জ্ঞান-ভক্তি, অমিত-হৃদয়-বল,
জীবশেষ পরিণতি, অনন্ত করম ফল,
যার তরে নিত্য সিদ্ধ প্রবুদ্ধ সন্তান কত—
তুচ্ছ করি সাধ-আশা প্রলোভন শত শত,

অব্যক্ত-আনন্দস্রোতে, স্থিরলক্ষ্যে, সঙ্গোপনে,
নিয়ত ধাবিত বিশ্বে, অমৃতের আস্বাদনে।
নিমজ্জিত ভক্ত তোর অনিত্য মায়ার ঘোরে,
নাশ মা অবিদ্যা তার কর্ম্মক্লান্ত এ সংসারে।
বিলাইয়া বিশ্ব-প্রেম অজ্ঞান সন্তানগণে—
প্রসীদ প্রসীদ দুর্গে দৈত্যদর্প-নিসূদনে।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সাহিত্যসম্মেলন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পালি, প্রাকৃত ও গাথা ভাষার বিলয়।

পালি, প্রাকৃত ও গাথা নামে যে তিনটী ভাষা সংস্কৃতপ্রবর্ত্তনের প্রতিপক্ষতা করিয়াছিল, তাহারা সকলেই নিজ নিজ সম্পদ্ সংস্কৃতকে অর্পণ করিয়া কালের করাল কবলে নিমগ্ন হইয়াছে। যদিও গাথা-ভাষায় লিখিত কোন বিশিষ্ট গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না, তথাপি মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে অসংখ্য গাথার নিদর্শন পাওয়া যায়। পালিভাষায় লিখিত ত্রিপিটক গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তদ্ভিন্ন অনেক কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পালিভাষায় বিরচিত হইয়াছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কনিষ্কের রাজত্বকালে পালিভাষার প্রভা হ্রাস হইতে থাকে। প্রাকৃত ভাষায় জৈন শাস্ত্রের ১১ অঙ্গ ও ৩৪ উপাঙ্গ ব্যতীত কাব্য, ব্যাকরণ, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ক অনেক গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। জৈনগণ অনেকদিন প্রাকৃত ভাষাকে সচল রাখিয়াছিলেন। জৈন শাস্ত্রে ও সংস্কৃত নাটকাদিতে স্বীয় চিহ্ন রাখিয়া প্রাকৃত ভাষা এক্ষণে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। পালি ও প্রাকৃত ভাষাই হৃদয়স্পর্শী। উভয়ের শব্দসম্পদ্ ও বাগ্‌ভঙ্গী সংস্কৃতে মিশিয়া গিয়াছে।

দেশজ ভাষাসমূহের ধ্বংস।

ভারতের আদিম অধিবাসিগণের কথিত ভাষাসমূহও সংস্কৃত ভাষার প্রবল প্রতাপে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। সাওতাল, ভিল প্রভৃতি যে সকল পার্ব্বত্যজাতি কখনও সংস্কৃতের অধিকারে আইসে নাই, তাহাদের ভাষা এখনও স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান আছে। আদিম অধিবাসিগণের ভাষাসমূহ দেশজ নামে পরিচিত। দেশজ ভাষাসমূহ

কিরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। আর্য্যগণ ভারতে আগমন করিয়া তাঁহাদের কথোপকথনে ব্যবহৃত নিজ ভাষা এতদ্দেশীয় অনার্য্যগণের মধ্যে প্রচারিত করিয়া দেশজ ভাষাসমূহের সংহার সাধন করেন। আর্য্যগণের কথোপকথনের ভাষা সংস্কৃত আদর্শ হইতে কখনও অধিকদূর বিচ্যুত হয় নাই। কথোপকথনে ব্যবহৃত আর্য্যভাষা প্রথম অবস্থায় কিরূপ ছিল, তাহার কোন নিদর্শন নাই। মহারাজ অশোকের অনুশাসনসমূহে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে উহাকে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর কথিত আর্য্যভাষা বলা যাইতে পারে। উহা সংস্কৃত অপেক্ষা অনেক কোমল এবং বৌদ্ধ গ্রন্থের পালির ন্যায় লঘু। উদাহরণস্বরূপে অশোকের একটী অনুশাসন নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

অশোকের সময়ের ভাষা।

দেবানং পিয়ে পিয়দসি লাজ হেবং আহা, কয়নং মেব দেখতি, ইয়ং মে কয়ানে কটেতি। নো মিন পাপং দখতি, ইয়ং মে পাপে কটেতি। ইয়ং বা আসিনবে নামাতি, দুপটিবেখে চু খো এসা, হেবং চু খো এস দেখিয়ে, ইমানি আসিনব গামীনি নাম, অথ চংডিয়ে নিঠূলিয়ে কোধে মানে ইস্যা কালনেন ব হকং মা পলিভসয়িসম্, এস বাঢ় দেখিয়ে, ইয়ং মে হিদতি কায়ে ইয়ং ম নাম পালতিকায়ে।

(তৃতীয় অশোকস্তম্ভ লিপি।)

"দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ বলেন। (মনুষ্য) আপনার সুকার্য্যই কেবল দেখে, (এবং বলে) এই সুকার্য্য আমি করিয়াছি। (সে) কিঞ্চিন্মাত্রও পাপ দেখে না, (এবং বলে না) এই পাপ আমি করিয়াছি। অথবা এইটীর নাম দোষ—ইহাও বস্তুতঃ দুষ্প্রতিবেক্ষ্য। তাহার এইরূপ দেখা উচিত যে এইগুলি দোষগামী, এবং আমি চণ্ডতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, অভিমান ও ঈর্ষার কারণে নিজকে পরিভ্রষ্ট করিব না। ইহা পুনঃ পুনঃ দেখা উচিত—এইটি আমার ঐহিক (প্রয়োজন) ; এইটি আমার পারত্রিক (প্রয়োজন)।

উল্লিখিত লিপিতে ব্যবহৃত শব্দসমূহের সংস্কৃত প্রতিশব্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অশোকলিপির শব্দ	সংস্কৃত প্রতিশব্দ।
দেবানং	দেবানাং
পিয়	প্রিয়
পিয়দসি	প্রিয়দর্শী
লাজ	রাজা
হেবং	এবং
আহা	আহ

কয়ন	কল্যাণ
মেব	এব
দেখতি	পশ্যতি
ইয়ং	ইয়ং
মে	মে
কয়াণে	কল্যাণ
কটেতি	কৃতেতি
নো	ন
মিন	মনাক্
পাপং	পাপং
দখতি	পশ্যতি
পাপ	পাপং
বা	বা
আসনবে	আদীনব
নামাতি	নামেতি
দুপটিবেখে	দুস্প্রতিবীক্ষ্য
চু	চ
খু	খলু
এসা	এষা
খো	খলু
দেখিয়ে	দ্রষ্টব্য
ইমানি	ইমানি
চংডিয়ে	চণ্ডতা
নিঠুলিয়ে	নৈষ্ঠুর্য্য
কোধ	ক্রোধ
ইস্যা	ঈর্ষ্যা
কালনেন	কারণেন
ব	বা
হকং	আত্মানং
পলিভসয়িসম্	পরিভ্রংশয়িষ্যামি
এস	এষঃ
বাঢ়	বাঢ়ং
হিদতিকায়ে	ঐহিকায়
ম	মে
পালতিকায়ে	পারত্রিকায়

(ক্রমশঃ)

"নস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৫ম ভাগ। } কার্ত্তিক ; ১৩২৩। [৭ম সংখ্যা।

সেইত সেই।

(১)

সেইত আমার পরাণ-সখা
সেইত সেইত সেই
বিজুড়ে রূপটী যাহার
সর্ব্বমূলে যেই।
যার শয়নে শয়ন আমার
যার খাওয়াতে খাওয়া ;
যার শ্রবণে আমার শ্রবণ
গমনে যার যাওয়া।
যর করুণা অপার সদাই,
ঘোর বিপদে রাখে
দেখ্‌তে পাইনে বটে, যে জন
সদাই কাছে থাকে ;
বিপদ্ কালে ভক্তি ভরে
ডাক্‌লে হৃদয়ে খুলে
ছুটে গিয়ে মাএর মতন
যে নেয় কোলে তুলে ;

কখনও মাতা কখনও পিতা
কখনও ভাইএর মত,
জাগ্‌লে হৃদে রূপটি যাহার
প্রাণে আরামকত ;
হৃদয় মাঝে তারই জ্যোতি
উঠছে আঁধারফুটে
ভক্তি মুক্তি সাধন পূজা
পড়ছে গিয়ে লুটে ;
"আমি" "তুমি" ভুলিয়ে দিয়ে
পূর্ণানন্দ হেই,—
সেইত আমার পরাণ-সখা
সেইত সেতু সেই।

(২)

রবি শশী যার আলোকে
করছে আলোক দান,
দীন হীনের সহায় যে জন—
সকল প্রাণের প্রাণ;
জাগ্‌লে হৃদে আদর যতন
অপার স্নেহ যার ;
হৃদয় ভরে উথ্‌লে উঠে
প্রেমের পারাবার ;
যার চেতনে চেতন আমার
যার জ্ঞানই মের জ্ঞান,
নামটি যাহার শুন্‌লে কানে
শিউরে উঠে প্রাণ
যার ঘুমেতে ঘুমিয়ে থাকি,—
যার খেলাতে খেলি,
যার গড়নে গড়াই সাজাই
আবার ভেঙ্গে ফেলি ;

পার কর মা।

যাবার দিন যে এগিয়ে এলো
পারের কড়ি নাই কিছু মা,
সম্মুখে যে অগাধ সিন্ধু
কেমনে পাড়ি দিব তা মা।
ভয়ব্যাকুল প্রাণ যে আমার
পরিত্রাহি ডাকে শ্যামা,
দানবদলনী তুমি, আমি
অসুর ভয়ে কাঁপি যে মা।
মারুক তারা মারুক মোরে
সে সব কথা ধরি নাকো,
লোক দুষ্‌বে তোমায় মাগো
এইটি কিন্তু মনে রেখ।
আর যে আমি পারি নাকো
আসতে ভবের তুফান বেয়ে,
স্রোতের টানে যাই যে ভেসে
দেখলি না মা ফিরে চেয়ে।
তোমার ধর্ম্ম তোর কাছে, মা।
বলে আমি খালাস হলাম,
স্মরণ করে তোমার চরণ
সিন্ধুতে গা ভাসান দিলাম।
রক্ষা যদি কর মাগো
চরণ-তরি পরশ দিয়ে
ভুলব না আর তোমায় মাগো
ভবসিন্ধুর পাকা নেয়ে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণ ধর্ম্ম।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের অবতীর্ণ কালে ভারতের ধর্ম্মাকাশ অমানিশার কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন, শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া অহংকারের পুষ্টিসাধনই ধর্ম্ম বলিয়া অনেকে মনে করিত। প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানের পরিবর্ত্তে নীরস তর্কবিজৃম্ভিত মায়াবাদ স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের স্থানে বাদবিতণ্ডা এবং জল্প আসিয়া অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এক কথায় যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় প্রকৃত বৈরাগ্যবান্ ধর্ম্মযাজকগণ লোকচক্ষুতে হেয় অপদার্থ ও বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া পরিগণিত, দেশের সেই দুর্দ্দিনে, সহসা বাসন্তী পূর্ণিমার নবোদিত অকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায়, সুস্নিগ্ধ ও প্রেমের অপূর্ব্বমূর্ত্তি শ্রীমৎ চৈতন্যদেব বঙ্গের এই উর্ব্বরভূমি অমৃতসিঞ্চনে প্লাবিত করিয়া এক অভিনব নূতন তত্ত্বের প্রচার করিয়া, স্বীয় আচরণ দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ও প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিলেন। তাই কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

নদীয়া উদয়গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করে হইলা উদয়,
পাপতম হইল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস
জগ ভরি হরিধ্বনি হয়।

বেদকে প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া, উপনিষদের মন্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের * ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি জীবকুলকে বলিয়াছিলেন—"যে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, জীব ও জগতের, ব্রহ্মের সহিত ভেদাভেদ বস্তুতঃ মায়ামুগ্ধ জীবের পথে অচিন্ত্য। সুতরাং ভেদাভেদের তর্ক ছাড়িয়া দিয়া সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ কর—চিত্তদর্পণের মলিনতা ঘুচিয়া যাইবে, আপনার স্বরূপ বুঝিতে পারিবে, তখন হৃদয়ে শ্রীভগবান্ প্রকট হইবেন।"

প্রেমপুটিত অদ্বৈতবাদ মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বাদ। সেই অদ্বৈত তত্ত্ব ভাগবতের অক্ষরে অক্ষরে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগবত স্পষ্টই বলিয়াছেন—

* অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ॥ গড়ুর পুরাণ।

ভাবাদ্বৈতং ক্রিয়াদ্বৈতং দ্রব্যাদ্বৈতং তথাত্মনঃ।
বর্ত্তয়ন্ স্বানুভূত্যেহত্রীন্ স্বপ্নান্ ধুনুতে মুনি ॥ ৭।১৫।৬২।

যখন ভেদ মাত্রই স্বপ্নমায়া বলিয়া বোধ হয়, কেবল সেই সৃষ্টির মধ্যে শাশ্বত, ক্ষরের মধ্যে অক্ষর, চঞ্চলের মধ্যে স্থির, আত্মাকে দর্শন করা যায়, তখনই ভাবাদ্বৈত সিদ্ধ হয়,—তখন 'সর্ব্ব'—পরম আমি'তে পরিণত হয়। ঘট-পটাদিরূপ মিথ্যা—মৃত্তিকাই সত্য এই ভাবে বা বস্ত্রের সর্ব্বই তন্তুময় দর্শনের ন্যায় কেবল একেকেই দেখায়, বহুকে দেখায় না; তাহারই নাম ভাবাদ্বৈত। মহাপ্রভু এই ভাবাদ্বৈত সাধনার কথাই মধুর করিয়া বলিলেন

জীবে সম্মানিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান।

এই ভাবাদ্বৈত বলেই মহাপ্রভু—

তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া।
কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়া ধরে জড়াইয়া ॥

মেঘ দর্শনে গোপীর হৃদয়ে ভগবদ্ভাব প্রকট হইত—ইহার মূল এই ভাবাদ্বৈত। যখন বাক্য মন তনু দ্বারা কৃতকর্ম্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানে পৌছায় তখনই 'ক্রিয়াদ্বৈত' সিদ্ধ হয়। গীতার ইহাই "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবি ব্রহ্মাগ্নি ব্রহ্মণাহুতং। দ্রব্যাদ্বৈত অর্থে—আত্মজায়া সুত প্রভৃতি সর্ব্বদেহীদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি—উভয় ভাবে স্বার্থ ও কামের ঐক্য বুঝায়। অর্থাৎ যাহাতে সর্ব্বদেহীর স্বার্থ ও কামের ঐক্য তাহাই দ্রব্যাদ্বৈত্য; সর্ব্বদেহীর স্বার্থ ও কামের ঐক্য এক অদ্বৈত দ্রব্য।

দ্বৈত রোগের অধিকারে এ তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার অধিকার আমাদের নাই। শাস্ত্র প্রমাণেই আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। মহাপ্রভুর মুখের কথা এবং ভাগবত শাস্ত্র এ বিষয়ে আমাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রত্যক্ষ প্রমাণে জীব আপনার ঔপাধিক জ্ঞানে অনুরঞ্জিত বলিয়া, সে নিজের মতই জগৎ দেখিয়া ফেলে। আমি স্থূল বলিয়া জগৎও স্থূল বলিয়া প্রতীয়মান হয়; আমি সূক্ষ্ম হইলে বস্তুও সূক্ষ্ম হইবে। অনুমান প্রমাণে আমরা বস্তুর বাহ্যিক রূপাংশ ত্যাগ করিয়া, তাহার অন্তরস্থ স্বভাব গুণ শক্তি প্রভৃতির দিকে চিত্তের গতি ফিরাইয়া তদ্দ্বারা বস্তুর বস্তুত্ব উপলব্ধি করি। কিন্তু অনুমান প্রমাণও ঔপাধিক জ্ঞানের উপর স্থাপিত; কাজেই প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ জীবের ঔপাধিক-জ্ঞান-সাপেক্ষ। শাস্ত্র প্রমাণে মন্ত্রদ্রষ্টা আপ্ত ঋষিগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমাণ প্রমাণের অতীত জ্ঞান, শব্দের দ্বারা এরূপ ভাবে উপদেশ করেন—যে

তাঁহাদের দৃষ্ট বা জ্ঞাত তত্ত্ব সহজেই অন্য হৃদয়ে সংক্রমিত হইয়া যায়। ভগবৎ-তত্ত্ব জ্ঞান ভেদদর্শী জীব-হৃদয়ে স্বরূপতঃ প্রকাশ হইতে পারে না বলিয়াই, কেবল জীবহিতের জন্য তাঁহারা শাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

ঋষিদের চৈতন্যের ঊর্ম্মি অর্থাৎ অহংকারাদি ভাব সকল শ্রীভগবানে ন্যস্ত। তাঁহাদের পুরুষবুদ্ধিতে 'আত্মভাবভাবনা' বা 'আমি কি' ইহা সিদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি নাই। কৈতবশূন্য এই ঋষিগণকে নিমিত্ত করিয়া কেবল জীবের মঙ্গলের জন্য ভগবান্ তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করিলেন। তাই মহাপ্রভু বলিলেন—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান।
জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥

সুতরাং শাস্ত্র ভিন্ন দুরূহ ভগবৎতত্ত্ব জ্ঞান হৃদয়ে কিছুতেই প্রকট হইবে না।* তবে শাস্ত্রের তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে চিত্তের গতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, কারণ যাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অতীত বিষয় তাহা বুঝিবার সময় আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা কথঞ্চিৎ সংযমিত হওয়া চাই, নতুবা ইন্দ্রিয়াতিরিক্তজ্ঞান ফুটিবে কেন? মনের সংকল্প-বিকল্পাত্মক ভেদশীলবৃত্তি ক্ষণিকের নিমিত্তও যদি পরিত্যক্ত না হয়, তবে সেই অভেদাত্মক অহংতত্ত্ব বা মনোবুদ্ধির অতীত সেই শ্যামসুন্দর প্রকাশ পাইবেন কেন? এই ভাবে আজ কাল কয়জন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে? করে না বলিয়াই আপনার কলুষিত চিত্ত লইয়া শাস্ত্রানুশীলনে রত হইয়া অপনার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ অভ্যস্ত বৃত্তিগুলির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, শাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে শ্রীভগবান্, বেদের তাৎপর্য্য যে অদ্বয়-জ্ঞান তত্ত্ব, ইহা না বুঝিয়া কেহ বা আর্য্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদরের এবং হৃদয়ের সামগ্রী বেদরত্নকে আদিম অসভ্য-মানবের প্রথমহৃদয়োচ্ছ্বাস বলিয়া মনে করে। বেদার্থের পরিপূরক শ্রীমদ্ভাগবৎগ্রন্থে অমোঘলীল শ্রীভগবান্‌কে না দেখিয়া, ভগবানের লীলায় আপন হৃদয়স্থ কামের প্রতিবিম্ব দেখিয়া ফেলে। তাই মহা-প্রভু বলিলেন—

বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ।
তার জ্ঞানে অনুসঙ্গে যায় মায়া বন্ধ॥

ঋষিগণ বিশিষ্ট বস্তু বা শক্তি বা কেন্দ্রের মোহে মোহিত নহেন; তাঁহাদের নিকট বিকার নাই, দ্বৈত-প্রপঞ্চ নাহ, তাঁহাদের দৃষ্টি এক বস্তুতে। যেমন

---

* সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্যে শাস্ত্র প্রমাণ
আমাসবা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান। চৈ চ মধ্য ২০

মনুষ্যগণ যেখানেই পদনিক্ষেপ করুন না কেন, তাহা মৃত্তিকাই হউক পাষাণই হউক কিংবা অট্টালিকা হউক, বাস্তবিক পক্ষে পৃথিবী; তদ্রূপ ঋষিরা বিকারজাতকে কোন পদার্থ ব্যক্তি বা জীবের কথা বলুন না কেন তাহার তাৎপর্য্য সর্ব্ব কারণ কারণ এবং পরমার্থভূত একমাত্র শ্রীভগবান্। তাই ভাগবত বলিলেন—

অত ঋষয়ো দধুস্তয়ি মনোবচনাচরিতং।
কথমযথা ভবন্তি ভুবিদত্ত পদানি নৃণাং ॥* ১০।৮৭।১৫

মহাপ্রভুও সেই কথাই বলিলেন —

গৌণ মুখ্য বৃত্তি কি অন্বয় ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে ॥

এই শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরতত্ত্ব ভগবান্। ইহাঁকেই তাঁহারা অপ্রাকৃত মদনমোহন বলিয়া উপাসনা করেন। এ তত্ত্বকে উপনিষদে নির্গুণ ব্রহ্ম বলে। ভাগবতে এই তত্ত্বকে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান্ ইতি শব্দ্যতে ॥

মহাপ্রভুও বলিলেন—'অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন'। সুতরাং সকল-দিক হইতে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে এক মাত্র সত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। জ্ঞানই নিত্যসিদ্ধ এবং সর্ব্ব বস্তুর সর্ব্ব ভাবের পরিসমাপ্তি। ষট্‌সন্দর্ভকার জীব গোস্বামী স্পষ্টই বলিলেন "যে ভগবান জ্ঞানস্বরূপ চিদেকরূপ অদ্বয়ত্ব তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধ কারণ তাদৃশ বা তাহার বিপরীত আর কোন তত্ত্বই নাই। এই একতত্ত্বকেই ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দে লক্ষিত করা হয়" † এই অখণ্ড তত্ত্বই একমাত্র সত্যবস্তু—সত্য অর্থে যাহার কখনও ব্যভিচার হয় না বা যাহার যেরূপে অবধারিত হয় তাহার ব্যতিক্রম হয় না, তাহাই সত্য। এই সত্যই ভগবানের স্বরূপ লক্ষণ।

---

* সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদিভিস্তথা প্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ। অতঃ কারণাৎ ঋষয়ো মন্ত্রাস্তদ্ দ্রষ্টারো বা ত্বয্যেব মনোবচনাচরিতং দধুঃ মনসা আচরিতং তাৎপর্য্যং বচনাচরিতং অভিধান-ধৃতবন্তঃ। ন পৃথক্ বিকারেষ্বিত্যর্থঃ। অত্র নিদর্শনং কথমযথেতি নৃণাং ভূচরাণাং যত্র কুত্রাপি দত্তানি নিখিপ্তানি পদানি ভুবি কথমযথা ভবন্তি অদত্তানি ভবন্তি। অতো যথা মৃৎপাষাণেষ্টকাদিষু দত্তানি পদানি ভুবং ন ব্যভিচরন্তি তথা যৎ কিমপি বিকারজাতং বদন্তো বেদাস্ত্বামেব সর্ব্বকারণং পরমার্থভূতং প্রতিপাদয়ন্তীর্থঃ।

† জ্ঞানং চিদেকরূপং অদ্বয়ত্বঞ্চাস্য স্বয়ং সিদ্ধ তাদৃশ অতাদৃশ তত্ত্বান্তর-অভাবাৎ।
(জীবগোস্বামী)

'সত্য শব্দে কহে তাঁর স্বরূপ লক্ষণ।'

"সুতরাং এই তত্ত্ব সর্বভাবে সর্ব্বাবস্থায় সম বা একরূপে অবস্থিত; এক অর্থাৎ বহুত্বের সম্ভব ও প্রলয় স্থান ও বিশ্রান্তিগ পুরুষোত্তম। ব্যক্তের আদি বলিয়া তিনি পুরাণ; জন্মাদি বিকার এবং স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য বলিয়া তিনি নিত্য,—সর্ব্বথা পরিপূর্ণ বলিয়া অক্ষর ও অজস্র আনন্দস্বরূপ। প্রকাশ বা লয় তাঁহাকে স্পর্শ করে না বলিয়া তিনি অনন্ত;—এবং সর্ব্বজগৎ ভাব দ্বারা অদৃষ্ট বলিয়া তিনি নিষ্কল ও জ্ঞানানন্দঘন সদাসিদ্ধ অর্থাৎ প্রকাশাদি ক্রিয়াদ্বারা বোধ হয় না, এবং ভেদবুদ্ধি দ্বারা অলব্ধ বলিয়া স্বপ্রকাশ স্বয়ং জ্যোতি এবং অমৃত-স্বরূপ; তাঁহাতে মায়ার লেশ নাই উপাধির সম্পর্ক নাই, সুতরাং তিনি অবশেষ অমৃতস্বরূপ ও নিরঞ্জন" *

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্য স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোক্ষরোজস্র—সুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোমৃতঃ॥ ১০।১৪।২৩

বহুত্বমূলক জগতেই আমরা বিদ্যমান; নানাত্ব দর্শনই আমাদের এক্ষণ স্বাভাবিক, ভেদ দর্শনই আমাদের স্বভাব; সুতরাং বৈচিত্র্যময় এই জগতের মূলে এই অদ্বয়তত্ত্ব স্বীকার করিলে এবং তাদৃশ বা তদ্বিপরীত তত্ত্বের অস্বীকার করিলে বা সেই "পরম পদের" স্থান হইতে দেখিতে গেলে, প্রতীয়মান নানাত্বের অলীকতা উপলব্ধি হইয়া থাকে। শাস্ত্র ভূয়োভূয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—নানাত্ব জ্ঞানেই মৃত্যু, একত্বজ্ঞানেই জীবন; একত্বজ্ঞানে রোগশোক কোথায়, জরামৃত্যু কোথায়। ভাগবত জগর্তের সকল পদার্থ বা সত্ত্বাকে ক্ষণিক বা মরণধর্ম্মী বলিয়া সেই মূলদেশস্থিত তত্ত্বকে 'অবশেষামৃত' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান স্বাভাবিক চৈতন্য এ তত্ত্ব গ্রহণ করিতে না পারিলে বা স্বাভাবিক ভাবের বিপর্য্যয়কারী বোধ হইলেই যে, সে উপদেশ "অসৎ শাস্ত্র" হইয়া পড়িবে, ইহা বলা অনুচিত। কারণ যে অবস্থায় বর্ত্তমান তাহার উপরের অবস্থা বা তদতিরিক্ত অবস্থা আমাদের তত্বৎভাবের বিপ্লবকারী বলিয়া মনে হয়। সাধারণ ভাবে এই মোহ আমাদিগকে অধিকার করিয়া আছে বলিয়া। আমরা এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের তত্ত্বকে এক হইলেও গ্রহণ করিতে চাহি না। এই ভেদ সংরক্ষণের মোহবশে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, এই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই দেশের

* মহাপূজা (পন্থা) ১৩১৯।

দুর্দ্দশা আনয়ন করিয়াছে। অদ্বৈতবাদের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলে চলিবে কেন—একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখুন কোনখানে পার্থক্য? অদ্বৈততত্ত্ব ভাগবতের ছত্রে ছত্রে কথায় কথায়। প্রহ্লাদ চরিত্রের বিষয় অনেকেই অবগত আছেন—আপনারা জানেন যে অগ্নির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াও প্রহ্লাদের মৃত্যু হইল না। সেই দহ্যমান অগ্নিমধ্যে প্রহ্লাদ নিপতিত হইলেন বটে; কিন্তু তিনি দেখিলেন যে অগ্নি ও তাঁহার দেহ ভগবানের আপাতত প্রতীয়মান বিভিন্ন ভাব মাত্র। তিনি সেই অদ্বয়তত্ত্বের জ্ঞানে আপ্লুত হইয়া, সেই ভাবোন্মত্ততায় মত্ত ব্যক্তির ন্যায়, দেহ অগ্নি ও ভগবান এই তিনের মধ্যে এক ভগবানকেই দেখিলেন। ভেদ দেখেন নাই, নানাত্ব দেখেন নাই, তাই সেই অগ্নির মধ্যে শ্যামসুন্দর তাঁহাকে কোলে লইলেন। এই একত্বের উপদেশ অনধিকারীর পক্ষে ভ্রমাত্মক ও বিপ্লবকারী হইতে পারে; কিন্তু অধিকারীর পক্ষে যে পরম মঙ্গল তাহা সুনিশ্চিত।

শাস্ত্র প্রমাণে স্বীকার করা গেলেও আমরা ত জগত সেরূপে দেখিতে পাই না,—বিভিন্নতাই দেখি, বিচিত্রতাই দেখি, নানাত্বই দেখিয়া থাকি। শঙ্করাচার্য্য এইখানেই বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিলেন। তিনি ভিতরে অনুসন্ধান করিলেন—শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির নিশ্চয় হইয়া দেখিলেন—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ॥ জগৎ মিথ্যা অর্থে জগতের পারমার্থিক সত্ত্বা নাই—ব্যবহারিক সত্ত্বা আছে মাত্র। রজ্জুতে সর্পজ্ঞানে, তেজে বারি-বুদ্ধি শুক্তিতে রজতজ্ঞান যেমন বস্তুতঃ ভ্রান্তি মাত্র, বারি রজতের অস্তিত্ব নাই; অর্থাৎ আছে সর্প, তেজ বা শুক্তি। কিন্তু তাহার স্বরূপের জ্ঞান না হইয়া জ্ঞান হইতেছে সর্প, বারি বা রজত। ইহাকেই মিথ্যা বলে। "অতস্মিন্ তৎবুদ্ধি" মিথ্যাত্বের লক্ষণ। এই সর্প বা বারি বা রজত এর কারণ কিন্তু রজ্জু তেজ এবং শুক্তি কারণের সত্তা কার্য্যে ঠিক নাই বটে, কিন্তু কার্য্যটী ত ঐ সত্তা অবলম্বন করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাই বিবর্ত্ত—'বস্তুনস্তৎঅসম সত্ত্বা কো বিবর্ত্তঃ। মোটা-মোটি যে বস্তু যেরূপ নয় তাহার সেইরূপ দর্শন বিবর্ত্ত। এ দর্শন মায়াজনিত; শঙ্করাচার্য্য এই মায়া শক্তির একটা পরিণাম বা অবস্থান্তর স্বীকার করিয়াছেন—এবং জগতের উপাদান বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। "জীব ব্রহ্মৈব না পরঃ" ইহার অর্থ শঙ্করাচার্য্য এরূপ বলেন নাই যে মায়াধীশ ঈশ্বরের সহিত মায়াধীন জীবের ভেদ নাই। তিনি ত দ্বিতীয় তত্ত্বই দর্শন করেন নাই—সুতরাং দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন জীবকে কি জ্ঞানানন্দঘন ভগবান বলিবেন?

এই বিবর্ত্তবাদের উপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তকারগণ কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে—"পরিণাম বাদই ব্যাস সূত্রের সম্মত।" এই পরিণামবাদ অবশ্য বিপরিণামী ভগবানের হইতে পারে না। তাই তাঁহাদের উক্তি—

অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত।

এই অচিন্ত্যশক্তি বলে ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াও অধিকৃত থাকেন।

কথাটী একটু বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। এই যে অদ্বয় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের কথা উল্লেখ করা হইল—এই তত্ত্ব একটা অভাব-বাচক পদার্থ নহে। স্বাভাবিক তিন শক্তি তাঁহাতে বর্ত্তমান—

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

স্বরূপ শক্তিরূপে হয় তাঁর অবস্থান।

সেই স্বরূপ শক্তির নাম পরাশক্তি। এই অন্তরঙ্গ শক্তি সৎ অংশে সন্ধিনী, চিৎ অংশে সম্বিৎ, এবং আনন্দ অংশে হ্লাদিনী। অর্থাৎ ভগবান যেমন সচ্চিদানন্দময় তাঁহার শক্তিও তদ্রূপ সচ্চিদানন্দময়ী। জীবন-শক্তিকে ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তি বলা হয় তৃতীয় শক্তির নাম মায়াশক্তি। *

এই ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি বা জীবশক্তি স্বরূপাংশে অভেদ যেমন জ্বলিত অগ্নি এবং স্ফুলিঙ্গের কণা। জগৎও সেই ব্রহ্মেরই শক্তি—

পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥

সুতরাং জীবই বলুন আর জগৎই বলুন প্রকারান্তরে ভগবানের অভিন্ন শক্তি বলিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সিদ্ধান্ত।

অনেকের বিশ্বাস শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মে শক্তি স্বীকার করেন নাই, এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। তিনি ব্রহ্মের অনন্ত-শক্তিস্বরূপতা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, স্বরূপভাব স্বীকার করিয়াছেন, মায়াশক্তিকে জগতের উপাদান স্বীকার করিয়াছেন। এই স্বরূপভূত শক্তি যে মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন ইহাও দেখাইয়াছেন। বেশ অন্তর্মুখী হইয়া দেখিলে এই দুই সিদ্ধান্তে প্রভেদ অতি অল্প। কারণ মায়া অর্থে ভাগবতে—

ঋতের্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।

তাদ্ব্যাদাত্মনো মায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ॥ ২।৯।১১

---

* বিষ্ণুশক্তি পরাপোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা।

অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা ন্যাতৃতীয়া শক্তি বিষ্যতে॥

বিষ্ণুপুরাণ॥

বাস্তব বস্তু বিনাও যাহা প্রতীত হয়, এবং যে সদ্বস্তু থাকিলেও যাহার জন্য প্রকাশ হইতে পায় না তাহারই নাম মায়া। যেমন অন্ধকার গৃহে বিদ্যমান তৈজসাদি বর্ত্তমান থাকিলেও, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না, পরন্তু অবিদ্যমান সর্প বৃশ্চিকাদির অস্তিত্বই বোধ করায়, তদ্রূপ মায়াশক্তি সেই ভগবানের সত্ত্বা না দেখাইয়া নানাত্বই প্রতীয়মান করায়।

ভগবান স্পষ্টই বলিতেছেন—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসদ্ পরং॥
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং॥ ২৷৯৷৩২

এক মাত্র তিনিই ছিলেন, আছেন থাকিবেন—স্বরূপ শক্তির জীব শক্তি মায়া শক্তি ইহাও তাঁহার অভিন্ন। শক্তি সুতরাং জগতে দ্বৈতের স্থান কোথায়—দ্বৈতবোধ কেবল মায়া-শক্তির কার্য্য। বিবর্ত্তবাদেও ঐ এক কথা, পরিণাম বাদেও শক্তির দিক দিয়া ঐ এক কথা। বিবর্ত্তবাদেও স্বরূপের অস্মরণ ও দেহবুদ্ধি, তাই ব্যবহারিক ভাব জন্মমৃত্যু গতাগতি; এ সিদ্ধান্তেও দ্বিতীয়ে অভিনিবেশ বশতঃ এই বিপর্য্যয় এবং দেহে আত্ম বুদ্ধি—

ভয়ং দ্বিতীয়া-ভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়ঃ স্মৃতিঃ।

তাই মহাপ্রভু বলিলেন—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥

উভয় দিক দিয়াই প্রায় একই তত্ত্বের প্রকাশ;—দুই মতেই পরম তত্ত্ব অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ মায়াতীত। উভয় মতেই মায়াশক্তি অবলম্বনেই জগৎ সৃষ্টি, শঙ্কর মতে জীবের ব্যবহারিক সত্তা—মহাপ্রভুর মতে জীব ভগবানের তটস্থাশক্তি। তবে স্বরূপাংশে অভিন্ন পরম তত্ত্বের জ্ঞান উভয় মতেই লক্ষ্য। শঙ্কর মতে "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" এই ভাবের আধিক্য অর্থাৎ একত্বভাবের স্থাপনা। মহাপ্রভু ঐ একত্বের উপর অদ্বিতীয় ভগবানের স্বরূপ-শক্তি-সমন্বিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চিত্র তিনি প্রেমানন্দ রামরায়ের সম্মুখে উন্মোচন করিয়াছিলেন—

তবে হাসি মহা প্রভু দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহা-ভাব দুই একরূপ॥

তখন রামানন্দ রায় আত্মহারা হইয়া গেলেন—ইন্দ্রিয়ের বর্হির্মুখী মত্ততা সেই মদনমোহনের সন্দর্শনে স্তিমিত হইয়া পড়িল, মনের সংকল্পবিকল্পাত্মক বৃত্তি সেই চরণ-সরোজে লীন হইয়া গেল—রামানন্দ—জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি অতীত

হইয়া তুরীয় শ্রীকৃষ্ণে রূপ সন্দর্শনে আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন; সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দমূর্ত্তির মধ্যে আপনার জীব ভ্রান্তি ঘুচিয়া গেল; সেখানে কি আর দুই থাকে, সেখানে যে সবটাই আনন্দ সবটাই বিস্ময়? সেখানে রাধাকৃষ্ণের একাঙ্গীকৃত মূর্ত্তি, দুইয়ে এক হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবদিগের ইহাই পরমপদ "তদ্বিষ্ণো পরমং পদং।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

স্পর্শ।

বহুদিন গেছে বুঝি, দেখি নাই চাহি
অনন্ত জীবন-স্রোত কোন্ পথ বাহি'
চলিয়াছে; দেখি নাই কি প্রশান্ত বিমল প্রভায়
আলোকিত ধরা-বক্ষ, জগতের নবীন উষায়।
শুনি নাই প্রকৃতির সে মহান্ অনন্ত সঙ্গীত—,
জলে স্থলে মহাশূন্যে হইতেছে নিয়তই গীত!
এত দিন তন্দ্রাবিষ্ট রুদ্ধ করি হৃদয়ে দ্বার,
বসেছিনু আমিত্বের অতি দীন কক্ষে 'আপনার।'
বিশ্বের সমস্ত তৃষা এতদিন লইয়া হৃদয়ে,
জ্ঞানীর বেশেতে সাজি বাসনার হীন অভিনয়ে
নিষ্কাম কর্ম্মের আখ্যা করিয়া অর্পণ,
ইন্দ্রিয়ের ভীম নৃত্য করেছি দমন!
অকস্মাৎ প্রকৃতির বাসন্তী উষায়
হৃদয় পূরিয়া গেল প্রেম-মদিরায়।
অকস্মাৎ অতীতের মধুর সঙ্গীত—
হৃদয়ের তারে তারে হইল ধ্বনিত!
দেখিলাম—কি সুন্দর কি যে শান্ত মধুময়
বিশ্বপতি প্রেমে মুক্তি প্রেমে(ই) সৃষ্টি লয়!
অনন্ত নীলের বুকে নক্ষত্রের হার
প্রেমের সূত্রেতে গাঁথা বর্ষে প্রেমধার!

ক্ষরে প্রেম চন্দ্র সূর্য্যে,—গায় প্রেম গান
শ্রাবণে বারিদ-মালা, নীলাম্বু মহান্।
অনল অনিল কিম্বা রবি শশী তারা—
একই সঙ্গীত-তালে সবে আত্মহারা।
শুনিলাম শ্রবণেতে—"তোমার আমার
" সোহহং সচ্চিদানন্দ পবিত্র ওঙ্কার।
" সকলি সে মহা প্রেমে বিভিন্ন বিবৃতি
" বহু রূপ, বহু নাম,- একত্বেই স্থিতি।
" এই বিশ্ব খণ্ড নহে, এক আছে "আমি"
" আমি তুমি সবই সেই জগতের স্বামী
" দর্শন পুরাণ বেদ সব আমাময়
" তোমার আমার ভেদ হয়ে তাহে লয়"
বুঝিলাম—অনন্ত প্রকৃতি অঙ্কে অনাদির পায়
সব তর্ক, সব যুক্তি, মূক হয়ে যায়।

শ্রীঅনাদিনাথ রায়।

—o—

বৈরাগ্য।

ভায়া, বৈরাগ্যটা যত সোজা ভাব্‌চ, তত সহজ নয়। প্রকৃত বৈরাগ্য হওয়া বড় কঠিন। অবশ্য সংসারের জ্বালায় যে কখন কখন বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা করে, সেটা শ্মশান-বৈরাগ্য—বড় বেশীক্ষণ থাকে না। সময়ে সময়ে তোমার সহধর্ম্মিণীর গঞ্জনার চোটে যে তোমার চিত্ত বৈরাগ্যে ভরিয়া উঠে, সেটাও আসলে বৈরাগ্য নয়, তা বোধ হয় বুঝতে পেরেচ। কিন্তু তবুও বৈরাগ্য না হলেই নয়। বৈরাগ্য না ফুটে উঠ্‌লে, অধ্যাত্মমার্গ একবারে অর্গলবদ্ধ থাকে। অধ্যাত্ম-মার্গে বৈরাগ্যের এতটাই প্রয়োজনীয়তা। বৈরাগ্য, ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গার মত, উচ্ছল জলে ছল্‌-ছল্‌ করিতে করিতে, চারিদিক্ প্লাবিত করিয়া পরিপূর্ণ মহাসিন্ধুর সহিত মিসিবার উদ্যোগ। গেরুয়া পরে, মাথায় ঝুঁটি বেঁধে, বেড়ালেই বৈরাগ্য হয় না বা কাছা না দিয়া, মাথা নেড়া করিয়া একটু নৃত্য করিয়া বেড়াইলেও বৈরাগ্য হয় না। বৈরাগ্য বড় কঠিন। বড় কঠিন বলেই তো

বৈরাগ্যের স্থান এত উচ্চে। বৈরাগ্য শব্দের ব্যুৎপত্তিই দেখনা—"বিরাগস্ত ভাবঃ বৈরাগ্যং"। বিরাগ কাহাকে বলে? যাহার রাগ বা আসক্তি নাই। ঈশ্বরানুরাগ ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে, রাগই চিত্তবিক্ষেপের কারণ। বিক্ষিপ্তচিত্তে শান্তি নাই এবং "অশান্তস্য কুতঃ সুখং"। সুতরাং বৈরাগ্যহীন ব্যক্তির চিত্তে সুখ নাই। শান্তিহীন ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দ লাভের অযোগ্য। ভগবান্ তাই অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।"

রাগ-দ্বেষবিমুক্ত নিজের বশীভূত ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় উপভোগ করিলেও বিধেয়াত্মা—মন যার বশবর্ত্তী—এইরূপ পুরুষ শান্তি উপভোগ করেন।

বৈরাগ্য যাহার প্রবল, বিষয়ভোগ তাহাকে মুক্তিদানে বাধা দিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ জনক রাজা ও বশিষ্টপ্রমুখ ঋষিদিগকে ধরা যাইতে পারে।

চারিদিকে বিষয়ের প্রলোভন, আবার ইন্দ্রিয়গণের অত্যধিক বিষয়-লোলুপতা ও মনের অদমনীয় বিক্ষেপশক্তি—এগুলি সমস্তই বৈরাগ্যের প্রতিকূল। তবুও বৈরাগ্য না হইলে নয়। বৈরাগ্য ব্যতীত আমাদের চিত্তে সুখ নাই, আনন্দ নাই, বুঝি চিত্তের আশ্রয়ও আর নাই!

আচ্ছা ভায়া, তবে যে কেহ কেহ বলেন "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—একথাটা কি প্রকার?

একথাটাও ভাল, বেশ ভেবে দেখবার জিনিষ। কপট বৈরাগ্যের প্রতি, ইহা কর্ম্মবীরের সুতীব্র কষাঘাত। কিন্তু মুক্তি প্রয়োজন নাই একথা বল্লে সত্যের অপলাপ করা হয়। দুঃখ হইতে মুক্তি, অভাব হইতে মুক্তি, অজ্ঞান হইতে মুক্তি, সংশয় হইতে মুক্তি, দ্বেষ হইতে মুক্তি এবং বিবিধ বন্ধন হইতে মুক্তি—আমরা সকলেই তো আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি, এবং এ মুক্তি পেলে তো বাঁচি। "মুক্তি চাই না" একথা আমরা বল্‌তেই পারি না। মুক্তি যদি প্রয়োজন হয়, তবে বৈরাগ্যও প্রয়োজন। মুক্তি হবে অথচ বৈরাগ্য নাই, এঅবস্থা কল্পনা করা যায় না। তবে আমাদের দেশের এই জটাধারী ও চিম্‌টেধারী গুলোর উৎপাতে, বৈরাগ্যটা দূষণীয় বলে যেন চোখে ঠেকতে আরম্ভ করেছে। ওদের তো বৈরাগ্য নয়, ওসব বৈরাগ্যের ব্যবসা। বোধ হয় বৈরাগ্য মানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা, আর লোকের ঘাড়ে চেপে ডাল-রুটি-ঘৃতের বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া, তোমরা মনে কর। তা কিন্তু বৈরাগ্যের মানে নয়। বৈরাগ্য

বড় পবিত্র, বড় সুন্দর; যাঁহার প্রকৃত বৈরাগ্য হয়, তাহার জীবন ধন্য। এমন পরের তরে "আত্মভোলা", বিশ্বাত্মার জন্য আপনার সব অভিমান বিসর্জ্জন, আর কিছুতেই হতে পারে না। প্রেম যে এত মিষ্ট, তাও তাতে এই বৈরাগ্য মাখানো আছে বলে। বৈরাগী "নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ"—সুতরাং সকলের জন্য সে পথ মুক্ত করিয়া দিয়া বসিয়া আছে, সে কাহারও সুখের (ভোগের) পথ আগলাইয়া বসিয়া নাই। সে কাহারও কাছে কিছু চাহে না, কেননা সে বিনিয়ত চিত্ত। সে সকলকে নিজের প্রাণের মত ভালবাসে; কেননা জগতে কেহ তাহার পর নাই, নিজ আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া সে দেখিতেই জানে না। সে ধন যশের প্রত্যাশী নহে, কেননা সে নিষ্কাম। তাহার হৃদয় কিছুতেই অবসন্ন হয় না, কেননা সে ঈশ্বরার্পিতচিত্ত, ভগবদ্-ভৃত্য। বৈরাগ্যবিহীন প্রেম ত মহামোহ। এই জন্যই প্রেমিক বৈষ্ণবদিগকে লোকে বৈরাগী বলিত। এখন বৈরাগী মানে একেবারে উল্টা হইয়া গিয়াছে! এখন বৈরাগ্য চাই কিনা বুঝেছ? সত্যিকার যে টা বৈরাগ্য সেটা চাইই চাই! প্রকৃত বৈরাগ্যবান্ পুরুষদেরও কথন কথন নিষ্কর্ম্মা বলে মনে হয় বটে, কিন্তু সে শ্রেণীর লোক আরও উচ্চ, তাঁহাদের হৃদয় অগাধ সিন্ধুর মত গভীর। আমরা তাঁহাদিগকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া অনেক সময় বুঝিতে ভুল করি। তাঁরা আমাদের মত কর্ম্মের ভয়ে কুঁড়ে হয়ে বসে নাই! তাঁরা যে রাজ্যে বিচরণ করেন, সে রাজ্যে গেলে সকলকেই ঐ "জড় ভরত" হয়ে যেতে হয়। কিন্তু কি কঠোর পরিশ্রম করে জন্ম-জন্মান্তারের তপস্যার ফলে, তবে তাঁরা ঈশ্বরানুগ্রহে, উক্ত অবস্থার অধিকার লাভ করেছেন। কামবিমূঢ়চিত্ত আমরা তাহা বুঝিতেও পারি না! আমাদের সবই বিপরীত কিনা! কাজের ভয়ে অনেক সময় আলস্যে নিদ্রায় কলহে সময় অতিবাহিত করি; আবার যদি রাজসিক গুণের আধিক্য হইল, তখন খোন্তা লইয়া গ্রামের নালা পরিষ্কার করিতে ছুটি!! কিন্তু ইহার কোন অবস্থাই বিচার-প্রসূত নহে,—সাত্ত্বিকতার ফল নহে। সুতরাং এরূপ কর্ম্মোদ্যমে বাহিরের প্রশংসা লাভ হইলেও (ঐজন্যই আমাদের কর্ম্মপ্রবৃত্তি!!) উহাতে সাত্ত্বিকতা বৃদ্ধি পায় না। কারণ উহা অত্যন্ত সকাম ও হেয়; তবে তামসিক ব্যক্তিদের জড়তা অপেক্ষা ঢের ভাল।

বৈরাগ্য কেন চাই? সেটা আরও পরিস্ফুট করে পরে বলব। আগে বৈরাগ্যটা কি অর্থাৎ তার স্বরূপ কি তাই বলা যাক। যিনি প্রিয়বস্তু লাভে হৃষ্ট হন না বা অপ্রিয় পাইয়াও ক্লিষ্ট হন না; ইষ্ট নাশেও যাঁর শোক নাই, ইষ্ট

দ্রব্য পাইবার জন্যও লোভীর মত ব্যাকুলতা নাই. শত্রু-মিত্রে সমভাব, মানাপমানে তুল্য জ্ঞান, শীতোষ্ণ-সুখ দুঃখে এক অবিকৃত ভাব ; স্তুতি নিন্দায় অবিচলিত ; বেশ দক্ষ, স্থির মতি ; সদা সন্তুষ্ট, সর্ব্বভূতে অদ্বেষ্টা, মৈত্র ও করুণ, নিরহঙ্কার, ক্ষমাশীল, সকল বিষয়েই অনপেক্ষ এবং উদাসীন, গীতায় তাঁহাকে ভক্ত বলা হইয়াছে। এই সমস্ত লক্ষণের মধ্যে কতকগুলিতে চিত্তবৃত্তিকে মঙ্গল ভাবে অনুপ্রাণিত করার এবং কতকগুলিতে অসৎ কর্ম্ম বা অসচ্চিন্তা হইতে প্রতিনিবৃত্ত রাখার কথা বলা হইয়াছে।

ইহাতে ভগবৎ-প্রেম লাভ হয়। অভ্যাস করিতে করিতে যখন ওগুলি সহজ ও স্বাভাবিক বৃত্তিরূপে পরিণত হয়, বাহির হইতে আর জোর করিয়া ঢুকাইয়া দিবার চেষ্টা থাকে না, তখন তাহা ভক্তের লক্ষণ রূপে কথিত হইয়া থাকে। পূজ্যপাদ পতঞ্জলি পর ও অপর বৈরাগ্যের দুইটি সূত্রে এই একই কথা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বলিলেন—"দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্" প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ঐহিক এবং বেদবোধিত সমস্ত ভোগ্যবিষয়াদিতে অনুরাগ না থাকার নাম 'বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য'। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বিচার দ্বারা এইটি চিত্তে উপলব্ধি করা যে জগতের সুখাদিতেও অবিমিশ্র সুখ নাই, বরং দুঃখই সুখের রূপ গ্রহণ করিয়া সময়ে সময়ে ধাঁধা লাগাইয়া দেয়। বস্তুতঃ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগজনিত যে সুখ, তাহা "মাত্রাস্পর্শা" ক্ষণস্থায়ী ও নিরানন্দেরই জনক।

তবুও তো ভায়া, এই ক্ষণিক সুখের মায়া আমরা ছাড়িতে পারি না, এবং এই অত্যল্প সুখের জন্য সংসারে যে, কি হানাহানিই চলিতেছে, তাহা তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছ !!

তাই তো বলিতেছি বৈরাগ্যের কত প্রয়োজনীয়তা। যদি বৈরাগ্য জন্মিয়া না থাকে, তবে বিচারের দ্বারা এই সব ক্ষণিক সুখের মধ্যে যে দুঃখের বোঝা লুক্কায়িত আছে, তাহাকে বাহির করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেই হইবে ; এবং দোষ প্রত্যক্ষ হইলে তৎপ্রাপ্তিবিষয়ে অনাস্থা হইবেই। এ সুখের প্রতি আস্থা যতক্ষণ থাকিবে—ততক্ষণ ব্রহ্মানন্দ পাইবে না। সুতরাং পুনঃপুনঃ দুঃখের কবলে পড়িতেই হইবে। "ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—ভূমাতেই সুখ, অল্পে সুখ নাই। সুতরাং প্রকৃত সুখ পাইতে হইলে এই সব ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখের বৈরাগ্য না হইলে চলিবে কেন ?

অগ্নির কাছে যদি তুমি এসে একটু বসতে চাও, তবে দেখবে তোমার

শরীরটি বেশ একটু তাপ অনুভব করচে। আচ্ছা ভায়া তোমার শরীরও বরাবর রয়েছে (এটা অস্বীকার অবশ্য করতে পারবে না) আর আগুনের তাপও চিরকাল রয়েছে (তা তো দেখ্‌তেই পাচ্ছ)। কই তবুতো সকল সময় তোমাকে তো ক্লেশ দেয় না? কিন্তু যেমনি তোমার শরীরটি অগ্নির নিকট আসল অমনি তোমার ক্লেশানুভব আরম্ভ হলো। তাতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছ, অর্থাৎ অগ্নির সঙ্গে তোমার শরীরের বেশ একটি সম্বন্ধ রয়েছে।

শরীরটি অগ্নির সন্নিকটস্থ হইলেই অগ্নি স্বকীয় তাপ শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেয়, এবং শরীরও অগ্নির তাপে তাপিত না হইয়া থাকে না। আচ্ছা তা যেন হলো, মধ্যে থেকে জ্বালাটা অনুভব হয় কেন? ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয় বিষয়ের সংযোগ বিয়োগ আছেই, কিন্তু তার জন্য সুখ দুঃখ অনুভব করে আমরা মরি কেন? এইটাই আসল প্রশ্ন। অগ্নির সঙ্গে শরীরের জন্মজন্মান্তর সংযোগ থাকুক না কেন, এবং পুত্রপরিজনের সঙ্গে চিরদিনই বিচ্ছেদ ঘটিতে থাকুক না কেন, কিছুতেই কিছু হতো না—যদি প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক বা আত্মা-অনাত্মার জ্ঞানটা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হতো। আমাদের এই যে "অহং মমেতি" জ্ঞান, এইটিই সর্ব্বনেশে। মনের এই যে সংস্কার এটা অবশ্যই কুসংস্কার। এইটাই ভবরোগের মূল। ইহারই চিকিৎসা আবশ্যক। এই আত্মা ও অনাত্মা সম্বন্ধে একটু বল্‌চি, বেশ মন দিয়ে শুনে যাও। আমাদের সব কাজে সব চিন্তায় 'আমি'র লেজুড় লেগেই আছে, আমি দেখি, আমি করি, আমি শুনি, আমি ভাবি। সকলটাতেই "আমি" "আমি"। গীতা ও অধ্যাত্ম শাস্ত্র বল্‌চেন—এইটাই মস্ত ভুল। "আমি করচি" "আমি বল্‌চি" ইত্যাদি বলাটাই ভুল। "আমি" তো কিছুই করে না, কিছুই ভাবে না। ওসব কাজ প্রকৃতির, তুমি ভুলে বলছ "আমার"।—"প্রকৃতৈ্যব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।" প্রকৃতি দেহেন্দ্রিয়াকারে পরিণত হইয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করে। তবে আত্মাকে কর্ত্তা মনে হয় কেন? না, তাঁহার দেহাভিমান হেতু, স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব তাঁহার নাই। বুদ্ধির ভিতর দিয়া আমরা আত্মাকে দেখি কিনা। বুদ্ধিখানি যেন আয়না, আয়নায় যদি মলাদি সংযুক্ত থাকে, তাহাতে যেমন প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট দেখায়, তদ্রূপ বুদ্ধি যদি বিশুদ্ধা না হইয়া গুণযুক্ত হয়, তবে তাহার মধ্য দিয়া আত্মাকে দেখিলে আত্মাকেও মলিন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু আত্মা নির্ব্বিকার সাক্ষিস্বরূপ; তবে যে আত্মাকে বিকৃত দেখি তাহা বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগে বুদ্ধিরই বিষয়। প্রকৃতি-সম্ভূত গুণত্রয় অভিব্যক্ত হইয়া সুখ দুঃখ ও মোহ উৎপন্ন করিতেছে। ইহা

প্রকৃতির মধ্যে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। স্ফটিক শুভ্র-নির্ম্মল হইলেও জবাকুসুমের সংযোগে যেমন তাহা রক্তবর্ণ বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ বুদ্ধির মধ্যে যে সুখ দুঃখের খেলা, তাহাই বুদ্ধির সান্নিধ্যবশতঃ আত্মাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত হইয়া থাকে মাত্র। ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ, চেতনা, উদ্যম, এ সমস্তই প্রকৃতির ধর্ম্ম, আত্মার নহে। "ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকার-মুদাহৃতং॥" সুতরাং যে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে, সমস্তই প্রকৃতির।

প্রকৃতিতে ২৪টি তত্ত্ব বিদ্যমান।

"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥"*

সুখ দুঃখাদি মনোবৃত্তি এ সমস্তই ক্ষেত্রের ধর্ম্ম, আত্মার নহে। সুতরাং ভগবান্ বলিয়াছেন যে "নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।" ইহার কারণ এই—আত্মার সহিত যোগযুক্ত হইলে প্রকৃতির অধ্যাস থাকে না, তখন সে দেখিতে পায় আত্মা কিছুই করে না, করাকরি যা কিছু ব্যাপার এ সমস্ত প্রকৃতির। সুতরাং প্রকৃতির কর্ম্মে আত্মায় অহংকার আসিবে কেন? আত্মবিৎ ইহা জানেন, তাই তাঁহার কর্ম্ম করিয়াও অহঙ্কার নাই। গীতায় ভগবান্ কর্ম্মের পাচটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাঙ্খ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধং।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্॥
শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ॥"

---

* পঞ্চ মহাভূত (অর্থাৎ আকাশতন্মাত্র, বায়ুতন্মাত্র, অগ্নিতন্মাত্র, সলিলতন্মাত্র ও পৃথ্বী তন্মাত্র), অহঙ্কার (রজস্তম গুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া অহঙ্কারের উৎপত্তি, পঞ্চ মহাভূত এই অহঙ্কার হইতে জাত), বুদ্ধি (সৃষ্টির প্রথমে সত্ত্ব গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানাত্মক মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধির উৎপত্তি হয়), অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি—সত্ত্বরজ স্তমোগুণাত্মিকা, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি) ইন্দ্রিয়াণি (দশ ইন্দ্রিয়—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক · পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ) ও এক (মন) ও ইন্দ্রিয়গোচরঃ (অর্থাৎ তন্মাত্রগুলি ব্যক্ত হইয়া স্থূলাকারে ইন্দ্রিয়গোচর হয় তখন ইহারা পঞ্চ তন্মাত্রের বিকার—স্থূল আকাশ, স্থূল বায়ু, স্থূল অগ্নি, স্থূল জল ও স্থূল পৃথ্বী)—এই চতুর্ব্বিংশতি পদার্থময়ীই ক্ষেত্র।

শারীর বাচিক ও মানসিক যে সমস্ত ন্যায্য (ধর্ম্মসঙ্গত) বা অন্যায্য (ধর্ম্মবিরুদ্ধ) কর্ম্ম মানুষ করিয়া থাকে, এই পাঁচটি তাহার হেতু। সেই পাঁচটি কারণ কি কি? অধিষ্ঠানং (স্থূল শরীর), কর্ত্তা (অহঙ্কার), করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্ (অনেক প্রকার করণ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি), বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা (অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ—পাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান), দৈবম্ (অধিষ্ঠাত্রী দেবতা:—শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ এবং প্রাণের অশ্বিনীকুমার; বাক্যের অগ্নি, পাণির ইন্দ্র, পাদের উপেন্দ্র, পায়ুর যম ও উপস্থের প্রজাপতি; মনের চন্দ্র, বুদ্ধির ব্রহ্মা অহঙ্কারের রুদ্র এবং চিত্তের বিষ্ণু—এই সমস্ত দেবতাকেই জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে তত্তৎ বিষয়সমূহে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। এই সমস্ত দেবতার প্রেরণবশতঃ ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ব বিষয় ভোগ করিতেছে।) সুতরাং ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্ম সমস্ত প্রকৃতিরই, আত্মার নহে।

"কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে"—কার্য্য (শরীর), কারণ (সুখ দুঃখ সাধন ইন্দ্রিয়গণ) সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির; সুতরাং "আমি" কর্ত্তা নহি। তবে কর্ত্তৃত্ব 'আত্মার" মনে হয় কেন? "পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহপি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।"—অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম বা কার্য্য দেহে তাদাত্ম্যভাবে অবস্থান করার জন্য প্রকৃতিজ গুণ—সুখ দুঃখাদি পুরুষই ভোগ করিতেছেন এইরূপ মনে হয়। পুরুষের মনে কেন হয়? আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য জ্ঞান না থাকার হেতু এই অধ্যাস উৎপন্ন হয়। অধ্যাস অর্থে এক পদার্থে অন্য পদার্থকে আরোপ করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে কর, আমি বলিতেছি—"আমি স্থূল।" স্থূলত্ব ধর্ম্ম দেহের, আত্মার নহে; কিন্তু আমি স্থূল বলাতে দেহের ধর্ম্ম আত্মায় আরোপ করা হইল।

এই যে অনাত্মা হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া দেখিবার চেষ্টা তাহারই নাম বৈরাগ্য সাধনা। "আমি"র স্বরূপ খুঁজিতে গেলে যখন ঠিক জায়গায় হাত পড়ে, তখনি ভূমানুসন্ধান আরম্ভ হয়। বেদ "নেতি নেতি" ক'রে বিচার করে দেখিয়ে দিলেন "আমি এ নই, আমি সে নই, আমি তা নই"—ইত্যাদি। 'আমি' তবে কি? ভগবান্ গীতায় তাহার উত্তর দিয়াছেন,—

"অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বোতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানাং অচরং চরমেবচ।
সূক্ষ্মত্বাং তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম, ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥"

ব্রহ্ম অনাদি. তিনি পর, নিরতিশয়, ব্রহ্ম সৎ—প্রমাণের বিষয়ও নহেন, অসৎ—নিষেধের বিষয় নহেন—তিনি অবিষেয়; কিন্তু অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি দ্বারা এই জগৎ চরাচর অবস্থিত—সর্ব্বময়।

প্রার্থনা।

কত আশা বুকে নিয়ে তব মুখ নিরখিয়ে
বসে আছি, জান না কি স্বামি!
বেলাটুকু গেল বয়ে, আসিল আঁধার হয়ে;
আর কবে কি পাব গো আমি?
এত হাসি এত সুখ— চাই মাত্র এতটুক;—
তুমি প্রেম অমিয়ার সিন্ধু;
সারাটি জীবন হায়, কেটে গেল প্রতীক্ষায়.—
পাব না কি শেষে এক বিন্দু?

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র প্রধান বি, এ।

স্বরূপ।

১

'আমি হারায়ে ফেলেছি আমারে'—
এই জগৎপ্রপঞ্চ মাঝারে ;
যা ছিল আমার, গিয়াছে সে সব,—
আছে শুধু এই অহমিকা রব ,
বাসনা বিকার হয়েছে আমার
পরাণ কেমনে রাখি !
জীবনের নিশি হয়ে এল ভোর
তবু ঘিরে আছে মায়া মোহ ঘোর
কোথা ওগো আমি ? কোথা তুমি মোর
বল ওহে প্রাণপাখী !

২

না দেখে তোমারে কাঁদে প্রাণ কত !
বুঝাব কেমনে ? বুঝাব বা কত!
নাহি সেই ভাষা, নাহি ত সে জ্ঞান—
নিরাশা-আঁধারে, কামনা-পাথারে
ডুবিতেছি ঘুরে ফিরে !
কোথা যাব ওগো, কোথা তবে পাব !
কেমনে কোথায় তোমাতে মিশিব !
কবে দূরে যাবে 'আমি' 'আমি' রব
ভাসিব আনন্দনীরে !

৩

বল ভাই সখা, বল সে সন্ধান !
কোথা গেলে মোর জুড়াইবে প্রাণ ;
সব হেথা আছে—যেন কিছু নাই ;—
কিসের অভাব—কিবা যেন চাই !
হেরিতে তোমারে ছুটী দিগন্তরে
কোথা তুমি কত দূরে ?

দূরে সখা ঐ নীলিমার গায়,—
খুঁজিলাম কত পাগলেরি প্রায়,
বনানীর মাঝে, পর্ব্বতকন্দরে
গেল দিন ঘুরে ঘুরে !

৪

কেন ছুটাছুটী ?— হৃদয়ের মাঝে,
দেখ দেখি চেয়ে কার ছবি রাজে !
না বুঝিয়া ছলা—খুঁজি চারিধার,
আমি যে তোমারি, তুমি যে আমার
অবিদ্যার ঘোরে ভুলিয়া আমারে
তোমারে করেছি পর ;
দূরে যাক আজ কুহকের ছলা
ভুলে যাই আজ 'তুমি আমি' বলা ;—
(আজ) ছোট আমিটুকু তোমাতে মিশুক
ওহে সর্ব্ব মনোহর !

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

আত্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিগত ১৩২২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের পন্থায় আত্মতত্ত্ব বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে করিতে প্রসঙ্গক্রমে বেদের অপৌরুষেয়তা সম্বন্ধের কথা উত্থাপিত হওয়াতে বেদবচন যে আপনার অর্থসিদ্ধির জন্য কোনও প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ অপেক্ষা করে না এবং বেদবচন আপনার অর্থ হইতে কদাচ ব্যভিচার হইবে না সুতরাং বেদবচন সর্ব্বপ্রমাণের মধ্যে রাজা, ইহা সুস্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে বেদবচন বিষয়ে প্রমাণতা সিদ্ধ করিবার জন্য, প্রথমে মীমাংসা শাস্ত্রের রীতি অনুসারে লৌকিক শব্দ বিষয়েও সামান্যরূপে প্রমাণতা নিরূপণ করা যাইতেছে।

হে মৈত্রেয়ি ! ইহলোকে অযথার্থ বচন প্রয়োগে নিপুণ যে অনাপ্ত পুরুষ আছেন, তিনি কোন পথিককে এইপ্রকার বাক্য বলিয়াছেন যে—'এই নদীতীরের

উপর তোমার ভক্ষণযোগ্য নানা প্রকার ফল আছে।' এতদ্রূপ বচন সেই সময়ে শ্রোতৃপুরুষকে নদীতীরে ফলের স্থিতিরূপ অর্থ বোধন করিয়াছে, সুতরাং সেই বচনও সমান্তররূপে প্রমাণরূপই হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে—নদীতীরে ফলের স্থিতিরূপ অর্থ সেই সময়ে নেত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখাইয়া দেওয়া হয় নাই। সুতরাং সেই অর্থবিষয়ে প্রত্যক্ষপ্রমাণতা নাই, প্রত্যুত সেই সময়ে সেই শব্দ দ্বারা সেই অর্থ বোধ হইয়াছিল। সুতরাং সেই অর্থবিষয়ে শব্দেরই প্রমাণতা আছে। এই কারণেই মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ এই প্রকার প্রমাণ অপ্রমাণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহা, কিছু অর্থ বোধন করে, তাহার নাম প্রমাণ। আর যাহা, কোনও অর্থ বোধন করে না, তাহার নাম অপ্রমাণ। সেই অর্থের বোধকতা সেই বচনেই আছে। সুতরাং সেই বচনও সামান্তরূপে প্রমাণরূপই হইতেছে। কিংবা, যে নৈয়ায়িক বাদী অর্থের বোধকতা রূপে সেই প্রমাণ বিষয়ে প্রমাণ-রূপতা অঙ্গীকার করেন না, সেই নৈয়ায়িকদিগের মতে সেই প্রমাণে প্রমাণ-রূপতা কিরূপে সিদ্ধ হইবে? সে বিষয়ে নৈয়ায়িক যদি এই প্রকার বলেন যে অর্থের বোধকতা রূপে সেই প্রমাণে প্রমাণরূপতা সিদ্ধ হইবে না, কিন্তু যে প্রমাণজন্য জ্ঞান, এই জীবের সমর্থ প্রবৃত্তি হইবে সেই সমর্থ প্রবৃত্তিরূপ হেতু হইতে সেই প্রমাণ বিষয়ে এবং সেই প্রমাণজন্য জ্ঞান বিষয়ে প্রমাণরূপতার অনুমান হইবে। যেরূপ পূর্ব্ব-অজ্ঞাত স্থলে জল দেখিয়া, এই পুরুষ সেই জল লইবার জন্য যাইবে। যখন সেই স্থলে এই পুরুষের জল প্রাপ্তি হয় তখন সেই পুরুষ এই অনুমান করে "যে পূর্ব্বে যে আমার জল জ্ঞান হইয়াছিল, সেই জ্ঞান প্রমা রূপ ছিল। কারণ আমার সমর্থ প্রবৃত্তি হওয়া হেতু।" এইপ্রকার যদি নৈয়ায়িক অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, যে সমর্থ প্রবৃত্তিরূপ হেতুবশতঃ সেই জ্ঞানের প্রমাণতা অনুমান হইবে, সেই প্রবৃত্তি বিষয়ে সমর্থতা কি বস্তু? তথায় যে পদার্থ সেই জ্ঞানের বিষয় হইতেছে সেই পদার্থ সেই প্রবৃত্তির বিষয়। এই প্রকার যে সমান বিষয়তা, সেই সমান বিষয়তার নাম সমর্থতা অথবা ফলের জনকতার নাম সমর্থতা? এখানে প্রথম পক্ষ যদি নৈয়ায়িক অঙ্গীকার করেন তাহা সম্ভব নহে। কারণ ইহলোকে চেতন পুরুষের যে যে প্রবৃত্তি হইবে সেই সেই প্রবৃত্তি, 'এই পদার্থ আমার সুখের সাধন' এই প্রকার ইষ্টসাধনত জ্ঞান বিনা, হইবে না। পরন্তু ইষ্টসাধনতা জ্ঞানের পরেই চেতন জীবের প্রবৃত্তি হইবে। সুতরাং অবশ্য সেই প্রবৃত্তি ও সেই প্রবৃত্তির সমর্থতা, সেই জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। সেই জ্ঞান বিনা সেই প্রবৃত্তির

বিষয়ে সমর্থরূপতা সম্ভব নহে। সুতরাং সেই সমর্থ প্রবৃত্তি হইতে জ্ঞান মাত্রেরই অনুমান হইবে। সেই জ্ঞানের প্রমাণতার অনুমান সম্ভব নহে। আর সেই বিষয়ে ফলের জনকতারূপ সমর্থতা আছে। এই দ্বিতীয় পক্ষ যদি নৈয়ায়িক অঙ্গীকার করেন, তাহাও সম্ভব নহে। কারণ সুখ ও দুঃখ এই উভয়ের নাম ফল। সেই সুখ-দুঃখরূপ ফলের সিদ্ধি বিষয়ে উপযোগী যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানমাত্রকেই সেই প্রবৃত্তি অপেক্ষা করে। সেই প্রবৃত্তি প্রমাণ জ্ঞানের অপেক্ষা করে না সেই সুখ-দুঃখরূপ ফলের জনকতারূপ সমর্থতা অনাপ্ত পুরুষের বচনজন্য প্রবৃত্তি বিষয়েও আছে। কারণ নদীতীরে ফল আছে এই প্রকার সেই অনাপ্ত পুরুষের বচন শ্রবণ করিয়া তদভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত যে পথিক পুরুষ, সেই পথিক পুরুষের সেই নদীতীর দর্শন হইতে সুখ-দুঃখরূপ ফল লাভ অবশ্যই হইবে।

শঙ্কা।—হে ভগবন্, সেই নদীতীরে ফলপ্রাপ্তি দ্বারা সেই পথিক পুরুষের যদ্যপি সুখরূপ ফল প্রাপ্তি তো সম্ভব, তথাপি সেই পথিক পুরুষের দুঃখরূপ ফল প্রাপ্তি সম্ভব নহে।

সমাধান।—হে মৈত্রেয়ি! ইহলোকে ও পরলোকে এরূপ কোন পুরুষের প্রবৃত্তি হয় না, যে প্রবৃত্তি দুঃখরহিত ও কেবল সুখই উৎপন্ন করে। পরন্তু জীবের যাহা কিছু প্রবৃত্তি হইবে সেই প্রবৃত্তি সুখ দুঃখ উভয়ই উৎপন্ন করে। আর বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে পুরুষের যে যে প্রবৃত্তি হইবে সেই সেই প্রবৃত্তি কেবল দুঃখেরই কারণ। সেই প্রবৃত্তি বিষয়ে যে লোকের সুখ সাধন বুদ্ধি হয়, তাহা কেবল ভ্রান্তিবশতঃই হইয়া থাকে। হে মৈত্রেয়ি! এই লোকের প্রবৃত্তি দুঃখরহিত কেবল সুখ উৎপন্ন করে না। এই অর্থে নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্তও অনুকূল। কারণ নৈয়ায়িকগণ দুঃখরহিত কেবল সুখ কোন পদার্থে অঙ্গীকার করেন না। এই কারণেই নৈয়ায়িকগণ সেই নিয়ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত, শ্রুতিপ্রসিদ্ধ পরমানন্দ রূপ মোক্ষ বিষয়েও নিরতিশয় আনন্দরূপতা অঙ্গীকার করেন নাই। কিন্তু দুঃখাভাব বিষয়েই নৈয়ায়িকগণ মোক্ষরূপতা অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং পুরুষের প্রবৃত্তি কেবল সুখেরই কারণ এই যে তুমি বলিতেছ তাহা সম্ভব নহে। অতএব এই অর্থ সিদ্ধ হইল যে প্রমাণ বিষয়ে যে অর্থের বোধকতা আছে, সেই অর্থের বোধকতাই সেই প্রমাণ বিষয়ে প্রমাণরূপতা সিদ্ধি করে। সেই অর্থের বোধকতাই যেরূপ শব্দ প্রমাণে আছে, সেরূপ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে নাই। সুতরাং 'নদীতীরে

ফল আছে’ এই প্রকার যে অনাপ্ত পুরুষের বচন, তাহাও অর্থের বোধক হওয়াতে প্রমাণ রূপই হইতেছে।

শঙ্কা।—হে ভগবন্! এই নদীতীরে ফল আছে এই বচনে প্রমাণরূপতা সম্ভব নহে। কারণ এই নদীতীরে ফল নাই, এই নিষেধ বচন দ্বারা যদিও সেই বচনের প্রমাণরূপতার বাধ হইয়া যাইবে, তথাপি সেই নিষেধ বচনের যে পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি হয় নাই সে পর্য্যন্ত সেই বচনের প্রমাণরূপতার নিবৃত্তি হইবে না। কিন্তু সেই নিষেধ বচনের প্রবৃত্তির পরই সেই বচনের প্রমাণরূপতার বাধ হইবে। এই কারণেই ভাষ্যকার ভগবান্ আত্মসাক্ষাৎকার পর্য্যন্তই সম্পূর্ণ লৌকিক বৈদিক প্রমাণ বিষয়ে প্রমাণরূপতা অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং যেরূপ সকল জন্তুর মধ্যে সিংহ বলবান্, সেইরূপ আপনার সম্বন্ধবশতঃ সর্ব্ব পদার্থের অভাববোধক যে এই ‘নকার’, সেই ‘নকার’ এই সম্পূর্ণ ককারাদি বর্ণের মধ্যে বলবান্।

শঙ্কা।—হে ভগবন্! যেখানে ‘নকার’যুক্ত দুই নিষেধ বচন থাকিবে সেখানে পরস্পর প্রতিবন্ধকতা দ্বারা কোনও অর্থ সিদ্ধ না হওয়া উচিত।

সমাধান।—হে মৈত্রেয়ি! যেখানে একই পদার্থ বিষয়ে দুই নিষেধ বচন প্রাপ্তি হইবে, সেখানে এক অর্থ নিশ্চয় করিবার জন্য কোন তৃতীয় প্রমাণ অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। পরন্তু সেই তৃতীয় প্রমাণও তখন সেই অর্থ সিদ্ধি করিবে যখন সেই তৃতীয় প্রমাণের অর্থবাধকারী কোন চতুর্থ প্রমাণ না থাকিবে। কিংবা সেই দুই নিষেধ বচন বিষয়েও যেখানে এক নিষেধ বচন লৌকিক এবং দ্বিতীয় নিষেধ বচন বৈদিক হইবে, সেখানে এক বচনের অর্থ নিশ্চয় করিবার জন্য কোনও তৃতীয় প্রমাণের অপেক্ষা হইবে না। কিন্তু ভ্রমপ্রমাদাদি দোষশঙ্কাযুক্ত যে লৌকিক নিষেধ বাক্য আছে তাহা দুর্ব্বল, আর প্রমাদাদি দোষের শঙ্কারহিত যে বৈদিক নিষেধ বাক্য আছে তাহা বলবান্। সেই বলবান্ বৈদিক প্রমাণ দ্বারা দুর্ব্বল লৌকিক প্রমাণের বাধ হইয়া যাইবে। যেরূপ নদী তীরে ফলের বিদ্যমানতা বোধনকারী যে ‘নদীতীরে ফল আছে’ এই প্রকার লৌকিক বচন; এবং সেই নদীতীরে ফলের অভাব বোধনকারী যে ‘নদীতীরে ফল নাই’ এই প্রকার লৌকিক নিষেধ বচন, সেই দুই লৌকিক বচনের যেরূপ পরস্পর বিরোধ আছে, সেই রূপ ‘পরলোক নাই’ এই প্রকার যে লৌকিক নিষেধ বচন এবং ‘পরলোক আছে’ এই প্রকার যে বৈদিক বচন, সেই দুই বচনেরও পরস্পর বিরোধ আছে তথায় ‘পরলোক নাই’

এই লৌকিক বচন যদ্যপি নিষেধ বচন হওয়াতে প্রবল সত্য, তথাপি সেই লৌকিক বচন বিষয়ে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের সম্ভাবনা আছে; সুতরাং সেই লৌকিক বচন দুর্ব্বল। আর 'পরলোক আছে' এই প্রকার বৈদিক বচন বিষয়ে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং সেই বৈদিক বচন সেই লৌকিক বচন অপেক্ষা বলবান্। সেই বলবান্ বৈদিক বচন দ্বারা সেই লৌকিক বচনের বাধ হইয়া যাইবে। কিংবা ককারাদি শব্দের স্বরূপ বোধনকারী যে ক খ গ ঘ ঙ ইত্যাদি বচন, সেই বচনবিষয়ে ও শব্দরূপ অর্থবোধকতারূপ যখন প্রমাণরূপতা সিদ্ধ হয় তখন নানা প্রকার অর্থবোধনকারী যে বচন সেই বচন বিষয়ে অর্থবোধকতারূপে প্রমাণরূপতা সিদ্ধ হইবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে?

শঙ্কা।—হে ভগবন্! অর্থবোধকতা রূপে যদি কদাচিৎ সেই বচন বিষয়ে প্রমাণরূপতা হয়, তাহা হইলে যে বচন হইতে কোনও অর্থ বোধ না হয় সেই বচন অপ্রমাণ রূপ হওয়া উচিত।

সমাধান।—হে মৈত্রেয়ি! যে বচন কোনও অর্থ বোধ উৎপন্ন না করে, সেই বচন বিষয় যদি প্রমাণরূপতা সিদ্ধ না হয়, তা নাই হউক এবিষয়ে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও হনি নাই। কারণ যে বচন কোন অর্থবোধক হইবে সেই বচনকে আমি প্রমাণরূপ মানিয়াছি; অবোধক বচনকে আমিও প্রমাণরূপ মানি না। কিংবা,—পরস্পর বিরোধ যুক্ত যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ তাহাদিগের সমাহার জন্য যে অবিরুদ্ধ প্রমা সমর্থ হইবে, তাহা অভাবকথনকারী 'নকার' সহায়তা দ্বারাই সমর্থ হইবে। ঐ কারণে সেই 'নকার' ককারাদি সকল বর্ণ অপেক্ষা বলবান্। সেই বলবান্ কার' যদি কখন অভাবরূপ অর্থকে বিষয় করিতে সমর্থ যে বোধ, সেই বো উৎপন্ন করে তবে 'নেতি নেতি' এই শ্রুতির নকারজন্য সর্ব্ব জগতের অভাব বোধ এই অধিকারী জীবের সর্ব্বদা হইবে।* সুতরাং যেরূপ নিষেধ চন বিষয়ে অর্থের বোধকতারূপে প্রমাণরূপতা সিদ্ধ হয়, সেইরূপ সর্ব্ব চনবিষয়ে অর্থের বোধকতারূপেই প্রমাণরূপতা হয়। পুরুষের প্রবৃত্তির নকতা রূপে কোনও বচন বিষয়ে প্রমাণরূপতা নাই। সুতরাং এই সিদ্ধ হইল যে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষদূষিত যে লৌকিক বচনও

লেখকের ভাব এই।—'আমি স্থূল নহি' এই 'নেতি' বাক্যে—দেহের অভাব-জ্ঞান ও তাহার পশ্চাতে সত্যপদার্থেবোধ ফুটাইয়া দেয়। সুতরাং—'নেতি, কেবল—Nehilistee—জ্ঞান-বিলোপনকারী বাক্য নঃ।—পং সং

যখন পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা অর্থের বোধকতারূপে প্রমাণরূপতা প্রাপ্ত হয়, তখন ভ্রমাদি সর্ব্ব দোষরহিত যে বেদবচন সেই বেদবচন অর্থের বোধকতা রূপে প্রমাণরূপতা প্রাপ্ত হইবে এ বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে? এই পর্য্যন্ত ঈশ্বর-উচ্চারিত অপৌরুষেয় বেদ বিষয়ে স্বতঃপ্রমাণতা নিরূপণ করা গেল।

এক্ষণে বেদের বিভাগ নিরূপণ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! প্রত্যক্ষাদি সর্ব্ব প্রমাণ-বিষয়ের রাজা যে বেদপ্রমাণ, সেই বেদ প্রথমে দুই প্রকার। একতো 'মন্ত্ররূপ' বেদ, দ্বিতীয় 'ব্রাহ্মণ রূপ' বেদ। তন্মধ্যে প্রথম মন্ত্ররূপ সেই বেদ ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব্বণ এই ভেদ দ্বারা চারি প্রকার। আর দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ রূপ বেদও ইতিহাস (১) পুরাণ (২) বিদ্যা (৩) উপনিষদ্ (৪) শ্লোক (৫) সূত্র (৬) ব্যাখ্যান (৭) অনুব্যাখ্যান (৮) এই ভেদে অষ্ট প্রকার। তন্মধ্যে যে বেদের বচন জনক রাজাদির কথাপ্রসঙ্গ বোধন করে সেই বেদ-বচনের নাম ইতিহাস (১)। আর যে বেদবচন মায়াবিশিষ্ট পরমাত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় কথন করে, এবং পৌতিমাষ্যাদি ঋষি-বংশের কথন করে এবং বিরাট্ ভগবানের পুত্র যে স্বায়ম্ভুব মনুর উৎপত্তির বিষয় কথন করে, এবং মনুর সৃষ্টিতে যে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রম এবং সেই সকলের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের বিষয় কথন করে, সেই বেদবচনের নাম পুরাণ (২)। আর যে বেদের বচন "উপাসীত" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবতার উপাসনা কথন করে সেই বেদবচনের নাম বিদ্যা (৩)। আর যে বেদবচন "সত্যেরও সত্য" ইত্যাদি ব্রহ্মের রহস্য কথন করে, সেই বেদবচনের নাম উপনিষদ্ (৪)। যে বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে কথিত যে মন্ত্র, সেই মন্ত্রের নাম শ্লোক (৫)। আর সংক্ষেপে অনেক অর্থবর্ণনকারী যে "আত্মান-পাসীত" ইত্যাদি বেদবচন তাহার নাম সূত্র (৬)। আর মন্ত্রের অর্থপ্রকাশক যে ব্রাহ্মণরূপ বেদের ভাগ তাহার নাম ব্যাখ্যান (৭)। আর যে বেদের বচন সূত্রের অর্থকে মন্ত্র এবং অর্থবাদাদির সহিত বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করে সেই বেদবচনের নাম অনুব্যাখ্যান (৮)।

শঙ্কা।—হে ভগবন্! যে বচন অনেক অর্থ প্রকাশ করে সেই বচনের নাম সূত্র এই যে আপনি সূত্রের লক্ষণ কহিলেন তাহা সম্ভব নহে। কারণ একভাবে উচ্চারিত শব্দ একই অর্থ প্রকাশ করে। এই প্রকার নিয়ম শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে; সেই নিয়মের বিরোধ হইবে।

সমাধান।—হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ লৌকিক বাক্যের পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিয়া

অনেক অর্থের বোধকতা দূষণরূপ হয়; সেইরূপ সূত্ররূপ বেদবাক্যের পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করিয়া অনেক অর্থের বোধকতা দূষণরূপ নহে। কিন্তু তদ্বিপরীতে উহা সূত্র বাক্যের ভূষণরূপ হয়। হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ ভূমিরূপ ক্ষেত্র হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ ব্রহ্মরূপ ক্ষেত্র হইতে এই বেদরূপ কল্প বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই বেদরূপ বৃক্ষ কিরূপ? ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্বণ— এই চারি স্কন্দযুক্ত এবং নানা প্রকার শাখাযুক্ত। এরূপ বেদ-ভগবানের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে। এই কারণে সেই বেদ-ভগবানকে শাস্ত্রে ব্রহ্মরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হে মৈত্রেয়ি! সেই মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে যেরূপ এই শব্দরূপ বেদ উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ সেই বেদের অর্থও সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে সংক্ষেপে সেই পদার্থের নিরূপণ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ এই দুই প্রকার যে যোগ, এবং যজ্ঞভূমি হইতে বাহির করিবার যোগ্য যে নানা প্রকার দান, এবং ইহলোকে ও পরলোকে জীবের প্রাপ্ত হইবার যোগ্য যে সুখ ও দুঃখরূপ ফল এবং সেই সুখ-দুঃখরূপ ফলভোগের সাধনরূপ যে স্থাবর-জঙ্গম শরীর এবং আকাশাদি যে পঞ্চভূত এবং বাগাদি যে একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ প্রাণ, এবং সেই বাগাদি ইন্দ্রিয়ের যে অভিমানী দেবতা ইত্যাদি এই সম্পূর্ণ জগৎ, সেই পরমাত্মা দেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে, ব্রহ্মবিষয়ে অদ্বিতীয়রূপতা সিদ্ধ হইল।

হে মৈত্রেয়ি! জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে যেরূপ ব্রহ্মের অদ্বিতীয়রূপতা নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপ স্থিতিকালেও ব্রহ্মবিষয় অদ্বিতীয়রূপতা পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই সংক্ষেপে সিদ্ধ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! এই সম্পূর্ণ জগৎ আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে তমোরূপ হইয়াছিল। সেই তমঃ কিরূপ? প্রত্যক্ষ প্রমাণের অযোগ্য, কার্য্যরূপ হেতু হইতে অনুমান করিবার অযোগ্য এবং শব্দ দ্বারাও বর্ণন করা যায় না এবং সুষুপ্ত পুরুষের ন্যায় কার্য্য করিতে অসমর্থ। এখানে তমের ন্যায় আচরণ করিতে সমর্থ যে অব্যাকৃত শব্দের কার্য্য অর্থরূপ অজ্ঞান, সেই অজ্ঞান-উপহিত সত্য বস্তুর নাম তমঃ। যেরূপ বালক আপন ছায়াতে বৈতাল কল্পনা করিয়া নিজেই ভয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ বৈতাল নিজের স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রত্যগাত্মা নিজের স্ফুরণরূপ সঙ্কল্প দ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকেই জগৎরূপে বোধ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক উহা

অন্য বস্তু কিছুই নহে। এই অব্যাকৃত রূপ কারণতত্ত্ব কিরূপ? এই জগতের উৎপত্তি কালে অস্পষ্ট নামরূপবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তথাচ শ্রুতিঃ—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" ইহা নিজে কারণের অপেক্ষা রহিত এক অদ্বিতীয় রূপ। ইহা কেবল প্রতিগম্য এবং 'সব্ব' লক্ষণরহিত। কেবল "ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানাপনোদ্যম্।" সলিল হইতে যেরূপ ফেন বুদ্‌বুদাদির সৃষ্টি হয় এবং সেই ফেন বুদ্‌বুদাদি যেরূপ সলিলেই মিলিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানপ্রবাহরূপ জগৎবীজ যে আত্মায় নামরূপাত্মক অব্যাকৃত ভাবে লুক্কায়িত ছিল। সেই নাম প্রথমে রূপ অব্যাকৃত আত্মারই সঙ্কল্প রূপে জগতের উপাদান কারণ। ভগবান্ সঙ্কল্পমাত্র জগতের আলোচনা করেন, পরে হিরণ্যগর্ভ সেই সঙ্কল্পানুসারে মায়া উপাদান দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে" ইত্যাদি। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে নির্গুণ ব্রহ্মে শশশৃঙ্গবৎ জগতের লেশমাত্রও নাই। প্রত্যগাত্মাতে রজ্জু সর্পবৎ কল্পিত রূপে জগৎ বিদ্যমান আছে। সুতরাং পরমার্থতঃ জগৎ কোন বস্তুই নহে,—জগৎ মিথ্যা। সুতরাং স্থিতি কালেও ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। এক্ষণে জগতের প্রলয় কালেও সেই ব্রহ্মবিষেয় অদ্বিতীয়রূপতা সিদ্ধ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ জগতের উৎপত্তি কালেও স্থিতি কালে ব্রহ্মে অদ্বিতীয়-রূপতা নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপ জগতের প্রলয় কালেও সেই ব্রহ্মের অদ্বিতীয়রূপতা বিষয়ে তুমি দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর। হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ গঙ্গাদি নদী-স্থিত যে জল এবং মেঘাদি স্থিত যে জল, সেই সমস্ত জল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা পরম্পর সম্বন্ধে মহান্ সমুদ্রকেই প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই সম্পূর্ণ স্থাবর-জঙ্গমরূপ জগৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা পরম্পর সম্বন্ধে পরমাত্মা দেবকেই প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে এই অর্থ স্পষ্ট রূপে নিরূপণ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! প্রলয় কালে এই শব্দ স্পর্শাদি বিষয় শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে লয় ভাব প্রাপ্ত হয়। আর সেই শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় আকাশাদি ভূতে লয় ভাব প্রাপ্ত হয়। আর সেই আকাশাদি পঞ্চভূত মায়াবিশিষ্ট পরমাত্মাতে লয় ভাব প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে স্পর্শরূপ বিষয় ত্বগিন্দ্রিয়ে, আর সমস্ত মধুরাদি রস রসন ইন্দ্রিয়ে, আর সমস্ত গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে, সমস্ত সঙ্কল্প মনে, আর সমস্ত নিশ্চয় রূপ বৃত্তি বুদ্ধিতে, আর সমস্ত গ্রহণাদি ব্যাপার হস্ত ইন্দ্রিয়ে, আর সম্পূর্ণ বিষয়জন্য আনন্দ উপস্থ ইন্দ্রিয়ে, আর সম্পূর্ণ মলাদি বিসর্জ্জন পায়ু ইন্দ্রিয়ে, আর সম্পূর্ণ গমন-আগমনাদি ব্যাপার পাদ ইন্দ্রিয়ে, আর সমস্ত বৈদিক শব্দ বাগিন্দ্রিয়ে লয় ভাব প্রাপ্ত হয়। এই

প্রকার যে যে ইন্দ্রিয় যে যে ভূতের কার্য্য, সেই সেই ইন্দ্রিয় সেই সেই ভূতে লয় ভাব প্রাপ্ত হয়। হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ ইহ লোকে ছোট নদীর জল প্রথমে শ্রীগঙ্গাদি মহতী নদীকে প্রাপ্ত হইয়া সেই গঙ্গাদি নদীর সহিত সেই ছোট-ছোট নদীর জল মহান সমুদ্রকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রলয় কালে এই সমস্ত কার্য্য প্রথমে আপন আপন কারণকে প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই কারণের সহিত সেই সমস্ত কার্য্য পরম কারণরূপ পরমাত্মাতে লয়ভাব প্রাপ্ত হয়। যেরূপ সঙ্কল্পের রচিত নগর সঙ্কল্পের অভাব হইলে অভাব হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান দ্বারা স্ফুরণের বা সম্বেদনের অভাব হইয়া যায়। তখন সম্বেদন সম্বিৎ বিষয়ে লীন হইয়া যায়। ইহার যে ভিন্ন সত্তা হইয়াছিল তাহা আর কিছুমাত্রও থাকে না। সুতরাং প্রলয় কালে সেই পরমাত্মা দেব অদ্বিতীয় রূপই হইয়া থাকেন। এই পর্য্যন্ত প্রলয় কালে আনন্দস্বরূপ আত্মার অদ্বিতীয়রূপতা সিদ্ধ করা গেল।

এক্ষণে মোক্ষ অবস্থায়ও সেই আনন্দস্বরূপ আত্মার অদ্বিতীয়রূপতা সিদ্ধ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইবার পর এই কার্য্যসহিত অবিদ্যা যে প্রকার লয়ভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে তুমি দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর। যেরূপ ইহলোকে স্বভাবতঃ দ্রবীভূত যে সমুদ্রাদির জল, সেই জল যখন আতপ বায়ু আদি দৃষ্ট নিমিত্তকে প্রাপ্ত হয় এবং জীবের পুণ্য-পাপরূপ অদৃষ্ট নিমিত্তকে প্রাপ্ত হয়, তখন সেই সমুদ্রাদির জল লবণাদি রূপ ঘনভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ বাস্তবিক জীব ঈশ্বরাদি ভেদরহিত এই শুদ্ধ আত্মাদেবও যখন অবিদ্যার সম্বন্ধরূপ নিমিত্ত প্রাপ্ত হন, তখন সেই আত্মাদেব জীবভাব প্রাপ্ত হন। হে মৈত্রেয়ি। যে প্রথম অণু তন্মাত্রা ছিল, তাহা ভাবনায় স্থূল দেহ-প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই জীব যে আদি সর্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং দেহ ভ্রম আপনার সহিত দেখিয়াছে অথচ প্রমাদ প্রাপ্ত হয় নাই, আপনার স্বরূপ বিষয়ে অহং প্রত্যয় রহিয়াছে, এই কারণে ঈশ্বর হইয়া স্থিত রহিয়াছেন। তাঁহার এই নিশ্চয় থাকে যে 'আমি সনাতন নিত্য শুদ্ধ পরম আনন্দস্বরূপ অব্যক্তরূপ পরম পুরুষ'; এই প্রকার আদি জীবের নিশ্চয় ছিল। আদি জীব উৎপন্ন হইয়া যে যে প্রকার সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেইরূপ হইয়া স্থিত হইয়াছেন। যেরূপ গর্দ্দভ নিজের শব্দে ভীত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে থাকে, সেইরূপ নিজের সঙ্কল্পে নিজে জড়িত হইয়া জন্ম-মরণপথে পরিভ্রমণ করেন এবং দুঃখী হন। আর হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ সেই লবণপিণ্ডের দশদিক্ এবং মধ্যস্থল সম্বন্ধে সেই সমুদ্রের জল হইতে ভেদ নাই, কিন্তু ক্ষাররসরূপে সেই লবণপিণ্ড সমুদ্র জল

রূপই,—সেইরূপ এই জীবাত্মা সম্বন্ধে পরমাত্মা দেব হইতে ভেদ নাই, কিন্তু সৎ চিৎ আনন্দ রূপে এই জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্নই হইতেছেন। আর হে মৈত্রেয়ি! সেই লবণপিণ্ড যেমন সেই সমুদ্রের জল প্রাপ্ত হয় সেইরূপ, জীব ব্রহ্মবিষয়েই লয় ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর হে মৈত্রেয়ি! সেই লবণপিণ্ড বিষয়ে জীবের যে ঘনীভাবতা প্রতীত হয় তাহা সেই সমুদ্রের জলের ভেদদর্শনকালেই প্রতীত হয়, সেইরূপ আমাদের ন্যায় জীবের অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিষয়ে যে এই সংসার প্রতীত হয়, তাহা সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ভেদদর্শনকালেই প্রতীত হইয়া থাকে। আর যেরূপ সেই লবণপিণ্ড বাস্তবিক তিনকালে সমুদ্রের জল হইতে ভিন্ন নহে; সেইরূপ এই জীবাত্মা বাস্তবিক তিন কালে সেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। আর হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ সেই লবণপিণ্ডে যে ঘনীভাবতা আছে তাহা নাশবান্ আর সেই লবণপিণ্ডে যে সমুদ্রজলরূপতা আছে তাহা নাশরহিত,—সেইরূপ এই আত্মাদেব বিষয়ে যে জীবরূপতা দৃষ্ট হয় তাহা নাশবান্ আর সেই আত্মাদেব বিষয়ে যে ব্রহ্মরূপতা তাহা নাশ রহিত। আর হে মৈত্রিয়ি! যেরূপ সেই লবণপিণ্ডের ঘনীভাবতার যখন নাশ হইবে তখন সেই লবণপিণ্ডেরও নাশ হইবে। সেইরূপ মোক্ষ অবস্থায় অবিদ্যার নাশ হইলে সেই জীবত্বেরও নাশ হইবে। আর হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ সেই লবণপিণ্ড আপনার উৎপত্তি স্থিতি ও লয় কালে সর্ব্বতোভাবে ক্ষাররসাবিশিষ্ট থাকে, সেইরূপ এই জীবাত্মাও তিন কালে স্বয়ং প্রকাশরূপই হন।

শঙ্কা।—হে ভগবন্! এই আনন্দস্বরূপ আত্মা যদি স্বয়ম্প্রকাশরূপই হন তবে সেই আত্মাদেব কি জন্য সর্ব্বজীবের প্রতীত হয় না?

সমাধান।—হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী যে সূর্য্যাদির প্রকাশ অন্ধপুরুষ দেখিতে পায় না, সেই রূপ অজ্ঞানরূপ অন্ধকারাবৃত বুদ্ধিরূপ নেত্রবিশিষ্ট যে অজ্ঞানী জীব, অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী স্বয়ং জ্যোতি আত্মাকে দেখিতে পায় না। আর হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ ইহলোক যে পুরুষের মন, স্ত্রী আদি বিষয়ে গমন করে, সেই পুরুষ অত্যন্ত সমীপস্থিত পদার্থকে দেখিতে পায় না; সেইরূপ যে পুরুষের মন স্ত্রী ধন পুত্রাদি পদার্থে আসক্ত হয়, সেই পুরুষ অত্যন্ত সমীপস্থিত আত্মাকে দেখিতে পায় না আর হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ সমুদ্রের লবণপিণ্ডে ঘনীভাবতা হয়, সেইরূপ এই আনন্দস্বরূপ আত্মাতে আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি বিশেষ জ্ঞানই ঘনীভাবতারূপ হইতেছে। আর সেই বিশেষ জ্ঞানরূপ ঘনীভাবতার কারণ এই স্থূল শরীর। সুতরাং সেই স্থূল শরীরের যখন নাশ হইবে,

তখন সেই বিশেষ জ্ঞানরূপ ঘনীভাববিশিষ্ট আত্মারও নাশ হইবে। হে শিষ্য, এই স্থূল শরীরের নাশ হইলে পর আত্মারও নাশ হইবে, এই প্রকার বচন যে অভিপ্রায়ে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন সেই যাজ্ঞবল্ক্য মুনির অভিপ্রায় তুমি শ্রবণ কর। এই আনন্দস্বরূপ আত্মা যদ্যপি বাস্তবিক নাশরহিত, তথাপি যেরূপ চারিকোণবিশিষ্ট লৌহপিণ্ডের সহিত তাদাত্ম্য ভাবপ্রাপ্ত অগ্নিও চারিকোণবিশিষ্ট প্রতীত হয়। তথায় চারিকোণবিশিষ্ট লৌহপিণ্ডের নাশের পর সেই চারিকোণবিশিষ্ট অগ্নিরও নাশ হইয়া থাকে। সেইরূপ জীবিত অবস্থায় এই স্থূল দেহের তাদাত্ম্য অধ্যাস সংযুক্ত এই আত্মদেব আমি মনুষ্য ইত্যাদি বিশেষ জ্ঞানবিশিষ্ট হওয়া প্রতীত হয়। আর মৃত্যুকালে এই স্থূল শরীরের যখন নাশ হয়, তখন সেই বিশেষ জ্ঞানবিশিষ্ট আত্মারও নাশ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ পুরুষ বিদ্যমান থাকিলেও দণ্ড-রূপ বিশেষণের নাশ দ্বারা, এখানে দণ্ডী পুরুষ নাই এই প্রকার দণ্ডবিশিষ্ট পুরুষের অভাব নিশ্চয় হয়, সেইরূপ মৃত্যুসময়ে আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও আমি মনুষ্য ইত্যাদি বিশেষ জ্ঞানরূপ বিশেষণের নাশ দ্বারা সেই বিশেষণবিশিষ্ট আত্মার নাশ ব্যবহার হইয়া থাকে। আর যেরূপ মৃত্যুসময়ে এই জীব আমি মনুষ্য আমি ব্রাহ্মণ ইত্যাদি সর্ব্ব বিশেষজ্ঞানরহিত হন, এই কারণে সেই জীব মৃত্যু হইলে এই স্থূল শরীরের দুঃখ প্রাপ্ত হন না, সেইরূপ মোক্ষ অবস্থায়ও এই জীব আমি মনুষ্য ইত্যাদি সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞানরহিত হন, এই কারণে জীব সেই মোক্ষ অবস্থায় কিঞ্চিন্মাত্রও দুঃখ প্রাপ্ত হন না।

শঙ্কা। হে ভগবন্ যেরূপ মৃত্যুকালে আমি মনুষ্য ইত্যাদি সর্ব্ববিশেষ জ্ঞানের অভাব হয়, সেইরূপ সুষুপ্তি অবস্থায়ও সেই সর্ব্ব বিশেষজ্ঞানের অভাব হইয়া থাকে; সুতরাং সুষুপ্তি অবস্থার দৃষ্টান্ত দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্য মুনি মোক্ষ অবস্থার সর্ব্বদুঃখের অভাব কি জন্য কথন করেন নাই ?

সমাধান।—হে শিষ্য ! যদ্যপি সুষুপ্তি অবস্থায় জীবের সেই সম্পূর্ণ বিশেষ জ্ঞানের অভাব হয় তথাপি এই জীব সেই সুষুপ্তি অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া যখন জাগ্রৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখন সেই জীব সেই শরীরে নানাপ্রকার দুঃখ পাইবে। কিন্তু মৃত্যু হইলে এই জীবাত্মা সেইরূপ এই স্থূল শরীরসম্বন্ধীয় দুঃখ পুনঃ প্রাপ্ত হইবে না এই কারণে সুষুপ্তি অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনি মোক্ষ অবস্থার দৃষ্টান্ত কথন করিয়াছেন। সুতরাং যেরূপ এই স্থূলশরীরের নাশের পর সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞানরহিত হওয়াতে এই জীব

পুনঃ এই শরীরজন্য দুঃখ প্রাপ্ত হন না, সেইরূপ আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা অবিদ্যা নাশ হইলে পর সর্ব্ববিশেষজ্ঞানরহিত হওয়াতে এই স্বয়ং-জ্যোতি আত্মা পুনঃ (সেই) শরীরসম্বন্ধীয় দুঃখ প্রাপ্ত হন না।

শঙ্কা।—হে ভগবন্! মোক্ষ অবস্থার ন্যায় মৃত্যুকালেও যদি কখন সর্ব্ব দুঃখের অভাব হয় তবে মৃত্যু-অবস্থাসম্প্রাপ্ত অজ্ঞানী জীব হইতে মুক্ত পুরুষের বিলক্ষণতা সিদ্ধ হইবে না।

সমাধান।—হে শিষ্য! মৃত্যুকালে সম্পূর্ণ বিশেষ জ্ঞানের অভাব হইলে যদ্যপি এই অজ্ঞানী জীব পূর্ব্বশরীরজন্য দুঃখ প্রাপ্ত হইবে না বটে, তথাপি ভবিষ্যৎ শরীর প্রদানে সমর্থ যে পুণ্য-পাপরূপ অদৃষ্ট এবং সর্ব্বশরীরের কারণ যে অবিদ্যা এই উভয়ই অজ্ঞানী জীবের মৃত্যুসময়ে বিদ্যমান থাকে; সুতরাং পুণ্য-পাপরূপ কর্ম্ম বশে এই অজ্ঞানী জীব অন্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া সে জন্মের অনেক প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মুক্ত পুরুষের আত্মজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যা এবং পুণ্য-পাপরূপ অদৃষ্ট এই উভয়ই নাশ হইয়া যায়। সুতরাং সেই মুক্ত পুরুষের পুনর্ব্বার শরীর প্রাপ্তি দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হইবে না। হে শিষ্য! এইপ্রকার অভিপ্রায় মনে রাখিয়া সেই যাজ্ঞবল্ক্য মুনি মৈত্রেয়ীকে শরীর নাশের পর আত্মার নাশ কথন করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মুনির সেই অভিপ্রায় না জানিয়া মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে এই প্রকার প্রশ্ন করিলেন। মৈত্রেয়ী বলিলেন, হে ভগবন্! পূর্ব্বে আপনি এই আনন্দস্বরূপ আত্মাকে সৎ চিৎ আনন্দ রূপ কথন করিয়াছেন; আর এখন আপনি এই স্থূল শরীরের নাশের পর সেই আত্মার নাশ কথন করিলেন। সুতরাং আপনার পূর্ব্ব উত্তরবাক্যের পরস্পর বিরোধ হইতেছে। হে ভগবন্! যেরূপ পবন তুলাকে দশদিকে উড়াইয়া লইয়া যায়, সেইরূপ আপনার বচন-বায়ু পরমাত্মার মন রূপ তুলাকে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত করাইতেছে। হে ভগবন্! যেরূপ রাজার বাক্যের অভিপ্রায় না জানিয়া সেবকদিগের মন ব্যামোহ প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ আপনার বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া আমার মন ব্যামোহ প্রাপ্ত হইতেছে। হে ভগবন্! যেরূপ বিচারহীন গাভী তৃণের লোভে দূর দেশে গমন করে, তথায় তৃণদ্বারা আচ্ছাদিত যে পঙ্ক, সেই পঙ্কে সেই গাভী জড়াইয়া (ফাঁসি) যায় সেইরূপ আত্মজ্ঞানের লোভে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার বচনরূপ পঙ্কে জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছি। হে ভগবন্! পূর্ব্বে আমি আত্মার নাশ হয় না, এই প্রকার বচন অনেক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি, এবং আত্মার নাশ হয় না, এই প্রকার বচন কোন না কোন

প্রসঙ্গক্রমে আপনার মুখ হইতেই আমি অনেক বার শুনিয়াছি কিন্তু এখন আপনি, এই স্থূল শরীরের নাশের পর সেই আত্মার নাশ বলিলেন। সুতরাং এই আপনার বচন শ্রবণ করিয়া সেই আত্মার নিত্যরূপতার নিশ্চয় আমার মন হইতে বিদূরিত হইতেছে। হে ভগবন্, যেরূপ কোন পুরুষ আপনার ধন বৃদ্ধি করিবার জন্য কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়, পরে সেই ব্যবসাতে আপনার পূর্ব্ব মূলধনকেও নষ্ট করিয়া দেয়, সেই প্রকার ন্যায়, আমার সম্বন্ধে ঘটিয়াছে। কারণ আত্মার প্রকৃত রূপ জানিবার জন্য আপনাকে প্রশ্ন করিলাম কিন্তু আপনার বচনে আত্মার প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান তো হইলই না, তদ্বিপরীতে আমি পূর্ব্বে যে আত্মার নিত্যরূপতা নিশ্চয় করিয়া'ছলাম সেই আত্মার নিত্যরূপতার ভাবও আপনার বচন শুনিয়া নিবৃত্ত হইয়া গেল।

হে শিষ্য! এই প্রকার বচন যখন মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে কহিলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য মুনি কৃপা করিয়া মৈত্রেয়ীকে আপনার হৃদয়ের অভিপ্রায় বলিতে লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বলিলেন, 'হে মৈত্রেয়ি! এই শরীরের নাশের পর আত্মারও নাশ হয় এই প্রকার আমার বচন হইতে তোমার সেই ব্যামোহ প্রাপ্তি এবং পূর্ব্বে তুমি যে আত্মার নিত্যরূপতা নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছ, তাহার হানি চিন্তা করিয়া তোমার খেদ প্রাপ্তি যেন হয় না। হে মৈত্রেয়ি! আমার বচন শ্রবণ করিয়া তুমি মোহ প্রাপ্ত হইয়াছ, কিন্তু তোমার মোহ উৎপাদন করিবার জন্য আমি সেই বচন বলি নাই। আমার পূর্ব্ব উত্তর বচনের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তুমি ব্যর্থই মোহ প্রাপ্ত হইয়াছ। হে মৈত্রেয়ি! এই স্থূল শরীরের নাশের পর আত্মারও নাশ হয় এই প্রকার বচন যে অভিপ্রায়ে আমি তোমাকে বলিয়াছি তাহা তুমি শ্রবণ কর। হে মৈত্রেয়ি! এই আনন্দস্বরূপ আত্মা যদ্যপি বাস্তবিক জীব-ঈশ্বর ভাবরহিত তথাপি অবিদ্যার সম্বন্ধপ্রযুক্ত সেই আত্মাদেব জীবরূপ ঘনীভাবতা প্রাপ্ত হন। যখন আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্ত হইয়া যায়, তখন এই আনন্দস্বরূপ আত্মা সেই জীবরূপ ঘনীভাব পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাস্তবিক স্বরূপে স্থিত হন। সেই মোক্ষ অবস্থায় 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি মনুষ্য' ইত্যাদি সমস্ত বিশেষ জ্ঞান নাশ হইলেও সেই আনন্দস্বরূপ আত্মার নাশ হয় না। কিন্তু যেরূপ মৃত্যুকালে সর্ব্ব বিশেষ জ্ঞান নাশ হইলে এই পুরুষ স্থূল শরীরজন্য দুঃখ প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ সেই মোক্ষ অবস্থায়ও সর্ব্ব বিশেষ জ্ঞানের অভাব হইলে এই আত্মাদেব সেই শরীরজন্য দুঃখ প্রাপ্ত হন না। হে মৈত্রেয়ি! এই প্রকার অর্থ বুঝাইবার জন্য আমি যাজ্ঞবল্ক্য এই শরীর

নাশের পর আত্মার নাশ কথন করিয়াছি। পরন্তু বাস্তবিক আত্মার নাশ হওয়া আমার তাৎপর্য্য নহে। এক্ষণে এই অর্থ দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ ঘটস্থিত যে আকাশ, তাহা স্বভাবতঃ নাশ হয় না, কিন্তু ঘটরূপ উপাধি নাশের পর, আকাশকে ঘটাকাশ বিষয়ে আরোপ করিয়া মূঢ় পুরুষ ঘটাকাশের নাশ মনে করে, সেইরূপ এই আনন্দস্বরূপ আত্মার স্বভাবতঃ নাশ কদাচ সম্ভব নহে, কিন্তু এই স্থূল শরীররূপ উপাধি নাশের পর এই শরীরের নাশ আত্মাতে আরোপ করিয়া অবিবেকী পুরুষ "আমি মরিলাম" রূপে আত্মার নাশ মনে করে। হে মৈত্রেয়ি! যদি কখন স্বভাবতঃই আত্মার নাশ অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহ লোকে কৃত পুণ্য-পাপরূপ কর্ম্মের সুখ-দুঃখরূপ ফলভোগ বিনাই নাশরূপ 'কৃতনাশ রূপ' দোষ, এবং অকৃত পুণ্য-পাপ-রূপ কর্ম্মের সুখদুঃখ রূপ ফলের ভোগ রূপ যে অকৃতাভোগরূপ দোষ, প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান্ পুরুষের আত্মার নাশ অঙ্গীকার করা উচিত নহে। হে মৈত্রেয়ি! মৃত্যুকালে এই পুরুষের ইন্দ্রিয়াদি সর্ব্ব সংঘাতের লয় হয় এই কারণে মরণ কালে আমি মনুষ্য ইত্যাদি বিশেষ জ্ঞান এই পুরুষের উৎপন্ন হয় না। সেই সকল বিশেষ জ্ঞানের অভাব হইলে এই আত্মাদেব যখন মরণ অবস্থায়ও সংসার-দুঃখ প্রাপ্ত হন না, তখন আত্মা-সাক্ষাৎকার দ্বারা কার্য্যসহিত অবিদ্যা নাশ হইলে এই আত্মাদেব মোক্ষ অবস্থায় সেই সংসার-দুঃখ প্রাপ্ত হইবেন না, এ বিষয়ে অধিক কি বক্তব্য আছে? সুতরাং হে মৈত্রেয়ি! এই মোক্ষ অবস্থায় 'আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি সর্ব্ব বিশেষজ্ঞান নাশ হইলেও এই স্বয়ং জ্যোতি আত্মার নাশ হইবে না। এই কারণে এই স্বয়ং জ্যোতি আত্মা অবিনাশী। "অবিনাশী বা অরে আত্মা অনুচ্ছিত্তি ধর্ম্মা।"

শঙ্কা।—হে ভগবন্! মোক্ষ অবস্থায় এই আত্মাদেব যদি স্বপ্রকাশ হন, তবে সেই মোক্ষ অবস্থায় এই আত্মাদেব শরীরাদি দ্বৈত প্রপঞ্চকে দেখেন না কেন? আর মোক্ষ অবস্থায় এই আত্মাদেব দ্বৈত প্রপঞ্চ দেখেন না; সুতরাং তাহাতে এই জানা যায় যে মোক্ষ অবস্থায় আত্মাদেব স্বয়ম্প্রকাশ নহেন।

সমাধান।—হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ সুষুপ্তি অবস্থায় এবং মরণ অবস্থায় স্বয়ম্প্রকাশ চৈতন্য রূপে বিদ্যমান থাকিয়াও এই আত্মাদেব যে স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থকে দেখেন না। সেই অদর্শন বিষয়ে আত্মার স্বপ্রকাশ-রূপতার অভাব কারণ নহে, কিন্তু সেই সুষুপ্তি অবস্থায় এবং মরণ অবস্থায় স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থের অভাব হয় এবং নেত্রাদি করণেরও অভাব হয়, এই কারণে

সুষুপ্তি অবস্থায় এবং মরণ অবস্থায় স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও এই আত্মাদেব সেই দ্বৈত প্রপঞ্চ দেখেন না, সেইরূপ মোক্ষ অবস্থায়ও এই আত্মাদেব যে দ্বৈত প্রপঞ্চকে দেখেন না। সেই অদর্শন বিষয়ে আত্মার স্বপ্রকাশ-রূপতার অভাব কারণ নহে কিন্তু সেই মোক্ষ অবস্থায় সর্ব্ব দ্বৈত প্রপঞ্চের অভাব হয় এই কারণে মোক্ষ অবস্থায় স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপে বিদ্যমান থাকিয়াও এই আত্মাদেব সেই দ্বৈত প্রপঞ্চ দেখেন না। "অথ যত্র সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তদা কেন কং পশ্যেৎ কেন কং জিঘ্রেৎ" ইতি শ্রুতেঃ। আর হে মৈত্রেয়ি! এই আনন্দস্বরূপ স্বয়ং জ্যোতি আত্মাদেব অবিনাশী। এই কারণে এই আত্মাদেব সুষুপ্তি মরণ ও মোক্ষ এই তিন অবস্থায় আপনার বাস্তবিক স্বরূপ পরিত্যাগ করেন না। "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ" ইতি ; সুতরাং যে আত্মার বাস্তবিক স্বরূপ মোক্ষ প্রভৃতি অবস্থায় থাকে, সেই আত্মার বাস্তবিক স্বরূপ সংসারদশায় অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন কালেও থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ কহিয়াছেন,—

"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ।

শ্রুতি-প্রমাণেও তাহাই জানা যায় যথা—"উপদ্রষ্টা সাক্ষী চ অনুদ্রষ্টানুমন্তৈষ আত্মা।" পরন্তু সংসারদশায় দেহাদির তাদাত্ম্য সম্বন্ধ দ্বারা সেই আত্মার বাস্তবিক স্বরূপ প্রতীত হয় না। আর মোক্ষ অবস্থায় দেহাদির তাদাত্ম্য সম্বন্ধ নিবৃত্ত হইয়া যায়, এই কারণে মোক্ষ অবস্থায় সেই আত্মার বাস্তব স্বরূপ বিদ্বান্ পুরুষের করামলকের ন্যায় স্পষ্ট প্রতীত হয়। সুতরাং এই অর্থ সিদ্ধ হইল যে, যেরূপ অগ্নির উষ্ণ স্বভাব কখনও অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি মরণ ও মোক্ষ এই সর্ব্ব অবস্থায় এই আনন্দস্বরূপ আত্মার স্বপ্রকাশ অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপের কখনও অন্যথাভাব প্রাপ্ত হইবে না। তথা চ শ্রুতিঃ:— "নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে, নহি শ্রোতুঃ শ্রুতের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইত্যাদি। "তচ্চক্ষুঃ পুরুষে যেন স্বপ্নং পশ্যতি"; "দৃষ্টের্দ্রষ্টা" ইত্যাদি। সুতরাং এই আত্মাদেব সর্ব্ব ভেদরহিত।

এই পর্য্যন্ত ত্বং-পদার্থরূপ জীবের শোধন করা গেল। এক্ষণে সেই জীবের পরিপূর্ণ ব্রহ্মের সহিত অভেদ প্রদর্শিত হইবে। "তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি। 'সোঽহং' 'শিবোঽহমিতি"। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!" (ক্রমশঃ) শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী।

শারদ-প্রভাতে পেয়েছি জননি তোমার করুণ বিন্দু,
সিনান করিয়া পূজিব তোমায় প্রেম অমৃত-সিন্ধু।
দ্যুলোক হইতে ভূলোকের পথে পড়েছে চরণ রেখা,
বিভোর সমাব শূন্য গগনে সে কিগো পেয়েছে দেখা?
মঞ্জীরধ্বনি সীঞ্জার তব ধ্বনিত বিহগ-আস্যে,
পুণ্য পরশ পেয়েছে জননি প্রসূন তোমার লাস্যে।
এসগো জননি মুক্ত করিয়া তোমার স্নেহের উৎস,
করুণা তোমার লভিগো আমরা ধন্য হউক বিশ্ব।
বরষা, জননি, দিয়াছ ভরিয়া পূর্ণকুম্ভ তোরণে,
শেফালিকা, যূথী বেলা, মল্লিকা এসেছে তোমার বরণে।
শঙ্কিত প্রাণে অঙ্কিত করি সাজের চিত্রপট,
অম্বর হ'তে এক করে' দেছ তোমার নদীর তট।
সজ্জিত আজি উটজ ভবন স্মিত সকলের মুখ,
তোমার প্রসাদে গরবে হরষে স্ফীত গো সবার বুক।
এসগো জননি মুক্ত করিয়া তোমার স্নেহের উৎস
করুণা তোমার লভিগো আমরা ধন্য হউক বিশ্ব।
সন্তান আজি অযুত জননি তোমার আসন তলে,
নিজ অধিকার চরণে তোমার পাইবে আজিকে বলে।
বিশ্বজননী, জ্ঞান দায়িনী তুমি গো জগদ্ধাত্রী,
সন্তান আজি হয় মাগো তব চরণে কৃপার পাত্রী।
মুছে দাও তুমি অন্তর হ'তে বিদ্বেষ মসী রেখা,
আনন্দরূপা প্রেমস্বরূপা তোমার পাইলে দেখা।
এস গো জননি মুক্ত করিয়া তোমার জ্ঞানের উৎস
করুণা তোমার লভিগো আমরা ধন্য হউক বিশ্ব।

শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রত্যাখ্যাতা।

১

সময়, সুযোগ ও ইচ্ছা না থাকিলে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, বিদ্যাশিক্ষা ত দূরের কথা। তাই দেবতাগণ কচের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যার্জ্জন করিতে অনুরোধ করিলে কচ তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে দেবাসুরে ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছিল। দেবগণ কচ-পিতা বৃহস্পতিকে পৌরহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন এবং শুক্রাচার্য্য অসুরগণ কর্ত্তৃক গুরুপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্য ভিন্ন আর কাহারও মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত ছিল না, সুতরাং কচকে পিতৃদ্বেষী দেববৈরী শুক্রাচার্য্যের উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইল।

শুক্রাচার্য্য বিদ্যার্থী কচের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বি পুত্র জানিয়া মনে মনে হাস্য করিলেন মাত্র।

২

দানবরাজ বৃষপর্ব্ব গুরু শুক্র মহাতপা ঋষি। অসুর অধীশ্বরের অধীশ্বর। দেবগণ পর্য্যন্ত তাঁহার বিদ্যাপ্রভাবে শশব্যস্ত। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বিত্তত্যাগী মহামুনি কোলাহলমুখরিত ঐশ্বর্য্যশালিনী রাজপুরী ত্যাগ করিয়া অরণ্যানী মধ্যে ক্ষুদ্র কুটীরে আশ্রম পাতাইয়া নিরন্তর অধ্যয়ন যজ্ঞ ও তপস্যাদি কার্য্য করেন। একমাত্র অবলম্বন অসামান্যা লাবণ্যময়ী দুহিতা দেবযানী।

শিমান্তে বসন্ত যেমন নবীন কোমল পল্লবে তরুদেহ ঢাকিয়া দেয়, যৌবন তখন তেমনি করিয়াই দেবযানীর সুগঠিত কোমল দেহে অঙ্গে অঙ্গে প্রভা ঢালিয়া দিতেছিল। মহর্ষি শুক্র কঠোর তপশ্চরণ করিতেন, আবশ্যকমতে রাজাকে পরামর্শ দিতেন এবং দেবযুদ্ধে নিহত দানবগণকে পুনর্জ্জীবন দান করিতেন। এদিকে দেবযানী ফল-পুষ্প আহরণ, বনভ্রমণ ও আশ্রম মৃগ পরিচর্য্যা করিতেন। গিরি, নদী, তরু ও মৃগশিশুর বন্ধুত্ব ভিন্ন ঐ কুমারী মানুষের বন্ধুত্বের আস্বাদ গ্রহণের অবকাশ পায় নাই। শুক্র নয়নমণি দেবযানীর সমস্ত উপদ্রবই স'হিতেন; তাঁহার মাতৃহীনা তনয়া তাই মাতার অভাব বুঝিতে পারে নাই।

এ হেন গুরুগৃহে কচ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া বিদ্যাভ্যাসে রত হইলেন।

৩

পুরাকালের প্রথানুসারে স্বতঃই কচের উপর আচার্য্যের গোচারণ, ফলমূল আনয়ন, পুষ্পচয়ন প্রভৃতির ভার পড়িল। দেবযানী'রও কচের সঙ্গলাভে নির্জ্জনবাসব্রত ভঙ্গ হইল। দেবগণ কচকে দেবযানীর সন্তোষসাধন করিতে বলিয়াছিলেন, বুদ্ধিমান্ কচও বুঝিয়াছিলেন দেবযানীর চিত্তবিনোদন ভিন্ন গুরুর অনুগ্রহ লাভ দুর্লভ, সুতরাং অভীষ্ট সিদ্ধি-কল্পে দেবযানীর মনস্তুষ্টিসাধনে ব্যস্ত হইলেন।

কচ দেবযানীর সকল অনুজ্ঞা পালন করিতেন। নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য ও অধ্যয়নের পর অবকাশ পাইলেই অপূর্ব্ব কৌশলে দেবযানীকে নৃত্যগীত শিক্ষা দিয়া ত্বরায় দেবযানীর পরিতোষ সাধন করিলেন। এ দিকে আচার্য্যও তাঁহার অধ্যবসায়, ধীশক্তি ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে যথোচিত শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দেবযানীর সাহচর্য্যে ও গুরুর কৃপায় কচের বিদ্যাভ্যাসকাল সুখেরদিনের ন্যায়ই যাপিত হইতে চলিল।

৪

দুঃখকে যেমন আপনার করিয়া ধরিয়া রাখা যায়, সুখ কিন্তু তেমন বাঁধা থাকিতে চাহে না। তাই দুঃখের দিন এত বড়, সুখের দিন এত ছোট। কচ কৃতবিদ্য হইয়াও স্বগৃহে গমন করিতেছেন না। অসুরগণ তাঁহার কোন দুরভিসন্ধি আছে সন্দেহ করিয়া একদিন নির্জ্জনকাননে গোচারণ কালে তাঁহাকে হত্যা করিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোপশূন্য গাভীর আগমন দেখিয়া দেবযানী পিতৃসন্নিধানে কচের কালবিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। মহর্ষি তপঃপ্রভাবে কচের বিনাশবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন এবং দেবযানীর প্রার্থনা অনুসারে তাঁহাকে মন্ত্রবলে পুনর্জ্জীবিত করিলেন।

ইহার পর আর এক দিন কচ পুষ্পচয়নে প্রেরিত হইলে অসুরগণ তাঁহাকে জীবিত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল এবং পুনরায় তাঁহাকে বধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। এবারও আচার্য্য তাঁহাকে বিদ্যাপ্রভাবে জীবন দান দিলেন। কচের পুনর্জ্জীবন লাভ লওয়ায় দানবগণ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিহত করিয়া দেহের ভস্মাবশিষ্ট শুক্রাচার্য্যের সোমরসের সহিত মিশ্রিত করিলে আচার্য্য না জানিয়া ঐ সুরা পান

করিলেন। দেবযানী কচের মৃত্যুতে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন এবং পিতাকে তাঁহার প্রাণদান করিবার নিমিত্ত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। দেবযানীকে আচার্য্যের কিছুই অদেয় ছিল না, কিন্তু এবার বিষম সমস্যা উপস্থিত। কচ তাঁহার পাকস্থলীমধ্যে, সুতরাং কুক্ষি বিদারণ এবং তাঁহার নিজ প্রাণনাশ ব্যতীত কচের জীবন রক্ষা হয় না। দেবযানী কচের অদর্শনে অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়া কচের অনুগমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। অগত্যা মহর্ষি জীবন দান করিয়া উদরমধ্যস্থ কচকে সঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা দিলেন এবং নিজ কুক্ষি বিদারণপূর্ব্বক বাহির হইয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে উপদেশ দিলেন। কচ তাহাই করিলেন। তৃতীয় বারও এইরূপে কচের প্রাণরক্ষা হইল।

তপোনিধি শুক্রাচার্য্য অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত সুরা সহ কচের দেহাবশেষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া সুরার প্রতি জাতক্রোধ হইলেন তদবধি ব্রাহ্মণের পক্ষে সুরাপান নিষিদ্ধ এবং নিন্দনীয় হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে অধার্ম্মিক এবং ব্রহ্মহা হইয়া ইহকালে ও পরকালে নিন্দিত হইবেন।

কচের জীবনলাভের সহিত অভীষ্টসিদ্ধ হইল, সুতরাং তাঁহার আর গুরুগৃহে বাস করিবার আবশ্যকতা ছিল না। কচ ত্বরায় স্বজন-সকাশে গমন করিয়া লব্ধবিদ্যা প্রচার করিতে উৎসুক হইলেন। গুরুপদে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া কচ দেবযানীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতে গেলেন।

কচ সত্যবদ্ধ ব্রহ্মচারী কিন্তু তথাপি তিনি হৃদয়হীন নহেন। তাই হিতৈষিণী দেবযানীর কাছে বিদায়ের কথা বলিতে পূর্ব্বস্মৃতি কচের কণ্ঠরোধ করিল। অনিন্দ্যসুন্দর প্রফুল্ল মুখখানি মেঘের ন্যায় বিষাদের ছায়ায় ক্ষণিক আবৃত হইল। কচ নতবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দেবযানী পূর্ব্বেই পিতৃসন্নিধানে কচের গমনসংবাদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার আয়তনয়নপ্রান্তে দুইটী মুক্তাফল শোভা পাইতেছিল।

আত্মসম্বরণ করিয়া কচ বিদায় যাচ্ঞা করিলেন।

দেবযানী কহিলেন, "তুমি আমায় সঙ্গে লইয়া চল।"

দেবদেব ইন্দ্রের কুলীশাঘাতেও কচ অধিকতর চকিত হইতেন না, কহিলেন, "সে কি!"

দেবযানী কহিলেন, "তুমি আমার পাণিগ্রহণ কর।"

কচের বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। সংযত হইয়া কহিলেন, "তুমি আমার গুরু-পুত্রী এবং প্রাণদাত্রী। তোমার সহিত চিরদিনই ভগিনীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া তোমার মনোরঞ্জন করিয়াছি। আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ। বহুদিন এ আশ্রমে বাস করিয়াছি, এ অন্যায় অনুরোধ তোমার শোভা পায় না।"

দেবযানী হৃদয়ে বল বাঁধিলেন। "তুমি সন্ন্যাসব্রতধারী তাই তোমাকে ব্রত-উদযাপনের পূর্ব্বে বিরক্ত করি নাই। তুমি জান না—কি যত্নে তোমাকে হৃদয়ে পোষণ করিয়াছি। তোমার অসাধারণ গুরুভক্তি, জিতেন্দ্রিয়তা, অধ্যবসায়, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ক্ষমা আমাকে সতত তোমার প্রতি আকর্ষণ করিয়াছে—যে আকর্ষণ আমি রোধ করিতে পারি নাই। তাই তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি। তোমার এক পল অনুপস্থিতিতে আমার এক যুগ বোধ হইত। তুমি গান গাহিলে অপ্সরা তাহাতে পরাজিত, তাই তোমার সঙ্গীতের কখন মর্ম্মগ্রহ করিতে পারি নাই। তোমার সান্নিধ্যে আমার পুষ্পসৌরভও জ্ঞান হইত না, তাই বার-বার নির্লজ্জের ন্যায় তোমার প্রাণভিক্ষা করিয়াছিলাম। তুমি আমার পিতৃগুরু, আঙ্গিরার পৌত্র, আমার পূজনীয়। তুমি আমার পাণিগ্রহণে আপত্তি করিও না।"

কচ কহিলেন, "আমি তদবধারণে কর্ত্তব্যানুরোধে তোমার পিতার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলাম। আমার কর্ত্তব্যময় জগতে আর কিছুরই স্থান ছিল না। কর্ত্তব্যই আমার সর্ব্বস্ব—তাহাই সাধন করিয়াছি। কিন্তু দেবযানি, তুমি আমার গুরুকন্যা, গুরুর এ বিষয়ে অনুমতি নাই, অতএব তুমি আমায় ক্ষমা কর।"

৬

দেবযানী উত্তর করিলেন, "আমার অনুরোধ অন্যায় বা অযথা নহে। তুমি কুলে শীলে গৌরবে আমার অপেক্ষা হীন নহ, সুতরাং পিতার ইহাতে অসম্মতি হইবে না। আমি ত বনবিহারিণী হরিণীর ন্যায়ই ছিলাম, তোমার আগমনে আমার সুখ গিয়াছে—তুমি আমায় অবহেলা করিও না।"

কচ বলিলেন, "জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমি দেবযানীর প্রেমাকাঙ্ক্ষা করি নাই। গুরু আমাকে এমত শিক্ষা দেন নাই। তোমার অসংযত হৃদয়ে বিকৃত চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। আমাকে দোষী করিও না!"

দেবযানী গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "আমি কুমারী স্বৈরিণী নহি। ঈশ্বর জানেন আমি তোমার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলপ্রয়াসী ছিলাম না। তোমাকে অসুরগণ

তৃতীয়বার বধ করিলে তোমার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত হইয়াছিলাম। তুমি আমায় বিনাদোষে ত্যাগ করিও না।”

কচ কহিলেন, “আমি শুক্রাচার্য্যের উদরে বাস করিয়াছি সুতরাং ধর্ম্মতঃ তুমি আমার ভগিনী। অনুমতি কর গৃহে যাই এবং আশীর্ব্বাদ কর, পথিমধ্যে কোন বিঘ্ন না হয়। সাবধানে গুরুর পরিচর্য্যা করিও। সততই স্নেহশালিনী ভগিনী দেবযানীকে স্মরণ করিব, তুমিও স্নেহময় ভ্রাতা কচকে স্মরণ করিও। তোমার প্রেমযোগ্য কচ কেহ ছিল না, অতএব তাহাকে বিস্মৃত হও!”

দলিতা ফণিনীর স্থায় উন্মনা দেবযানী বলিলেন, “তুমি যেমন নিরপরাধিনী অসহায়াকে পরিত্যাগ করিলে, তোমার অধীতবিদ্যা সফল হইবে না।”

কচ উত্তর করিলেন, “আমি তোমাকে নীতিকথাই বলিতেছিলাম, তুমি ক্রোধান্ধ হইয়া আমাকে অভিসম্পাত করিলে। তুমি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শুক্রের দুহিতা, তোমার অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে; কিন্তু আমি যাহাকে বিদ্যাদান করিব সে সফল হইবে। আমি তোমাকে প্রত্যভিশাপ দিতেছি, তোমার মনোরথ সফল হইবে না।”

এই কথা বলিয়া কচ স্বভবনে গমন করিলেন। দেবযানী ছিন্নমূল-লতিকার স্থায় ভূতলে পতিতা হইলেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্যসম্মেলন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অন্ধ্রবংশীয় রাজগণের সময়ের ভাষা:

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আর্য্যগণের কথিত ভাষা কিরূপ ছিল তাহার নিদর্শনস্বরূপে আমি অন্ধ্রবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলুমায়ী সময়ে নাসিক গুহায় উৎকীর্ণ একটি লিপি উদ্ধৃত করিতেছি। দ্বিতীয় পুলুমায়ী বা বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ী খৃষ্টীয় ১৩৮ অব্দে রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং তাহার ছয় বৎসর পরে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। লিপিটী এই:—

সিধ রঞো বাশিঠী পুতস পুলুমায়িস সংবছরে ছটে গিম্হ পখে পচমে দিবসে।

(নাসিক গুহায় উৎকীর্ণ লিপি)।

"সিদ্ধ রাজ্ঞা বাশিষ্ঠীপুত্র শ্রীপুলুমায়িয় ষষ্ঠ সংবৎসরে গ্রীষ্মপক্ষে পঞ্চম দিবসে।"

উদ্ধৃত লিপিতে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে উহা অত্যন্ত কোমল। উহাদের সংস্কৃত প্রতিশব্দ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

লিপির শব্দ	সংস্কৃত প্রতিশব্দ
সিধ	সিদ্ধ
রঞো	রাজ্ঞঃ
বাসিঠী	বাশিষ্ঠী
পুতস	পুত্রস্য
সিরি	শ্রি
পুলুমায়িস	পুলুমায়িনঃ
সংবছরে	সংবৎসরে
ছঠে	ষষ্ঠে
গিমহ	গ্রীষ্ম
পখে	পক্ষে
পচমে	পঞ্চমে
দিবসে	দিবসে

প্রাদেশিক ভাষাসমূহের উৎপত্তি।

আর্য্য ও অনার্য্য ভাষার মিশ্রণ

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে রাজকীয় লিপিতে বিশুদ্ধ সংস্কৃত-ভাষার ব্যবহার হইতে আরম্ভ হয়। কাথিয়াবারের গীর্নার নামক স্থানে রুদ্রদামের সময়ে অনুমান ১৫০ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ লিপিতে সর্ব্বপ্রথম বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তদনন্তর তাম্রশাসন প্রভৃতি সমস্ত প্রয়োজনীয় রাজকীয় কার্য্যে সংস্কৃত ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত অশোকের অনুশাসন ও পুলুমায়ীর লিপি হইতে অনুমান হয় যে, আর্য্যগণের কথিত ভাষা এক এবং উহা সংস্কৃতের অনুযায়ী। কিন্তু দেশজ বা ভারতীয় আদিম অধিবাসিগণের কথিত ভাষা নানাবিধ এবং উহারা সংস্কৃত হইতে পৃথক্ ছিল। আর্য্যভাষা ঐ সকল দেশজ ভাষাকে বিদূরিত করিয়া উহাদের বিভিন্ন প্রকার শব্দসম্পদ্ ও রচনা-রীতি গ্রহণপূর্ব্বক বাঙ্গালা, উড়িয়া, আসামী, গুরুমুখী, মহারাষ্ট্রী, হিন্দী

প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার সৃষ্টি করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে প্রাচীনকালে আর্য্য প্রভাব সমধিক বিস্তৃত না হওয়ায় তামিল, তেলেগু, মলয়ালম্ প্রভৃতী দ্রাবিড়ী ভাষাসমূহ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

তৎসম, তদ্ভব ও দেশজ।

পূর্ব্বকালে বাঙ্গালা, উড়িয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাসমূহ "প্রাকৃত" এই সাধারণ নামে অভিহিত ছিল। প্রাকৃত ভাষার শব্দ ত্রিবিধ, যথা—তৎসম, তদ্ভব ও দেশজ। সংস্কৃতের তুল্য শব্দকে তৎসম বলে। দশন, শ্রবণ, অরণ্য, লতা ইত্যাদি যে সকল সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে উহাদিগকে তৎসম বলা যায়। যে সকল শব্দ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়া কিঞ্চিৎ বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে তদ্ভব বলে। বাঙ্গালা ভাষার চোক্, কাণ্, গাধা ইত্যাদি শব্দ চক্ষুঃ, কর্ণ, গর্দ্দভ ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আর যে সকল প্রাদেশিক শব্দ সংস্কৃতের তুল্য নহে এবং সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হয় নাই, উহাদিগকে দেশজ প্রাকৃত বলা যায়, যথা—উষ্ণীষ অর্থে পাগড়ী, নারিকেল অর্থে ডাব এবং নৌকা অর্থে ডোঙ্গা ইত্যাদি। দেশজ প্রাকৃত শব্দ অনন্ত।

বাচস্পতেরপি মতির্ন প্রভবতি দিব্যযুগসহস্রেণ।
দেশেষু যে প্রসিদ্ধাস্তান্ শব্দান্ সর্ব্বতঃ সমুচ্চেতুম্॥

"দেশে দেশে যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে উহাদিগকে একত্র সংগ্রহ করা বৃহস্পতিরও অসাধ্য"। এই হেতু কলিকাল-সর্ব্বজ্ঞ জৈন হেমচন্দ্র খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে "দেশী নামমালা" নামক গ্রন্থে অনাদি প্রবৃত্ত প্রাকৃত শব্দ অর্থাৎ যে সকল দেশীয় শব্দ বহুকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে তাহাই সংগ্রহ করিয়াছেন :—

দেস বিসেস পসিদ্ধীঈ ভণ্ণমাণ অণন্তয়া হুন্তি।
তম্হা অণাই-পাইঅ পয়ট্ট-ভাসা-বিসেসও দেসী॥ ৪॥

(দেশী নামমালা, ১ম বর্গ)॥

এতদ্দেশের আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে যে সকল ভাষা প্রচলিত ছিল, দেশজ প্রাকৃত শব্দই তাহাদের প্রাণ। মহাবীর ও বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত প্রাকৃত ও পালি ভাষায় তৎসম ও তদ্ভব প্রাকৃত শব্দের বহুল ব্যবহার দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় তৎসম ও তদ্ভব প্রাকৃত শব্দের প্রাচুর্য্য থাকিলেও উহাতে দেশজ শব্দের অভাব নাই। (ক্রমশঃ।)

"নাস্তী সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৫ম ভাগ।] অগ্রহায়ণ, ১৩২৩। [৮ম সংখ্যা।

তাহারই-তাহারই!

কুল কুল কুল ভাসায়ে দু'কূল
গরবে চলিছে তটিনী।
সাগর সদনে কহিতে সাদরে
কা'র প্রেমময়ী কাহিনী?
কা'র হাসিরাশি ল'য়ে উষাদেবী
সাজায় পূরব গগনে?
প্রভাত কিরণে পুলকিত চিত
জীব রত কা'র স্মরণে?
গুন্ গুন্ গুন্ কা'র গুণ-গাথা
গায় অলিকুল হরিষে?
কানন ভরিয়া সুতানে বিহগ
কা'র সুধাধার বরিষে?
ঝির ঝির ঝির প্রভাত সমীর
উড়ায়ে কুসুম সুবাসে
গলা জড়াজড়ি চুমিয়ে প্রকৃতি
কা'র রূপরাশি বিকাশে?

রবি শশী তারা অচল ভূধর
কাহার গরিমা প্রকাশে ?
কা'র দেহ-ছটা ঝলসি নয়ন
দামিনী জলদে বিকাশে ?
কা'র সরলতা সুকুমার মতি
বালক-হৃদয়ে থাকিয়া
বিশ্বাস সবল মাথামাথি ভাব
যতনে রেখেছে আঁকিয়া ?
কাহার মমতা অকৃত্রিম স্নেহ
জননী হৃদয়ে জাগিছে ?
কা'র দয়া বুকে সাধুর হৃদয়
পরদুঃখ দেখি কাঁদিছে ?
কা'র মহিমায় পাতকী জীবনে
উঠিছে প্রেমের লহরী ?
কা'র বিশ্বরূপ প্রেমিক হৃদয়ে
সতত রয়েছে প্রহরী ?
তাঁ'রি গুণগান তাঁ'রি ভালবাসা
তাঁরি সব বিশ্ব ভরিয়া
তাঁহারি তাঁহারি লুকায় যে জন
হৃদিমাঝে উঁকি মারিয়া ?

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস ভক্তিবিনোদ বি, এ।

আধ্যাত্মিক জীবন ও তাহা লাভের উপায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কিন্তু এই জ্ঞান ও ভক্তি পূর্ণতার সীমায় উন্নীত হইতে যাইয়া আমরা প্রায়শঃ প্রাচীনের অবলম্বিত অনুদার পথে চালিত হই। পৃথিবীর ধর্ম্মগ্রন্থ এইরূপ ক্ষুদ্র বহু অনুদার মতে পরিপূর্ণ। কিন্তু এক্ষণে আমাদের কোন্ পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ? কি উপায়ে মানব এই সংসারে বাস করিয়া, সর্ব্বপ্রকার

সাংসারিক কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও অধ্যাত্মজীবন লাভের উপায় অবগত হইতে পারে?—কি উপায়ে প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা লাভ হয়? পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সাংসারিক জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রভেদকল্পনা কিয়ৎপরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এই প্রভেদকল্পনার ফলে যাহা বাস্তব, তাহাকে আমরা প্রায়শঃ ভুল বুঝি; এবং সেই ভুল ধারণাও অন্যকে বুঝাইয়া থাকি। মানবের অন্তর্নিহিত ধর্ম্মপ্রবণতাই যে পরমার্থ-প্রাপ্তির হেতু, ইহা বিস্মৃত হইয়া, কোন নির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধ-নিয়মিত কর্ম্মানুষ্ঠানই আধ্যাত্ম-জীবনের সাধন বলিয়া মনে করি।

সাংসারিক জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন যে সম্পূর্ণ পৃথক্, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বকালেই স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে ঈশ্বরলাভের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করিয়া থাকেন। সংসার ত্যাগ করিলেই যে, ভগবান্‌কে লাভ করা যাইবে, এই কল্পনায় অনেকে জনহীন মরুপ্রদেশে, কিংবা গহন কাননে, পর্ব্বতে কিংবা গিরিগুহায় বা নির্জ্জন প্রান্তরে গমন করেন। কিন্তু যদি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী হয়েন, তবে মরুভূমে, জনকোলাহলপূর্ণ নগরে, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থানে বা জঙ্গলে বা জনহীন পর্ব্বতে, সর্ব্বত্রই ত তিনি সমভাবে বিরাজিত। যদি একথা সত্য হয় যে, বলহীন মানব, জনবহুল মনুষ্যসমাজ অপেক্ষা নির্জ্জনস্থানে, সেই সর্ব্বব্যাপী মহান্ পুরুষকে সহজে অনুভব করিতে পারেন, তবে তাহা আধ্যাত্মিকতার চিহ্ন নহে,—দুর্ব্বলতারই চিহ্ন। বলবান্ বিজয়ী সামর্থ্যশালী পুরুষ কখন অধ্যাত্মজীবন লাভের জন্য নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিবেন না;—তিনি সংসার-কোলাহল ও সর্ব্ববিধ বাধাবিপত্তির মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও অধ্যাত্মজীবনের উৎকর্ষ লাভ করেন।*

ইহা অবশ্য স্বীকার করা যায় যে, মানবজীবন ধীরে ধীরে যে পূর্ণতালাভে অগ্রসর হয়, নির্জ্জনবাস সে পূর্ণতালাভে অনেক পরিমাণে সাহায্য করে, এবং এই কারণে এখনও অনেক স্ত্রী-পুরুষ সারাজীবন নির্জ্জনবাস করিয়া থাকেন। কিন্তু এবম্প্রকারে জীবনের উন্নতিসাধন কখনও শ্রেষ্ঠ ও অত্যুজ্জ্বল মহিমামণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। একরূপভাবে কৃষ্ণ কি খৃষ্ট কখন পৃথিবীর বক্ষে বিচরণ করেন নাই। অধ্যাত্মজীবন লাভের উপযোগী হইবার জন্য নির্জ্জনবাসের

* বিবি বেশান্তের এই মতটী সমীচিন নহে। সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব বুদ্ধিতে প্রতিভাসিত হইতে গেলে, বুদ্ধি তন্মুভাব প্রাপ্ত হওয়া চাই। তাই লম্বু জীবন ও তাহার কোলাহল মধ্যে আত্ম-সাক্ষাৎকার সহজে হয় না। ধ্যানেও যে ত্যাগ, সন্ন্যাসও ত তাই। পং সং

প্রয়োজন হইতে পারে; কিংবা যে সকল সাংসারিক বন্ধন হইতে আমরা অন্য প্রকারে মুক্তিলাভ করিতে পারি না, সেই সকল বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য নির্জ্জনবাসের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা যায়। সাধন সমরে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে না পারিলে, বিভুব সহিত মুখামুখী হইয়া যুঝিতে না পারিলে, সংসার হইতে পলায়নই অবশ্য শ্রেয়ঃ। যৎকালে মানবের মনোবৃত্তিগুলি সাতিশয় দুর্ব্বল থাকে, তখন এরূপ যুক্তি মন্দ নহে। যাঁহারা প্রলোভনে জয়ী হইতে না পারেন, প্রলোভনের মোহিনী-শক্তি যাঁহাদের বিবেকের উপর প্রভুত্ব করে, প্রলোভনের বস্তু হইতে দূরে থাকা তাঁহাদের পক্ষে সুন্দর উপদেশ। "বিকার-হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাম্ ন চেতাংসি তে এব ধীরাঃ"—এই উপদেশের সার্থকতা রক্ষা করিতে যাওয়া দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রশংসার্হ নহে। অবশ্য অধ্যাত্ম-জীবন-পথের প্রকৃত বীর, * অধ্যাত্মজীবন লাভের অনিষ্ট আশঙ্কায় স্থান বিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষকে ত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করেন না। তিনি কলুষস্পর্শে সঙ্কুচিত হয়েন না; কারণ যে চিত্তশুদ্ধিরূপ আবরণে তিনি সুরক্ষিত তাহা কলুষকালিমাস্পর্শে মলিন হইতে পারে না। প্রথম অবস্থায় সংসার-আশ্রম হইতে পলায়ন বা বৈরাগ্য অবলম্বনই সে ক্ষেত্রে বিশেষ সঙ্গত হইলেও, ইহা দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। যে সকল ব্যক্তি নির্জ্জনবাসে অভ্যস্ত, তাঁহারাই আবার সংসারের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন; নির্জ্জন-প্রদেশবাসে যে বৈরাগ্যভাব অর্জ্জন করিয়াছেন, সাধারণ সাংসারিক জীবনে তাহাই সদ্ব্যবহার করিতে পারেন। ঈশ্বরের সহিত অভিন্নজ্ঞান বা মুক্তি সংসারেই লাভ করা যায়, পরন্তু জঙ্গলে বা মরুপ্রদেশে লাভ হয় না †

সংসারে থাকিয়াই অধ্যাত্মজীবন গঠিত হইবে; সংসারের শিক্ষা হইতে সেই শিক্ষার সূত্রপাত ও পূর্ণপ্রতিষ্ঠা হইবে; কিন্তু এ সম্বন্ধে একটী বিধি আছে। এই বিধি আবার দুইরূপে বিভক্ত। প্রথমতঃ যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পালন করিতে হইবে; যতই অধ্যাত্মজীবনের বিকাশ হইবে, ততই কর্ত্তব্যপালন সহজসাধ্য হইবে। কিন্তু এই কর্ত্তব্য কর্ম্ম কোনও বিশিষ্ট ফল কামনায় নহে; কর্ত্তব্য বলিয়া নিষ্কামভাবে সম্পাদিত হইবে। এইরূপ নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্যসম্পাদন বস্তুতঃই অতিশয় কঠিন ব্যাপার। অধ্যাত্মজীবনলাভ করিতে হইলে সংসারের অন্ত

---

* এখানে "বীর" অর্থে কি অহঙ্কার-পরিপুষ্ট বুঝায় না? বীরত্বেরও কি আবশ্যকতা? পং সং

† একথা সত্য নহে। সংসার কেন, ব্যক্তভাব ত্যাগ না করিলে প্রকৃত মিলন হয় না। পং সং

কিছুই পরিত্যাগ করিবার আবশ্যক নাই, কেবলমাত্র মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আবশ্যক; সর্ব্বপ্রকার কামনাকে চিরতরে বিসর্জ্জন দিতে হইবে এবং সমস্ত কর্ম্ম নিষ্কামভাবে সম্পাদন করিতে হইবে; কেননা, সেগুলি কর্ত্তব্য। আত্মানুভূতিই সেই অখণ্ড সত্ত্বার অনুভূতির সর্ব্বপ্রথম সোপান। আর চিন্তাসমষ্টিকে আত্মাভিমুখী করাই আত্মানুভূতির পন্থা। যদি একমাত্র অখণ্ড পরমাত্মাই অনন্ত বিশ্বের জীবন বলিয়া মনে করা যায়, তবে ত জীবমাত্রেই তাঁহার প্রকাশ * তাহা হইলে আমাদের কর্ম্মও আমাদের সেই আত্মশরীরস্থ পরমপুরুষের কর্ম্ম। সুতরাং কর্ম্মফলও সাধারণের, ইহা অন্য পৃথক্ জীবের দ্বারা অনুষ্ঠিত নহে। এখানে প্রাচীন কালের সেই নীতিবাক্যটী পালনীয়—"ফলকামনায় কর্ম্ম করিও না, কেন না, কর্ম্মমাত্রেরই ফল আছে।"

যাঁহারা ধর্ম্মজীবন যাপন করিবেন, তাঁহাদেরই সম্বন্ধে এই উপদেশ, অন্য সাধারণের জন্য নহে। ফলকামনাশূন্য কর্ম্ম করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব;—কারণ ফলকামনাই তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। যে রূপেই হউক, কর্ম্মপ্রবণতা আমাদের সকল অবস্থায় প্রয়োজন; কারণ ইহাই ক্রমোন্নতির পন্থা স্বরূপ। কর্ম্মপ্রবণতা ব্যতীত মানবজীবনের ক্রমবিকাশ অসম্ভব। নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম জীব জীবনপথে অগ্রসর হইতে পারে না, ক্রমোন্নতির পতাকাবাহী কর্ম্মিগণের বহুপশ্চাতে পড়িয়া থাকে। কর্ম্মপ্রবণতাই উন্নতির মূল। মানব যতই পরিশ্রম করে, আত্মার উৎকর্ষলাভে যত্নবান হয়, ততই সে নবজীবনে প্রবেশ করে; আলস্যপরায়ণ উদ্যমহীন ব্যক্তি কখনও আত্মসাক্ষাতকার লাভ করিতে পারেনা। আত্মসাক্ষাতকার ত দূরের কথা, নিষ্কর্ম্মা অলস ব্যক্তি কখন অধ্যাত্মজীবনলাভের কল্পনাও করিতে পারে না। সাধারণ ব্যক্তির কর্ম্মস্পৃহা কেবলমাত্র কর্ম্মফল লাভের আনন্দ উপভোগের জন্য। কর্ম্মফলের এইরূপ স্পৃহাই মানবকে সংসারের মধ্য দিয়া বিবর্ত্তনের পথে লইয়া যায়। সংসারের ইহাই যেন মনুষ্যকে উন্নতির পথে লইয়া যাইবার জন্য ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট পন্থা। ঈশ্বর মানবমাত্রকেই কর্ম্মফলের পুরস্কার দিয়া থাকেন। মানব সেই ফল কামনায় কর্ম্ম করে এবং নিয়ত কর্ম্ম সাধনে তাহাদের কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাহারা কর্ম্মফল লাভ করিলে দেখিতে পায় যে, এ ফললাভ নিরর্থক। মানব জীবনের গতিবিধির উপর দৃষ্টিপাত করিলেও এ কথার যাথার্থ্য নিরূপিত হইবে। মানবমাত্রেই ধনের আকাঙ্ক্ষা করে, এবং হয়ত লক্ষ লক্ষ সে

---

* তাহাকে না চিনিতে পারিলে কি জীবকে তাঁহার প্রকাশ বলিয়া বুঝা যায়?—পং সং

উপার্জ্জন করে, কিন্তু এত ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যেও অশান্তির উষ্ণশিখা যেন তাহাকে দগ্ধ করিতে থাকে, সে আর সুস্থচিত্তে ধনোপভোগ করিতে পারে না। মানব ধনের ন্যায় যশেরও কামনা করে, এবং তাহাও লাভ হয়। কিন্তু পরক্ষণেই মানব বুঝিতে পারে যে, খ্যাতি অন্তঃসারশূন্য; শূন্য-গর্ভ বাণী শূন্যেই বিলীন হইবে। মানব ক্ষমতালাভে কত না ব্যগ্র হয়! কিন্তু জীবনব্যাপী উদ্যমের ফলে যখন অভিপ্সিত ক্ষমতা তাহার করগত হয়, তখন তাহাই তাহার অসুখের কারণ হয়। সে ক্লান্ত ও আশাহত হইয়া তাহার বড় সাধের সঞ্চিত ধন দূরে পরিত্যাগ করে। এইরূপ ব্যাপার সর্ব্ববিষয়েই পুন পুনঃ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ এই সকল বিশ্বপিতা প্রদত্ত ক্রীড়নক মাত্র; ইহাদের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়াই তাঁহার সন্তান সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। তিনি এই সকল ক্রীড়নক রাশির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া প্রিয় সন্তানগণের প্রতীক্ষা করিতেছেন; ক্রীড়নকমুগ্ধ সন্তান-গণ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া, যখন তাঁহার পরমানন্দময় ক্রোড়ে উপনীত হইবে তখনই তাহাদের সর্ব্ব প্রলোভন দূরীভূত হইবে। কারণ তিনিই সর্ব্বসৌন্দর্য্যের সকল আকর্ষণের একমাত্র আধার। মানব একটীর পর একটী কাম্যবস্তু পাইবে এবং আমার বলিয়া পরিত্যাগ করতঃ পুনর্ব্বার অগ্রবর্ত্তী হইবে; অভীষ্ট লাভে কর্ম্মপ্রবণতার নিবৃত্তি হইলে চলিবে না। কারণ ইহার ফলেই সে ক্রমশঃ প্রকৃত কামনার ধনের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইবে। কিন্তু এইরূপ ক্রমিক নৈরাশ্য ও অবিরাম অতৃপ্তির ফলে যখন মানবের আত্মসাক্ষাতকার বাসনা সন্দীপিত হইয়া উঠিবে, তখন এই সকল আপাতরম্য প্রলোভন আর তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিবে না। সে কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবি ফলের প্রতি লক্ষ্যশূন্য হইয়া তাহার চরম উদ্দেশ্যের প্রতি অভিনিবিষ্ট হইবে। সে তখন কর্ম্ম করিবে কর্ত্তব্য বলিয়া, আপনাকে সেই এক বিশ্বমানবের অংশ মাত্র জানিয়া, * তাহার কৃত কর্ম্ম ও অন্য সকলের কৃতকর্ম্ম সেই একত্বেই পর্য্যবসিত বুঝিয়া! এই অবস্থায় উপনীত মানব কখন কর্ম্মে উদাসীন হয় না; অপিচ তাঁহারা ফলান্বেষী জন-সাধারণের ন্যায়, ক্ষেত্রবিশেষে অপেক্ষাকৃত অধিক কর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকেন। যে মানব কোন কোন লোকহিতকর মহৎ উদ্দেশ্যে অক্লান্তভাবে কর্ম্ম করিয়া, শেষকালে যুগব্যাপী পরিশ্রমের পরিণামে কেবল নিষ্ফলতা দেখিয়াও ক্লিষ্ট না হন,

---

* বিবি বেসান্ত বিশ্বমানব (humanity) পর্য্যন্ত অস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছেন. ভগবানকে বুঝেন নাই। বুঝিলে বুঝিতেন যে, কর্ম্ম হিসাবে শ্রীভগবানই একমাত্র কর্ত্তা, জ্ঞান হিসাবে সবই তিনি; কর্ম্মও নাই, কর্ত্তৃত্বও নাই। পং সং

তিনি অধ্যাত্মজীবনপথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। ইহা কি অসম্ভব বোধ হয়? না—যখন আমরা আত্মসাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হই, যখন আমরা এক অখণ্ড সত্তার আভাস পাই, তখন আর ইহা অসম্ভব থাকে না! এ অবস্থায় অনুষ্ঠিত লোকহিতকর প্রয়াস ব্যর্থ হয় না—প্রায়শঃ সফলতা লাভ করে। এ অবস্থায় অবলম্বিত পদ্ধতির বিভিন্নতার চরমফলের পার্থক্য হয় না; কোন পদ্ধতি অসম্যক হইলেও—তাহার অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন অনুষ্ঠানের অসম্পূর্ত্তি হয় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

বিভু-স্তোত্র।

জয় জগদীশ মহীশ অধীশ
মহদীশ মহাত্মন।
অনাদি মহান, সর্ব্বশক্তিমান,
নিত্য সত্য সনাতন॥
জয় পরমেশ, অনন্ত মহেশ,
হৃষিকেশ ভগবান।
পরমাত্মারূপ চৈতন্যস্বরূপ,
চিদানন্দ মহাপ্রাণ॥
জয় জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতিষ্কনিচয়
প্রভাকর-প্রভাকর।
যাহার নিদেশে ভ্রমি কক্ষদেশে,
বিতরিছে যাঁর কর॥
জয় জগন্নাথ জগজন তাত
জগবন্ধু দীনাশ্রয়।
জয় আত্মারাম চিরশান্তি ধাম
জয় জয় জগন্ময়॥

তুমি বিশ্বপাতা নিয়তি বিধাতা
মাতা পিতা গুরুজন।
শিক্ষাদীক্ষাদাতা কলত্র দুহিতা
তুমি প্রেম প্রস্রবণ॥
তুমি বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মা বিষ্ণুশর্ম্মা
সদাশিব শুভঙ্কর।
সর্ব্বভূতময় সর্ব্বভূতাশ্রয়
স্বভাবের চিত্রকর॥
এ ভব ভবন তোমার রচন
তুমি দেব দয়াময়।
এ বিশ্ববিভূতি তোমারি প্রকৃতি
তুমি প্রভো! সর্ব্বময়॥
আকাশ অনিল অনল সলিল
তেজ হ'তে সমুদয়
অবনী অম্বর যত চরাচর
চন্দ্রসূর্য্য গ্রহচয়
তোমা হ'তে সব হ'য়েছে উদ্ভব
তোমাতে বিলয় পায়।
তুমিও সবাতে আছ অলক্ষিতে
মণিতে সুত্রেরপ্রায়॥
তরুগুল্মলতা তৃণ শস্য তথা
ফল মূল পত্র সহ।
জীবের লাগিয়া যতন করিয়া
যোগাইছ অহরহ॥
পীড়ায় ঔষধি বৈদ্য নিরবধি
ঘুচাতে ব্যাধির জ্বালা।
বিলাসবাসন বস্তু অগণন
ভরিয়া রেখেছ ডালা॥
চর্ব্ব্য চুষ্য পেয় লেহ্য উপাদেয়
ভক্ষ্য নানাবিধ তায়।

করিয়া প্রস্তুত　　রয়েছ প্রস্তুত
কে কোথা কখন চায় ॥
এত দয়া কা'র ?　　দয়ার আধার
তুমি ভিন্ন এ সংসারে ।
তাই ভক্তিভরে　　পূজিতে তোমারে
মনে বড় সাধ করে ॥
কেমনে পূজিব　　কি দিয়ে পূজি ।
কোথা পাই উপচার ?
যা' কিছু আমার　　সকলি তোমার
জানিয়ে রেখেছি সার ॥
দেহ প্রাণ মন　　ভাবিয়ে আপন
করি সদা অহঙ্কার ।
এ বড় আশ্চর্য্য　　মনের মাৎসর্য্য
মায়া যা'র মূলাধার ॥
তাই বলি মন　　মায়ার বন্ধন
অহমিকা পরিহরি ।
এস একমনে　　বিভুর চরণে
সব সমর্পণ করি ॥
দূরে যাবে মায়া　　মোহ ভ্রম ছায়া
এ জগৎ বিভুময় ।
দেখিব দেখাব,　　মাতিব মাতাব
বলি 'বিভু জয় জয়' ॥

শ্রীকুঞ্জবিহারী মিত্র ।

———

মোহ।

—•—

(১)

নিকুম্ভ পুরাণ-প্রসিদ্ধ ঈশ্বরদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর বংশধর। তাঁহার দুই পুত্র সুন্দ ও উপসুন্দ, যেন এক বৃন্তে যুগল পুষ্প। সহোদর ভ্রাতায় এরূপ সৌহার্দ্দ দেখা যাইত না। তাঁহারা সর্ব্বদাই একত্র বাস ভোজন ও শয়ন করিত। তিলার্দ্ধ কেহ কাহাকেও চক্ষের আড় করিত না। তাহাদিগের ন্যায় প্রণয়ী প্রণয়শীলও এত সমসুখ সমবেদনা অনুভব করিত না।

সংসারে প্রকৃতি-দত্ত উপহারের সকলেই সমান অংশ কখনই পায় না, নতুবা পার্থক্য লোপ পাইত; কিন্তু সুন্দ উপসুন্দের পক্ষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। তাই তাহারা উভয়েই বয়োবৃদ্ধি সহকারে তুল্য বলবিক্রমশালী হইয়া উঠিল। উভয়ের মনেও একই চিন্তা। তাহাদিগের তপস্যা দ্বারা ত্রিলোকবিজয় এবং অমরত্ব-লাভের সংকল্প হইল।

(২)

ভারতের কটিতটতুল্য পরম রমণীয় বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতে গমন করিয়া তখন দুই ভ্রাতায় তপকার্য্য আরম্ভ করিল। সে তপশ্চরণ কি কঠোর! কতদিনই না তাহারা অনশনে কাটাইল! উর্দ্ধবাহু করতঃ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর করিয়া—দাঁড়াইয়া ভগবান্ কমল যোনির প্রীতিকামনায় আরাধনা করিতে লাগিল।

দেবতাগণ এই ব্যাপার দর্শনে ভীত হইয়া সুন্দ উপসুন্দের তপোবিঘ্ন করিতে যত্নবান হইলেন, কিন্তু তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। যুগ্ম ভ্রাতা তাঁহাদিগের মায়া-প্রেরিত বিভীষিকা-ভয়ে ভীত হইলেন না।

বহুদিন তপোনুষ্ঠানের পর ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, উভয়ে সংকল্পানুরূপ অমর বর প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু অমর করিলে তাহারা দেবগণের সমকক্ষ হইবে, এ কারণ ব্রহ্মা তাহাদিগকে এ বর দিলেন না। ব্রহ্মা কহিলেন, "তোমরা ত্রিলোক বিজয়ী হইবে, এবং দুই

ভ্রাতার পরস্পরের বিরোধ ভিন্ন অন্য কেহই তোমাদিগকে সংহার করিতে পারিবে না।”

(৩)

আশানুরূপ বর লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে উভয় ভ্রাতা নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিল। তাহাদিগের আত্মীয় বন্ধুগণের তাহাতে আনন্দের পরিসীমা রহিল না। তাহারা তখন ব্রহ্মচর্য্য ত্যাগ করিয়া, জটা ভার কর্ত্তন করতঃ সংসার সুখে মনোনিবেশ করিল।

যে কোন ব্রতই হউক না কেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া অমিশ্র মঙ্গল নহে। ব্রতী যে পরিশ্রম চেষ্টা ও যত্ন করেন, ব্রত উদ্‌যাপিত হইলে ও তাহার ফললাভে সক্ষম হইলে, তাহার সেই পরিশ্রম চেষ্টা ও যত্ন স্বতঃই অন্তঃহিত হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আর বড় বিদ্যাচর্চ্চা করে না। যাঁহারা সফলকাম হইয়াও পূর্ব্বকৃত পরিশ্রম চেষ্টা ও সে যে সদ্‌গুণের প্রভাবে সাফল্য লাভ হইয়াছে তাহার চর্চ্চায় ক্লান্ত না হয়, তাঁহারাই প্রকৃত কর্ম্মী। সুন্দ ও উপসুন্দ ব্রহ্মার উপাসনায় মন দিয়া জগতের কতই না উন্নতি সাধান করিতে স্থিরসংকল্প হইয়াছিলেন, ? দয়া দাক্ষিণ্য, ক্ষমা, দান, আত্মসুখ-বর্জ্জন প্রভৃতি কতই না সদ্‌গুণের ও সৎকার্য্যের চিন্তা করিয়াছিলেন ? কিন্তু ব্রহ্মার বর-লাভের সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রাতাদ্বয়ের হৃদয় হইতে সেই সব চিন্তা বিদায় গ্রহণ করিল।

সুন্দ উপসুন্দ প্রথমে পৃথিবী জয় করিলেন। তৎপরে দেবপুরী করতলগত করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্রের নিগ্রহ করিয়া, অবশেষে অনায়াসে পাতাল পরাজয়ে সমর্থ হইলেন। এতদিনে ত্রিলোক বিজয় বাসনা পূর্ণ হইল। এক্ষণে তাহাদিগের রমণী-পীড়ন ও ব্রাহ্মণগণের তপোনুষ্ঠানের বিঘ্ন-সাধন এক উত্তম ক্রীড়া হইল।

ইহারা স্বভাবতঃই দুর্ব্বল। দুর্ব্বল সহজেই অত্যাচার সহ্য করে, অত্যা-চারীকে দণ্ড দিতে পারে না। কিন্তু দুর্ব্বলের ক্ষোভ কখনই ব্যর্থ হয় না, বিভূ-পদে আর্ত্তনাদ একদিন না একদিন শ্রুত হয়ই হয়; এবং দুর্ব্বলের বল অসহায়ের সহায় ভগবান্, অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে ত্রাণ করেন।

(৪)

সুন্দ উপসুন্দের অত্যাচারে সমগ্র পৃথিবী বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে ইহা লোক পিতামহ ব্রহ্মার কর্ণগোচর হওয়ায়, তিনি নিজ বরের কথা স্মরণ করিয়া ক্ষণেক চিন্তান্বিত হইলেন। পরক্ষণেই তাহাদিগের সংহার বাসনায় দেবশিল্পী

বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া এক সুন্দরী কামিনী নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা ত্রিলোকের সমস্ত সৌন্দর্য্য একীভূত করিয়া ঐ কামিনীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন : এবং তিলে তিলে রূপসীগণের রূপ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইল তিলোত্তমা।

তিলোত্তমা ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে নিজরূপ লাবণ্যদ্বারা প্রলোভিত করিয়া সুন্দ উপসুন্দের মধ্যে বিরোধ বাধাইতে আদেশ দিলেন।

তিলোত্তমা তখন সভাসীন দেবতাগণকে প্রদক্ষিণ করিলেন। রুদ্র দক্ষিণমুখে উপবিষ্ট ছিলেন, তিলোত্তমা তাঁহাকে বেষ্টন কালে তিলোত্তমার রূপ প্রভা দর্শনার্থ তাঁহার আর তিনটি মুখ নির্গত হইল এবং দেবরাজ ইন্দ্রের বেষ্টন কালে তাঁহার গাত্রে সহস্র চক্ষু আবির্ভূত হইল। তদবধি শঙ্কর চতুর্ম্মুখ এবং ইন্দ্র সহস্র লোচন হইয়াছেন।

সুন্দরী রমণী মুনির মনেরও বৈলক্ষণ্য ঘটায়, ধন যৌবন বল ও মদমত্ত সুন্দ উপসুন্দ কোন্ ছার! রক্তাম্বর-পরিহিতা লোকললামভূতা ললনা যখন সেই ভ্রাতৃদ্বয়-সন্নিকটে উপনীত হইল, তখন তাঁহারা কামিনীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া সুরাপানে প্রবৃত্ত। তিলোত্তমাকে দর্শনমাত্রই উভয় ভ্রাতাই মদনবাণে জর্জ্জরিত হইলেন এবং তৎপ্রতি ধাবিত হইলেন।

জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "এ আমার ভার্য্যা, সুতরাং তোমার গুরু, অতএব ইহার আকাঙ্ক্ষা করিও না।"

কনিষ্ঠ কহিল, "এ আমার পত্নী, তোমার ইহাকে স্পর্শ করা বিধেয় নহে।"

সুযোগ বুঝিয়া তিলোত্তমা দুই ভ্রাতার মধ্যে যে কেহ অপরকে পরাজয় করিবে তাহারই অঙ্কলক্ষ্মী হইবার আশা দিলেন। অতঃপর তাহাদিগের মধ্যে যুদ্ধ হইল। বিধাতৃ-বিধানে তাহারা আশৈশব অবিচ্ছিন্ন সৌহার্দ্দ ও ভালবাসায় জলাঞ্জলি দিল, এবং বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া পরস্পরের আঘাতে উভয়েই প্রাণত্যাগ করিল।

দেবকার্য্য সিদ্ধ এবং পৃথিবী নিষ্কণ্টক হইল। তিলোত্তমাও পুনরায় ব্রহ্মা-সকাশে ত্রিদশালয়ে প্রতিগমন করিলেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

চলা।

নিলেই যদি দীক্ষা চলার তন্ত্রেরে।
আর কেন রও পিছে সরে
মিছা দুখের সন্দেরে?
যদি গাবেই বলিয়া গান,
তুমি আগেই তুলেছ তান,
কণ্ঠে ওঠে কিনা সুর-গ্রাম,
কি ফল এই দ্বন্দ্বেরে?
পথের মাঝে চলই জপে—
চলবারই এ মন্ত্রেরে।
এবার শুধুই ধেয়ে চলা,—
ধাওয়ারই সে মন্ত্রবলা,
নিরুৎসাহে নাইক টলা,—
নাইক থাকা বন্ধেরে।
ঐ শোন না চলার স্তোত্র
ওঠে ভুবন ছন্দেরে।
'কি হবে' তার কাজ কি খোঁজে?
হবার আগে ক'জন বোঝে?
করার মাঝেই আছে ও যে,—
চলার প্রতি রন্ধ্রেরে।
আঁধারে তাই পথ করে নে'
চলার বসন-গন্ধেরে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

সুখ ও স্বাস্থ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গত আষাঢ়মাসের পত্রাতে 'সুখ ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে একস্থানে লিখিত হইয়াছে যে, "আমাদিগের মনের ভাব মিথ্যা না হইয়া সত্য হইলেই, শরীরটি সুস্থ ও নীরোগ থাকিবে। জীবন আর ভারবহ থাকিবে না, অত্যন্ত হাল্কা হইয়া যাইবে"। সত্যের উপর সুখ ও স্বাস্থ্য নির্ভর করিতেছে। আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে কেহ বিচারক, কেহ উকীল, কেহ মোক্তার, কেহ ডাক্তার, কেহ বণিক্, কেহ কারিকর, কেহ কৃষিজীবী। আমরা কেহ হাসিতেছি, কেহ খেলিতেছি, কেহ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছি, কেহ বিচার করিতেছি, কেহ বক্তৃতা দিতেছি, কেহ, চিকিৎসা করিতেছি, কেহ নিকাশ লইতেছি, কেহ নিকাশ দিতেছি। যে যাহাই করিতেছি, মনের ভাব যাহার যেরূপই হউক, আমাদিগের প্রত্যেককেই জানিতে হইবে যে, আমরা সকলেই স্বপ্ন দেখিতেছি, গভীর নিদ্রায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। ইহাই মহামায়ার নিদ্রা। ইহাকেই দীর্ঘ স্বপ্ন বলে। এই যে সত্য বিশ্বাসে টাকা গণিয়া আমি লোহার সিন্দুকে রাখিতেছি, প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা আমার স্বপ্নের কার্য্য। এইরূপে দিবাভাগে এক প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছি, ও রাত্রিতে অন্য প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছি। রাত্রির স্বপ্নে যাহা সত্য ভাবিয়াছিলাম, দিবার স্বপ্নে তাহা মিথ্যা ভাবিতেছি। দিবার স্বপ্নে যাহা সত্য ভাবিতেছি, রাত্রির স্বপ্নে তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছি। কি ভয়ানক ব্যাপার! কি আশ্চর্য্য ঘটনা! কিন্তু ঘটনা যতই অদ্ভুত হউক ইহা ধ্রুবসত্য সন্দেহ নাই। সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, আমরা এইক্ষণ গভীর নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিতেছি।

আমি কি? আমি কে? তাহা বুঝিতে না পারিলে এই স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে "আমি" কি পদার্থ তাহা জানি না। রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থায় যে সকল কাজ কর্ম্ম করি তাহা আমিই করি। স্বপ্নে দালান, কোঠা প্রস্তুত করি, বক্তৃতা দেই, চিকিৎসা করি সে সকল কার্য্যই আমি করিতেছি, এই বিশ্বাসে করা হয়। দিবসেও আমিই কাজকর্ম্ম করিতেছি এই বিশ্বাস বদ্ধমূল আছে। স্বপ্নাবস্থায় কখনও কখনও কাহারও কাহারও সন্দেহ হয় যে, ইহা

স্বপ্নাবস্থা কিনা? পরে স্বপ্নেই নানা প্রকার পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হয় যে, ইহা স্বপ্নাবস্থা নহে—ইহা নিশ্চিতই জাগ্রৎ অবস্থা। ফলতঃ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থার আমিই এক আমি। আমির কোন বিভিন্নতা নাই। বিভিন্নতা কেবল অবস্থার। অবস্থা কখনও আমি হইতে পারে না। আরও দেখুন, আমার দেহ আমি হইতে পারে না। দেহের একটি অঙ্গচ্ছেদন করিলে আমির কোন অঙ্গচ্ছেদন করা হয় না। দেহ আমার, আমি দেহ হইতে পারি না। এইরূপ আমি মনও হইতে পারি না। বাল্যকালে ও যৌবনে আমার যে মন ছিল, এখন বার্দ্ধক্যে আমার সে মন নাই। দিবা রাত্রি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার শরীর ও মন সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু আমি একরূপই আছি। আমি অপরিবর্ত্তনশীল। জন্মজন্মান্তরে এই অপরিবর্ত্তনশীল আমি বারংবার এই সংসারক্ষেত্রে বহুদর্শিতালাভের নিমিত্ত আসিতেছি। আমি কে পরিষ্কার বুঝিতে না পারিলে, চিরসুখ ও চিরস্বাস্থ্য কখনও হইবে না। প্রকৃত আমি মায়িক জীব নহি, মায়িক জীব একটী পৃথক্ পদার্থ। প্রকৃত আমি উক্ত মায়িক জীব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এতৎসম্বন্ধে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত জ্ঞানীদিগের এক মত। আমরা ক্ষুদ্রজীব, যদি প্রকৃত আমি ও মায়িক আমির বিভিন্নতা বুঝিতে না পারি, তাহা হইলে প্রথমতঃ তর্কবিতর্ক পরিত্যাগ করিয়া 'প্রকৃত আমি একটী ভিন্ন পদার্থ' এই বিশ্বাস অনুসারে জীবনযাপন করিতে আরম্ভ করিলে, আপনা হইতেই আমাদিগের এই সত্যের অনুভূতি জন্মিবে। যে পর্য্যন্ত এই সত্যের অনুভূতি না জন্মিবে, সে পর্য্যন্ত আমরা সত্যজীবন যাপন করিতেছি না। মিথ্যা জীবন যাপন করিতেছি। এই মিথ্যার অনিবার্য্য ফল রোগ, শোক, দুঃখ দারিদ্র্য এবং অবশেষে মৃত্যু!

জিজ্ঞাস্য এই যে সত্যজীবন কি প্রকার।

উত্তর:— সর্ব্বপ্রকার দুশ্চিন্তারহিত ভয়শূন্য, সচ্চিদানন্দ যে জীবন তাহাই সত্যজীবন। আমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ, আমি কখনও রোগ-শোকাধীন মায়িক জীব নহি। এই বিশ্বাসে থাকিতে পারিলে কখনও রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য এবং মৃত্যুদ্বারা আক্রান্ত হইতে হইবে না এই অবস্থা অতি প্রশস্ত, যাঁহারা এই অবস্থায় থাকিতে পারেন তাঁহাদিগের অন্য কোন উপদেশের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে অন্তরে যাহা বাহিরে তাহাই "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" যোগশাস্ত্রের এই

মূলমন্ত্র সর্ব্বদা ধ্যান করা আবশ্যক। পাঠক! যদি সুখ ও স্বাস্থ্য আপনার বাঞ্ছিত বিষয় হয়, তাহা হইলে তন্নিমিত্ত কিঞ্চিৎ যত্ন করিতে হইবে। উল্লিখিত যোগ সূত্রটীকে আপনার মূলমন্ত্র করিতে হইবে। আপনি ক্রোধান্বিত হইয়াছেন, চক্ষু দুইটী আরক্ত হইয়াছে, শরীর কম্পিত হইতেছে, মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না শরীরটি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করিয়াছে, শরীরের অভ্যন্তরে রক্তকণিকা সকল বিষাক্ত হইয়াছে, স্নায়ু সকল ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, প্রবল ঝটিকা দ্বারা একটি বৃক্ষের যে অবস্থা হয় আপনার শরীরটীরও সেই অবস্থা হইয়াছে, আপনি সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য নরাকৃতি পশুতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। এই প্রকার ক্রুদ্ধ অবস্থায় এক জননী তাঁহার শিশুকে স্তন্যপান করাইয়াছিলেন, শিশুর তৎক্ষণাৎ প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। পরে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছিল যে, জননীর দুগ্ধ বিষাক্ত হওয়ায় বিষপানে ঐ শিশুর প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, মনের ভাবগুলিও এক প্রকার পদার্থ। ইহাদিগের আকার আছে, রং আছে এবং ওজন আছে। ক্রোধ একটী ভিন্ন-জীব; অতিশয় বলবান্, একটী অসুর। তাহার দ্বারা আপনি আক্রান্ত হইয়াছেন। এ স্থলে যাহা অন্তরে তাহাই বাহিরে। এই যোগসূত্রের সত্যতা প্রমাণীত হইল।

আপনি একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর সহিত খেলা করিতেছেন। সে খেলিতেছে আপনিও খেলিতেছেন, সে হাসিতেছে আপনিও হাসিতেছেন। তাহার মনের সহিত আপনার মন মিশাইয়া আপনিও শিশুভাবাপন্ন হইয়াছেন। এস্থলে আপনার যে মন আছে, সেই মন শিশুর মনের সদৃশ হওয়াতে বাহিরে, আপনার মুখে শিশুর হাসির ন্যায় হাসি বিকশিত হইয়াছে। এই প্রকারে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, দ্বেষ, সন্দেহ, ভীরুতা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি মস্তিষ্কে উৎপন্ন হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ুদ্বারা সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয় এবং শরীর-যন্ত্রের অস্বাভাবিক অবস্থা উৎপন্ন করিয়া রোগ আকারে প্রকাশিত হয়। এই দুর্ঘটনা নিবারণের নিমিত্ত প্রথম উপায় এই যে আপনাকে কল্পনাশক্তির দ্বারা কাম,ক্রোধ, লোভ, মোহাদি বিবর্জ্জিত একটি সুস্থ, বলিষ্ঠ যুবকদেহ নির্ম্মিত করিতে হইবে। কল্পনাশক্তিদ্বারা আপনি যথাসাধ্য প্রতিনিয়ত ঐ কাল্পনিক দেহ দেখিবেন, এবং আপনিই যেন ঐ দেবদেহ বলিষ্ঠ মানব এইরূপ চিন্তা করিবেন।

যদি কল্পনাশক্তিদ্বারা এই প্রকার দেহ নির্ম্মিত করিতে পারিতেছেন না মনে করেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, অর্জ্জুন, রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি কোনও আদর্শ

দেবদেবের ছবি আপনার গৃহে রাখিয়া, সেই-মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে তদ্ভাবাপন্ন হওয়ার চেষ্টা করিবেন। যদি তাহাও না পারেন তাহা হইলে শব্দশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিবেন। এতৎসম্বন্ধে পৃথক্‌রূপে বিস্তারিত ও বিশদব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শব্দশক্তির সাহায্য গ্রহণ।—শব্দশক্তি ও মন্ত্র প্রায় একই কথা। যদিও সকল শব্দেরই শক্তি আছে, তথাপি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যজনক শক্তিসম্পন্ন শব্দকেই সাধারণতঃ মন্ত্র বলে। এই পৃথিবীতে ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে যে ব্রাহ্মণ জাতি ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা নানাবিধ বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রের উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা ঋষিনামে খ্যাত ছিলেন। ঋষিদিগের প্রাচীন গ্রন্থ সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, নানাবিধ বিজ্ঞানের সমালোচনা করিয়া ঋষিগণ যে সকল সত্য আবিষ্কৃত করিতেন সেই সকল সত্যের উপরেই ভারতবর্ষের সামাজিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইত। সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর প্রত্যেক লোকের পক্ষে বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারণ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব বিধায়, বিজ্ঞানকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া সমাজ শাসনের নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণীত হইত। ইয়ুরোপে যেরূপ বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র স্মরণাতীত কাল হইতে পরস্পর বিরুদ্ধভাবে মানব-হৃদয়ে আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াস পাইতেছে, ভারতবর্ষে সেরূপ ছিল না। তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন যে, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। এই তিনগুণ পৃথক্ পৃথক্ নহে। সর্ব্বদাই ন্যূনাধিকরূপে একত্র জড়িত। এই তিনগুণ মনোময় পদার্থ। ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতম পদার্থও এই তিন গুণ দ্বারা নির্ম্মিত। প্রত্যেক সূক্ষ্মতম পদার্থেরই এক একটী মন আছে এবং সূক্ষ্মতম পদার্থ সকলের যে পৃথক্ পৃথক্ সমষ্টি তাহার প্রত্যেক সমষ্টিরই পৃথক্ পৃথক্ মন আছে। সূর্য্যরশ্মি সকলেরও মন আছে; এবং সূর্য্যমণ্ডলেরও একটী মন আছে। এই মনই সূর্য্য দেবতা। এই সূর্য্য দেবতাকে আমরা সম্বোধন করিতে পারি; ইঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে পারি, ইহাঁর পূজা করিতে পারি। ইনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগের রোগ আরোগ্য করিতে পারেন। এই সকল কার্য্য সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। ইহাতে অবৈজ্ঞানিক কিছুই নাই। আধুনিক শিক্ষা—সূর্য্য একটী জড় পদার্থ, তাহার মন নাই। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। ফলতঃ প্রত্যেক এই উপগ্রহেরই মন আছে। সূর্য্য হইতে যে রশ্মি বাহির হইতেছে এই রশ্মিই জগতের প্রাণ। বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, নর,

নারী, সকলেই এই সূর্য্যরশ্মি হইতে অক্সিজেন নামক বায়ুযোগে প্রাণনামক পদার্থ গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। একথা একটী পঞ্চম বর্ষীয় শিশুকেও বুঝান যায় না। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা বলিলেন, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সকলেরই সূর্য্যদেবতাকে নমস্কার করা উচিত এবং তন্নিমিত্ত সূর্য্য নমস্কারের শক্তি-যুক্ত শব্দ অর্থাৎ মন্ত্র রচিত হইল। এক ব্যক্তির মন এই দেহ পরিত্যাগ করিল। দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল। মন সর্ব্বপ্রকার বাসনার সহিত যেমন ছিল তেমনই রহিল। মন যে মরে না এবং সাধারণতঃ দেহবিনির্মুক্ত মনের কি উপায়ে শক্তিলাভ হইতে পারে বিজ্ঞান তাহা আবিষ্কার করিলেন। বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত তদনুসারে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। মৃত আত্মার পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে যে সকল শব্দ শক্তিযুক্ত করিয়া ঋষিগণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন সেই সকল শব্দশক্তিই শ্রাদ্ধের মন্ত্র। ঋষিদিগের সময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল; কালচক্রে সেই সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বলিতে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয় আমরাও সেই ভারত-সন্তান। অনেকে সেই ঋষিদিগেরই সন্তান। কিন্তু মন্ত্রের প্রতি এইক্ষণ অনেকেরই আস্থা নাই। আমরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া আধুনিক জড় বিজ্ঞানের শিক্ষালাভ করত উপাধিগ্রহণ পূর্ব্বক নিজ জীবনকে ধন্য মনে করিতেছি। বালক পিতৃদত্ত স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের বিনিময়ে কাচখণ্ড পাইয়া উল্লসিত হইতেছে। "কাচমূল্যেন বিক্রতোহস্তচিন্তামণির্ময়া"।

শব্দশক্তি অর্থাৎ মন্ত্র কি তাহা বুঝিতে হইলে শব্দের উৎপত্তি কোন্ স্থান হইতে হইয়াছে এবং মানবশরীরের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। এই দৃশ্যমান জগৎ প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে মানবচক্ষুর অদৃশ্য ভাবে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোমের সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে ইহাদের প্রত্যেকটীর অর্দ্ধাংশ ও অবশিষ্ট চারিটীর এক অষ্টমাংশ করিয়া অর্দ্ধাংশ মিশ্রিত হইয়া বর্ত্তমান পরিদৃশ্যমান ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের সৃষ্টি হইয়াছে। শাস্ত্রে ইহাদিগকে পঞ্চতত্ত্ব বলে। সৃষ্টির প্রণালী অনুসারে ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ্, ক্ষিতি বলাই সঙ্গত। কিন্তু সাধারণতঃ লোকে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম বলে। সেই নিমিত্ত আমিও সেই প্রথা অবলম্বন করিলাম। ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবী, অপ্ জল, তেজ অগ্নি, মরুৎ বায়ু, ব্যোম আকাশ। ক্ষিতির গুণ আকর্ষণ, অপের গুণ সঙ্কোচন, তেজের গুণ প্রসারণ, মরুতের গুণ গমন, ব্যোমের গুণ অন্তরীক্ষ (space)। আমরা ইন্দ্রিয়-দ্বারা ক্ষিতি হইতে ঘ্রাণ, অপ্ হইতে স্বাদ, তেজ হইতে দৃষ্টি, বায়ু হইতে স্পর্শ,

এবং ব্যোম হইতে শব্দ অনুভব করি। এই তত্ত্বসকলের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ আকার ও রং আছে। নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় এস্থলে তাহার উল্লেখ করা গেল না। পাঠক! দেখুন শব্দ অনন্ত আকাশের গুণ। ইহা কোন তুচ্ছ পদার্থ নহে। পঞ্চতত্ত্বের প্রথম তত্ত্বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণ শব্দ। মনের সহিত শব্দের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দূরস্থ কোন ব্যক্তিকে শব্দ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া আপনি নিকটস্থ করিলেন। নিকটস্থ কোন ব্যক্তিকে শব্দ দ্বারা বিকর্ষণ করিয়া দূরস্থ করিলেন।

অন্তরীক্ষে (Space) নানাপ্রকার অসংখ্যভাব (Thought) সর্ব্বদা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। এই সকল ভাবের (Thought) সাধারণ ধর্ম এই যে প্রত্যেক ভাব তাহার সমগুণবিশিষ্ট ভাবকে আকর্ষণ করে। (Like attracts like is an occult truth). আপনি শব্দ উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন, "আমি অত্যন্ত বলবান্, আমি বলিষ্ঠ, আমিই শক্তি, আমিই বল, আমার শক্তির সীমা নাই। আমি হস্তীসম বলশালী, বল, বল, বল, শক্তি, শক্তি," এই ভাবে শরীরের সমস্ত অঙ্গকে শক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করিলেন। উৎকট একাগ্রতা দ্বারা আমিই স্বাস্থ্য, আমিই শক্তি, আমিই সুখ এই প্রকার শব্দ বারম্বার উচ্চারণ করিলে অন্তরীক্ষে যে স্বাস্থ্য, শক্তি ও সুখের ভাব সকল (Thoughts) নিয়ত বিচরণ করিতেছে তাহারা শব্দ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার মনে তাহাদিগের সদৃশ যে ভাব আছে সেই সকল ভাবের সহিত মিলিত হইয়া আপনার ভাবগুলিকে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিবে। পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতিপাদ এই নিয়মের অর্থাৎ সদৃশ ভাব দ্বারা সদৃশভাব আকৃষ্ট হয় এই নিয়মের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বিভূতিপাদের পঁচিশ সূত্র, "বলেষু হস্তিবলাদীনি" ও চব্বিশ সূত্র "মৈত্র্যাদিষু বলানি"। বলেষু হস্তীবলাদীনি অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূতের শক্তিকে ও হস্তী প্রভৃতি বলশালী জীবদিগের শক্তি উৎকট একাগ্রতাদ্বারা আকর্ষণ করিয়া চিত্তকে তন্ময় করত অনির্ব্বচনীয় বলশালী হওয়া যায়। এবং মৈত্র্যাদিষু বলানি অর্থাৎ মিত্রতা, দয়া প্রভৃতি গুণ উৎকট একাগ্রতদ্বারা আকর্ষণ করিয়া মনে সেই সকল গুণ উৎপন্ন করা যায়।

উল্লিখিত সূত্র দুইটী পতঞ্জলি মুনীর মস্তিষ্কবিকৃতির চিহ্ন নহে। ইহা সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমরা বলকারক পেটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপন পাঠে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া বহু অর্থ ব্যয় করত বহু পেটেণ্ট ঔষধ সেবন করিতেছি। তাহার ফলে

স্নায়ুসকল অস্বাভাবিক ভাবে উত্তেজিত হইয়া পরে প্রতিক্রিয়া (Reaction) দ্বারা অধিকাংশ স্থলে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হইবে। কিন্তু শব্দশক্তি দ্বারা শক্তি আকর্ষণ করিলে শক্তি উৎপন্ন হইবে তাহার প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ বিপরীত ক্রিয়ার আশঙ্কা থাকিবে না। ইহা বলা বাহুল্য যে, মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও শব্দশক্তির কার্য্য অব্যাহত থাকে। অন্তরীক্ষে যে স্বাস্থ্য সুখ ও বল ভাবরূপে আমাদিগের সমক্ষে বিচরণ করিতেছে। ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া হস্তদ্বারা কোন বাহ্যবস্তুকে আকর্ষণ করিয়া সন্নিকটস্থ করার ন্যায় মন্ত্র দ্বারা উৎকট একাগ্রতার সহিত আকর্ষণ করিলেই ঐ সকল ভাব মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু (Nerve) দ্বারা সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হইবে।

শব্দের যে মনের সহিত এবং মনের যে শরীরের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহা প্রত্যক্ষ। আষাঢ় মাসের প্রবন্ধে লিখিয়াছি জগতের সকলই মন। মন ব্যতীত জগতে আর কোন পদার্থ নাই। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণের দ্বারাই জড় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং আমরা ভ্রান্তিবশতঃ যাহাকে জড় পদার্থ মনে করি তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে মানসিক পদার্থ, অতএব জড়পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া একাগ্রচিত্তে শক্তিসম্পন্ন শব্দের উচ্চারণ করিলে সেই জড়পদার্থের উপর ঐ শব্দ অবশ্য কার্য্যকরী হইবে। শরীরযন্ত্রস্থ প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ মন আছে। শব্দ দ্বারা তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিলে তাহারা সেই উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। যোগিগণ শব্দের এই শক্তি অবগত হইয়া মানসিক চিকিৎসার আবিষ্কার করিয়াছেন। আমেরিকাতে এই চিকিৎসা-প্রণালী বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় যোগিগণও এই প্রণালী পূর্ব্ব হইতে অবগত আছেন। এই প্রণালীর উপরেই জলপড়া ও নানাবিধ যন্ত্রাদি প্রতিষ্ঠিত আছে। শব্দের শক্তি অনিবার্য্য। কিন্তু উচ্চারণকারীর একাগ্রতা আবশ্যক। আপনি যদি শান্তভাবে একাগ্রচিত্তে বিশ্বাসের সহিত বারংবার বলেন, "আমি সুস্থ, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, আমার রোগ হইতে পারে না, আমি সচ্চিদানন্দ পদার্থ, শরীর আমি নহি" তাহা হইলে ক্রমশঃ আপনার দেহ রোগমুক্ত হইয়া যাইবে এবং সুস্থদেহ থাকিলে রোগ প্রবেশের সুযোগ পাইবে না। যদি বিশ্বাসের অভাব এবং সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহা হইলে ফল হইবে না। আপনি যে ঔষধ সেবনে আরোগ্য লাভ করেন সে আরোগ্যের মূলকারণ আপনার বিশ্বাস। আপনি সংসারে নানাপ্রকার রোগ শোক ও দুঃখ দারিদ্র্য-

দ্বারা বিজড়িত আছেন। আপনি প্রতিমুহূর্ত্তে যে অবস্থা প্রস্তুত করিতেছেন সেই অবস্থাপন্ন হইতেছেন। কল্পনা করিয়া বারংবার অসন্দিগ্ধচিত্তে যে অবস্থাব্যঞ্জক শব্দ উচ্চারণ করিবেন ক্রমশঃ আপনার সেইরূপ কাল্পনিক অবস্থা প্রকৃত অবস্থাতে পরিণত হইবে।

এই প্রবন্ধ কোন উপন্যাস নহে। প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই এই সত্য সীমাবদ্ধ আছে। তাঁহারা এই মতানুসারে কার্য্য করিয়া চিরকাল ফল পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। ব্যাপার অতি কঠিন নহে। আপনার পৃষ্ঠদেশে বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। আপনি অসুস্থ। আপনি কিরূপে বলিবেন আপনার বেদনা নাই ও আপনি সুস্থ আছেন? উত্তর:—অসত্য বিষয়ও কল্পনা করা যায়। সুতরাং বেদনার অভাব ও সুস্থতা কল্পনা করা সাধ্যাতীত নহে। যদি এই প্রকার অসত্য কল্পনাতে আপত্তি থাকে তাহা হইলে বলিতেছি প্রকৃত প্রস্তাবে আপনি এক পৃথক্ পদার্থ। দেহ আপনা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রোগ দেহের। আপনার কোন রোগ হইতে পারে না। সুতরাং এই প্রকার বাক্য উচ্চারণ দ্বারা অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। "ফলেন পরিচীয়তে"। কার্য্য করিয়া দেখুন। ফল দৃষ্টে অবাক্ হইবেন। ১০০০০০ একলক্ষ ডাইলিউসনের এক বিন্দু হোমিওপ্যাথিক ঔষধে একটি জটিল রোগ আরোগ্য হইতে পারে, ৫০ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইহা অনেকেই অবিশ্বাস করিতেন। এইক্ষণ ফলদৃষ্টে বিশ্বাস করিতেছেন। এখন আর সেরে সেরে ঔষধ ভক্ষণের প্রথা নাই। হোমিওপ্যাথিক অপেক্ষা শব্দশক্তি সূক্ষ্ম; এতদ্দ্বারা তদপেক্ষা অনন্তগুণে ফল হইবে। কবিরাজি ও এলোপ্যাথিক ঔষধ পঞ্চভূতের উপর স্থূলভাবে কার্য্য করে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ স্থূলভূতের সূক্ষ্মকারণ পঞ্চতন্মাত্রের উপর সূক্ষ্মভাবে কার্য্য করে। মন্ত্র প্রকৃতির উপর সূক্ষ্মতমরূপে কার্য্যকরী হয়। স্থূল বিকাশের মূল কারণের উপর কার্য্য করিলে তাহা অবশ্যই স্থূলবিকাশে অর্থাৎ বাহ্যজগতে কার্য্যকরী হইবে। প্রকৃতিতে সকল শক্তি, সকল অবস্থা, সকল পদার্থ সকল ভাবই গূঢ়ভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারিলে অসম্ভবও সম্ভব হয়। শীঘ্রই জগতের পরিবর্ত্তন হইবে। মানবশক্তি অনন্ত। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে উন্নতি হইয়াছে তাহা অনন্ত উন্নতির আরম্ভ মাত্র। উন্নতির শেষ হয় নাই। রেলগাড়ী, ষ্টীমার, এরোপ্লেন, টেলিগ্রাফ, তারবহীন টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতি এইক্ষণ যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে, সন্নিহিত ভবিষ্যতে এ সকল এতদপেক্ষা অল্পব্যয়ে

ও সহজে অধিকতর কার্য্যকরী হইবে। কে বলিতে পারে যে মনুষ্য কোনও যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিতে পারিবে না? কে বলিতে পারে যে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম ও বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, সকলেই মনুষ্যের আজ্ঞাধীন হইবে না? কে বলিবে যে রেলের গাড়ী ভবিষ্যতে কেবল ইচ্ছাশক্তিদ্বারা মনুষ্যের আজ্ঞানুসারে পরিচালিত হইবে না? এই পৃথিবীতে এখনও অতি অল্পসংখ্যক ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ কোন কোন স্থানে বিচরণ করিতেছেন। কাশীধামে সাহেব সন্ন্যাসী নামে এক মহাপুরুষ ছিলেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রবন্ধ-লেখকের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার দর্শন লাভ হইয়াছিল। মহাপুরুষ দয়াপরবশ হইয়া অন্যূন তিন ঘণ্টা এই প্রবন্ধ-লেখককে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং কয়েকটি ভবিষ্যৎ কথা বলিয়াছিলেন। তাহা সম্পূর্ণ ফলবতী হইয়াছে। এই সাহেব সন্ন্যাসী সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে পাঞ্জাবে কর্ণেল ছিলেন। অদূর ভবিষ্যতে বসুন্ধরা নূতন আকৃতি ধারণ করিবেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহার পূর্ব্বলক্ষণ প্রকাশিত হইতেছে।

আমাদিগের দেশে জ্যোতিষিগণ ও তান্ত্রিকগণ নানাবিধ মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া রোগ আরোগ্য করিতেছেন। এখনও শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। এই সকল প্রণালী সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। মনোময় জগতের উপরে মন্ত্র অর্থাৎ মানসিক ভাবযুক্ত শব্দশক্তিদ্বারা পূর্ব্বকালে ঋষিগণ যে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন আমরাও এইক্ষণ তাহা কেন পারিব না? প্রকৃতির অখণ্ডনীয় নিয়ম কি কলিযুগে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে? প্রকৃতির, আমাদের মত, কোন নীতিজ্ঞান নাই। প্রকৃতি কোন ভালমন্দ বুঝেন না। বহুদর্শিতাবিহীন শিশু কিংবা বহুদর্শী বৃদ্ধ আগুনে হাত দিলে উভয়ের হাতই সমভাবে দগ্ধ হইবে। বাজারে আগুন লাগিয়াছে, বহুলোকের বহু অনিষ্ট হইতেছে, কোন দয়ালু সাহসী পুরুষ আত্মরক্ষার সঙ্কুচিত ভাব বিস্মৃত হইয়া সেই অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার বহুচেষ্টা করিলেন। জ্বলন্ত অগ্নির তাপে তাঁহার শরীরের অনেক স্থান দগ্ধ হইয়া গেল। অগ্নি, দয়ালু পুরুষের শরীর রক্ষা করিলেন না। প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে না পারিলে প্রকৃতি বশীভূত হইবে না।

বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে ভারতসন্তানগণের এক্ষণ শব্দশক্তির প্রতি সেরূপ আস্থা নাই। ক্রমোন্নতির নিয়ম অনুসারে পুনর্ব্বার সেই আস্থা অবশ্যই হইবে। এখন পৃথিবীর একটী পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র পাঠে

অনেকের ঔৎসুক্য দেখা যায়। দিন দিন গীতার নানাপ্রকার ব্যাখ্যা বাহির হইতেছে। অতি গোপনীয় তন্ত্রশাস্ত্র ইংরেজীভাষাতে অনুবাদিত হইয়াছে। পৃথিবীর সৃষ্টি কাল হইতে ভারতবর্ষই জ্ঞানালোকদ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করিয়াছিলেন। এইক্ষণ পুনর্ব্বার ভারতবর্ষেই জ্ঞানসূর্য্য উদিত হইতেছে। "সুখ ও স্বাস্থ্য" প্রবন্ধ উপন্যাসের ন্যায় পাঠ করিলে নিশ্চিতই কোন উপকার হইবে না। আমরা মনে করি সকলেই সকল বিষয় জানি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেহই কোন বিষয় জানি না। যাঁহারা জানেন, তাঁহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প। মনে মনে বারংবার এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়া জীবন পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। একটী নূতন জীবন গঠিত করিতে হইবে। পূর্ব্ব অভ্যাস অনুযায়ী আচরণ করিলে, অসুখ ও অস্বাস্থ্য পূর্ব্ববৎই বর্ত্তমান থাকিবে। পাঠক! বিশ্বাসপূর্ব্বক আমি সুখী, আমি সুস্থ, এই মর্ম্মের শব্দ সকল প্রাতে ও রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে বারংবার উচ্চারণ করিবেন, এবং যথাসাধ্য আপনাকে সুখী ও সুস্থ কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত প্রকৃতির প্রতি, বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, ফল কি হয়। মূল্যদ্বারা কত পেটেণ্ট ঔষধ সেবন করিয়া ক্ষণস্থায়ী আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, কতবার আরোগ্যলাভ করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিদিগের এই বিনামূল্যের পেটেণ্ট সেবন করিয়া দেখুন, নিশ্চিত আপনি এক নূতন জীবন লাভ করিয়া উৎসাহিত চিত্তে জীবনযাপন করিতে পারিবেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রাচীন ঋষিদিগের মতানুযায়ী আচরণ করিলে অবশ্যই চিরসুখ ও চিরস্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিব।

যে পঞ্চভূত দ্বারা শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে তাহাদিগের উপযুক্ত পরিপোষণ দ্বারা শরীর অনন্তকাল স্থায়ী হওয়া অসম্ভবপর নহে। মানব দেহ একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডে যেরূপ চন্দ্র, সূর্য্য, নদী, পর্ব্বত, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি আছে, মানব-দেহেও সেইরূপ সংক্ষিপ্তভাবে ঐ সকল পদার্থ আছে। মানব-দেহটী সুস্থ রাখিতে হইলে তত্ত্বগুলিকেও সমভাবে রাখিতে হইবে। শরীরে কোন তত্ত্বের আধিক্য ও কোন তত্ত্বের ন্যূনতা জন্মিলে উক্ত হ্রাসবৃদ্ধি সাম্যের নিমিত্ত শরীরের যে স্বাভাবিক চেষ্টা তাহাকে আমরা রোগ বলি। প্রকৃত প্রস্তাবে শরীর সুস্থ রাখার নিমিত্ত শরীরের যে স্বাভাবিক চেষ্টা তাহাকে হিতকারী ব্যতীত অহিতকারী বলা যায় না। এই সকল বিষয় পাঠকগণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। এই প্রবন্ধ উপসংহারের পূর্ব্বে

পৃথ্বীতত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

এ দেশে ভদ্রলোকদিগের সর্ব্বদা জুতা ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত আছে। কাছারী, আফিস, স্কুল, কলেজ, প্রভৃতি স্থলে জুতা ব্যবহার করা উচিত কিনা তাহার মীমাংসা করা এই প্রবন্ধ লেখকের উদ্দেশ্য নহে। গ্রামে কিংবা নগরের বাহিরে কিংবা নিজ বাড়ীতে যে যে অবস্থাতে জুতা ব্যবহার না করিলেও চলিতে পারে, সেই সেই অবস্থায় জুতা ব্যবহার করা নিতান্ত অপরিদর্শিতা ও ভারুতার কার্য্য। জুতাদ্বারা পায়ের সমস্ত স্থলে স্বাধীনভাবে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত জন্মে। খালি পায়ে মাটীর উপর হাটিলে মাটীর রস শরীরে প্রবেশ করিয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে। বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সমস্ত উদ্ভিজ্জ-রাজ্য মৃত্তিকা হইতে জীবনীশক্তি আকর্ষণ করিয়া, পৃথ্বীতত্ত্বে যে জীবনীশক্তি নিহিত আছে তদ্দ্বারা তাহাদিগের শরীর পোষণ করে। খালিপায়ে মাটীর উপর বেড়াইলে আমরা উক্ত জীবনীশক্তি আকর্ষণ করিতে পারি। ইষ্টকনির্ম্মিত রাস্তায় ও দালানে খালি পায়ে বেড়াইলেও সে ফল হইবে না। শরীরে মৃত্তিকালেপনদ্বারাও অত্যন্ত উপকার হয়। অনেক রুগ্ন ব্যক্তি মৃত্তিকালেপন দ্বারা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। মল্লদিগের মধ্যে শরীরে গুঁড়া মাটী মর্দ্দন করার প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান আছে। অন্যান্য তত্ত্বের সহিত শরীরের সম্বন্ধ আলোচনা করিলে এই প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে।

শ্রীরজনীকান্ত ঘটক চৌধুরী।

অনুভূতি।

নয়ন হেরেনি কভু তা'রে
শুধু যেন তা'র কথা শুনেছিনু কারু কাছে;
এ শূন্য হিয়ার মাঝে, তাই কেন আজ
বেজে ওঠে ছিন্ন বীণা-তারে?
কি সঙ্কেত বিনি-সুত-হারে!

কেন আজ শরীর শিহরে?
পরাণে পুলকে আনি' স্মৃতি কে জাগা'লে আজি?
প্রকৃতির পুষ্পসাজি কি সুবাসে ভরি'!
বাসন্তী গরিমা ধরা'-পরে!
আকুল হৃদয় কা'র তরে?
জানি নাই ভালবাসা তা'র
ক'দিন গোপনে মোরে পাঠা'য়েছে কত দান—
সে আশিস্ (তা'র) সে কল্যাণ! আমার পরাণ
যাচেনি বারতা কভু যা'র
আজি হৃদে তা'র অধিকার!

শ্রীশশধর মৈত্র বি, এ,

আত্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এক্ষণে পরিপূর্ণ ব্রহ্মের সহিত সেই জীবের অভেদ প্রতিপাদন করিবার জন্ম, প্রথমে ভেদদর্শন বিষয়ে অবিদ্যার ব্যাপ্যতা নিরূপণ করা যাইতেছে। "হে মৈত্রেয়ি! এই আনন্দস্বরূপ স্বয়ং জ্যোতিঃ আত্মা-বিষয়ে বাস্তবিক এই দ্বৈত প্রপঞ্চ কখনও নাই। এরূপ অদ্বিতীয় আত্মা-বিষয়ে যে জীবের দ্বৈত-প্রপঞ্চ প্রতীত হয় তাহা, যেরূপ নেত্র-দোষবশতঃ মূঢ় বালকের আকাশে দুই চন্দ্র প্রতীত হয়। সেইরূপ অবিদ্যা-দোষবশতঃ অজ্ঞানী জীবের অদ্বিতীয় আত্মা বিষয়ে এই দ্বৈত-প্রপঞ্চ প্রতীত হইয়া থাকে। এই কারণে এই সম্পূর্ণ দ্বৈত-প্রপঞ্চ মায়ামাত্র। হে মৈত্রেয়ি! এরূপ আত্মার অদ্বিতীয়স্বরূপ যে সময়ে দ্বৈত প্রপঞ্চের ন্যায় পতীত হইবে, সেই সময়ে এই অজ্ঞানী জীব আপনাকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন রূপে দেখিবে; এবং বিশ্ব তৈজস প্রাজ্ঞ ইত্যাদি অনেক ভেদ-বিশিষ্ট আপনাকে দেখিবে শব্দ, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি সম্পূর্ণ জগৎকে এই অজ্ঞানী জীব শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখিতে থাকিবে।" এই পর্য্যন্ত অবিদ্যা বিদ্যমান থাকিলে দ্বৈত দর্শনের বিদ্যমানতা রূপ অন্বয় নিরূপণ করা গেল। এক্ষণে অবিদ্যার অভাব হইলে দ্বৈত দর্শনের অভাব রূপ

'ব্যতিরেক' নিরূপণ করা যাইতেছে। "হে মৈত্রেয়ি! এই অধিকারী পুরুষের যখন গুরু ও শাস্ত্র উপদেশ দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞান হইবে, তখন সেই অধিকারী পুরুষের মায়া রূপ অজ্ঞান নাশ হইয়া যাইবে। সেই অজ্ঞানরূপ কারণের নাশ হইয়া গেলে পর স্থাবর জঙ্গম শরীর এবং শব্দাদি বিষয় সহিত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় এবং সুখদুঃখাদির সহিত অন্তঃকরণ ইত্যাদি সম্পূর্ণ কার্য্য-প্রপঞ্চ লয়ভাব প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে সম্পূর্ণ কার্য্যপ্রপঞ্চ সহিত অজ্ঞান নাশ হইলে পর পরিশেষে স্বয়ং জ্যোতি আনন্দস্বরূপ আত্মাই অবশিষ্ট থাকিবেন। তবে তখনও যে সেই জ্ঞানী মনুষ্য দ্বৈতের ন্যায় দেখেন, তাহা কেবল মরুস্থলে মরীচিকার ন্যায় সোপাধিক ভ্রমমাত্র। "এই সম্মুখবর্ত্তী মরু-ভূমিতে জল নাই" ইহা দর্শকের জ্ঞান হইলেও, যতক্ষণ বালুকার উপর প্রখর সূর্য্যকিরণ পড়িবে ততক্ষণ জল প্রতীত হইবে বটে; কিন্তু তাহাতে তিনি প্রলোভিত হইবেন না অথবা জলপান করিতে তদভিমুখে ধাবিত হইবেন না; অথবা যেরূপ সূর্য্যতাপে দগ্ধ বীজ অঙ্কুর উৎপাদন করে না, অথবা যেরূপ রজ্জু দগ্ধ হইলে তাহার অচালিত ভস্মরাশি রজ্জুর ন্যায় দেখায় বটে কিন্তু তাহাতে মত্ত মাতঙ্গকে বদ্ধ করা যায় না, সেইরূপ এই জ্ঞানী মনুষ্য নিখিল প্রপঞ্চ কল্পিতরূপে অবলোকন করিলেও তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হন না, তাহাতে আবদ্ধ হন না কিংবা এরূপ মনে করেন না যে উহা তাঁহার প্রকৃত সুখের সাধন। এজন্য শ্রুতি ভগবতী কহিয়াছেন "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে" "প্রারব্ধান্তে বিশ্বমায়া নিবৃত্তিঃ"; অর্থাৎ মৃত্যুর পর তাঁহার কৈবল্য মুক্তি অনিবার্য্য। হে মৈত্রেয়ি! এরূপ মোক্ষ অবস্থাসম্প্রাপ্ত এই বিদ্বান্ পুরুষ সমস্ত জগৎকে আপনার আত্মা রূপই দেখিবেন। অতএব সেই মোক্ষ অবস্থায় এই বিদ্বান্ পুরুষ আপনা হইতে ভিন্ন রূপে নেত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপাদি পদার্থ দেখেন না এবং রূপাদি পদার্থ দর্শন হইতেও যে আবরণ নিবৃত্তি রূপ ফল হয়, সেই ফলও পূর্ব্বে আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে মোক্ষ অবস্থায় আবরণনিবৃত্তিরূপ ফলও হয় না; কারণ আত্মার আবরণই নাই, তবে আবার নিবৃত্তি কি? হে মৈত্রেয়ি! "মামহং ন জানামি" এই জ্ঞান মায়াময়; সুতরাং আত্মায় যে আবরণ প্রতীতি হয় তাহা মিথ্যাকল্পিত; আত্মাই তাহার কল্পক। যেরূপ বাজীকরের কল্পনাতে যে ইন্দ্রজাল প্রদর্শিত হয় তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, তদ্দ্বারা সে নিজে মুগ্ধ বা বিকৃত বা আবরিত হয় না। কারণ সে জানে যে, সে যাহা দেখাইতেছে

এবং যদ্দ্বারা দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিতেছে তাহা কেবল মিথ্যা কৌশল মাত্র।

শঙ্কা।—হে ভগবন্! সেই মোক্ষ অবস্থায় এই বিদ্বান্ পুরুষ আপনা হইতে ভিন্ন রূপে জগৎকে নাই দেখুন্, পরন্তু সেই বিদ্বান্ পুরুষ মোক্ষ অবস্থায় আপনার আত্মাকে কেন না দেখিতে পায়?

সমাধান।—হে মৈত্রেয়ি! যে অবিদ্যা কালে এইআত্মাদেব দ্বৈতের ন্যায় প্রতীত হন, সেই অবিদ্যাকালেও এই স্বয়ং-জ্যোতি আত্মা কোন জ্ঞানের বিষয় হন না। যখন অবিদ্যা কালে ও এই স্বয়ং-জ্যোতি আত্মা কোন জ্ঞানের বিষয় না, তখন মোক্ষ অবস্থায় সর্ব্বদ্বৈত প্রপঞ্চের অভাব হইলে এই স্বয়ং জ্যোতি আত্মা কোন জ্ঞানের বিষয় হইবেন না, এ বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে? চক্ষু সমস্ত বাহ্যপ্রপঞ্চ পরিদর্শন করে সত্য, কিন্তু স্বয়ং তন্নিষ্ঠ অতিশয় সন্নিকটবর্ত্তী চক্ষু ইন্দ্রিয়কে দেখিতে পায় না। এক্ষণে এই অর্থ স্পষ্টরূপে নিরূপণ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! আপনার স্বপ্রকাশ রূপে সর্ব্ব জগৎকে যে বিজ্ঞাতা আত্মা জানেন, "সেই বিজ্ঞাতা অদ্বিতীয় আত্মাকে আমি জানি," এই প্রকার বচন যে ব্যক্তি বলে সেই মূঢ় পুরুষকে এই জিজ্ঞাসা করা উচিত "যে ইহলোকে যে জীবের যে যে পদার্থের যেরূপ যেরূপ জ্ঞান হয় সেই জ্ঞান কোন নেত্রাদি করণ দ্বারাই জন্মিয়া থাকে। নেত্রাদি ইন্দ্রিয় বিনা কোনও জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সুতরাং অদ্বিতীয় আত্মাকে বিষয় করিতে সমর্থ যে তোমার জ্ঞান হইয়াছে সেই জ্ঞান কোন্ করণ দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তর তুমি আমাকে বল"। তথায় সেই বাদী যদি মূর্ত্ত অমূর্ত্ত রূপ জগৎকে এবং সেই জগতের অভাবকে আত্মজ্ঞান বিষয়ে করণ মানেন তাহা সম্ভব নহে। কারণ অবিদ্যারহিত সেই শুদ্ধ আত্মাতে মূর্ত্ত অমূর্ত্ত জগৎ এবং সেই জগতের অভাব বাস্তবিক নাই। সুতরাং এই স্বয়ং জ্যোতি আত্মাদেব মন বুদ্ধি আদি অন্তঃকরণ দ্বারা এবং নেত্রাদি বাহ্য করণ দ্বারা গ্রহণ করা যাইবে না। কিংবা, ইহলোকে যে যে পদার্থ ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের বিষয় হইবে সেই সেই পদার্থ ক্রমে ক্রমে আপনার অবয়বের শিথিলতা রূপ শীর্য্যতা অবশ্য প্রাপ্ত হইবে। যেরূপ ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের বিষয় যে বস্ত্রাদি পদার্থ, তাহা ক্রমে ক্রমে শীর্য্যতা প্রাপ্ত অবশ্য হইবে। কিন্তু এই আনন্দস্বরূপ আত্মা অশীর্য্য। ইহা বেদে নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং এই আত্মাদেব কোনও ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের বিষয় নহে। আর হে মৈত্রেয়ি! ইহ লোকে যে যে পদার্থ শীর্য্যতা

প্রাপ্ত হইবে সেই সেই পদার্থ সংযোগাদি সম্বন্ধ রূপ সঙ্গবিশিষ্ট। যেরূপ বস্ত্রাদি পদার্থ শীর্ণ্যতাধর্ম্মসম্পন্ন সুতরাং সেই বস্ত্রাদি পদার্থ জলাদি পদার্থের সঙ্গ-বিশিষ্ট। কিন্তু এই স্বয়ং জ্যোতি আত্মা সংযোগাদি সম্বন্ধরূপ সর্ব্ব সঙ্গরহিত। সুতরাং এই আত্মাদেব শীর্য্যতা প্রাপ্ত হইবেন না। আর হে মৈত্রিয়ি! ইহলোকে যে যে পদার্থ সংযোগাদি রূপ সঙ্গবিশিষ্ট হইবে সেই সেই পদার্থ ভয়বিশিষ্টও অবশ্যই হইবে। যেরূপ এই মনুষ্যাদি শরীর সংযোগাদি রূপ সঙ্গবিশিষ্ট; সুতরাং এই মনুষ্যাদি শরীর সিংহ সর্পাদি হইতে ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আর এই আত্মাদেব সর্ব্বভয় রহিত, সুতরাং এই আত্মাদেব কোন পদার্থের সঙ্গবিশিষ্টও নহে। আর হে মৈত্রেয়ি! ইহলোকে যে যে পদার্থ ভয়সম্পন্ন হইবে সেই সেই পদার্থ ব্যথাযুক্তও হইবে। যেরূপ মনুষ্যাদি শরীর ভয়-সম্পন্ন সুতরাং এই মনুষ্যাদি শরীর ব্যথাযুক্তও বটে। কিন্তু এই আনন্দ স্বরূপ আত্মা সর্ব্ব ব্যথা-রহিত, সুতরাং এই আত্মাদেব ভয়রহিত। আর হে মৈত্রেয়ি! ইহলোকে যে যে পদার্থ ব্যথাযুক্ত সেই সেই পদার্থ বিনাশের কারণযুক্ত। যেরূপ এই মনুষ্যাদি শরীর ব্যথাযুক্ত, সুতরাং এই মনুষ্যাদি শরীর বিনাশেরও কারণযুক্ত। কিন্তু এই আত্মাদেব বিনাশের কারণরহিত, সুতরাং এই আত্মাদেব ব্যথা হইতেও রহিত। তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানেই অগ্নি অবশ্য থাকিবে। অগ্নি বিনা ধূম কদাচ থাকে না। সুতবাং ধূম ব্যাপ্য আর অগ্নি ব্যাপক। ব্যাপক অগ্নির যেখানে অভাব হইবে সেখানে ব্যাপ্য ধূমেরও অভাব হইবে। যেরূপ জলপূর্ণ পুষ্করিণীতে ব্যাপক অগ্নির অভাব আছে, সুতরাং সেই পুষ্করিণীতে ব্যাপ্য ধূমেরও অভাব আছে। সেইরূপ এখানে প্রসঙ্গবিষয়ে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের বিষয়তা (১) শীর্য্যতা (২) সংযোগাদি সম্বন্ধ রূপ সঙ্গ (৩) ভয় (৪) ব্যথা (৫) বিনাশের কারণ (৬) এই ছয় পদার্থ বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের অপেক্ষা উত্তর-পদার্থ ব্যাপক। আর উত্তরপদার্থের অপেক্ষায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থ ব্যাপ্য। সেই উত্তর উত্তর ব্যাপক পদার্থের আত্মাতে অভাব রহিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্যাপ্য পদার্থেরও আত্মাতে অভাবই সিদ্ধ হইতেছে। যেরূপ এই আত্মাদেব নাশের কারণরহিত, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ; সুতরাং ব্যথারহিত। আর এই আত্মাদেব ব্যথারহিত সুতরাং এই আত্মাদেব ভয়রহিত। আর এই আত্মাদেব ভয়-রহিত, সুতরাং সঙ্গরহিত। আর এই আত্মাদেব সঙ্গরহিত, সুতরাং শীর্য্যতা-রহিত। আর এই আত্মাদেব শীর্য্যতারহিত, সুতরাং ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের

বিষয় নহে। এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি ভগবতী এই স্বয়ং জ্যোতি আত্মাকে 'অগৃহ্য' এই নাম দ্বারা কথন করিয়াছেন। হে মৈত্রেয়ি! এই প্রকার ভাব অভাব রূপ সর্ব্ব জগৎরহিত এবং মায়ারহিত যে স্বপ্রকাশ আত্মা, সেই স্বপ্রকাশ আত্মা বিষয়ে নেত্রাদি করণজন্য জ্ঞানের বিষয়তা কদাচিৎ সম্ভব নহে। সুতরাং এই অর্থ সিদ্ধ হইল যে বেদান্ত শাস্ত্রের মতে এবং যোগ শাস্ত্রের মতে আত্মসাক্ষাৎকার সম্বন্ধে নেত্রাদির করণরূপতা সম্ভব নহে। এক্ষণে অন্য অন্য শাস্ত্রের মতেও আত্মসাক্ষাৎকার সম্বন্ধে নেত্রাদি করণের অভাব নিরূপণ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! বৃহস্পতি-শিষ্য যে চার্ব্বাক সেই চার্ব্বাক মতাবলম্বীদিগের কেহ কেহ এই স্থূল শরীরকেই আত্মা মানিয়াছেন। আর কেহ কেহ প্রাণকে আত্মা মানিয়াছেন। আর কেহ কেহ মনকে আত্মা মানিয়াছেন। আর ন্যায়-শাস্ত্রবেত্তা মহাত্মাগণ দেহ ইন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন কর্ত্তা ভোক্তাকেই আত্মা মানিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের মতে আত্মা সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে নেত্রাদির করণরূপতা সম্ভব নহে। এক্ষণে এই অর্থকে সুস্পষ্ট নিরূপণ করা যাইতেছে। হে মৈত্রেয়ি! যে চার্ব্বাক এই স্থূল সংঘাতকেই আত্মা মানেন, সেই চার্ব্বাক মতেও এই সংঘাত রূপ আত্মার সাক্ষাৎকার বিষয়ে নেত্রাদির করণরূপতা সম্ভব নহে। কারণ এই সংঘাতরূপ আত্মা হইতে এই নেত্রাদি করণ ভিন্ন নহে, কিন্তু এই নেত্রাদি করণ সংঘাতরূপই। আর সেই সংঘাতরূপ আত্মা সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা। সুতরাং সেই সংঘাত হইতে অভিন্ন নেত্রাদিও কর্ত্তারূপই হইবে। সেই কর্ত্তারূপ নেত্রাদি বিষয়ে করণরূপতা সম্ভব নহে। কারণ ইহলোকে কর্ত্তা পুরুষ হইতে ভিন্নই করণ দেখা যায়। যেরূপ ছেদনরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা যে পুরুষ তাহা হইতে কুঠাররূপ করণ ভিন্নই হইয়া থাকে। সুতরাং সেই চার্ব্বাকের মতে সেই সংঘাতরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার বিষয়ে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের করণরূপতা সম্ভব নহে।

আর কোন কোন চার্ব্বাক নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সমুদায়কেই আত্মা মানেন। সেই চার্ব্বাক-মতেও ইন্দ্রিয়রূপ আত্মার সাক্ষাৎকার বিষয়ে কোন করণ সম্ভব নহে। কারণ ইন্দ্রিয়রূপ আত্মা সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা। সুতরাং সেই ইন্দ্রিয়রূপ কর্ত্তা আত্মা বিষয়েও সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার করণরূপতা সম্ভব নহে। আর এই স্থূল শরীর এবং বাহ্য ঘটাদি পদার্থ ইহারা সকলেই সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্মরূপ। সুতরাং সেই দেহাদি পদার্থেও সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার করণরূপতা সম্ভব নহে। অতএব চার্ব্বাক-মতাবলম্বীদিগের মতেও

ইন্দ্রিয়রূপ আত্মার সাক্ষাৎকার বিষয়ে কোন করণ সম্ভব নহে। আর যে অন্ত চার্ব্বাক প্রাণকে আত্মা মানিয়াছেন এবং মনকে আত্মা মানিয়াছেন, আর যে নৈয়ায়িক দেহাদি হইতে ভিন্ন কর্ত্তা-ভোক্তাকেই আত্মা মানিয়াছেন, সেই তিন বাদীর মতেও সেই আত্মা সাক্ষাৎকার বিষয়ে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের করণরূপতা সম্ভব নহে। কারণ সেই তিন বাদীদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত 'তোমরা প্রাণরূপ এবং মনোরূপ এবং কর্ম্ম-ভোক্তারূপ যে আত্মা অঙ্গীকার করিয়াছ সেই তোমাদের আত্মা নীল-পীতাদিরূপবিশিষ্ট অথবা নীল-পীতাদি রূপরহিত'? তন্মধ্যে আত্মারূপবিশিষ্ট এই প্রথম পক্ষ যদি বাদী অঙ্গীকার করে তাহা সম্ভব নহে। কারণ যদি আত্মা ঘট-পটাদি পদার্থের ন্যায় রূপবিশিষ্ট হন তাহা হইলে যেরূপ রূপবিশিষ্ট ঘট-পটাদি পদার্থ জীবের (আমাদিগের) নেত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রতীত হয় সেইরূপ রূপবান্ তোমাদের আত্মাও আমাদিগের মত জীবের নেত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রতীত হওয়া উচিত। কিন্তু ঘটাদির ন্যায় নেত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মা প্রতীত হন না। সুতরাং নেত্রাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় বিষয়ে তো সেই আত্মার সাক্ষাৎকারের করণতা সম্ভব নহে। আর নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সহায়তা বিনা রূপবান্ পদার্থ মন গ্রহণ করে না; সুতরাং আত্মার সাক্ষাৎকার বিষয়ে মনেরও করণতা সম্ভব নহে। আর সেই আত্মা নীল-পীতাদি রূপরহিত, এই দ্বিতীয় পক্ষ যদি বাদী অঙ্গীকার করে তাহা হইলেও সেই রূপরহিত আত্মার সাক্ষাৎকার বিষয়ে কোন কারণ সম্ভব নহে। কারণ নেত্রাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় তো রূপবান্ ঘটাদি পদার্থ গ্রহণ করে সুতরাং সেই রূপরহিত অন্তর আত্মার সাক্ষাৎকার বিষয়ে নেত্রাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের তো করণরূপতা সম্ভব নহে। তথায় যদি বাদী সেই সাক্ষাৎকার বিষয়ে মনকেই করণ মানেন তাহা হইলে তাঁহাকে এই জিজ্ঞাসা করা উচিত, মনোরূপ করণ দ্বারা সেই আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, অতএব সেই জ্ঞানরূপ সেই আত্মা কর্ম্ম অথবা কর্ত্তা। তন্মধ্যে সেই আত্মা সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্মরূপ। এই প্রথম পক্ষ যদি বাদী অঙ্গীকার করেন, তাহা সম্ভব নহে। কারণ যদি সেই আত্মা সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম হয় তো যে পদার্থ যে ক্রিয়ার কর্ম্মরূপ হইবে সেই পদার্থ সেই ক্রিয়ার কর্ত্তা রূপ হইবে না। সুতরাং সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার সেই আত্মা হইতে ভিন্ন কোন অন্য কর্ত্তা মানা উচিত। পরন্তু আত্মাভিন্ন অন্য কোন পদার্থ সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা নহে। সুতরাং কর্ত্তার অভাব হওয়াতে সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়া বিষয় মনের করণ-রূপতা সম্ভব নহে। আর সেই আত্মা সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা এই দ্বিতীয়

পক্ষ যদি বাদী অঙ্গীকার করেন তাহাও সম্ভব নহে। কারণ আত্মাকে বিষয় করিতে সমর্থ যে জ্ঞান সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার আত্মা হইতে ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ কর্ম্মরূপ হইতে পারে না। সুতরাং কর্ম্মের অভাব হওয়াতে সেই জ্ঞান রূপ ক্রিয়া বিষয়ে মনের করণরূপতা সম্ভব নহে। কারণ ইহলোকে যাহা যাহা করণ হইবে তাহা কর্ত্তাকে ও কর্ম্মকে অবশ্য অপেক্ষা করিবে। কর্ত্তা বিনা এবং কর্ম্ম বিনা করণরূপতা সিদ্ধ হইবে না। যেরূপ ছেদনক্রিয়ার কর্ত্তা যে পুরুষ এবং ছেদনরূপ ক্রিয়ার কর্ম্মরূপ যে কাষ্ঠ সেই উভয় বিদ্যমান থাকিলে কুঠার বিষয়ে করণরূপতা সিদ্ধ হইবে। সেই কর্ত্তা ও কর্ম্ম বিনা সেই কুঠার বিষয়ে করণরূপতা সিদ্ধ হইবে না। এই কারণেই শাস্ত্রবেত্তা পুরুষ সেই করণের এই লক্ষণ করিয়াছেন। কর্ত্তা পুরুষ যে পদার্থ দ্বারা কর্ম্ম বিষয়ে কিঞ্চিৎ ফল উৎপত্তি করে সেই পদার্থের নাম করণ। যেরূপ এই কর্ত্তা পুরুষ কুঠার দ্বারা কাষ্ঠরূপ কর্ম্ম বিষয়ে (কর্ম্মকে) দুই বিভাগরূপ ফল উৎপত্তি করে, এই জন্য সেই কুঠার করণরূপ। এই প্রকার করণরূপতা সেই মনের সম্ভব নহে।

শঙ্কা।—আত্মা হইতে ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তারূপ এবং কর্ম্ম রূপ যদ্যপি না হয় তথাপি সেই এক আত্মাই সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তারূপ এবং কর্ম্মরূপ। সুতরাং কর্ত্তা কর্ম্ম বিদ্যমান থাকাতে সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার সেই মনেরই করণরূপতা সম্ভব হইতে পারে। সমাধান। হে বাদী! এক কালে একই ক্রিয়াতে একই পদার্থের কর্ত্তারূপতা এবং কর্ম্মরূপতা ইহলোকে কোথাও দেখা যায় না; এবং যুক্তি দ্বারাও সম্ভব নহে। সুতরাং একই জ্ঞানরূপ ক্রিয়া বিষয়ে একই আত্মার কর্ত্তারূপতা এবং কর্ম্মরূপতা অত্যন্ত বিরুদ্ধ। আর এই বিরুদ্ধ অর্থ অঙ্গীকার করিয়াও যদি বাদী সেই আত্মসাক্ষাৎকার বিষয়ে মনকেই করণরূপ মানেন তাহা হইলে সেই বাদীকে এই কথা বলা উচিত, হে বাদী ইহলোকে কর্ত্তাকর্ম্মের অভেদ অত্যন্ত বিরুদ্ধ। সেই বিরুদ্ধ অঙ্গীকার করিয়াও যদি তুমি আত্মসাক্ষাৎকার বিষয়ে মনেরই করণতা মানিতেছ তাহা হইলে শ্রুতিসিদ্ধ এবং বিদ্বান্ আত্মজ্ঞানী পুরুষের অনুভব সিদ্ধ যে আত্মার স্বপ্রকাশরূপতা, সেই স্বপ্রকাশরূপতা অঙ্গীকার করিতে তোমার কি ভার হইতেছে? সুতরাং শ্রুতি ও অনুভবসিদ্ধ আত্মার স্বপ্রকাশরূপতা পরিত্যাগ করিয়া আত্মা বিষয়ে নেত্রাদি করণজন্য জ্ঞানের বিষয়তা অঙ্গীকার করা অত্যন্ত অনুচিত। শঙ্কা।—হে ভগবন্! পূর্ব্বে আপনি আত্মসাক্ষাৎকার বিষয়ে

মহাবাক্যরূপ শব্দের করণরূপতা বর্ণন করিয়াছেন। আর এক্ষণে আপনি সেই আত্মসাক্ষাৎকার বিষয়ে করণের খণ্ডন করিলেন; সুতরাং আপনার পূর্ব্ব উত্তর বচনের পরস্পর বিরোধ প্রাপ্ত হইতেছে। সমাধান।—হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ ঘটাদি জড় পদার্থের সাক্ষাৎকার বিষয়ে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের করণরূপতা আছে, সেইরূপ আত্মসাক্ষাৎকার বিষয়ে মহাবাক্যরূপ শ্রুতির করণরূপতা নাই। কিন্তু আত্মার আশ্রিত তথা আত্মাকে বিষয় করিতে (ঢাকিতে) সমর্থ যে অজ্ঞানরূপ আবরণ, সেই অজ্ঞানরূপ আবরণ আত্মসাক্ষাৎকারে প্রতিবন্ধক। শ্লোক—

আশ্রয়ত্ব বিষয়ত্ব ভাগিনী নির্ব্বিভাগা চিতিরেব কেবলা।
পূর্ব্বসিদ্ধতমসোহি পশ্চিমো (জীব) নাশ্রয়ো নাপি গোচরঃ॥

সেই আবরণরূপ প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি মহাবাক্য জন্য বৃত্তি দ্বারা হইয়া থাকে। এখানে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, প্রতিবন্ধক কাহার? হে মৈত্রেয়ি! সেই অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ আত্মা সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থাতে স্বপ্রকাশস্বরূপ, কোন কালে তাঁহার স্বপ্রকাশের লোপ হয় না। শ্রুতি কহিয়াছেন—"নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টেবিপরিলোপো বিদ্যতে"। তবে অজ্ঞানকালে যে আবরণরূপ প্রতিবন্ধক প্রতীত হয় তাহা ব্যষ্টি অন্তঃ-করণবিশিষ্ট আভাসচৈতন্যের (চিদাভাসের), আত্মার নহে। সেই আবরণ কিরূপ? হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ কোন মনুষ্য রঙ্গভূমিতে নটের বেশ ধারণ করিয়া নৃত্যগীতাদি করিতে করিতে তাহাতে সময়ে সময়ে এরূপ আসক্ত হইয়া পড়েন যে তৎকালে আপনার স্বরূপ বিস্মৃতির ন্যায় হইয়া নটোচিত সুখ দুঃখ মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন রূপে আপনার ও দর্শকমণ্ডলীর গোচরান্বিত হন, বাস্তবিক আপনার আনন্দময় স্বরূপ পরিত্যাগ করেন না, সেইরূপে জীব শব্দাদি বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া অজ্ঞান কালে আভাসচৈতন্যরূপে স্ফুরিত হইয়া আপনার স্বরূপ বিস্মৃতের ন্যায় থাকিয়া তৎস্বরূপে অর্থাৎ আভাসচৈতন্য স্বরূপে সুখ দুঃখ মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন রূপে আপনার ও অপরের আভাস চৈতন্যের গোচরান্বিত হয়, বাস্তবিক নিজে আপনার আনন্দময় স্বরূপ কদাচ পরিত্যাগ করেন না অথবা শিশুবৎ অবলোকিত হইয়াও বাস্তবিক শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ে লিপ্ত বা অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হন না "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি শ্রুতেঃ। কারণ অবিদ্যা কাম কর্ম্ম সংবিত প্রত্যগাত্মা রূপ জীব জানেন যে তিনি স্ব-অতিরিক্ত যাহা কিছু দেখেন বা যাহা কিছু করেন তৎসমস্তই মায়াময় "স মায়ী সৃজতে বিশ্বম্" অতএব আবরণ কোথায়? সেই কল্পিত আবরণ রূপ আভাস

চৈতন্যের প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি মহাবাক্য-জন্য বৃত্তির দ্বারা হইয়া থাকে। সেই আবরণ-নিবৃত্তি হইবার পর এই আনন্দ-স্বরূপ আত্মা আপনার স্বাভাবিক স্বপ্রকাশ রূপে স্ফুরিত হন। সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকার বিষয় মহাবাক্য রূপ শ্রুতিরও বাস্তবিক করণ-রূপতা নাই। কিন্তু সেই মহাবাক্য রূপ শ্রুতি জন্য অন্তঃকরণবৃত্তি আবরণ রূপ প্রতিবন্ধক নিবৃত্তি করিয়া দেয় মাত্র। এ কথা বিদ্যারণ্য স্বামী পঞ্চদশীতে উল্লেখ করিয়াছেন যথা "আত্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তি-ব্যাপ্তিমপেক্ষ্যতে। ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিবারিতা॥" সুতরাং এই টুকু অংশ অঙ্গীকার করিয়া পূর্ব্বে আমি আত্মসাক্ষাৎকার বিষয়ে মহাবাক্য রূপ শ্রুতির করণরূপতা কহিয়াছিলাম। সুতরাং পূর্ব্ব ও উত্তর বচনের বিরোধ নাই।

হে মৈত্রেয়ি! যে মন্দবুদ্ধি চার্ব্বাকাদি শরীরাদিকেই আত্মা বলিয়া মানেন, সেই চার্ব্বাকাদির মতেও যখন শরীরাদি রূপ আত্মার সাক্ষাৎকার বিষয়ে পূর্ব্ব উক্ত রীতি অনুসারে কোনও করণ সিদ্ধ হইল না, তখন আত্মার স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার-কারী আমরা অদ্বৈতবাদী, আমাদের মতে সেই স্বপ্রকাশ আত্মার সাক্ষাৎকার বিষয়ে কোন করণ নাই, এই বিষয়ে কি বক্তব্য আছে? হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ ঘট পটাদি অর্থ জড় রূপ, সুতরাং সেই ঘটাদি পদার্থ অনাত্মা স্বরূপ; সেইরূপ দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ইত্যাদি এই সম্পূর্ণ সংঘাত ও জড় রূপ, সুতরাং এই সংঘাতও অনাত্ম-স্বরূপ। সেই অনাত্ম রূপ সংঘাত, অধিষ্ঠান আত্মার সম্বন্ধ পাইয়াই চিদাভাস দ্বারা প্রতীত হইয়া থাকে। একথা বিদ্যারণ্য স্বামী পঞ্চদশী প্রকাশ করিয়াছেন যথা "বুদ্ধিতৎস্থচিদ্যাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটঃ। তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নস্থেৎ আভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ"॥ সুতরাং সেই অনাত্ম স্বরূপ সংঘাত মিথ্যারূপ। সত্যস্বরূপ আত্মা সেই মিথ্যা জগতের অধিষ্ঠানরূপ, সর্ব্ব ভেদ রহিত, অদ্বিতীয়। হে মৈত্রেয়ি! এই অদ্বিতীয় রূপ আত্মাই বুদ্ধি আদি সংঘাতের সাক্ষী রূপ। যেরূপ দর্পণস্থিত মিথ্যা প্রতিবিম্ব নাশে মুখরূপ বিম্ব অক্ষয় রূপে বর্ত্তমান থাকে সেইরূপ বুদ্ধি (মায়া) প্রতিবিম্বিত মিথ্যা অভ্যাস-চৈতন্য (চিদাভাস) রূপ জগৎ নাশ হইলে, সত্যরূপ বিম্ব, সাক্ষী আত্মা স্বপ্রকাশরূপে বিদ্যমান থাকেন। এরূপ সাক্ষী স্বপ্রকাশ আত্মাকে এই অধিকারী পুরুষ দেহাদি করণ দ্বারা জানিতে পারে না। সুতরাং দুঃখদায়ী যে পতি পুত্র ধনাদি পদার্থ তাহা পরিত্যাগ করিয়া তুমি আপনার হৃদয়ে এরূপ নিত্যসিদ্ধ স্বয়ং জ্যোতি আনন্দস্বরূপ আত্মাকে নিশ্চয় কর। হে মৈত্রেয়ি! তুমি যে পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে মোক্ষরূপ

অমৃতের সাধন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহাতে আমি যে তোমাকে এই ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিলাম। সেই ব্রহ্মবিদ্যাই সেই মোক্ষরূপ অমৃত প্রাপ্তির সাধন। হে মৈত্রেয়ি! সর্ব্ব জীবের হৃদয়দেশে বিরাজমান যে পরব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম আমার আত্মারূপ "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই প্রকার যে আত্মসাক্ষাৎকার সেই আত্মসাক্ষাৎকার বিনা মোক্ষরূপ অমৃত প্রাপ্তির অন্য কোন সাধন নাই। পরন্তু এই আত্মসাক্ষাৎকারই সেই মোক্ষ রূপ অমৃত প্রাপ্তির সাধন। হে মৈত্রেয়ি! এই দেহাদি অনাত্ম পদার্থের প্রতি 'অহং মমঅভিমান' পরিত্যাগ করিয়া, যখন তুমি এই আনন্দ স্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার করিবে, তখন সেই আত্মসাক্ষাৎকার প্রভাবে তুমি এই শরীর পরিত্যাগের পর পুনঃ মৃত্যু ও জন্ম কখনই প্রাপ্ত হইবে না। শ্লোক যথা "দ্বি অক্ষরং ভবেৎ বন্ধো ত্রি অক্ষরং ব্রহ্ম শাশ্বতং। অহং মমেতি বন্ধো, ন মহং ন মমেতি যুক্ততা" ॥ সুতরাং দেহাদি সর্ব্ব অনাত্ম পদার্থের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া এই আনন্দ স্বরূপ আত্মা-বিষয়ে তুমি চিত্ত একাগ্র কর।

হে শিষ্য! এই প্রকার যাজ্ঞবল্ক্য মুনি আপনার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ দিয়া পশ্চাৎ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া, সংন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। হে শিষ্য! যে বিচার করিয়া সেই যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সংন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বিচার তুমি শ্রবণ কর।

সৎচিৎ আনন্দ স্বরূপ আত্মা হইতে বিলক্ষণ অসৎ, জড় ও দুঃখরূপ মায়াশক্তি সত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন গুণ যুক্ত; "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বী প্রজাঃ সৃজমানাঃ স্বরূপাঃ"। "ইতি শ্রুতেঃ। এরূপ আত্মার মায়ারূপ শক্তিকে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি মিথ্যারূপে দেখিতে লাগিলেন; যে মায়াশক্তিকে পূর্ব্ব মনস্বিগণও জগতের কারণ বিচার করিয়া এইপ্রকার মিথ্যারূপ নিশ্চয় করিয়া-ছিলেন "দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং ইতি 'শ্বেতাশ্বতর'। "মায়াময় মিদং দ্বৈতং অদ্বৈতং পরমার্থতঃ "ইতি 'মাণ্ডুক্যকারিকা'। এই আনন্দ স্বরূপ আত্মাই এই জগতের প্রধান কারণ। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ এবন্ত্যভিসম্বিসন্তি তৎ বিজিজ্ঞাশস্ব তৎ ব্রহ্ম।" ইতি শ্রুতেঃ। "জন্মাদ্যস্য যতঃই" ব্রহ্মসূত্রঃ। আর এই মায়াশক্তি তো এই জগতের সহকারী কারণ এই প্রকার বিচার করিয়া সেই মুনীশ্বরগণ সেই মায়ারূপ শক্তিকে যেরূপ নিশ্চয় করিয়াছিলেন :সেইরূপ যাজ্ঞবল্ক্য মুনিও সেই মায়ারূপ শক্তিকে মিথ্যারূপে নিশ্চয় করিতে লাগিলেন। আর শীত

উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমান, শত্রু মিত্র, আপন শরীর, পর শরীর, ধর্ম্মাত্মা পাপাত্মা ইত্যাদি যত অনুকূল প্রতিকূল পদার্থ আছে, সেই সমস্ত পদার্থের প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সমদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর রূপাদি বিষয়ে নেত্রাদি ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তিতে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি দ্বেষ বুদ্ধি করেন নাই; আর সেই রূপাদি বিষয় হইতে যে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি, সেই নিবৃত্তিকে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি ইচ্ছা করেন নাই। পরন্তু বিষয়ে প্রবৃত্তি ও বিষয় হইতে নিবৃত্তি এই উভয়ই নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, আমি পরমানন্দ স্বরূপ আত্মাতো সর্ব্বদা নির্ব্বিকার, এই প্রকার বিচার করিয়া সেই যাজ্ঞবল্ক্য মুনি ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি বিষয়ে এবং নিবৃত্তি বিষয়ে উদাসীন থাকিতে লাগিলেন। এবং শরীর মন দ্বারা সকল প্রাণীকে অভয় প্রদান করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনি সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় রাগ দ্বেষাদি বিকাররহিত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই পর্য্যন্ত যাজ্ঞবল্ক্য মুনির বৃত্তান্ত বলা হইল।

এক্ষণে মৈত্রেয়ীর বৃত্তান্ত নিরূপণ করা যাইতেছে। হে শিষ্য! যেরূপ যাজ্ঞবল্ক্য মুনি চতুর্থ বা সংন্যাস আশ্রম ধারণ করিয়া ইহ লোকে বিচরণ করিতে লাগিলেন, সেইরূপ ব্রহ্মবিদুষী মৈত্রেয়ীও সংন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া ইহলোকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরন্তু ইঁহার বিষয়ে এই টুকু প্রভেদ। যাজ্ঞবল্ক্য মুনিতোলিঙ্গ সংন্যাস ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মৈত্রেয়ী অলিঙ্গ-সংন্যাস ধারণ করিয়াছেন। এখানে দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক যে সংন্যাস তাহার নাম 'লিঙ্গ-সংন্যাস'। আর দণ্ড গ্রহণ বিনা যে সংন্যাস তাহার নাম 'অলিঙ্গ-সংন্যাস'। এইটুকু ভিন্নতা ছাড়িয়া দিলে, অন্য ভিক্ষাটনাদি বাহ্যধর্ম্ম এবং শমদমাদি অন্তর ধর্ম্ম লিঙ্গ সংন্যাসী এবং অলিঙ্গ-সংন্যাসীদিগের মধ্যে সমান।

শঙ্কা।—হে ভগবন্! যাজ্ঞবল্ক্য মুনির ন্যায় মৈত্রেয়ীও দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক লিঙ্গ সংন্যাস কিজন্য করেন নাই?

সমাধান।—হে শিষ্য! দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক যে লিঙ্গ-সংন্যাস তাহাতে ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের সেই লিঙ্গ-সংন্যাসে অধিকার নাই। যখন ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরও সেই লিঙ্গ-সংন্যাসে অধিকার না থাকিল, তখন সেই লিঙ্গ-সংন্যাসে স্ত্রীর অধিকার কি প্রকারে হইবে? এই বার্ত্তা স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে।

শ্লোক। "মুখজাতানাময়ং ধর্ম্মো যদ্বিষ্ণোর্লিঙ্গধারণং। বাহুজাতোরুজাতানাং নায়ং ধর্ম্মো বিধীয়তে"। পরমেশ্বরের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণের কেবল দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক লিঙ্গ-

সংন্যাসে অধিকার আছে। যে ক্ষত্রিয় পরমেশ্বরের বাহু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে বৈশ্য পরমেশ্বরের উরু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাঁহাদের উভয়েরই লিঙ্গ-সংন্যাসে অধিকার নাই।১॥ হে শিষ্য! পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য কর্ম্মের প্রভাবে যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য পুরুষের এবং ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীর এই সংসার হইতে তীব্র বৈরাগ্য হইবে সেই ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং স্ত্রীগণ অলিঙ্গ-সংন্যাস গ্রহণ করিয়া যেরূপ লিঙ্গ-সংন্যাসীর অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে সেইরূপ সেই সকল ধর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। অহিংসাদি ধর্ম্ম সম্পাদন বিষয় সর্ব্ব প্রাণীরই অধিকার আছে।

এক্ষণে চতুষ্টয় সাধনসম্পন্ন অধিকারীর প্রতি ব্রহ্মবিদ্যা প্রদানের জন্য-গুরু, শিষ্য ভাবের ব্যবস্থা নিরূপণ করা যাইতেছে। হে শিষ্য! এই ভারত খণ্ডে অধিকারী মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া যে পুরুষ আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত না হইবেন, সেই পুরুষের মহান্ হানি প্রাপ্তি শ্রুতি কহিয়াছেন। যথা "ন বেদ-বেদির্মহতি বিনষ্টি, যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি"। অর্থাৎ,—এই ভারত খণ্ডে অধিকারী মনুষ্যশরীর প্রাপ্ত হইয়া যে পুরুষ এই আনন্দ স্বরূপ আত্মাকে না জানেন, সেই অজ্ঞানী পুরুষের জন্ম মরণাদি অনেক দুঃখ প্রাপ্তি হইবে। আর যে পুরুষ সেই আনন্দ স্বরূপ আত্মাকে জানিয়াছেন সেই পুরুষ মোক্ষ রূপ অমৃত প্রাপ্ত হইবেন।১। সুতরাং এই অধিকারী পুরুষ আত্ম সাক্ষাৎকার অবশ্য সম্পাদন করিবেন। আর "স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিং"।— স্ত্রী বৈশ্য এবং শূদ্র এই সকলেই আত্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন। এই ভগবৎগীতার বচন হইতে স্ত্রী বৈশ্য শূদ্র এই তিনেরও মোক্ষ বিষয় অধিকার সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সেই মোক্ষ আত্মজ্ঞান বিনা হইবে না। শ্রুতি—"ঋতে জ্ঞানান্নমুক্তিঃ নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"—আত্মজ্ঞান বিনা মুক্তি হইবে না। আত্ম জ্ঞান বিনা মোক্ষ প্রাপ্তির অন্য কোন পথ নাই। কিন্তু কেবল আত্ম জ্ঞানই মোক্ষ প্রাপ্তির পথ।১। আর সেই আত্মজ্ঞান শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর উপদেশ হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। "আচর্য্যবান্ পুরুষো বেদ"। শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, সদাচার-বিশিষ্ট পুরুষ আত্মাকে জানেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণের পুরুষ এবং সেই চারি বর্ণের স্ত্রী শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু-মুখ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়া আত্মজ্ঞান অবশ্য সম্পাদন করিবেন। তন্মধ্যে কোন্ বর্ণবিশিষ্ট অধিকারী কোন্ বর্ণবিশিষ্ট বিদ্বান্‌কে গুরু করিবেন এই প্রকার ব্যবস্থা তুমি শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ সকল

বর্ণের শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সেই ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণ চতুষ্টয় সাধনসম্পন্ন অধিকারী ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়কে এবং বৈশ্যকে এবং ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীকে উপনিষদ্ রূপ বেদ-বচন উপদেশ দিয়া আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্তি করাইবেন। কারণ যেরূপ শাস্ত্রে শূদ্রকে উপনিষদ্ রূপ বেদবচন শ্রবণ করিবার নিষেধ কথন করা হইয়াছে, সেইরূপ অধিকারী ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীকে উপনিষদ্ রূপ বেদবচন শ্রবণ করিবার নিষেধ কোন শাস্ত্রে কথন করা হয় নাই।

শঙ্কা।—হে ভগবন্! শ্রুতিতে স্ত্রীলোকের বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য নিষেধ করা হইয়াছে; "স্ত্রীশূদ্রো নাধীয়তাং"। স্ত্রী শূদ্র এই উভয়কে বেদ অধ্যয়ন করাইবে না। এই শ্রুতির বচন বিরোধ হইবে।

সমাধান।—হে শিষ্য! যে বেদবচন গুরু উচ্চারণ করেন, যদি সেই বেদবচন শিষ্যও উচ্চারণ করে তাহার নাম অধ্যয়ন। এই প্রকার বেদ অধ্যয়ন যদ্যপি ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীর নিষেধ আছে, তথাপি ব্রহ্মবেত্তা গুরুর মুখ হইতে বেদবচন শ্রবণ করিবার ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীর নিষেধ নাই। যদি কথন ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীর বেদবচন শ্রবণ করাও নিষেধ হইত, তাহা হইলে সেই বেদে মৈত্রেয়ী, গার্গি, সুলভা প্রভৃতি স্ত্রীর প্রতি যে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশের প্রকার কথিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইত। সুতরাং মুমুক্ষু ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীর উপনিষদ্ রূপ বেদবচন শ্রবণ করিবারও অধিকার আছে আর ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য পুরুষের তো বেদ অধ্যয়ন করিবারও অধিকার আছে। সুতরাং সেই ব্রহ্মবেত্তা বিদ্বান্ পুরুষ অধিকারী ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে এবং ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীকে উপনিষদ্ রূপ বেদবচন উপদেশ দিয়া আত্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্তি করাইবেন। পরন্তু সেই বিদ্বান্ পুরুষ সেই ক্ষত্রিয়কে এবং বৈশ্যকে এবং ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীদিগকে দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক লিঙ্গ-সংন্যাস কথনই দিবেন না। আর যদি কথন সেই ক্ষত্রিয় বৈশ্য পুরুষের এবং ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীর এই সংসার হইতে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তবে সেই বিদ্বান্ পুরুষ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং স্ত্রীগণকে দণ্ড গ্রহণ বিনা অলিঙ্গ-সংন্যাস প্রদান করিবেন। কারণ যেরূপ শাস্ত্রে যদ্যপি শূদ্রকে যজ্ঞাদি বিশেষ কর্ম্ম করিবার জন্য নিষেধ কথন করা হইয়াছে, তথাপি সেই যজ্ঞে ব্রাহ্মণাদি অধিকারী দ্বারা করণীয় যে দান তপ সত্য নমস্কারাদি শুভকর্ম্ম, সেই দানাদি শুভকর্ম্ম করিবার জন্য শূদ্রেরও অধিকার শাস্ত্রে বিধান করা হই-য়াছে; সেইরূপ দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক লিঙ্গ-সংন্যাস যদিও ব্রাহ্মণেরই কেবল অধিকার আছে তথাপি সেই লিঙ্গ সংন্যাসীর কর্ত্তব্য যে অহিংসা ব্রহ্মচর্য্য

সত্যাদি ধর্ম্ম, সেই অহিংসাদি ধর্ম্মপূর্ব্বক অলিঙ্গ-সংন্যাস গ্রহণে ক্ষত্রিয় বৈশ্য পুরুষের এবং ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীর দোষ প্রাপ্তি হইবে না। তদ্বিপরীতে তাঁহাদের মহান্ পুণ্য লাভ হইবে। হে শিষ্য! ইহলোকে ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং ত্রৈবর্ণিক স্ত্রী যদি কখন ব্রহ্মবিদ্যাতে অত্যন্ত পারদর্শীও হয় ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণ বিদ্যমান থাকিতে সেই ক্ষত্রিয়াদি গুরুরূপ হইয়া অন্য অধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিবেন না। কিন্তু ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণই সেই অধিকারীকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবেন। আর যখন কোন ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণ বিদ্যমান না থাকিবেন, তখন সেই ব্রহ্মবেত্তা ক্ষত্রিয় গুরুরূপ হইয়া আপনার সমান জাতি ক্ষত্রিয় পুরুষকে এবং ক্ষত্রিয়াণী স্ত্রীকে এবং বৈশ্য পুরুষকে এবং বৈশ্যানী স্ত্রীকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবেন। পরন্তু ক্ষত্রিয় গুরুরূপ হইয়া ব্রাহ্মণকে অথবা ব্রাহ্মণী স্ত্রীকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবেন না। এইরূপ ব্রহ্মবেত্তা বৈশ্য পুরুষও ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণের এবং ব্রহ্মবেত্তা ক্ষত্রিয়ের অভাব হইলে আপনার সমান জাতিবিশিষ্ট বৈশ্যকে এবং বৈশ্যানী স্ত্রীকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবেন। পরন্তু সেই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ গুরুরূপ হইয়া আপনার অপেক্ষা উত্তম বর্ণবিশিষ্ট ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণকে এবং ক্ষত্রিয়াণী বা ব্রাহ্মণীকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবেন না। আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের যে স্ত্রী, সেই স্ত্রীর শাস্ত্র বেদ অধ্যয়ন নিষেধ আছে; সুতরাং সেই ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীও গুরুরূপ হইয়া ত্রৈবর্ণিক পুরুষকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করিবেন না। আর যখন কোন ত্রৈবর্ণিক পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যায় কুশল না থাকিবেন তখন সেই ত্রৈবর্ণিক স্ত্রীও গুরুরূপ হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবেন। পরন্তু সেই ত্রৈবর্ণিক স্ত্রী আপনার সমান জাতিবিশিষ্ট পুরুষকে এবং আপন অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতিসম্পন্ন পুরুষকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবেন। আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতিবিশিষ্ট পুরুষকে সেই স্ত্রী ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিবেন না। আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণবিশিষ্ট পুরুষেরও যখন আপনার সমান জাতিবিশিষ্ট গুরু এবং আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতিবিশিষ্ট গুরু না মিলিবে, তখন সেই ব্রাহ্মণাদি পুরুষও আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতি-বিশিষ্ট ব্রহ্মবেত্তা গুরু হইতে শাস্ত্র-মর্য্যাদা অবগত হইয়া বেদবচন হইতে নিজেই আত্মসাক্ষাৎকার সম্পাদন করিবেন। আর যে ব্রাহ্মণ কুলীন হইবেন এবং বাল্যাবস্থায় মাতা দ্বারা শিক্ষিত হইবেন, তদনন্তর পিতা দ্বারা শিক্ষিত হইবেন, তদনন্তর আচার্য্য দ্বারা শিক্ষিত হইবেন এরূপ ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণকেই ব্রাহ্মণী স্ত্রী গুরু করিবেন। এবং অন্য ক্ষত্রিয়াদিও এরূপ ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণকেই গুরু

করিবেন। আর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের স্ত্রীর তো আপনার পতিই গুরু হইবেন। যদি কখন সেই পতি ব্রহ্মবিদ্যাবান্ না হন, তাহা হইলে স্ত্রী আপন সমান জাতিবিশিষ্ট কোন ব্রহ্মবেত্তা পুরুষকে গুরু করিবেন। আর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধম জাতিবিশিষ্ট যে ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্য অপেক্ষাও অধম জাতিবিশিষ্ট যে শূদ্র, সেই শূদ্র কোন আপৎকালেও ব্রাহ্মণাদি উত্তম বর্ণের গুরু হইবেন না। আর শূদ্র পুরুষের এবং শূদ্র স্ত্রীর এবং অন্য কোন শঙ্কর জাতি-বিশিষ্ট পুরুষের পূর্ব্ব জন্মের কোন পুণ্যকর্ম্মের প্রভাবে যদি আত্মসাক্ষাৎকারের অভিলাষ হয়, তবে এই বিদ্বান্ পুরুষ সেই শূদ্রাদিকেও উপদেশ দিবেন। পরন্তু এই বিদ্বান্ পুরুষ সেই শূদ্রাদিকে সাক্ষাৎ উপনিষদ্রূপ বেদের উপদেশ করিবেন না। কিন্তু উপনিষদের অর্থ-প্রকাশকারী যে ভাগবতাদি পুরাণ এবং পঞ্চদশী আদি প্রকরণ গ্রন্থ, বিশেষতঃ শঙ্করানন্দী গীতা, আত্মপুরাণাদি প্রকরণ গ্রন্থ তাহাদিগকে উপদেশ করিয়া সেই বিদ্বান্ পুরুষ মুমুক্ষু শূদ্রাদিকে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করাইবেন। আর যখন কোন উত্তম জাতিবিশিষ্ট ব্রহ্মবেত্তা গুরু না পাওয়া যায়, কিন্তু অধম জাতিবিশিষ্ট কোন ব্রহ্মবেত্তা গুরু পাওয়া যায়, তবে উত্তম জাতিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণাদি সেই অধম জাতিবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়াদি হইতে ধনাদি পদার্থ দিয়া ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিবেন। আর যদি কখন অধম জাতিবিশিষ্ট গুরু ধনাদি পদার্থ ইচ্ছা না করেন এবং নিষ্কাম হন, তাহা হইলে সেই অধম জাতিবিশিষ্ট শিষ্য আপনার কোন বিদ্যা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা লইবেন। আর সেই অধম জাতিবিশিষ্ট পুরুষ যদি কখন সেই উত্তম জাতিবিশিষ্ট পুরুষকে ব্রহ্মবিদ্যা দেয়, তাহা হইলেও সেই উত্তম জাতিবিশিষ্ট শিষ্য হইতে সেই অধম জাতিসম্পন্ন গুরু পাদসংবাহনাদি (টেপান) নিকৃষ্ট সেবা করাইবে না। হে শিষ্য, বেদে অশ্বপতি নামক ক্ষত্রিয় রাজা উদ্দালকাদি ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন কথিত আছে এবং অজাতশত্রু নামক ক্ষত্রিয় রাজা বালাকী ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন, কথিত হইয়াছে। এই প্রকার বেদপ্রতিপাদিত কথা দেখিয়া ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বক্তা মনু আদি ঋষিগণ ক্ষত্রিয়াদি অধম বর্ণ হইতে ব্রাহ্মণাদি উত্তম বর্ণের ব্রহ্মবিদ্যা লইবার প্রকার কথন করিয়াছেন। পরন্তু সেই সমস্ত প্রকার সেই পর্য্যন্ত চলিবে, যে পর্য্যন্ত কোন ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণের অভাব হইবে। আর যদি ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণ গুরু লাভ হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়াদি হইতে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন কদাচ করিবেন না। হে শিষ্য ! এই প্রকার যে শাস্ত্রে মর্য্যাদা কথিত হইয়াছে সেই সমস্ত মর্য্যাদা

জ্ঞাতা ব্রহ্মবিদুষী মৈত্রেয়ী দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক লিঙ্গ-সংন্যাস গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনপূর্ব্বক অলিঙ্গ সংন্যাস ধারণ করিয়া মৈত্রেয়ী যাজ্ঞ্যবল্ক্য মুনির ন্যায় ইহলোকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মৈত্রেয়ী হইতে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির এক দণ্ড গ্রহণ মাত্র বিশেষতা ছিল। সেই দণ্ডগ্রহণরূপ বিশেষতা ব্যতীত অন্য শম দমাদি ধর্ম্ম উভয়ের সমানই ছিল। হে শিষ্য! যাজ্ঞবল্ক্য মুনি আপনার মৈত্রেয়ী স্ত্রীকে যে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন সেই সম্পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা আমি তোমাকে বলিলাম। হরি ওঁ। শ্রীগুরবে নমঃ। শ্রীকেশবানন্দায় নমঃ। শ্রীশঙ্করাচার্য্যেভ্যো নমঃ। শ্রীকাশীবিশ্বেশ্বরাভ্যাং নমঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র,
৺কাশীধাম।

আরাধ্য।

বাক্যমন অগোচর—নিত্য অবিচল—
জ্ঞান-কর্ম্ম ভক্তি পারে—সে মহা নির্ব্বাণ;
নিষ্কাম নির্লিপ্ত হিয়া লভেরে কেবল,
অনুপম সে আনন্দ দীপ্ত গরীয়ান্।
সাধনায়, ত্যাগ ধর্ম্মে, কর্ম্ম-উদ্দীপনে,
ত্রিগুণের পরিণতি, সত্ত্বের বিচারে,
চৈতন্য সমাধি যোগে, চিদানন্দ ধ্যানে,
প্রকটিত শুদ্ধ আত্মা হৃদয় মাঝারে;—
বিরাজিত সে মূরতি—প্রদীপ্ত আলোকে,
হের হের কি বিরাট্ মহিমা-মণ্ডিত!
উজলে নবীন রাগে বিপুল পুলকে,—
গম্ভীর ওঙ্কার নাদে বিশ্ব মুখরিত।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সর্ব্বস্ব বিভব,
হৃদি মাঝে সত্যসার আরাধ্য দুর্লভ।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দূরে ও নিকটে।

এক বিন্দু হইতে অপর বিন্দু, এক বস্তু হইতে অপর বস্তু, এক স্থান হইতে অন্য স্থান, কতটা ব্যবধানে অবহিত তাহার পরিমাণ ভেদে একটিকে অপরটির নিকটস্থ বা দূরস্থ বলা হইয়া থাকে। এই ব্যবধানটা অবস্থানভূমির দূরত্বের হিসাবেই ধরা হয়। কিন্তু দুই-এর মধ্যে অন্য নানা ব্যবধানও রহিতে পারে। সেই সব ব্যবধানও যে কিরূপে একটিকে অপরটির দূরস্থ বা নিকট করিতে পারে, তাহাই দেখিবার বিষয়। কেমন করিয়া দূরের বস্তুকেও নিকটে মনে হয়, আবার কি হইলে নিকটের বস্তুকেও বহু দূরের বলিয়া প্রতীতি :জন্মে ইহাই আলোচ্য।

একটা প্রবাদ আছে—"এক নদী বিশ ক্রোশ।" একটি নদী পথিমাঝে থাকিয়া এমন অসুবিধাই ঘটাইতে পারে তাহা সারিয়া লইতে যে সময় লাগিবে, সেই সময়ে সুপথের বিশ ক্রোশ জমি অতিক্রম করা যাইতে পারে। এ স্থলে ব্যবধান গতাগতির সুবিধা অসুবিধা লইয়াই পরিমিত হইল না কি?

কলিকাতা হইতে ১৪৮ মাইল দূরে একটি রেলওয়ে ষ্টেশনের ধারে আমার বাড়ী। যশোহর জিলার মহকুমা মাগুরা সে স্থান হইতে অনেক কম দূর। কিন্তু যাতায়াতের সময়ের হিসাবে ভাবিয়া দেখি কলিকাতা মাগুরার চেয়ে খুবই কাছে। কলিকাতা যাইতে ৬।৭ ঘণ্টা মাত্র লাগে আর মাগুরা আসিতে দুই দিন লাগে। যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত নাই বলিয়াই মাগুরা নিকটে হইলেও আমার কাছে বহুদূর বলিয়া বোধ হয়।

আমার এক বন্ধু রাজসাহীতে আছে। আমি প্রায়ই তাহাকে চিঠি লিখি, ; কখন কি করি,কা'র সঙ্গে এখানে আমার কেমন ভাব হইয়াছে,তাহাকে জানাই। কখন যদি সখ করে একটি পদ্য লিখি তাহাকে তাহার নকল পাঠাই, সে আমাকে তার জন্য কত প্রশংসা করে; মাসিকপত্রিকাগুলি আত্মম্ভরী, অপদার্থ অগুণগ্রাহী, স্বার্থপর লোকেরই পরিচালিত, তাহাও আমার সহিত তর্ক করিয়া প্রতিপাদনের চেষ্টা করে, আমি তাহাতে আর উৎসাহ পাইয়া তাহাকে আরও খারাপ কবিতা পাঠাই, সে সেটার আরও দ্বিগুণ প্রশংসা করে। বল দেখি

সেই বেশী নিকটে, না ঐ যে ২৫ গজ দূরে যাঁর বাসা সেই ভদ্রলোকটিই বেশী নিকটে? ইঁহাকে আমি রোজ দুবেলাই দেখি, সভাসমিতিতে সাম্‌নাসাম্‌নি বসিয়াছি. রাস্তায় বেড়াইতে প্রায় গা ঘেসাঘেসি হইয়া গিয়াছে, চোখে চোখেও পড়িয়াছে বহুদিন, তিনিও জানিয়াছেন আমি কে এবং কি, আমিও জানি যে তিনি এখানকার স্থানীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, অথচ দুজনে বাক্যবিনিময় হয় নাই। কে বেশী নিকটে? বল কে নিকটে আর কে দূরে? এই ভদ্রলোকটি না ঐ বন্ধু? তোমরা যাই বল আমি বলি ঐ বন্ধুই আমার বেশী নিকটে।

আমার অনেক কয়টি বন্ধুর সহিতই আমার বেশ correspondence আছে। এদের মধ্যে দুজনে বহুদিনের সহপাঠী—একেবারে স্কুল থেকে কলেজ পর্য্যন্ত; আর কয়েকজন শুধু কলেজে পড়িবার সময়কার সহপাঠী। এঁদের মধ্যে যে উক্ত দুই জনই আমার বেশী নিকটে, এ কথা স্পষ্টতঃ বলিয়া ফেলিলে, অন্য বন্ধুরা যদি চটিয়া যান ত যেতে পারেন, ভবিষ্যতে সুবিধা হইলে তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সাধন করা যাইবে। এখানে কি লইয়া কম বেশী করিলাম? বহুদিনের অভ্যস্ত জিনিষটিই বেশী প্রিয় হইয়া পড়ে। যে পথে রোজ হাঁটা যায় সেটা যেন অপেক্ষাকৃত সোজা এবং অল্প বলিয়া বোধ হয়। নূতন অপরিচিত পথে অর্দ্ধ মাইল ও এক মাইলের বেশী। অতএব যার সঙ্গে সম্বন্ধ যত বেশী আদিম অথচ স্থায়ী, সে তত বেশী আপন, তত বেশী নিকটে হইবে, ইহাই কি স্বাভাবিক নিয়ম নহে?

বাল্যাবধি রাম শ্যাম দুজনকেই চিনি। একজনকে ভালবাসিতাম, অন্যকে ঘৃণা করিতাম। যাহাকে ঘৃণা করিয়াছি সে এখনও আছে। আমার বেড়া সরাইয়া ফেলিয়া, আমার জমির খানিকটা সে ঘিরিয়া লইয়াছে। যাহাকে ভালবাসিতাম সে আমাকে এবং সকলকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে জানি না। এই মাত্র জানি সে আর আসিবে না। কিন্তু কে বেশী নিকটে? তোমরা যাই বল, আমি বলি, না না আমি—ঠিক্ জানি, ঐ যে আর আসিবে না সেহ আমার বেশী নিকটে;—কারণ আমি তাহাকে ভালবাসি।

কে আমার বেশী নিকটে? হীরালাল মৈত্র না লালচাঁদ মণ্ডল? প্রথমোল্লিখিত ব্যক্তি আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা। তার সঙ্গে আমার রক্তের সংস্রব রহিয়াছে। কয়েক পুরুষ পূর্ব্বে আমাদের উভয়ের পূর্ব্বপুরুষ একই ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু আজ তাহাতে আমাতে আর কোন বিষয়েই সাদৃশ্য নাই।

কারণ সে ধনী আমি দরিদ্র ; সে জমিদার আমি নফর। বাল্যকালে এক বাটীতে থাকিয়াই উভয়ে লিখাপড়া করিয়াছি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের একটু বিকাশও সম্ভবপর হয় নাই। সে দেখিত—সে বাড়ী তার আপনার। আমি দেখিতাম—আমি সেখানে আশ্রিত প্রবাসী মাত্র। সে ছিল আমার ছোট ; তাই সে আমাকে, নামোচ্চারণপূর্ব্বক "বাবু" সম্বোধন করিত। আর অপর ব্যক্তি আমার প্রতিবেশী ; একজন মুসলমান সন্তান। সে আর আমি দুজনে এক রাত্রে একই মুহূর্ত্তে না কি ভূমিষ্ঠ হই। ইহার পিতা আমার মাতামহের আশ্রিত এবং ধর্ম্মপুত্র ছিল। তাই লালচাঁদ আমার "নবু"মামুর ছেলে মামাতি ভাই। বাল্যকালে যতদিন মামার বাড়ী ছিলাম ততদিন ইহার সহিত প্রায়ই একত্র হইবার সুযোগ পাইতাম। বাড়ীতে কোন একটি ভাল খাবার হইলেই লালচাঁদের তাহাতে ভাগ থাকিত। কাজেই সেও যে আমার এক ভাই্ এ শিক্ষা আমি শৈশবেই পাইয়াছিলাম। * * * ইহার ভাগ্যচক্র আর আমার নিয়তি যেন এক সঙ্গে একই ছাঁচে প্রস্তুত হইয়াছিল ; উভয়েই বহু শোক দুঃখ ও বিপদের মধ্যে দিয়া জীবন-পথে ক্ষতবিক্ষত চরণে গমন করিতেছি। এখন সে আমার প্রতিবেশী। আমি বিদেশী প্রবাসী। আমি তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করি জানি না। তবে সে এখনও আমাকে শুধু দাদা বলিতে দ্বিধা রাখে না ; এবং কোন সাহায্যের আবশ্যক হইলে, সে তাহা ভিক্ষা চাহিবার মত চায় না, জোর করিয়া আবদার করিয়াই চায়। বল দেখি কে আমার বেশী নিকটে ? এই চাষী লালচাঁদ, না ঐ জমিদার হীরালাল মৈত্র ? হৃদয়ের সহানুভূতি সমবেদনার বিকাশ যেখানে, সেই স্থানই নিকট, আর তাহার বিপরীত স্থানই দুর দূর—অতি দূর।

কে আমার বেশী নিকটে ? আমার room mate যাঁহার সঙ্গে আমি সর্ব্বদা কথা বলি, গল্প করি, একত্রে শয়ন ভোজন করি অথচ যাঁহার সহিত আমার ভিতরকার কিছুরই ঐক্য নাই। প্রথমে মনে হয়—ইনিই আমার বেশী নিকটে ? না—ঐ দূর সাগরের সুদূর ওপার থেকে বীজগণিতের অজ্ঞাতরাশি 'ক' বা 'খ'এর মত একটা না একটা নামবিশিষ্ট কোন এক অচেনা অজানা কবি,—যে তাঁর প্রত্যেক পংক্তিতে প্রতি বর্ণে আমার মনের কথা অন্তরের নিগূঢ় কাহিনী ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তিনিই বেশী নিকটে ? মনের কথা যে বুঝে, হৃদয়ের ভাব যে বুঝিতে পারে, মর্ম্ম যে অনুভব করিতে পারে, সেই বেশী নিকটে নয় কি ?

তবে আমাদের আত্মার প্রবাহনিদান পরমাত্মা পরমেশ্বর যাঁহার সহিত

আমাদের অতি আদিম এবং চিরস্থায়ী সম্বন্ধ, যিনি আমাদিগকে তাঁহার অনন্ত ভালবাসা হইতে কখন বঞ্চিত করেন না, আমাদের অন্তরের মনুষ্যটির সঙ্গে যাঁর অভিন্ন সম্বন্ধ, অতিশয় সাম্য, অত্যন্ত ঐক্য, তিনিই কি আমাদের নিকটতম বন্ধু নহেন ?

"কোথায় তিনি! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে কোথায় এমন কে আবার আছেন ? সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর যিনি, তাঁহার কথা আবার বলিয়া ফল কি ? যদিই থাকেন, তবুও তিনি সকলের দূরতম। কেন না যেটা যত বেশী দূরে, সেটা তত বেশী ইন্দ্রিয়ের অগোচর। ঈশ্বর সর্ব্বথা সকল মনুষ্যের সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তাই তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহাকে নিকটতম বলিতে পার না। তিনি দূর, দূর, দূরতম বস্তু নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে।"

ওগো, ইন্দ্রিয়ের কথা বলিও না। স্থূল ইন্দ্রিয় ছাড়াও তোমার আরও ইন্দ্রিয় আছে। তুমি মানুষ, তোমার মন আছে, তোমার জ্ঞান আছে। সেই ইন্দ্রিয়ের, তোমার সেই ভিতরের—অন্তরেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব কর, তোমার অন্তর্য্যামী অন্তরঙ্গকে তখনই ধরিতে পারিবে। স্থূল ইন্দ্রিয় তোমাকে বহু নিকটের বস্তুকেও দূরস্থ করিয়া দেখাইতে পারে, আবার বহুদূরের বস্তুকেও অতি নিকটের বলিয়া বুঝাইতে পারে। বৃহৎকে ক্ষুদ্র করিতে পারে, ক্ষুদ্রকেও বৃহৎ দেখাইতে পারে। রজ্জু একগাছি যখন সাপ হইয়া তোমাকে কামড়াইতে আসে আর সে ভয়ে তোমার হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠে ; সামান্য যাদুকর যখন তোমার চক্ষু কর্ণের বিবাদ বাধাইয়া দেয় ; তখন আর সেই ইন্দ্রিয়ের গর্ব্ব করিয়া, যাঁহার কৃপায় ওগুলি আদরে পাইয়াছ তাঁহার অস্তিত্বে সন্দেহ করা যায় কেন ? কি ? তাঁহার সহিত যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ অতীব নিকট,—যার চেয়ে আর নিকটতর সম্বন্ধ হইতে পারে না এমন সম্বন্ধ টানিয়া দূরে ফেলা যায় কি ?

হইতে পারেন তিনি বীজগণিতের অজ্ঞাতরাশিরই মত ব্যক্তভাব অজ্ঞাত। কিন্তু সম্বন্ধ জানা থাকিলে (relations between the unknown quantities being given in terms of known ones) সে ক, খ, এর ত নির্দ্দেশ হয়। সম্বন্ধ জানা থাকিলে, relations জানা থাকিলেই, অজ্ঞাতকেও খুঁজিয়া— বেশী খুঁজিতেও হয় না, অন্ধকারে হাতড়াইতে হয় না—বাহির করা যায় ; দূরতমকেও নিকটতম করা যায়। স্থূল ইন্দ্রিয়ের হিসাবে বহুদূরের জিনিষকেও যখন দূরবীক্ষণের সাহায্যে নিকটতর দেখা যায়, তখন মনোজগতের ত কথাই নাই।

ভগবানকে অতদূরে বোধ হয় কেন? দেখা গিয়াছে অন্ধকার রাত্রে যদি কোথাও আগুন লাগে, ত সেটা যত কাছে বলে বোধ হয়, জ্যোৎস্না রাত্রের আগুন কিন্তু সেরূপ কাছে বোধ হয় না। ইহার কারণ কি? আমি মনে করি অন্ধকার রাত্রে ঐ আগুন এবং আমাদিগের মধ্যে যে সকল ঘর বাড়ী ও জঙ্গলের ব্যবধান রহিয়াছে, সেই ব্যবধানটা দেখা যায় না। ব্যবধান না রহিলেই সেটা নিকটে হইল। জ্যোৎস্না রাত্রে সবই দেখা যায়, তাই দূরের আগুন দূরেই থাকে। ঠিক তেমনই আমার মনে হয় নানা বাজে কাজের ব্যবধান যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই মানুষ ভগবান্‌কে অত দূরে বোধ করে। আর সেই ব্যবধানটা যখন ঘুচিয়া যায় তখনই মানুষ "তোমার বিশাল নন্দনের" গন্ধ পাইয়া তাহাতে প্রবেশ-পিপাসায় পাগল হইয়া উঠে। তাই সম্পদের চাঁদনী চেয়ে, আপদের অন্ধকার অনেকে ভালবাসিয়াছেন।

তাই কে দূরে কে নিকটে কে তাহা বলিবে? যার যেমন অবস্থা, যার যেমন মন, তাহার তেমনি বস্তুই নিকটের হইয়া থাকে।

শ্রীশশধর মৈত্র বি, এ,

প্রার্থনা।

(আমি) যতনে আসন রেখেছি পাতিয়া হৃদয়-গৃহের মাঝে,
(আমার) সুকৃতি অর্থের অভাব বলিয়া ডাকিতে পারি না লাজে,
(যখন) সংসারের সারাটি দিবস ছুটিব আপন কাজে
(তখন) আপনি আসিয়া বসিও সেথায় অতিথি দেবতা সাজে,
(শেষে) বিরল শয্যায় বসিব যখন উষাকালে আর সাঁঝে
(প্রভো) হৃদয়ে চাহিয়া দেখি যেন সেথা তোমার মুরতি রাজে,
(আমার) গোপন অন্তরে নিশিদিন যেন তোমার আহ্বান বাজে
(শেষে) প্রেমের সে ডাকে লইও টানিয়া লুকায়ো অঞ্চল ভাঁজে।

শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত এম, এ, বি, এল,

সাহিত্যসম্মেলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভারতে কথিত ভাষা ও লিখিত ভাষার মর্য্যাদা কথনও এক হয় নাই। কথিত ভাষার নিয়মে লিখিত কোন প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। লিখিত ভাষা কথিত ভাষা হইতে মধ্যে মধ্যে শব্দাদি গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু ঐ ভাষাকে কথনই প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে দেয় নাই। মহারাজ অশোক ও অন্ধ্রবংশীয় রাজগণ তাঁহাদের উৎকীর্ণ লিপিতে কথিত ভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন বটে কিন্তু ঐ প্রথা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। অধিকন্তু ঐ সকল লিপির ভাষা সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে। কথিত ভাষাসমূহ দেশজই হউক অথবা সংস্কৃতেরই অনুসরণ করুক, উহাদের এদেশে কথনও সম্যক্ আদর হয় নাই। কথিত ভাষা কথনও সাহিত্যে স্থান পায় নাই। কিন্তু সম্প্রতি এই ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বাঙ্গালা, উড়িষ্যা প্রভৃতি কথিত বা প্রাদেশিক ভাষার এক্ষণে সম্পূর্ণ সমাদর ও অভ্যুন্নতি হইয়াছে। আমি এস্থলে অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার কথা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাঙ্গালা ভাষার কথা বলিব।

কথিত ও লিখিত ভাষা।

গত ২৫ বৎসর মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। প্রায় ২৩ বৎসর পূর্ব্বে স্বদেশ-বৎসল স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি শোভাবাজারের রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবনে মিলিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানের জন্ম সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৃষ্টি করেন। তদনন্তর রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রিপ্রমুখ পণ্ডিতগণের সহযোগিতায় সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একনিষ্ঠ সেবক আমাদের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চেন্সলর সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়ের প্রযত্নে বাঙ্গালা সাহিত্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকরূপে গৃহীত হইয়াছে। সুবিখ্যাত লেখক রায়সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Reader এবং Ram Tanu Rescareh Fellow নিযুক্ত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক গূঢ় তত্ত্ব শিক্ষিত জগতে প্রকাশ করিতেছেন। শুনিতেছি আমাদের বর্ত্তমান ভাইস্‌চেন্সলর

ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় এম্ এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষা প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত কি না তদ্বিষয়ে গভীর চিন্তা করিতেছেন। সংস্কৃত আস্ত ও মধ্য পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। সংপ্রতি ভারতগবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় স্থির হইয়াছে যে বাঙ্গালা ভাষায় চিকিৎসা গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং বাঙ্গালা ভাষায় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় উপদেশ লাভ করিয়া এতদ্দেশীয় লোক গ্রাম্য চিকিৎসক হইতে পারিবেন। বোম্বাই নগরীতে "মহিলা বিদ্যা পাঠ" নামে যে স্ত্রী-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার কথা হইতেছে উহাতে না কি বাঙ্গালা, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাদানের সম্যক্ ব্যবস্থা করিয়া লিখিয়াছেন :—

বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি।

The Bengali language has made great progress under British Rule; and its further development should be regarded as one of the duties of the State Universities of the Bengal Presidency (Dacca University Committee Report, chap. VII. P 31). "বৃটিশ শাসনে বাঙ্গালা ভাষা সমধিক অগ্রসর হইয়াছে, এবং যাহাতে ইহার আরও পরিপুষ্টি হয় তাহরে উপায় বিধান করা বঙ্গদেশীয় সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের অন্যতম কর্ত্তব্য"। প্রতিবৎসর বঙ্গদেশের স্থানবিশেষে যে সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হয় উহাতে সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাগ্রহ সমাবেশ দেখিয়া আনন্দরসে আপ্লুত হইতে হয়। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সার বিজয় চাঁদ বাহাদুর ও কাশিম বাজারের মহারাজ সার মণিন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ স্ব স্ব রাজধানীতে সাহিত্য সম্মেলনের আহ্বান করিয়া প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। আজকাল নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা হইতেছে। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পরীক্ষার সৃষ্টি ও অধ্যাপকগণের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অবাধিত রাখিয়াছেন বটে কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় আর আশানুরূপ নূতন পুস্তক রচিত হইতেছে না। অথচ বাঙ্গালা ভাষায় বহু উপাদেয় গ্রন্থ লিখিত হইতেছে।

যে সংস্কৃত ভাষা অন্ততঃ তিন সহস্র বৎসর কাল গৌরবমণ্ডিত হইয়া ধরাতলে বিচরণ করিয়াছে, যাহার জয়পতাকা এক সময়ে সমগ্র এশিয়া খণ্ডে উড্ডীন

হইয়াছিল, এবং "আত্মোন্নতিঃ পরগ্লানিঃ" এই কূটনীতির বশীভূত বর্ত্তমান যুগেও যে সংস্কৃত ভাষা ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে গ্রীক লাটিন্ ইত্যাদি ভাষার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সপ্রকাশ রহিয়াছে, সেই সুবিশাল ও সতেজ সংস্কৃত ভাষাকে সাহিত্যের সিংহাসন হইতে চ্যুত করিয়া কেন অধুনা তৎপদে ক্ষুদ্রকায় ও ক্ষীণবল বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাকে অধিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ হইতেছে—

এই প্রশ্ন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তাহা হইলে আমি তাঁহাকে বলিব ইহা বিধির বিধান। কি জানি কি দৈবযোগে খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ পশ্চিম এসিয়ার মুসলমানগণের অধিকার ভুক্ত হইতে আরম্ভ হয়। ১০২৩ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মহম্মদ পঞ্জাব অধিকার করেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে আজমীর ও দিল্লীতে মহম্মদ ঘোরীর আধিপত্য ঘোষিত হয়। তৎপরবর্ত্তী বৎসরে কান্যকুব্জ তাঁহার অধীনত্ব স্বীকার করে। ১২০৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই অযোধ্যা, বিহার, বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রদেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা, হিন্দী, মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাসমূহ সংস্কৃতের প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করিয়া স্ব স্ব মস্তক উত্তোলন করে। বিজেতৃগণের প্রচারিত আরবিক ও পারস্য ভাষার আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া একদিকে সংস্কৃত যেমন আত্মবল প্রকাশ করে, অপরদিকে বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাসমূহেরও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ঘটে। কবি বলিয়াছেন :—

মুসলমানসংঘর্ষ।

> জ্বলতি চলিতেন্ধনোঽগ্নির্বিপ্রকৃতঃ পন্নগঃ ফণং কুরুতে।
> প্রায়ঃ স্বং মহিমানংক্ষোভাৎ প্রতিপদ্যতে হি জনঃ ॥
>
> (অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৬অঙ্ক)।

"কাষ্ঠ সঞ্চালিত করিলে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে, সর্প উদ্বেজিত হইলে ফণা উত্তোলন করে। লোক আঘাত প্রাপ্ত হইলেই নিজ মহিমা বহুল পরিমাণে প্রকাশ করিয়া থাকেন।"

ক্রমশঃ—

"নাস্তী সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৫ম ভাগ।] পৌষ, ১৩২৩। [৯ম সংখ্যা।

চর্পটপঞ্জরিকা-স্তোত্রম্।

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-বায়ুঃ॥
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ় মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে॥

দিন রাত্রি গেল কত সকাল বিকাল
শীত গ্রীষ্ম ঘুরি ফিরি আসে চিরকাল,
চলিছে কালের খেলা, ক্রমে ক্ষীণ আয়ু
তবুত হয় না দূর পাপ আশা-বায়ু।
কর মূঢ়, গোবিন্দের শ্রীচরণ ধ্যান,
বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি পরিত্রাণ।

২

অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানুঃ রাত্রৌ চিবুক-সমর্পিতজানুঃ।
করতলভিক্ষা তরুতলবাসস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপাশঃ॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)

রাখিয়া সম্মুখে অগ্নি পৃষ্ঠে রাখি ভানু;
রজনী যাপন কর চিবুকেতে জানু,

তরুতলে কর বাস, ভিক্ষা করতলে
তবুও আশার পাশ এড়াতে নারিলে।
কর মূঢ়, গোবিন্দের শ্রীচরণ ধ্যান ;
বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি পরিত্রাণ।

৩

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনসক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
পশ্চাদ্ধাবতি জর্জ্জরদেহে বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)

যে অবধি সাধ্য তব বিত্ত উপার্জ্জন
দারাসুত অনুগত রবে ততক্ষণ ;
জরায় হইলে মগ্ন, শক্তি হ'লে হীন
স্বজনে না লবে তত্ত্ব ভাবি হেয় হীন।
কর মূঢ়, গোবিন্দের শ্রীচরণ ধ্যান ;
বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি পরিত্রাণ।

৪

জটিলী মুণ্ডী লুঞ্চিতকেশঃ কাষায়াম্বর-বহুকৃতবেশঃ।
পশ্যন্নপি নহি পশ্যতি মূঢ় উদরনিমিত্তং বহুকৃতবেশঃ॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)

উদর পোষণ তরে শিরে জটাভার,
বাহিতেছ তুমি মূঢ় ! অক্লেশে, আবার
মুণ্ডিত করিয়া কভু মস্তকের কেশ
গৈরিক বসনে তুমি করিতেছ বেশ ;
বহুবেশে বহুবার সাজিলে সংসারে,
অনিত্য সংসার এ যে দেখিলে না ফিরে।
কর মূঢ়, গোবিন্দের শ্রীচরণ ধ্যান,
বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি পরিত্রাণ।

৫

ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা গঙ্গাজললবকণিকা পীতা।
সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চ্চা তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চ্চাম্॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)

যে করেছে কিছুমাত্র গীতা অধ্যয়ন,
কণামাত্র গঙ্গাজল করেছে সেবন,
বারেক মুরারি পদ করেছে অর্চ্চনা
যমের শাসনে কভু সে ভীত হবে না।
কর মূঢ়, গোবিন্দের শ্রীচরণ ধ্যান ;
বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি পরিত্রাণ।

৬

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-পিণ্ডম্॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)

বার্দ্ধক্য আসিলে অঙ্গ শ্লথ হয়ে পড়ে,
মস্তকের কেশগুলি শুভ্র বর্ণ ধরে,
দন্তহীন হয় ক্রমে বিশুষ্ক বদন ,
যষ্টি বিনা অগ্রসর হয় না চরণ ;
দুঃখময় হয় দেহ – যেন কারাগার,
আশার বন্ধন তবু ঘুচেনাকো তার।
কর মূঢ়, গোবিন্দের শ্রীচরণ ধ্যান ,
বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি পরিত্রাণ।

৭

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা-মগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)

শৈশব কাটিয়া গেল খেলা ধূলা লয়ে,
যৌবন যুবতী-প্রেমে আত্মপাসরিয়ে,
বার্দ্ধক্য চিন্তায় যায়—চিন্তা মাত্র সার,
কোন কালে ব্রহ্মধ্যান কেবা করে আর ?
কর মূঢ়, গোবিন্দের শ্রীচরণ ধ্যান ;
বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি পরিত্রাণ।

৮

পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননীজঠরে শয়নম্‌।
ইহ সংসারে খলু দুস্তারে কৃপয়াঽপারে পাহি মুরারে॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)

পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু—জঠরযন্ত্রণা,
বার বার অনিবার—কে করে গণনা!
হে মুরারে? তোমা বিনা এ অধমে পার
কে করিবে? কৃপাময়, করগো নিস্তার!
কর মূঢ়, গোবিন্দের শ্রীচরণ ধ্যান;
বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি পরিত্রাণ।

৯

পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ।
পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্‌॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)

দিবা যায় রাত্রি যায় পক্ষ পুনঃ মাস;
বর্ষ কত যায় চলি—নাহি গেল আশ!
কর মূঢ়, গোবিন্দের শ্রীচরণ ধ্যান;
বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি পরিত্রাণ।

১০

বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ।
নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারো জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)

বয়স হইলে গত—কোথা কাম রয়?
নীরহীন সরোবরে—কমল কি হয়?
বিত্ত নাশে নষ্ট হয়, সাধের সংসার,
ব্রহ্ম জ্ঞান হলে যায় বাসনা অসার।
কর মূঢ়, গোবিন্দের শ্রীচরণ ধ্যান;
বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি পরিত্রাণ।

১১

নারীস্তনভরণাভিনিবেশং মিথ্যামায়ামোহবেশম্।
এতন্মাংসবসাদিবিকারং মনসি বিচারয় বারম্বারম্॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)

যুবকের অনুরাগ যুবতীর স্তনে
জন্মে মাত্র মোহকর মিথ্যার ছলনে।
তুচ্ছ সেই মাংসপিণ্ড মেদের বিকার,
নহে অন্য ;— মনে মনে করহ বিচার।
কর মূঢ়, গোবিন্দের শ্রীচরণ ধ্যান ;
বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি পরিত্রাণ।

১২

কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ কা মে জননী কো মে তাতঃ।
ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিকারম্॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)

কে তুমি, কে আমি, ভবে কোথা হতে আসি ;
পিতামাতা পরিজন—ভালবাসাবাসি,
দেখ দেখি, মূঢ় মন! করিয়া বিচার—
এ সব ভবের খেলা নহে কি অসার ?
কর মূঢ়, গোবিন্দের শ্রীচরণ ধ্যান ;
বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি পরিত্রাণ।

১৩

গেয়ং গীতা নামসহস্রং ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রম্।
নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্তং দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)

কর সদা এক মনে হরিনাম গান,
অপরূপ রূপ তাঁর সদা কর ধ্যান ;
সাধু সঙ্গ লও, দান কর দীনহীনে,
এ সংসারে সার ইহা, জেন নিত্য মনে।
কর মূঢ়, গোবিন্দের শ্রীচরণ ধ্যান,
বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি পরিত্রাণ।

১৪

যাবজ্জীবো নিবসিত দেহে কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে।
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন কায়ে॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)

যত দিন দেহ মাঝে বিরাজে জীবন,
কুশল জিজ্ঞাসে যত আত্মীয় স্বজন ;
আয়ু শেষে এই দেহ শবরূপ হ'লে
প্রাণসমা প্রিয়তমা ভয়ে দূরে চলে।
কর মূঢ়, গোবিন্দের শ্রীচরণ ধ্যান ,
বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি পরিত্রাণ।

১৫

সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ।
যদ্যপি লোকে মরণং শরণং তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)

কামিনী সম্ভোগে আশ—সুখ লালসায়,
দেহ শেষে রোগাধার হয়ে পড়ে, হায় !
যদিও মরণ ভবে নিয়তি লিখন,
তথাপি পাপের মোহ ছাড়ে কোন জন ?
কর মূঢ়, গোবিন্দের শ্রীচরণ ধ্যান ;
বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি পরিত্রাণ।

১৫

রথ্যাকর্পট-বিরচিত কন্থঃ পুণ্যাপুণ্য-বিবর্জ্জিত-পন্থঃ।
নাহং ন ত্বং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)

কুড়ায়ে পথের চীর,— বিরচিয়া কন্থা,
ধর তুমি পাপপুণ্য বিবর্জ্জিত পন্থা !
তুমি আমি চরাচর সত্য কিছু নয়,
কার জন্য তবে মিছে শোক কর, হায়।
কর মূঢ়, গোবিন্দের শ্রীচরণ ধ্যান ;
বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় নাহি পরিত্রাণ।

১৬

কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং ব্রত পরিপালনমথবা দানম্।
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন মুক্তির্ন ভবতি জনমশতেন॥
(ভজ গোবিন্দমিত্যাদি)

সাগরসঙ্গমে গিয়া　　　　　স্নান দান সমাধিয়া
(করে যদি) ব্রত আচরণ।
তবুও জনমে শত　　　　　নাহি পাবে মুক্তিপথ
জ্ঞানহীন জন।
তাই বলি মূঢ় মন,　　　　দেহ মন সমর্পণ
সে অভয় পায়,
কর ত্বরা,—কাল যায়,　　　বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায়
না হবে উপায়।

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

বৈরাগ্য।

স্বর্ণ যেরূপ কুণ্ডলের ভিতরে বাহিরে, সেইরূপ চরাচর ভূতের অন্তরে বাহিরে তিনি অবস্থান করিতেছেন। বেদের "নেতি নেতি" বিচার এইরূপ। বনে বাঘ থাকে তাই বনে বাঘ দেখিবার জন্য বনে আছি—কিন্তু বাঘ চিনি না। বনে একা বাঘই তো নেই, অনেক জন্তুই বনে আছে। এক একটা জন্তুকে দেখি আর লক্ষণের দ্বারা মিলিয়ে দেখি যে, ও বাঘ নয়। এই রকম করে সব জন্তুগুলা যখন বেরিয়ে এলো সকলকেই বাঘ নয় বলে জানলাম, তার পর অবশিষ্ট যে একটি রহিল, সেইটিই বাঘ বলে নিশ্চয় হলো। তার পর ব্যাঘ্রমহাশয় যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর একটা স্বকীয়স্বরূপ প্রকটিত হলো, তা পূর্ব্বে জানা না থাক্‌লেও দেখবামাত্রই বেশ মনে বিশ্বাস হয়ে গেল। এটার নাম প্রত্যয়! প্রত্যয় করবার জিনিষটার মধ্যেও একটা স্বাভাবিক—তার একান্ত নিজস্ব শক্তি থাকে—যেটা প্রমাণনিরপেক্ষ হয়েও আপনাকে আপনি প্রকাশ করে। সে আপনিই আপনার প্রমাণ। আত্মা এ নয় ও নয় করে, যেমনি কি নয় ঠিক হয়ে যায়, আর তেমনি আত্মা যে কি সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয়ে

পড়ে। তা তখন কেউ বুঝিয়ে না দিলেও বুঝতে পারা যায়—এই যে "নেতি নেতি" করে খোঁজার ভাবটা এইটাই বৈরাগ্য। তিনি যদি এ সব না হলেন তবে আমি এ সব নিয়ে করব কি? চিরজন্ম, জন্মজন্মান্তর যাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, সেই প্রাণারাম প্রিয়তম বন্ধুকে না পেয়ে ধূলা মাটির জন্য লালায়িত হয়ে লাভ কি? এই যে সব হতে মনকে ছাড়িয়ে এসে তাঁর দিকে মুখ ফিরাইয়া দেওয়া, ইহাই বৈরাগ্য। যখন বিষয়ে তৃষ্ণা থাকিবে, বিষয়কে স্বাদু বোধ হইবে—ততক্ষণ পরমেশ্বরকে পাইবার তেমন প্রবল ইচ্ছা জন্মে নাই বুঝিতে হইবে। বিষয়ও বেশ লাগে, ভগবান্‌ও বেশ লাগে—এ যে বলে সে মিথ্যাবাদী, ভণ্ড। তাহার কথা কাণে শুনিতে নাই।—তবে যে ব্যক্তি সমস্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়কে ভগবানের প্রসাদরূপে গ্রহণ করিবার শক্তি লাভ করিয়াছে তাহার কথা স্বতন্ত্র। আমি যে তাঁকে চাই, এর মানেই হচ্ছে সংসারের সুখে আমি সুখী নহি। আমি তার চেয়েও অধিক আনন্দ চাই,—সে জন্যই ভগবান্‌কে চাই—কেন না তাঁর মধ্যে ঐকান্তিক আনন্দ পরিপূর্ণমাত্রায় আছে বলে। এত তৃপ্তি, এত আরাম, এত শান্তি আর কোথাও পাই না বলেই তাঁর আশ্রয় লাভের জন্য লালায়িত হয়ে উঠি—তুমি বল্‌বে স্ত্রী-পুত্র ধন-ঐশ্বর্য্য বিদ্যা-বুদ্ধির মধ্যে পরম সুখ নাই, এ তোমায় কে বলে? এ সবের মধ্যে সুখ আছে সত্য, কিন্তু সে সব সুখ অবিমিশ্র নয়। সুখের সঙ্গে দুঃখের বড় মাখামাখি ভাব। সে এক প্রকার (দুঃখের) মাখিল বল্লেই হলো। তাই ও সব সুখকে ছেড়ে দিয়ে যথার্থ সত্য অবিমিশ্র সুখের অনুসন্ধানই মনুষ্য-জীবনের ঐকান্তিক লোভনীয় লক্ষ্য, এবং ইহা কর্ত্তব্যও বটে। এই যে আসলকে পাবার জন্য নকলকে সরিয়ে দেওয়া ইহারই নাম বৈরাগ্য।

তা পর পর-বৈরাগ্য। তাঁর লক্ষণ মুনি বলেছেন,—"তৎপরং পুরুষখ্যাতেঃ গুণবৈতৃষ্ণ্যম্।" পুরুষখ্যাতেঃ অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু "গুণবৈতৃষ্ণ্যম্" কি না প্রকৃতির কার্য্যাদিতে বিতৃষ্ণা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই যে অননুরাগ ইহাই "পরং" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য। এই পরবৈরাগ্যের উদয়ে—যাহা প্রাপ্তব্য তাহা পাওয়া হইয়াছে বলিয়া অন্য প্রাপ্তির আশা মাত্র হৃদয়ে থাকে না। অবিদ্যা-গ্রন্থি হৃদয়দেশ হইতে চিরকালের জন্য উন্মূলিত হইয়া যায়। এ বৈরাগ্য লাভ হইলে আর পতনের আশঙ্কা থাকে না। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান্ বলিয়াছেন— "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।"

অবিদ্যাদি-ক্লেশ ইহাতে নিঃশেষরূপে চলিয়া যায় বলিয়াই এইরূপ হওয়া

সম্ভব হয়। ইহাই মুক্তি এবং এই মুক্তির সহিত পরবৈরাগ্যের কোন তফাৎ নাই! এখন গীতার ভাবটা আর একবার বুঝে দেখ। ভক্ত হতে হলে যে ভারটি কাঁধে নিতে হয় তা খুব হাল্কা নয়। সুতরাং হাত পা ছড়িয়ে চুপ করে শুয়ে পড়বার সুবিধা তাতে একেবারেই নাই!

"যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥"

জ্ঞানীর কর্ম্ম নাই—পাছে এই কথাটা শুনে জ্ঞানী সেজে কর্ম্ম করতে না চাও তজ্জন্য পূর্ব্ব হতেই মুখবন্ধ করে রাখলেন—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"

চিত্তশুদ্ধি না হইলে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, চিত্তশুদ্ধির জন্যই স্ব স্ব আশ্রমোচিত (কর্ম্ম) করা কর্ত্তব্য। অকর্ম্মকৃৎ হইয়া কাহারও থাকিবার উপায় নাই। কারণ প্রকৃতি অবশভাবে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবেই। সুতরাং কর্ম্মেন্দ্রিয় নিরোধ করিলেই কর্ম্মত্যাগ হয় না, মন তাহার কার্য্য করিতে ছাড়ে না; বরং জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা যে কর্ম্ম করে সেই ফলাসক্তি-হীন ব্যক্তিই বিশিষ্ট। অতএব "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং" এবং

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥"

এই কথাগুলি তলিয়ে বুঝিলেই সব কথার মীমাংসা হবে। আগে আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ—এই তিনটি কথা বলার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে "তস্মাদসক্তঃ সততং" কথাটা বুঝবার সুবিধা হবে। "আত্মরতি" আত্মাতে যার রতি—ইন্দ্রিয়বিষয়ে নহে। আনন্দ পায় বলেই কোন একটি বস্তুতে আমাদের আসক্তি হয়। বস্তুতে আসক্ত হওয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ের স্বভাব। স্বভাব তো কেউ ছাড়তে পারে না। তাই করতে হবে কি না চিত্তের বৃত্তিটির মুখটি ঘুরিয়ে দিতে হবে,—বিষয়ের দিকে না রেখে বিষয়ীর পানে। বিষয়ের সহিত যেমন ইন্দ্রিয়ের যোগ হয়,—তেমনি ইন্দ্রিয়দের সহিত বিষয়ীর (আত্মার) সংযোগ স্থাপন করিতে হবে। পাতঞ্জলদর্শনে আছে—"তদাদ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং," অর্থাৎ যে চিত্তবৃত্তির নিরোধ দ্রষ্টার (আত্মার) স্বরূপে অবস্থানের কারণ হয়, তাহাকেই যোগ বলে।

ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের যোগ মানেই হইল এই যে চিত্ত তখন ইন্দ্রিয় দ্বারা

তত্তৎ বস্তুকে গ্রহণ করে, এবং সেই গ্রহণ করা হইল চিত্তের বিষয়াকার ভাব প্রাপ্ত হওয়া। তাই একটা বিষয় যখন ভাব, ঠিক তখনই অন্য একটা বিষয় ভাবতে পার না। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ীর সংযোগও ঠিক ঐ প্রকার। চিত্ত বিষয়ীর ভাব প্রাপ্ত হয়--এবং আত্মা ব্যতীত অন্য কোন ভাবনা ভাবিতেই পারে না। সুতরাং দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থানরূপ যোগ সিদ্ধ হয়।

এখন এইটা মনে করিলেই যে হবে তা মনে করো না। তা হলে সাধনের কণ্টকময় পথে কেহই বিচরণ করিতে চাহিত না—চিত্তের বৃত্তিগুলিকে একবার স্মরণ কর। "ক্ষিপ্তং, মূঢ়ং, বিক্ষিপ্তং, একাগ্রং, নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ" (যোগভাষ্য)। চিত্তের প্রভূত চাঞ্চল্যবশতঃ বিষয় হইতে বিষয়ান্তর গ্রহণ করাকেই "ক্ষিপ্ত" বলা যায়। আলস্য, তন্দ্রা, মোহ প্রভৃতি বৃত্তিকে "মূঢ়" অবস্থা বলে। আর চাঞ্চল্যের মধ্যে মধ্যে যে স্থির ভাব হয় তাহাই "বিক্ষিপ্ত" ভাব। একই বিষয়ে বৃত্তিপ্রবাহের নাম "একাগ্র" ভাব। এইখানে ধ্যেয় পদার্থের স্বরূপ প্রত্যক্ষ হয়; সকল বৃত্তির নিরোধের নাম "নিরুদ্ধ" ভাব। বিক্ষিপ্তাবস্থায় চিত্ত যে সময়ে সময়ে স্থির হয় তাহাতেই সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আবার চিত্তের সাত্ত্বিকতা যত বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে ততই আত্মেতর পদার্থের প্রতি ঔদাসীন্য আনিয়া দেয়, এবং অন্য বস্তুর প্রতি যত উদাসীনতা আসে, ততই আত্মদৃষ্টির প্রতি আসক্তি বাড়িতে থাকে। এইরূপে চিত্ত যখন বৃত্তিবর্জ্জিত হয়,—তারই মানে চিত্ত বলিয়া যখন কোন কিছু থাকে না তখন সংস্কার গ্রহণের থলিটির অভাব হয়,—সুতরাং কোন বিষয়ের সংস্কারই আর জমিয়া উঠিতে পারে না!

এইবার পূর্ব্বের কথায় আসা যাউক। আত্মরতি হলো। তার পর আত্মতৃপ্তি। আত্মরতি হতে হতেই আত্মতৃপ্তি আসে ইহাই দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান; এ হলেই "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" সুতরাং আত্মা ব্যতীত বাহিরে আর কোন পদার্থের আবশ্যকতা নাই। পাখীরা যে গাছগুলিতে বসে তা-সব যদি কেটে দেওয়া যায়—তবে তারা যায় কোথায়? আকাশমার্গে। ঠিক সেই রকম আর কিছুরই যদি আবশ্যকতা না থাকে তবে মন পাখীর তো বসবার স্থান থাকে না—বিষয় না পেলে বিষয়ের সহিত তদাকার কারিত হওয়া ঘুচে যায়—তখন আকাশকল্পম্ আত্মাতে অর্থাৎ আপনাতে আপনি থাকা ছাড়া আর উপায় কি? এই হলো তোমার প্রকৃত "আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ।"

এখন এই সব লোকদের তোমার আমার মত কার্য্য থাকে না। কার্য্য যদি

ফুরাইল তবে "কার্য্যং কর্ম্ম সমাচার" বলে এত মাথার দিব্য দেওয়া কেন? তার কারণ পূর্ব্বেই বলেছি, অর্থাৎ কি না প্রকৃতির কার্য্য হবেই, কিন্তু তখন আত্মানাত্মা বিবেক হওয়ায়—উহাকে আর আত্মকার্য্য বলিয়া ভ্রম হবে না। কিন্তু তা ছাড়া আরও একটা কারণ আছে, তাহা লোকসংগ্রহের জন্য। তোমার কার্য্য ফুরালো বটে কারণ তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন নাই, অন্য লোকদের তো প্রয়োজন শেষ হয়নি, প্রবৃত্তিও মেটে না। কাজেই তাহাদের সাহায্য করতে হবে। যদি বল আমার যখন কাজ শেষ হয়ে গেল তখন অন্যের জন্য খেটে মরি কেন? খেটে মরিতেই হবে। অন্যের জন্য না খেটে মুক্তি নাই। কারণ একা সে তো কিছুই নয়। সবাইকে নিয়েই সে পূর্ণ।

"লভন্তে ব্রহ্ম নির্ব্বাণং ঋষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতেরতাঃ॥"

যাঁহাদের পাপ ক্ষীণ হইয়াছে, দ্বৈধ সংশয় মিটিয়া গিয়াছে, যাঁহারা সংযতচিত্ত এবং সর্ব্বভূতের হিতে রত, এইরূপ ঋষিরা ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা মোক্ষ লাভ করেন। তাই আপনাকে উপলব্ধি করাই সর্ব্ব ধর্ম্মের সার ও জ্ঞানের চরম বলা হইয়াছে। আমার বুদ্ধির জড়তা কেটেচে, আমি শিকল ছিঁড়েছি বটে, কিন্তু অপর সকলে যে হাহাকার করচে—তাদের হাহাকার না ঘুচিয়ে পালাবার জো কি ? একজনের কাছে প্রচুর অন্ন, আর একজন পেটের জ্বালায় কাঁদচে- এখন এই ক্ষুধাতুরকে অন্ন না দিয়ে কোন জ্ঞানবানের ভোজনে অভিরুচি হয় কি? এক ভক্তকে বিধাতা যখন স্বর্গে টানিলেন—সে তখন বলিল "প্রভো! স্নেহ প্রেম দিলে কেন? ঐ বন্ধনে যত পাপীদের সঙ্গে আমাকে বাঁধিয়া দিলে কেন? আমি আজ সে বন্ধন ছাড়াইতে পারিব না। উহারা যদি না যায় আমি যাইতে পারিব না; একজন পাপীকে ছাড়িয়াও না। ওগো পাপী ভাই, তোমরা যাইতে প্রস্তুত হইয়াছ কি? ঐ শুন প্রভু, উহারা সকলে এখনও প্রস্তুত হয় নাই, তবে আজ আমি কিরূপে যাইতে পারি? আমার হাত ধরিয়া তবুও যদি টান, আমার ছিন্ন হস্তমাত্র চলিয়া যাইবে, আমার হৃদয় ও শরীর উহাদের কাছেই পড়িয়া থাকিবে! * * * ওগো এখনও বল পাপী ভাই যাইবার ইচ্ছা হয় নাই কি? না প্রভু! এখনও হয় নাই। তবে আমিও রহিলাম!" ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদও বলিয়াছিলেন—"নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষঃ একঃ।"—এই দীন অসুরবালকগণকে ছাড়িয়া একাকী আমি মুক্তি চাই না!

তাই জীবন্মুক্ত পুরুষেরা স্ব-প্রয়োজন না থাকিলেও কাজ করেন। আর এক কথা তাঁদের "স্ব"টা কেবল তখন ১৪ পোয়াখানি নহে,--তখন তাঁদের "স্ব" বেড়ে বেড়ে এই সারা বিশ্বখানি জুড়ে বসে। তাই ভক্ত তখন অভীষ্ট-দেবীর নিকট প্রার্থনা ক'রতেছেন—' জায়া সুতঃ প'রিজনোহতিথয়োহন্নকামা, ভিক্ষাং পদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যং।" যা আগে স্ব শরীরে ও স্বজনে আবদ্ধ ছিল—এখন তাহা বিশ্বব্যাপী হইয়া দাঁড়ায়! সুতরাং বৈরাগ্যের আসল মানেটা বুঝতে পেরেছ, আপনাকে ছেড়ে সবকে ধরা! আগে নিজের জন্য কাজ করেই সন্তুষ্ট থাকতে এখন বিশ্বের জন্য খাট্‌তে হবে। আগে নিজের সুখ হলেই চল্‌তো—এখন বিশ্বের সুখের জন্য ব্যতিব্যস্ত। বুঝতে পারচ শুধু কাঁথা গায়ে দিয়ে গোপীযন্ত্র নিয়ে গান গেয়ে বেড়ালেই চলবে না! আর একটু চক্ষু বুঁজে পরমপিতার ধ্যান করলেও চলবে না। আশা করি অতঃপর তোমার বৈরাগ্যের প্রতি অনাবশ্যক ঝোঁকটা বেড়ে উঠবে না! এই সব শুনে "বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে, গাণ্ডীবং স্রংশতে হস্তাৎ" বলে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়নের উদ্যোগ করলেও চলবে না। মুক্তি পেতে হলে বৈরাগ্য গ্রহণ করতেই হবে—এবং বৈরাগ্যের জন্য এত কঠোর সাধনারও একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য তাই বলে ভয় পেয়ে চলে যেও না। একটা ভরসার কথা তোমাকে শুনাই। "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ, দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।"—হে তাত, কোন শুভকারী ব্যক্তি দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। তুমি যে ভাবচ এমন সুন্দর সুখ, ভোগ, ঐশ্বর্য্য ছেড়ে দিয়ে কাল্পনিক সুখের আশায়—মন কি যেতে চাবে? চাবে বৈ কি, তবে ক্রমশঃ। "অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে!" মন দুর্নিগ্রহ এবং চঞ্চল ত বটেই, কিন্তু হে কৌন্তেয়, অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভাবে মনকে নিগৃহীত করা যায়! এখানে পাতঞ্জলের সূত্রটি মনে কর—"অভ্যাস-বৈরাগাভ্যাং তন্নিরোধঃ।" ভাষ্যকার বলেন "চিত্তনাম নদী—উভয়তঃ বাহিনী, বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ। যা তু কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা (কৈবল্যের অভিমুখ) বিবেকবিষয়নিম্না (বিবেক-বিষয় যাহার নিম্ন-পথ—বৈরাগ্যের দিকেই যাহার গতি) সা কল্যাণবহা! সংসারপ্রাগ্‌ভারা (সংসার-অভিমুখ) অবিবেকবিষয়নিম্না (অবিবেক বা অজ্ঞান দিকেই যাহার গতি) পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন বিবেকস্রোতঃ উদ্ঘাট্যতে—ইত্যুভয়াধীনশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"॥

এইরূপ বিবেকদর্শনাভ্যাসে যখন বিবেকস্রোত উদ্ঘাটিত হয় তখন আত্মা

ব্যতীত অনাত্ম পদার্থের আস্থা থাকিতে পারে না! থালি প্রিয়া স্বর্ণ পাইলে কেহ ধূলিমুঠার জন্য ব্যাকুল হয় না! সুতরাং স্বভাবতঃই মনের বিষয়-রস গ্রহণে অনিচ্ছা জন্মে! দেহের আসক্তি যায়, ইহামূত্র (ইহকাল ও পরকাল) ফল-ভোগবিরাগ বিকাশপ্রাপ্ত হয়—সুতরাং ঐহিক স্রক্ চন্দন বনিতার প্রতি আসক্তি ঘুচিয়া যায়। এখন দেহপিঞ্জরের আবদ্ধ পাখী শূন্যে উড়িতে শিখিয়াছে। সুতরাং আপনার বা পর বলিয়া ধারণা তাহার মুছিয়া গিয়াছে, সারা বিশ্বই আপনার। তাই শত্রু মিত্রে ভেদ নাই। উচ্চ নীচে পার্থক্য নাই। এক প্রাজ্ঞ, এক আত্মা, এক মহাচৈতন্য সমস্ত বুদ্ধি সাক্ষিরূপে তাহার নিকট পকাশিত, সুতরাং জগৎ জগদ্ব্যাপার—তাহার নিকট ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যা প্রতীয়মান—আর সে কোন্ বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা রাখিবে?—তাই তাহার পরমবৈরাগ্য লাভ হয়—যাহাকে "স্ব-স্বরূপে" অবস্থান বলে! ইহা যাহার হইয়াছে তিনি প্রকৃত বৈরাগ্যবান্ হইয়া ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়াছেন। বৈরাগ্যই শুভকামীদের চিত্তকে পরাভিমুখ—(ঈশ্বরার্পিতচিত্ত) করিয়া রাখে। পরাভিমুখী চিত্ত দ্বারাই "পরম নিবৃত্তি" আসিয়া উপস্থিত হয়। এই "পরম নিবৃত্তি"ই 'পরবৈরাগ্য।" ভগবৎ-কৃপায় এই পরবৈরাগ্যের অধিকার যেন আমরা লাভ করিতে পারি।

(ভূপেন্দ্রনাথ)।

উদ্যান।

আমার বাগানে আজি আয় তোরা আয়,
দেখে যা কি শান্তির নিলয়,
ফুটেছে রজনীগন্ধা গন্ধরাজ তায়,
পরিমল বহিছে মলয়।
দুলিছে পল্লবগুচ্ছ মৃদুল পবনে,
ঝরিতেছে অশোক বকুল,
গাহিছে মল্লিকা বেলা ভ্রমর গুঞ্জনে,
চারিদিক্ আনন্দে আকুল।
আমার বাগানে আজি আয় তোরা আয়
তেয়াগি নগর কোলাহল,
লভিয়া বিশ্রাম হেথা সাঁঝের বেলায়
শান্ত কর মানস চঞ্চল।

দেখ মা উদ্যানবীথি ভরিয়া আমার
রহিয়াছে পদচিহ্ন কার,
গোলাপ টগর যুঁই ফুল ভরা আর
স্বর্গের সে হাসিরাশি তাঁর।
আমার বাগানে আজি আয় তোরা আয়
দেখে যা এ প্রকৃতির ছবি,
কুলু কুলু নির্ঝরিণী- তাতে অস্ত যায়
সায়াহ্নের শান্ত রাঙ্গা রবি।
দেখে যা হাসিছে মোর বাগান শোভায়
শুনে যা এ প্রকৃতির গান
নিভৃতে দুদণ্ড হেথা বসি আজ আয়
করি তাঁর প্রেমসুধা পান।

শ্রীনলিনীনাথ দাসগুপ্ত, এম্ এ, বি, এল্।

দুঃখের আত্মকাহিনী।

আমি ভুবনত্রাস দুঃখ। আমি দ্বিরূপ, কিন্তু বহুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকি। আমার লীলা অসীম—অপরিব্যক্ত।

আমি ব্যাধিরূপে শরীরীর শরীরে প্রকাশ। আমার ক্ষয়কল্পে কত না প্রকরণ উদ্ভাবিত হইয়াছে। আমার হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভ আশায় কত না ঔষধেরই প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই ঔষধ প্রয়োগাদির নাম চিকিৎসা। এক শ্রেণীর মানব চিকিৎসাকার্য্য করিয়াই জীবিকার্জ্জন করে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে। তাহারা আমার কৃপায় যশস্বী। তাহারাই সম্যক্‌রূপ পরিজ্ঞাত যে আমি বিনা কারণে কাহাকেও ক্লেশ দিই না বা যাহাকে যতটুকু ক্লেশ দিয়া থাকি তাহার অধিক ক্লেশ আমারও দিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং সাধারণবুদ্ধি মানবের ন্যায় তাহারা আমার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া আমার প্রীতিসাধনে তৎপর হয়।

ব্যাধিরূপে আমি অসংখ্য মূর্ত্তি ধারণ করি। এখনও তৎসমুদায়ের নামকরণ হয় নাই। পুরাণকারের ব্যাখ্যায় জানিয়াছি আমার এই রূপ ঈশ্বরসৃষ্ট।

আমার তাহাতেই বিশ্বাস হইয়াছে আমি নিন্দনীয় ঘৃণ্য বা ভয়যোগ্য নহি। আমারও জগতে আবশ্যক আছে। যাহারা আমাকে পৃথিবীত্যাগী করিতে চায় তাহারা বাতুল। তাহারা বুঝে না যে আমি সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা ভগবানের কার্য্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ এবং সেই পরমকারুণিকের অভিলাষ পূরণ করি মাত্র।

মনুষ্য মূর্খতাপ্রযুক্ত আমার দ্বিতীয় রূপ সৃষ্টি করিয়া মনকে আমার কার্য্যক্ষেত্র নিরূপণ করিয়া দিয়াছে। সৃষ্টি করা বিধাতারই হাত ছিল, মানুষ প্রতিযোগিতা করিতে গেল, সুতরাং মানুষের এই সৃষ্টি আদৌ শুভফলপ্রসূ নহে। তাই সকল অশুভের সহিত আমি সংশ্লিষ্ট।

ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়সংযোগই আমার দ্বিতীয় রূপে আবির্ভাবের কারণ। সুখও আমার ন্যায় এই ভাবেই উৎপন্ন।—

"মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যা স্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত।"

প্রথম রূপে যেমন আমি অসংখ্য মূর্ত্তি ধারণ করি, এই দ্বিতীয় রূপেও আমার মূর্ত্তি অগণ্য। আমার সংক্রামতা আছে। কিন্তু তাহা সর্ব্বজনীন নহে। পরের সুখেও আমি বিষাদ আনিতে পারি। আমার এই মূর্ত্তির নাম—পরশ্রীকাতরতা।

ইচ্ছা করিলে সকলেই আমাকে প্রতিরোধ করিতে পারে। কিন্তু মানুষ আমাকে এইরূপে সৃষ্টি করিয়া আমার এইই ভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে কেহই আমাকে ত্যাগ করিতে স্বীকৃত নহে। আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকিয়াও তাহারা আনন্দানুভব করে। তাই "Own sweetest songs are these that tell of saddest thoughts," "Sorrows crown of sorrow is remembering of happy thing," এই সব কথার উৎপত্তি।

আমি সর্ব্বব্যাপী। সমগ্র পৃথিবীকে আপন শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছি। মানুষ বুঝে না, সৃষ্টি প্রয়োজন ও সুবিধা অনুসারেই হইয়া থাকে, সুতরাং প্রয়োজনের অভাবে আমার পৃথিবীতে তিষ্ঠান ভার হইত।

আমি মনুষ্যসৃষ্ট বলিয়াই সকলের নিকট আমার সমান আদর নাই। পুত্রশোক মূর্ত্তিতে আমি সকল পিতার মনে সমান ব্যথা দিতে পারি না। উৎসবব্যস্ত উৎসবস্বামী অনাচ্ছাদিত-গাত্রে পৌষের শীতে ও শীতানুভব করেন না, তাই তাঁহাকে গাত্রবস্ত্র অভাবে ক্লেশ দিতে পারি না। প্রণয়ী প্রিয়ার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া দুঃখিত হয় না, বরং আনন্দানুভাব করে।

পৃথিবীতে আমি এতদিনই আছি যে কেহ কেহ আমাকে ঈশ্বর-সৃষ্ট এরূপ সন্দেহ করেন :—

"সুখ কি জীবিত মানে, কিবা অর্থ নির্ব্বাণে,
কাহা হতে জনমিল জগতের যাতনা।
অশুভ সৃজন কার, নিরমল বিধাতার
মানস হইতে কি এ মলিনতা রচনা॥

সেই সচ্চিদানন্দের নিকট আমি পাবক-স্পৃষ্ট শুষ্ক পত্রের ন্যায় স্বতঃই বিনষ্ট। সৎ চিৎ আনন্দ রূপ ব্রহ্ম দেহগত হইলেই তাঁহার নাম হইল আত্মা। আত্মা অবিনশ্বর ঘটের মধ্যে আকাশ সদৃশ। দেহের বিনাশে আত্মার বিনাশ সাধিত হয় না। দেহই সুখ-দুঃখভোগী, আত্মা নহে।

দেহী নিজ সুখান্বেষণ করে অকৃতকার্য্য হইলে আমার বশ্যতা স্বীকার করে। তাই মানসিক দুঃখ স্ব স্ব নিজস্ব। এই সুখান্বেষণে যে যত ব্যস্ত তাহার ততই দুঃখ ; কারণ আশানুরূপ সুখ লাভ করা কঠিন। সুখ বাহ্য বস্তুতে নহে, সুখ মনে। এই নিমিত্তই শাস্ত্রে নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্মাচরণ করার বিধান আছে। যাহারা আমার দ্বারা প্রপীড়িত সুতরাং ইচ্ছা করিলেই তাহারা আমার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে।

লোকে প্রকৃত সুখের আস্বাদন জানে না বা কিরূপে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্‌বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়াই আমার এত প্রতিপত্তি। আপনার নিকট চাবী রাখিয়া খুঁজিয়া বেড়ানর মত তাহারা আনন্দ বা সুখের অন্বেষণ করে, নতুবা আমার স্থান থাকিত না। বাহিরের বস্তুতে এই আসক্তির নাম—মায়া। মায়া ত্যাগ করিতে না পারিলে আমার হস্তে নিস্তার নাই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ বি, এল্।

অরূপের রূপ।

নয়ন-কোণে হাসির রেখা
নয়ন মন জুড়াইয়ে,
ক্ষণিক হেসে হৃদয়াকাশে
কোথায় গেলে মিলাইয়ে ?

উপাধি হীন অরূপ মাঝে
নাহি যায় সে রূপ দেখা,
চন্দ্রমার লেখা যেন
মেঘ আবরণে ঢাকা।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বরূপ
কাতরে কৃপা বিতরি গো,
মদন-মন মোহিত করি
বিনোদ রূপ ধর যে গো।
ওরূপ হেরে মদন শত
মূরছি যাক চরণোপরে,
বাজাও সখা বিনোদ বাঁশী
ভকত-প্রাণ আকুল করে।
যেরূপ হেরে সত্যলোকে
ব্রহ্মাদি মহিমা গায়,
আঁধার মুছি ঝলকে জ্যোতি
নিখিল লোক প্রকাশ পায়।
দহরাকাশে মুরলি-ধ্বনি
শুনিয়া যোগী মূরছি পড়ে,
ব্যাকুল আঁখি হইতে কত
অমিয়মাখা সলিল ঝরে।
পাগল হর মগন ধ্যানে
যাঁহার লাগি কৈলাসে,
প্রমথগণ সে ভাব হেরি
নৃত্য করে উল্লাসে।
কত যে ঋষি যোগেতে বসি
করিছে তনু মন ক্ষীণ
পলকহীন নয়নে তারা
যাচিছে তাঁরে অনুদিন।
মধুর সুরে নারদ ঋষি
গাহিছে তাঁর মহিমা গান,

নয়নে তাঁর ঝরিছে বারি
প্রেমেতে যেন পাগল প্রাণ।
তপন শত চন্দ্র তারা
ঘুরিছে নীল অম্বরে,
সকল ভুলি তোমাকে চাহি
রোদন নাহি সম্বরে।
নিখিল-জন-হৃদয়-ধন
অপরূপ কিশোর শ্যাম,
যেরূপে মোহি ব্রজ-গোপীরা
ত্যজিল নিজ কুল মান।
সাধুরা তাঁকে স্মরণ করে
গহন বনে পশিয়া,
গভীর ধ্যানে মগন হয়ে
নিখিল যায় ভুলিয়া।
সে রূপ হেরে সকল ভুলে
মূরছি গেনু পদতলে,
হাসিয়া তুমি ঝটিতি এসে
লইলে মোরে কোলে তুলে।
আদরে তনু পরশি মোর,
বলিলে "সখা কি চাহ আর?"
নয়নে মোর ঝরিল বারি
উথলি প্রেমপারাবার।
বলিনু আমি কিবা যে মোর
আছে গো প্রভু চাহিবার,
জানি না আমি পেলাম তবু
সর্ব্বস্ব যা পাইবার।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ—

আর্য্যললনা—শশিকলা।

(শ্রাবণ-সংখ্যার পর।)

আর্য্য হিন্দুগণ অতিথিকে সর্ব্বদেবময় বলিয়া জানেন। অতিথির সেবা হিন্দুদিগের প্রধান ব্রত। যে গৃহে অতিথি অনাদৃত হয় আর্য্যগণ সেই গৃহকে নরকাপেক্ষাও ঘৃণ্য মনে করেন। পুরাণে উক্ত আছে যে, ভক্তপ্রবর লোমশ ঋষি স্বীয় দেহস্থ লোমাবলির ন্যূনতা সম্পাদনাভিপ্রায়ে একদা বিধাতার নিকট গমন করিয়াছিলেন। কমলযোনি তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে চণ্ডালান্ন গ্রহণের উপদেশ ব্যবস্থা করিলেন। ঋষিবর মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া কচিৎ চণ্ডালকুলজাত ভগবদ্ভক্তের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তদ্দত্ত ভোজ্য পানাদি গ্রহণে সেই সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিপরায়ণ ঋষি-প্রবর স্বীয় দেহজাত রোমাবলির কিঞ্চিন্মাত্রও ন্যূনতা দেখিতে না পাইয়া, পুনর্ব্বার বিধাতার নিকট গমন করত তদীয় আচরিত-কর্ম্মের যথাযথরূপ বর্ণন করিয়া বিধিবাক্যের ব্যত্যয় হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ও বিধি-প্রমুখাৎ চণ্ডালকুলজাত ভগবদ্ভক্তের তথাকথিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ-ত্বতথ্যাবগত হইয়া বিধাতার নিকট যথার্থ চণ্ডালের অনুসন্ধান প্রার্থনা করিলেন। বিধাতা মর্ত্ত্যবাসী ব্রাহ্মণকুলজাত জনৈক কদাচারপরায়ণ ব্যক্তির সন্ধান বলিয়া দিলেন। ঋষিবর তাহার দ্বারে সমাগত হইয়া আতিথ্য প্রার্থনা করিলে, সেই ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও তদীয় গৃহিণীর সম্মার্জ্জনী আঘাতেও ক্ষুব্ধ না হইয়া অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন ও অবশেষে উচ্ছিষ্টকুণ্ড-নিক্ষিপ্ত ভুক্তাবশেষ অন্ন-কণিকা গ্রহণ করিবার মুহূর্ত্ত মধ্যেই তদীয় মুখমণ্ডল ও করচরণাদি বিরল লোমাবৃত দর্শন করিতে পাইলেন। ফলতঃ ঋষিকুলোপদিষ্ট শাস্ত্র-বাক্যে ও একমাত্র সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার প্রতি সবিশেষ আস্থাবান্ আর্য্য হিন্দুগণ জগতের যাবতীয় দৃশ্যকেই সেই পরমপুরুষের অভিব্যক্তি বলিয়া জানেন ও জগতের যাবতীয় বস্তু যে তাঁহারই রূপের প্রাকৃতিক আভাসমাত্র ইহা জানিতে পারিয়াই সর্ব্বজীবে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান-জ্ঞানে সম্মান করিতে পারেন। তাই এককালে হিন্দুগণ গৃহাগত পরমশত্রুকেও অতি আদরে সেবা করিতে পারিতেন—অতিথির কুল, শীল, চরিত্রাদির বিচার না করিয়া নারায়ণ-বুদ্ধিতে তাঁহার সেবায় পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেন ও অতিথির কৃত অপকারকেও নিজের কর্ম্ম-ফল-বোধে সন্তুষ্ট থাকিয়া অতিথির প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ হইতেন না। তাই নীতি-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—

অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতি দ্রুমঃ॥
অপিচ -উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতে।
পূজনীয়ঃ যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ॥

বিশেষতঃ অতিথি যে দেবতা, তিনি যে নারায়ণেরই মূর্ত্তি—তিনি গুরু, তিনি গুরুর ন্যায় পূজার্হ থাকিবেন বই কি?—সে ত যেমন তেমন গুরু নয়; বৈশ্বানর যেমন দ্বিজগণের—ব্রাহ্মণ যেমন সংসারাশ্রমসেবী বর্ণনিচয়ের—পতি যেমন সতীর গুরু, অভ্যাগত জনও সেই প্রকার গুরু। সর্ব্বত্রই অভ্যাগত গুরুর ন্যায় বরণীয় ও সেবার্হ। তাই গুরুরূপী অতিথির সেবায়—দেবতার সেবায়—যথার্থ হিন্দু কোনও দ্বিধা বোধ করেন না। সহস্র কিরীটের অধীশ্বর নরপতিগণও অতিথির সেবা করিতে পাইলে সেই দিবস জীবনের একটী পুণ্য দিন মনে করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন এমন কি অসূর্য্যম্পশ্যা কুলাঙ্গনাদিগকেও অতিথির সেবায় নিয়োগ করিতে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু কোনও প্রকার দ্বিধা বোধ করেন না বা রমণীগণও কোনও প্রকারের কুণ্ঠানুভব করেন না। কারণ, ইহা যে প্রত্যক্ষ দেবতা—বৈকুণ্ঠবিহারী মূর্ত্তিমান্ নারায়ণের সেবা, তাহাতে কুণ্ঠা কি?

আজ ভূদেব ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে কাশী রাজপুরে সমাগত। রাজকুমারী শশিকলা এই অতিথি দেবতার—নররূপী বৈকুণ্ঠবিহারীর সেবায় নিয়োজিতা হইয়াছেন; তাই তাঁহার দুশ্চিন্তা-পরিশীর্ণদেহলতা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তিনি অতিথি বেশধারী ব্রাহ্মণকে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু দেবাদিদেব গৌরীপতি রূপে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন। আজ তিনি তাঁহার চির-পূজিত আরাধ্য দেবতাকে মূর্ত্তিমান্ অনুভব করিয়া তাঁহার সেবায় পরমানন্দে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন; তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া কেবলমাত্র দৈহিক সংস্কারবশে বহিরাচরণ নিষ্পন্ন হইতেছে মাত্র।

যথাবিহিত রূপে মধ্যাহ্নকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক আহারান্তে যখন ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন কিঙ্করীগণপরিবৃতা রাজনন্দিনী স্বহস্তে চামর ধারণ করিয়া তাঁহার অঙ্গে মৃদু মৃদু বিজন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের ইন্দ্রিয়-নিচয় তন্দ্রাভিভূতের ন্যায় অন্তর্ম্মুখী হইয়া আসিলে, তিনি ক্ষণকালের জন্য সুপ্ত-মীন-হ্রদের ন্যায় প্রশান্ত ভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া নৃপনন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"বৎসে, তোমার শুদ্ধসত্ত্বানুপ্রাণিত সেবায় আমার অন্তরাত্মা পরিতুষ্ট হইয়াছেন, আশীর্ব্বাদ করি তোমার অভিলষিত পতিলাভ হউক।" এই বলিয়া

তিনি কহিতে লাগিলেন—"বৎসে, আমি অধুনা ভরদ্বাজাশ্রম হইতে আগমন করিতেছি। সেইস্থানে পরলোকগত মহারাজ ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শনকে দেখিয়া আসিলাম। রাজকুমার সুদর্শনের রূপ, গুণ ও মহানুভব চরিত্র প্রভাবে ভরদ্বাজাশ্রম যেন বিভূষিত বোধ হইল। বৎসে, তোমার হৃদয়ে যেরূপ সত্ত্ব-বৃত্তির আভা দর্শন করিতেছি, সেই রাজনন্দনও তাদৃশ সত্ত্বসম্পন্ন। বিধিনির্ব্বন্ধে তোমাদের পরস্পরে সম্মিলন সংঘটিত হইলে তাহা যথার্থই কল্যাণজনক ও সুখকর হইবে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান সময়ে পিতৃহীন নৃপনন্দন হৃতরাজ্য হইয়া তাপসাশ্রমবাসী হইলেও তাদৃশ শৌর্য্য বীর্য্য ও চরিত্রবান্ ব্যক্তি কখনও হীন হইয়া থাকিতে পারে না, ইহাই আমার বিশ্বাস।"

শশিকলা দ্বিজমুখে নিজ আরাধ্যদেবতা সুদর্শনের গুণগ্রাম শ্রবণে ঈষৎ চমকিতা হইলেন ও বিনয়নম্রবচনে কহিলেন—মহাত্মন্, আপনি যে নৃপনন্দনের নাম করিলেন, তিনি কি কারণে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ভরদ্বাজাশ্রমে বাস করিতেছেন তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার সাতিশয় কৌতূহল জন্মিতেছে। যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বিবৃত করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন—সুব্রতে, তিনি অযোধ্যাপতি মহারাজ ধ্রুবসন্ধির পুত্র। মহারাজ ধ্রুবসন্ধির মনোরমা ও লীলাবতী নামে দুই পত্নী ছিল। জ্যেষ্ঠা মনোরমা রাজা বীরসেনের কন্যা, তাঁহারই গর্ভে সুদর্শন জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যুধাজিতের কন্যা লীলাবতীর গর্ভে শত্রুজিৎ জন্মগ্রহণ করে। মহারাজ ধ্রুব-সন্ধি অশেষ পরাক্রমশালী হইলেও মৃগয়াব্যপদেশে দৈববশতঃ সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর লীলাবতীর পিতা যুধাজিৎ বীরসেনকে সংগ্রামে পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বীয় দৌহিত্র শত্রুজিৎকে অযোধ্যার সিংহাসনে স্থাপিত করেন। সুদর্শন-জননী নিজ পুত্র সহ রাজ্য ত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে ভরদ্বাজা-শ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যুধাজিৎ সুদর্শনকে সংহার করিবার অভিপ্রায়ে এই আশ্রমোপকণ্ঠ পর্য্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মুনির নিষেধ-ক্রমে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেনাপরিচ্ছদ ও রাষ্ট্রসম্পদ্‌বিহীন সুদর্শন মুনিবরাশ্রমে থাকিয়া নানাবিধ শাস্ত্রজ্ঞানে ও দেবী ভগবতীর কৃপায় শুদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়াছেন। ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি ব্রহ্মজ্ঞান ব্রাহ্মণের অগ্র-গণ্য হইবার যোগ্য। অপিচ শস্ত্রবিদ্যায়ও তাঁহার সমকক্ষ বীর জগতে দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বৈরথসংগ্রামে তাঁহার সমযোধ ধরাতলে নাই।

আকুলহৃদয়া শশিকলা কহিলেন—"আপনি কে মহাভাগ? এই দুঃখিনী তনয়ার মর্ম্মবেদনা বুঝিতে পারিয়া দেবাদদেব শঙ্কর কি এই দ্বিজ-দেহ ধারণ করত তাহাকে সান্ত্বনা দান করিতে আসিয়াছেন! পিতা, আপনার এই অসহায় বালিকা স্বপ্নযোগে—স্বপ্নযোগেই বলি—সেই নৃপনন্দন সুদর্শনকে মাল্য সম্প্রদান করিয়াছে। প্রভো, পিতা, এক্ষণে এই দীনা বালিকার অমূল্য রত্ন সতীত্বসম্পদ কি প্রকারে রক্ষিত হইবে দেব?" এই বলিয়া নরেশনন্দিনী দরবিগলিতধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"বৎসে, সতি, যাঁহার সতীত্ব প্রভাবে বিশ্ববিধৃত রহিয়াছে সেই মহা সতী শঙ্করজায়া অবশ্যই সতীমর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। জগৎ সতী-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। কোনও প্রকৃতিরূপিণী সতীরমণীর মর্য্যাদা হানি হইলে যে সেই মহাদেবীর 'সৎ'স্বরূপ অঙ্গ ক্ষুণ্ণ হয় মা, সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমপুরুষ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সৎভাবে কি ক্ষুণ্ণতা আসিতে পারে? তাহা ক্ষুণ্ণ হইলে বিশ্ব কোথায় থাকে? সুতরাং কায়মনোবাক্যে সতীত্বের সেবায় যত্নবতী থাক, সতীত্ব রক্ষণের অন্তরায় উপস্থিত দেখিলে এই অকিঞ্চিৎকর তনু ত্যাগত অতি সামান্য কথা। মা, তুমিই মহাসতীর অংশ; সেই সতীরত্ন সতীত্ব, সতীত্ব তোমার নহে, তুমিও সতীত্বের কণা। বিশ্বরূপিণীর সতীত্বসাগরে তোমার এই ক্ষুদ্র 'আমি' কণাটিকে নিঃশেষে মিশাইয়া দিয়া সতীত্বের মহিমামণ্ডিত গৌরবে আত্মনির্ভর করিয়া থাক, জগদম্বা অবশ্যই সতীমর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। পুত্রি, জগতে সতীমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকুক। তোমার ও জগতের সতীরমণীগণের সকলের প্রতিই আমার এই আশীর্ব্বাদ। বৎসে, এক্ষণ গৃহে গমন কর। আর বৃথা দুশ্চিন্তায় সতীজননীর এই সুরম্য মন্দিরখানি—এই কোমল তনু—নষ্ট করিও না।"

রাজনন্দিনী অতিথির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনুমতি লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক চৌধুরী।

———

প্রতীক্ষা।

নয়নজলে ধুইয়া, হৃদয় শূন্য করিয়া
আজি রেখেছি,
তুমি আসিবে, তুমি বসিবে, তুমি ডাকিবে
আমায় ভেবেছি।
বাঁশী বাজিবে, মন হারিবে
তুমি আসিয়া,
আমি সেই ভরসায় বসে রয়েছি॥
চৌদিকে বায়ু বহিবে বহিবে, ফুল গন্ধে
আকাশ ভরিয়া,
সখা আসিবে আসিবে, বাঁধিবে বাহুবন্ধে
প্রেমে মাতিয়া॥
আঁধার ঘুচিবে আলো ফুটিবে ভূলোকে
দ্যুলোকে ব্যাপিয়া,
সুপ্তি মাথা সে অমল দীপ্তি আসিবে
এখনি ছুটিয়া॥
সব হতে তাই হৃদয় আমার ছিন্ন
করিয়া লয়েছি,
শুধু তারি তরে হৃদয়কমলে আসন
বিছায়ে রেখেছি॥
যতদিন সে, না আসিবে, শূন্য আসন
রবে পড়িয়া,
তবু আর কারে নিভৃত অন্তরে বসাব না
কভু ভুলিয়া॥
যেদিন হে নাথ পাবে অবসর, আসিও
আমার আবাসে
জুড়ায়ে দিও এ আকুল জীবন তোমার
প্রেমপরশে॥

তুমি নিজ পানে টানিছ নিয়ত
তাইত বাঁধন খসে যায় কত,
বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি,
(তাই) সবাকে ভুলিয়া ব্যাকুল হইয়া
তোমাকেই শুধু লক্ষ্য করিয়া
কত কাল ছুটে চলেছি ॥

নিবেদন ।

প্রভু,

লহ পদতলে টানিয়া,
তৃষিত এ প্রাণে প্রেম-সুধা দানে
তৃষা দাও তার মিটায়ে ॥
কামনা-অনলে প্রাণ যায় জ্বলে
দাও জ্বালা দাও জুড়ায়ে,
তব চরণ-ধৌত-শান্তি-কিরণে
দাওগো স্নিগ্ধ করিয়ে ॥
অযাচিত কত করুণা তোমার
পড়ে অবিরত ঝরিয়ে,
যে তোমারে চাহে তুলে তারে নিতে
আস কোথা হতে ছুটিয়ে ॥
আঁখি নাহি খুলি মাথে যারা ধূলি
ধূলিতে পড়িছে লুটায়ে,
(তুমি) অঞ্চলে ধূলি মুছায়ে তাহার
নিজ কোলে লও তুলিয়ে ॥
যে তোমারে নাহি চাহে কোন দিন
তারেও দাওনা ফেলিয়ে,
গোপনে গোপনে ধীরে ধীরে তারে
লও নিজ পাশে ডাকিয়ে ॥

না জানি কেমনে তার প্রাণে
কি যে ব্যথা দাও জাগায়ে,
(সে)　সব ফেলে দিয়ে আকুল হইয়ে
তব পদে পড়ে লুটায়ে।
যে তোমায় নমি ভক্তি-কুসুমে
দেয় পদ দু'টি সাজায়ে,
তুমি চরণ-ছায়ায় ডেকে তারে নাও
কত না আদর করিয়ে।
তোমার করুণা মরমে জাগিলে
সব ব্যথা যাই ভুলিয়ে,
নির্ভয়ে আমি পশিতে যে পারি
মরণের মাঝে হাসিয়ে॥

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

পঞ্চীকরণাখ্য জীববাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৩২২ সালের মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায় শিষ্য গুরুকে পঞ্চ ভূতের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিতে কহিয়া, এই স্থূলদেহে পঞ্চ ভূতের কোন্ কোন্ অংশ আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত বিনয়-নম্রবচনে গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

এক্ষণে গুরু স্থূলদেহের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব শিষ্যের অববোধার্থ কহিতে লাগিলেন।

স্থূলদেহের তত্ত্বের কোষ্ঠক।

আকাশের	বায়ুর	তেজের	জলের	পৃথিবীর
কাম	চলন	ক্ষুধা	শুক্র	অস্থি
ক্রোধ	বলন	তৃষ্ণা	রক্ত	মাংস
শোক	ধাবন	আলস্য	লালা	ত্বক্
মোহ	প্রসারণ	নিদ্রা	মূত্র	নাড়ী
ভয়	আকুঞ্চন	কান্তি	স্বেদ	লোম

গুরু :—হে শিষ্য! আকাশের পাঁচ তত্ত্ব—কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ এবং ভয়।

এই পাঁচ তত্ত্ব হৃদয়াকাশে উৎপন্ন হয়, এ জন্য উহারা আকাশের। তুমি উহাদিগের দ্রষ্টা, এজন্য ঐ সমস্ত তত্ত্ব তুমি নহ; এবং উহারা আকাশের, এজন্য উহারা তোমার নহে। তুমি উহাদিগের দ্রষ্টা। এই পাঁচ তত্ত্ব দ্বারা প্রত্যক্ষ দুঃখ উৎপাদন করে, এজন্য উহাদিগকে তুমি শীঘ্র পরিত্যাগ কর।

দেখ কামে আসক্ত হওয়াতে রাবণ কত ক্লেশ ভোগ করিয়াছিল; উহার রাজ্য স্বজন পরিজন বন্ধুবর্গ সমস্ত নাশপ্রাপ্ত হইল। এজন্য কাম সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ক্রোধ রাক্ষস অপেক্ষাও অধিক দুর্জ্জন। কারণ রাক্ষস অন্যের রক্ত পান করে কিন্তু ক্রোধী ব্যক্তি নিজের এবং অন্যের—সকলের রক্ত শোষণ করে। রাক্ষস রাত্রিতে নিজকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু ক্রোধী ব্যক্তি দিবারাত্র সকল সময়েই নৃত্য করিতে থাকে। রাক্ষস অন্যকে ভয় ও ত্রাস প্রদান করে, নিজে ভয় পায় না; পরন্তু ক্রোধী নিজে ভয় প্রাপ্ত হয় এবং অন্যকে ভয় ও ত্রাস প্রদান করে।

এজন্য ক্রোধ রাক্ষস অপেক্ষাও অধিক দুঃখদায়ী। সুতরাং ক্রোধ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে।

এই প্রকার মোহ ও ভয় হইতেও দুঃখ হয়। উহা প্রাণী মাত্রেরই অনুভব-সিদ্ধ। সুতরাং উহাদিগকেও ত্যাগ করিবে। উহাতে অহংতা মমতা ভ্রমক্রমেও করিবে না।

যদ্যপি উক্ত কামাদি পঞ্চতত্ত্ব সূক্ষ্মদেহের ধর্ম্ম, স্থূলদেহের নহে; কিন্তু ইহাদের আবেশ প্রত্যক্ষ স্থূলশরীরেই অনুমিত হয়। এজন্য ইহাদিগকে স্থূলশরীরের তত্ত্ব কহা গেল।

এই প্রকার বায়ুর পাঁচ তত্ত্ব প্রসিদ্ধ আছে। যথা,—চলন, বলন, দৌড়ান, প্রসারণ ও সংকোচন।—

এই পাঁচ তত্ত্ব তুমি জান, এজন্য তুমি ঐ পাঁচ তত্ত্ব নহ। উহারা বায়ুর, সুতরাং তোমার নহে। বায়ু বিনা চলনাদি ক্রিয়া হইতে পারে না, এজন্য ইহা-দিগকে বায়ুর কহা যায়। তুমি এই সকলের সাক্ষী—তুমি দ্রষ্টা। দ্রষ্টা দৃশ্য কি রূপে হইতে পারে? এই রূপ অবগত হইয়া তুমি ইহাদের প্রতি অহংতা মমতা ত্যাগ কর। ঐ প্রকার, তেজের পাঁচ তত্ত্ব যথা—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা ও কান্তি।

এই পাঁচ অগ্নির তত্ত্ব প্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ। যেহেতু জঠরে অগ্নি প্রবল না হইলে ক্ষুধা লাগে না। গ্রীষ্মকালে অগ্নির প্রাবল্যবশতঃ অধিক তৃষ্ণা জন্মে। এই প্রকার আলস্য ও নিদ্রা গ্রীষ্মকালে অধিক হইয়া থাকে। তখন বিশ্রাম করিলে অন্ন পরিপাক হইয়া যায়। সুতরাং উহারা সমস্ত প্রত্যক্ষ অগ্নির ভাগ। কান্তি তো সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তেজই। তুমি এ সকলের দ্রষ্টা—সাক্ষী, সুতরাং তুমি উহা নহ; এবং উহারা তেজের, এজন্য তোমার নহে। ইহা অবগত হইয়া উহাদিগের প্রতি অহংতা মমতা পরিত্যাগ কর।

জলের পাঁচ তত্ত্ব, যথা—শুক্র (বীর্য্য), রক্ত, লালা, মূত্র এবং স্বেদ।

এই পাঁচ তত্ত্ব প্রত্যক্ষ জলরূপই। এই হেতু তুমি উহা নহ এবং উহারা জলের, সুতরাং তোমার নহে। তুমি উহাদের দ্রষ্টা—উহা হইতে ভিন্ন, অতএব উহাদের প্রতি অহংতা মমতা পরিত্যাগ করিয়া সুখী হও।

পৃথিবীরও পাঁচ তত্ত্ব যথা—অস্থি, মাংস, ত্বক্, নাড়ী এবং লোম।

এই পাঁচ তত্ত্ব পৃথিবীর। কারণ, যে সময়ে স্থূলশরীর হইতে প্রাণ বহির্গত হইয়া যায় সেই সময়ে আকাশ, বায়ু, তেজ এবং জল,—এই চারি ভূতের কাম

ক্রোধাদি বিভাগ স্ব স্ব কারণ আকাশাদি চারি ভূতে লয় হইয়া যায়। যেহেতু মৃত শরীরে কাম ক্রোধাদি আকাশতত্ত্বের অভাব হয়; চলন বলন ইত্যাদি বায়ুর তত্ত্বও মৃতদেহে থাকে না। ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি তেজের তত্ত্বও তাহাতে থাকে না। সেইরূপ শুক্র শোণিতাদি জলের তত্ত্বও দৃষ্টিগোচর হয় না; কিন্তু পৃথিবীর পাঁচ তত্ত্ব যে অস্থি, মাংস, ত্বক্, নাড়ী ও লোম তাহারা মৃতদেহে প্রত্যক্ষীভূত হয়। শরীর অগ্নিতে ভস্মীভূত হইলে ঐ সকল তত্ত্ব নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মৃতদেহ প্রোথিত করিলে শরীর গলিত হইয়া মৃত্তিকারূপ হইয়া যায়। আর যদি উহা পশুপক্ষী ভক্ষণ করে তাহা হইলেও বিষ্ঠা হইয়া অবশেষে মৃত্তিকার সহিত একীভূত হইয়া যায়।

"জারে ভসম হোয়জায়ী গাড়ে ক্রিমি কীট খায়ী।
শূকর স্বান কাগকে ভোজন তনকী যহী বড়াখী অন্ত মিট্টী মিল জায়ী॥"

এই কারণে ঐ পাঁচ তত্ত্ব পৃথিবীর এবং তুমি উহাদের জ্ঞাতা; সুতরাং উহারা তুমি নহ কিংবা তোমার নহে। তুমি উহাদের দ্রষ্টা—সাক্ষী, সুতরাং তুমি সদা উহাদের হইতে পৃথক্।

উপরি উক্ত পঁচিশ তত্ত্ব হইতে এই স্থূলদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং উহা পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের কার্য্য। ইহা অবগত হইয়া, ইহা (দেহ) হইতে তুমি অহংতা মমতা পরিত্যাগ করিয়া আপনার স্বরূপানন্দ প্রাপ্ত হইয়া সুখী হও।

শিষ্য:—হে ভগবন্; পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত কাহাকে কহে তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু:—হে শিষ্য! ঈশ্বরেচ্ছায় প্রথমে এক এক ভূত দুই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এই দুই ভাগের মধ্যে এক এক ভাগ প্রত্যেক ভূতের নিজের থাকে। অন্য এক ভাগ চারি চারি ভাগে বিভক্ত হয়। এক্ষণে প্রত্যেক ভূতের অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগ ছাড়িয়া দিয়া আর যে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাগ চারি চারি ভাগে বিভক্ত হইল, তাহা অন্য চারি ভূতের অর্দ্ধ ভাগের সহিত মিলিত হইয়া পুরা এক এক পূর্ণ ভাগ হইল; ইহাকেই পঞ্চীকরণ কহে। ইহা বেদবিহিত ত্রিবৃৎ করণের অনুরূপ। এই প্রকারে যাহারা পঞ্চীকরণ হইয়াছে তাহাকে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত কহে।

এই পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে উপরি উক্ত পঁচিশ তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমস্ত একত্র হইয়া স্থূলদেহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

হে শিষ্য! এক্ষণে স্থূল দেহের পঁচিশ তত্ত্ব পঞ্চীকরণরীতিতে বর্ণন করিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

স্থূলদেহেও পঞ্চীকৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব প্রকাশক কোষ্ঠক।

পঞ্চভূত	পৃথিবীর	জলের	অগ্নির	বায়ুর	আকাশের
পৃথিবীর	১/২ অস্থি	১/৮ রক্ত	১/৮ আলস্য	১/৮ সংকোচন	১/৮ কট্যাকাশ
জলের	১/৮ মাংস	১/২ বীর্য্য	১/৮ কান্তি	১/৮ চলন	১/৮ উদরাকাশ
অগ্নির	১/৮ নাড়ী	১/৮ মূত্র	১/৮ ক্ষুধা	১/৮ উৎক্রমণ	১/৮ হৃদয়াকাশ
বায়ুর	১/৮ ত্বক্	১/৮ স্বেদ	১/৮ তৃষা	১/২ ধাবন	১/৮ কণ্ঠাকাশ
আকাশের	১/৮ লোম	১/৮ লালা	১/৮ নিদ্রা	১/৮ প্রসারণ	১/২ শির আকাশ

কোষ্ঠকের স্পষ্টীকরণ।

পৃথ্বীর তত্ত্ব।

অস্থি :—পৃথিবীর ভাগ। যেহেতু উহা পৃথিবীর সমান কঠিন। ইহাতে পৃথিবীর অর্দ্ধ ভাগ; পৃথিবীর আর অর্দ্ধ ভাগ চারি ভাগ হইয়াছে—(১) শোণিত, (২) আলস্য, (৩) সংকোচন (৪) কট্যাকাশ; উহারা জল আদি অন্যান্য চারি ভূতের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই প্রকার—

(১) শোণিত :—রক্তের বর্ণ লাল, এজন্য উহা পৃথিবীর ভাগ। উহা জলের সহিত মিশ্রিত হয়, এজন্য জলের তত্ত্বের সহিত কথিত হইয়াছে।

(২) আলস্য :—আলস্যে পৃথিবীর ন্যায় জড়তা দৃষ্ট হয়, এজন্য উহা পৃথিবীর। তেজের সহিত উহা মিলিত হয়, এজন্য উহা তেজের তত্ত্বের সহিত কথিত হইয়াছে।

(৩) সংকোচন :—ইহাও পৃথিবীর ন্যায় জড়তা নিবন্ধন পৃথিবীর ভাগরূপে পরিগণিত; কিন্তু বায়ুর সহিত মিলিত হইয়াছে, এজন্য বায়ুর সহিত কথিত হয়।

(৪) কট্যাকাশ :—উহা পৃথিবীর ভাগ; মল ধারণ করে এজন্য উহা পৃথিবীর ভাগ। কিন্তু আকাশের সহিত মিলিত হওয়াতে আকাশরূপে কথিত হয়।

জলের তত্ত্ব।

বীর্য্য :—ইহাতে জলের মুখ্য ভাগ আছে। যেরূপ জল শ্বেতবর্ণ এবং বৃক্ষাদি উৎপন্ন করে, সেইরূপ বীর্য্যও শ্বেতবর্ণ এবং গর্ভ উৎপন্ন করে। এজন্য উহা জলের মুখ্য ভাগরূপে প্রসিদ্ধ। আরও জলের শেষ অর্দ্ধ ভাগ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—(১) মাংস, (২) কান্তি, (৩) চলন, (৪) উদরাকাশ। উহা পৃথিবী আদি অন্য চারি ভূতের সহিত মিলিত হয়, উহাদের মিলন নিম্নলিখিতরূপ জানিও।

(১) মাংস :—দ্রবীভূত হইয়া যায় এজন্য উহা জলের ভাগ, কিন্তু পৃথিবী-তত্ত্বের সহিত মিলিত হয়, এ জন্য পৃথিবীতত্ত্বের সহিত কথিত হইয়াছে।

(২) কান্তি :—ইহা জলেব ভাগ, কারণ জলের সম্বন্ধবশতঃ কান্তির তারতম্য হইয়া থাকে। জল দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিলে মুখের কান্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু কান্তি তেজের সহিত সংযুক্ত হয়, এজন্য ইহা তেজের সহিত অভিহিত হইয়াছে।

(৩) চলন :—জলের ন্যায় চালিত হয় এজন্য ইহা জলের ভাগ বলিয়া গণ্য। কিন্তু বায়ুর তত্ত্বের সহিত মিলিত হওয়াতে বায়ুর সহিত কথিত হইয়াছে।

(৪) উদরাকাশ :—জলের অবস্থিতির স্থান, এজন্য উহা জলের ভাগ ; কিন্তু আকাশের সহিত মিলিত হয়, এজন্য উহা আকাশতত্ত্বের সহিত কথিত হইয়াছে।

তেজের তত্ত্ব।

ক্ষুধা :—উহা তেজের মুখ্য অর্দ্ধ ভাগ, কারণ উদরে অগ্নি বাড়িলে ক্ষুধা অনুভূত হয়। তেজের শেষ অর্দ্ধ ভাগ (১) নাড়ী, (২) মূত্র, (৩) উৎক্রমণ, (৪) হৃদয়াকাশ হইয়াছে। উহারা পৃথিবী আদি অন্য চারি তত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়াছে।

উহাদের সহিত কথিত হয়। অর্থাৎ—

(১) নাড়ী :—নাড়ী দ্বারা জ্বরের পরীক্ষা হইয়া থাকে, এই হেতু উহা তেজের ভাগ ; কিন্তু পৃথিবীর সহিত মিলিয়া পৃথিবীতত্ত্বের সহিত কথিত হইয়াছে।

(২) মূত্র :—উষ্ণস্পর্শ, এজন্য তেজের ভাগ বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু জলের সহিত মিলিত হয়, এজন্য জলের সহিত কথিত হইয়াছে।

(৩) উৎক্রমণ :—অগ্নির সমান উৎক্রমণে উর্দ্ধগতি হয়, এজন্য উহা তেজের অংশ; কিন্তু বায়ুর সহিত মিলিত হয় বলিয়া উহা বায়ুর সহিত অভিহিত হইয়াছে।

(৪) হৃদয়াকাশ :--হৃদয়ে সর্ব্বদা উষ্ণতা থাকে, এ জন্য উহা তেজের ভাগ; কিন্তু আকাশতত্ত্বের সহিত মিলিত হওয়াতে আকাশের সহিত কথিত হইয়াছে।

বায়ুর তত্ত্ব।

ধাবন :—উহা বায়ুর মুখ্য অর্দ্ধ ভাগ। কারণ দৌড়াইতে গেলে বায়ুর ন্যায় বেগ হয়। বায়ুর শেষ অর্দ্ধ ভাগ চারি ভাগে বিভক্ত—(১) ত্বক্, (২) স্বেদ, (৩) তৃষ্ণা, (৪) কণ্ঠাকাশ; উহারা অন্য চারি তত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া উহাদের সহিতও কথিত হইয়াছে।

(১) ত্বক :—ত্বক্ দ্বারা স্পর্শ অনুভূত হয়। এজন্য উহা বায়ুর, কিন্তু পৃথিবী তত্ত্বের সহিত মিলিত হওয়াতে পৃথিবীর সহিতও কথিত হইয়াছে।

(২) স্বেদ:—বহু শ্বাসোচ্ছ্বাসরূপ বায়ু হইতে ঘর্ম্ম হয় এবং বায়ু দ্বারা শুষ্ক হয়, এজন্য উহা বায়ুর ভাগ; কিন্তু জলতত্ত্বের সহিত মিলিত হওয়াতে উহা জলের সহিত কথিত হইয়াছে।

(৩) তৃষ্ণা :—বায়ুর দ্বারা শোষিত হইয়া তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়, এজন্য ইহাকে বায়ুর ভাগ কহে। কিন্তু তেজের সহিত মিলিত হওয়াতে তেজের সহিত কথিত হইয়াছে।

(৪) কণ্ঠাকাশ :—ইহা বায়ুর গমনাগমনের পথ, এজন্য বায়ুর ভাগ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু আকাশতত্ত্বের সহিত মিলিত হওয়াতে আকাশের সহিত কথিত হয়।

আকাশের তত্ত্ব।

শিরাকাশ :—উহা আকাশের মুখ্য অর্দ্ধ ভাগ; কারণ মস্তিকের অভ্যন্তরে যে সচ্ছিদ্র স্থান থাকে তাহা আকাশরূপ। আকাশের শেষ অর্দ্ধ ভাগ চারি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত; যথা :—(১) লোম, (২) লালা, (৩) নিদ্রা, (৪) প্রসারণ। উহা পৃথিবীর আদি চারি ভূতের সহিত মিলিত হওয়াতে পৃথিবী আদির সহিত কথিত হইয়াছে।

(১) লোম :—কর্ত্তন করিলে দুঃখ হয় না, এজন্য উহা আকাশের ভাগ; কিন্তু পৃথিবীর সহিত মিলিত হওয়াতে পৃথিবীর সহিত কথিত হয়।

(২) লালা :—শিরাকাশ হইতে নীচে আসিয়াছে, এজন্য উহা আকাশের ভাগ; কিন্তু জলের তত্ত্বের সহিত মিলিত হওয়াতে উহার সহিত কথিত হইয়াছে।

(৩) নিদ্রা :—শূন্যস্বভাবযুক্ত হয়, এজন্য আকাশের ভাগ; কিন্তু তেজ-তত্ত্বের সহিত মিলিত হওয়াতে তেজের সহিত কথিত হইয়াছে।

(৪) প্রসারণ :—ইহাতে ব্যাপকতা আছে, এজন্য আকাশের ভাগ; কিন্তু বায়ুর সহিত মিলিত হওয়াতে বায়ুতত্ত্বের সহিত কথিত হইয়াছে, যে হেতু বায়ু দ্বারাই শরীর স্থূল হইয়া থাকে।

ইতি কোষ্ঠকের স্পষ্টীকরণ সমাপ্ত।

হে শিষ্য! এই প্রকার স্থূলদেহের পঁচিশ তত্ত্ব দ্বারা আমি পঞ্চীকরণ নিরূপণপূর্ব্বক তোমাকে যাহা শুনাইয়াছি তাহা গৌণ প্রকারের উৎপত্তি এবং পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের দ্বারা পঁচিশ তত্ত্বের সমষ্টি যে স্থূলশরীর উহা মুখ্য প্রকারের উৎপত্তি। ঐ সমস্ত তত্ত্বগুলিকে প্রথম কোষ্ঠকের অনুসারে জানিও; কেবল আকাশের তত্ত্বে দুই পক্ষ। উহার প্রথম পক্ষে কাম ক্রোধাদি কহিয়াছি এবং দ্বিতীয় পক্ষে শিরাকাশ, কণ্ঠাকাশ, হৃদয়াকাশ, উদরাকাশ, কট্যাকাশ বলা হইয়াছে; কিন্তু ঐ সমস্ত নিরূপণ করিবার মুখ্য অভিপ্রায় এই যে সর্ব্বতত্ত্ব ভৌতিক (পঞ্চভূতের কার্য্য) এজন্য জড়। এবং ইহাদের জ্ঞাতা, দ্রষ্টা, নির্ব্বিকারী অসঙ্গ আত্মা। ঐ তত্ত্ব সকলের সমষ্টি রূপ স্থূলদেহ তুমি নহ; ঐ সকল তত্ত্ব পঞ্চভূতের, এজন্য তোমার নহে। অতএব তুমি ইহাদের প্রতি অহংতা মমতা পরিত্যাগ কর। তুমি মিথ্যাকল্পিত দুঃখ আপনার মস্তকোপরি কেন বহন করিতেছ? বিচার করিয়া দেখ দেখি, ঐ সকল তত্ত্বের মধ্যে তুমি কোন্‌টী? উহাদের সহিত তোমার কি সম্বন্ধ আছে? যদ্দ্বারা উহাদিগকে তুমি আপনার জানিতেছ। সত্য সত্য বিচার করিয়া দেখিলে তো তুমি উহা নহ, কিংবা উহারাও তোমার নহে। এ জন্য, হে শিষ্য! এইরূপ বিচার করিলেই দেহ হইতে অহংতা মমতা চলিয়া যায়। দেহ নাম ও উপরোক্ত পঁচিশ তত্ত্বের মিলন দ্বারাই হইয়া থাকে। যদি এই তত্ত্ব সকলের এক এক (আলাদা) বিচার করা যায় তাহা হইলে দেহও কিছু নহে স্থির হইবে। যেরূপ পাথর, ইট, কাট, চূণ ইত্যাদি সমুদায় হইতে ঘর নির্ম্মাণ হয় কিন্তু তাহাদিগকে পরস্পর আলাদা করিলে ঘর কিছুই থাকে না। এজন্য যথার্থ বিচার করিলে দেহের সত্যতা কিছুই পাওয়া যায় না; কেবল

কল্পনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

দেহের অসিদ্ধি বিষয়ে গাড়ীর দৃষ্টান্ত।

বিবেকী এবং অবিবেকী নামক দুই ব্যক্তি কোন পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। অবিবেকী বিবেকীকে কহিল,—"ভাই তুমি চলিতে চলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছ, অতএব এই গাড়ী আসিতেছে উহার উপর বসিয়া যাও।" বিবেকী বলিল,—"গাড়ীতো কোথাও দেখা যাইতেছে না।"অবিবেকী বলিল, —"গাড়ী আসিতেছে প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে আর তুমি বলিতেছ কি গাড়ী দেখা যাইতেছে না! ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" বিবেকী বলিল,—"কি যদ্যপি গাড়ী সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে তোমার কি সাজা হওয়া উচিত?" তখন অবিবেকী উত্তর করিল,—"কি তাহা হইলে আমার মুখের উপর এক চাপড় মারিও।" এই প্রকার উভয়ের পরস্পর কথাবার্ত্তা চলিতেছিল এমন সময়ে গাড়ী আসিয়া পৌছিল। অবিবেকী বলিল,—"দেখ এই গাড়ী। যদি তোমার বসিবার ইচ্ছা হয় তবে ভাড়া স্থির করা যায়।" বিবেকী বলিল,—"ভাই তুমি মুখেই গাড়ী গাড়ী বলিতেছ, কৈ হাত দিয়া গাড়ী দেখাও তো যে এই গাড়ী।" বিবেকী বলিল,—"এই তো, ধর।"

এই প্রকার অবিবেকী গাড়ীর প্রত্যেক অঙ্গ উপাঙ্গের উপর হাত দিয়া দেখাইল কিন্তু বিবেকী উহার নাম বলিয়া গাড়ী সিদ্ধ করিতে দিল না। তখন অবিবেকী আপনাকে পরাজিত জানিয়া বলিতে লাগিল,—"ভাই আমি পরাজিত হইয়াছি। আমার মুখের উপর চাপড় মার।" তখন বিবেকী বলিল,—"আপনার মুখ দেখাও তবে ত চাপড় মারিব।" অবিবেকী গালের উপর হাত দিল, তখন বিবেকী কহিল,—"উহা তো তোমার গাল; মুখ দেখাও।" তখন অবিবেকী মুখের সর্ব্ব অবয়ব—নাক, কান, চোক ইত্যাদি সর্ব্বত্র হাত দিল কিন্তু বিবেকী উহার নাম বলিয়া বলিয়া মুখ অসিদ্ধ করিয়া দিল। পরিশেষে মুখ কিছুই সিদ্ধ হইল না।

হে শিষ্য! এই প্রকার সংসারে যত কিছু নাম আছে তাহার যথার্থ রূপ অনুসন্ধান করিতে গেলে তো কিছুই সিদ্ধ হয় না। সমস্ত নামের কল্পনা তো কেবল ব্যবহারসিদ্ধির নিমিত্ত হইয়াছে। সেইরূপ এই দেহ কল্পনা মাত্র ইএ; অত ইহাতে অহংতা মমতা করা মহা ভুল এবং বন্ধনের কারণ। ইহা হইতে অহংতা মমতা ত্যাগ করাই মোক্ষ।

ইহা ব্যতিরেকে এই স্থূলদেহকে অন্নময় কোষও কহা যায় ; সেই অন্নময় কোষ হইতেও তুমি আপনাকে ভিন্ন জানিবে।

শিষ্য :—হে গুরো ! স্থূলদেহকে অন্নময় কোষ কেন বলে তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু :—হে শিষ্য ! মাতা পিতার ভুক্ত অন্নের পরিণাম রুধির এবং বীর্য্য। সেই রুধির এবং বীর্য্যের সম্বন্ধবশতঃ এই স্থূলদেহ উৎপন্ন হয়। জন্ম গ্রহণের পরেও আত্মার ভুক্ত অন্নের পরিণামরূপ মাতৃস্তন্য পান করিয়া স্থূলদেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পুনঃ দন্ত বহির্গত হইবার পর অন্ন ভোজন করিয়া শরীর পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। পুনঃ মৃত্যুর পর এই স্থূলদেহ অন্য প্রাণীর ভক্ষ্যরূপ অন্ন হইয়া থাকে। অন্ন ভোজন বিনা এই দেহ থাকে না, বরং অন্ন হইতে জীবিত থাকে। যখন এই দেহ কালগ্রাসে পতিত হয়, তখনও অন্নরূপ পৃথিবীতেই লয় হইয়া যায়। এজন্য ইহাকে অন্নময় কোষ কহা যায়।

আর ইহাকে কোষ বলিবার কারণ এই যে, যেমন কোষ তরবারি আচ্ছাদন করে এবং ধন রক্ষা করিবার আগারকেও যেমন কোষ (ধনাগার) কহা যায়, এজন্য যদ্দ্বারা কিছু আচ্ছাদিত হয় তাহাকে কোষ কহে ; সেই রূপ, এই অন্নময় শরীর আত্মাকে আচ্ছাদিত করে, এজন্য ইহাকেও কোষ কহে। এই কারণ এই স্থূলশরীরের নাম অন্নময় কোষ।

স্থূলশরীরের অবস্থা।

"জাগ্রত অবস্থা নেত্র স্থান।
বৈখরী বাচা স্থূল ভোগ জান ॥
ক্রিয়া শক্তি রজোগুণ মান।
অকার মাত্রা বিশ্ব অভিমান ॥

টীকা—জাগরণের নাম জাগ্রত অবস্থা। এবং যে অবস্থাতে ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান হয় তাহাকে জাগ্রত অবস্থা কহে। ইহাই শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ বাক্য। এই জাগ্রত অবস্থার ব্যবহার বিয়াল্লিশ তত্ত্ব দ্বারা হইয়া থাকে। এই বিয়াল্লিশ তত্ত্ব নিম্নলিখিত কোষ্টক অনুসারে বুঝিবে।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ত্রিপুটী।

(অধ্যাত্ম) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম	(অধিভূত) উহাদের বিষয়ের নাম	(অধিদৈব) উহাদের দেবতাদিগের নাম
শ্রোত্র	শব্দ	দিক্
ত্বক্	স্পর্শ	বায়ু
চক্ষুঃ	রূপ	সূর্য্য
জিহ্বা	রস	বরুণ
ঘ্রাণ	গন্ধ	অশ্বিনী কুমার

কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ত্রিপুটী।

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নাম	উহাদের বিষয়	উহাদের দেবতাগণ
বাক্	বচন	অগ্নি
পাণি	আদান (দান গ্রহণ)	ইন্দ্র
পাদ	গমনাগমন	উপেন্দ্র
পায়ু	আনন্দ	প্রজাপতি
উপস্থ	বিসর্গ	মৃত্যু

অন্তঃকরণের ত্রিপুটী।

চারি অন্তঃকরণের নাম	বিষয়	দেবতা
মন	সংকল্প ও বিকল্প	চন্দ্রমা
বুদ্ধি	নিশ্চয়াত্মিকা	ব্রহ্মা
চিত্ত	চিন্তন	নারায়ণ
অহঙ্কার	অভিমান	রুদ্র

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—ত্রয়োদশাধ্যায়প্রারম্ভঃ।

শ্রুতিসঙ্গত ভাবার্থপ্রকাশিকা ভাষা-টীকা সহিত।

ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ। শ্রীগুরুভ্যো নমঃ। শ্রীকাশীবিশ্বেশ্বরাভ্যাং নমঃ।
শ্রীকেশবানন্দায় নমঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায় হইতে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্য্যন্ত প্রথম ছয় অধ্যায়ে 'ত্বং'পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। এবং সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে 'তৎ' পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞান প্রধান রূপে বর্ণিত এবং তৎ ত্বং পদার্থের অভেদরূপ মহাবাক্যের অর্থ এই ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে কথিত হইবে। তন্মধ্যে ত্রয়োদশ অধ্যায় আরম্ভ করা যাইতেছে।

পূর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায়ে "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাত্তবামি"—এই বচন দ্বারা শ্রীভগবান্ আপনাকে অধিকারী জনের মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধারকর্ত্তারূপে কথন করিয়াছেন। সেই আত্মবিষয়ক অজ্ঞানরূপ মৃত্যু হইতে এই অধিকারী জনের উদ্ধার আত্মজ্ঞান বিনা হইতে পারে না। পরন্তু "তরতি

শোকমাত্মবিৎ"॥ "তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্নিবেশিতে।" ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি বচন আত্মজ্ঞান হইতে অবিদ্যারূপ অজ্ঞান নিবৃত্তি কথন করিয়াছেন। সুতরাং যে প্রকার আত্মজ্ঞান দ্বারা সেই মৃত্যুসংসার নিবৃত্ত হইয়া থাকে এবং যে তত্ত্বজ্ঞানযুক্ত অদ্বেষ্টৃত্বাদি গুণসম্পন্ন সন্ন্যাসীর বিষয় পূর্ব্বে দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে, সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞান এক্ষণে অবশ্য বর্ণনীয়। এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান অদ্বিতীয় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদই বিষয় করে। কারণ জন্মমৃত্যু প্রভৃতি যত কিছু অনর্থ জগতে লক্ষিত হয়, সেই সমস্ত অনর্থ জীব ব্রহ্মের ভেদ ভ্রম হইতেই হইয়া থাকে। শ্রুতি প্রমাণ যথা—"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"। অর্থ,—যে পুরুষ এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মে উক্ত ভাব দেখে, সেই পুরুষ বারবার জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে ইতি। এই রূপে ভেদভ্রম নিবৃত্তি জীব ব্রহ্মের অভেদ জ্ঞান বিনা হইতে পারে না; কিন্তু জীব ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান হইতেই সেই ভেদভ্রম নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্ত বিষয়ে এইরূপ সংশয় হয় যে আমি সুখী,' 'আমি দুঃখী', 'আমি কর্ত্তা', 'আমি ভোক্তা' এই প্রকার অনুভব সর্ব্বপ্রাণীরই হইয়া থাকে; সুতরাং এই জীবাত্মা তো সুখ-দুঃখাদিরূপ সংসারী এবং প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। যদি সর্ব্বশরীরে একই আত্মা বিরাজমান হন্ তবে এক শরীরে সুখ দুঃখের অনুভব হইলে সর্ব্বশরীরে সেই সুখ দুঃখের অনুভব হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হয় না; সুতরাং প্রতিশরীরে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন। আর পরমাত্মা দেব তো সেই সুখ-দুঃখাদিরূপ সংসাররহিত এবং এক অদ্বিতীয়। এরূপ অনেক সংসারী জীবের এক অসংসারী পরমাত্মার সহিত অভেদ সম্ভব নহে। এরূপ সংশয় হওয়াতে সেই সুখ দুঃখাদি রূপ সংসার এবং প্রতি জীবে আত্মার ভিন্নত্ব, অবিদ্যাকল্পিত অনাত্মবস্তুরই ধর্ম্ম; পরন্তু জীবাত্মার সংসারিত্ব এবং ভিন্নত্ব ধর্ম্ম নাই,—এই প্রকার বিচার অবশ্য করিতে হইবে। এই বিচারার্থ দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, প্রাণ, ইত্যাদিরূপ ক্ষেত্র হইতে ভিন্ন যে ক্ষেত্রজ্ঞনামা জীবাত্মা পুরুষ তিনি সর্ব্ব ক্ষেত্রে একই, এবং নির্ব্বিকার;—এই অর্থ প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞের বিবেচন করা হইয়াছে। পরন্তু পূর্ব্বে সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ("ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ" ইত্যাদি) যে ভূমি প্রভৃতি অষ্ট প্রকার অপরা নামক প্রকৃতি ক্ষেত্ররূপে সূচনা করিয়াছেন এবং ("অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্" ইত্যাদি, যে জীবরূপ পরা প্রকৃতি ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সূচনা করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞরূপ

উভয় প্রকৃতির স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে নিরূপণপূর্ব্বক শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে নিম্নলিখিত বচন কহিলেন ;—

(মূঃ শ্লোঃ) শ্রীভগবানুবাচ ;—ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতৎ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ ॥১

হে অর্জ্জুন ! (জ্ঞানের প্রবাহ ভূমি বলিয়া) এই শরীর ক্ষেত্র এই নামে কথিত হয় ও এই ক্ষেত্রকে যিনি জানেন ক্ষেত্রবিদ্‌গণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ এই নামে কথন করিয়া থাকেন।

টীকা।—হে কৌন্তেয় অর্থাৎ কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন ! শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সহিত এবং চতুষ্টয় অন্তঃকরণ সহিত এবং পঞ্চ প্রাণ সহিত যে এই সুখ দুঃখ ভোগের আয়তনরূপ শরীর, সেই শরীর ক্ষেত্র এই নামে কথিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ক্ষেত্র শব্দের অর্থ নিরূপণ করা যাইতেছে। অবিদ্যা দ্বারা যাহা আত্মক্ষয় করে এবং বিদ্যা দ্বারা আত্মাকে রক্ষণ করে তাহার নাম ক্ষেত্র। অথবা সর্ব্বকালে দীপশিখার ন্যায় যাহা নিজে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায় তাহার নাম ক্ষেত্র। অথবা সুখ-দুঃখাদিরূপ ফলের উৎপত্তিবিষয়ে যাহা লোকপ্রসিদ্ধ ভূমিরূপ ক্ষেত্রের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম ক্ষেত্র। এইরূপে এই শরীররূপ ক্ষেত্রকে যিনি জানেন, অর্থাৎ এই শরীররূপ ক্ষেত্রে যিনি অহং মম অভিমান করেন, তাঁহাকেক্ষেত্রজ্ঞ এই নামে কহা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ চাষী কৃষক ভূমিরূপ ক্ষেত্রের ফলভোক্তা হয়, সেইরূপ এই জীবাত্মাও এই সংঘাতরূপক্ষেত্রের সুখ-দুঃখরূপ ফলের ভোক্তা হইয়া থাকেন। এজন্য এই জীবাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ এই নামে কহা যায়।

শঙ্কা। হে—ভগবন্ ! এই জীবাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ এই নামে কে কথন করে ? এরূপ অর্জ্জুনের শঙ্কা হওয়াতে, শ্রীভগবান্ কহিতেছেন—(তদ্বিদঃ ইতি) হে অর্জ্জুন এই ক্ষেত্র অসৎ জড় দুঃখরূপ আর এই ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সৎ চিৎ আনন্দরূপ। এই প্রকারে এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ের ভেদজ্ঞাতা যে বিবেকী পুরুষ সেই বিবেকী পুরুষই এই জীবাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ এই নামে বর্ণন করিয়া থাকেন ইতি।

এখানে কোন কোন মূল পুস্তকে 'শ্রীভগবানুবাচ।—ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে" এই শ্লোকের পূর্ব্বে অর্জ্জুনের প্রশ্নরূপ এই শ্লোক কহা যায়— "অর্জ্জুন উবাচ ! প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ। এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব" ॥ অর্থ।—হে কেশব ! প্রকৃতি কি ও পুরুষ কি ও ক্ষেত্রজ্ঞ কি, এবং জ্ঞান কি ও জ্ঞেয় কি, এই সমস্ত অর্থ জানিতে আমি ইচ্ছা করিতেছি। আপনি কৃপা করিয়া সেই সমস্ত অর্থ আমাকে বলুন ইতি। পরন্তু এই শ্লোক

শ্রীভাষ্যকার প্রভৃতি কোন টীকাকার গ্রহণ করেন নাই। তাহাতে এই জানা যায় যে, এই অর্জ্জুনের প্রশ্ন-শ্লোক কোন বিদ্বান্‌ পুরুষ পশ্চাতে রচনা করিয়া থাকিবেন। এই কারণে এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে এই শ্লোক আমি লিখিলাম না। ইতি ॥১॥

অবতরণিকা।—এইরূপ দেহ ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণাদি রূপ ক্ষেত্র হইতে বিলক্ষণ স্বপ্রকাশ ক্ষেত্রজ্ঞকে বর্ণন করিয়া এক্ষণে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ নামা জীবাত্মার যে অসংসারী পরমাত্মার সহিত একতারূপ পারমার্থিক স্বরূপ, সেই স্বরূপ শ্রীভগবান কহিতেছেন।

(মূঃ শ্লোঃ) ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥২

পদার্থ।—হে ভারত! পুনঃ সর্ব্বক্ষেত্রে স্থিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে। এইরূপ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়ের যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই (মুক্তির হেতু বলিয়া) আমি যে পরমেশ্বর আমার অভিমত।

টীকা।—হে ভারত! অর্থাৎ হে ভরতরাজবংশোদ্ভব অর্জ্জুন! অথবা আত্মাকার বৃত্তির নাম 'ভা,' সেই আত্মাকার অখণ্ড বৃত্তিতে যিনি সর্ব্বদা 'রত' অর্থাৎ রমণ করেন অথবা সেই অখণ্ড বৃত্তিতে যিনি সর্ব্বদা প্রীতিযুক্ত তাঁহার নাম ভারত। অর্থাৎ হে আত্মজ্ঞানানুরক্ত অর্জ্জুন! পূর্ব্বোক্ত দেহ ইন্দ্রিয়াদি সংঘাতরূপ সর্ব্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠানরূপে স্থিত যে এক ক্ষেত্রজ্ঞ, যিনি স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ এবং বিভু এবং অবিদ্যা দ্বারা আরোপিত কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্ম্ম-সম্পন্ন এইরূপ সেই ক্ষেত্রজ্ঞের, হে অর্জ্জুন তুমি সেই অবিদ্যাকল্পিত রূপ পরিত্যাগ করিয়া, আমি যে পরমেশ্বর আমারই স্বরূপ জান। অর্থাৎ অন্তঃকরণাদি সর্ব্ব উপাধিরহিত সেই প্রত্যগাত্মরূপ ক্ষেত্রজ্ঞকে তুমি অসংসারী অদ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দরূপ জান। শ্রুতি,—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"। অর্থ।—এই জীবাত্মা ব্রহ্ম রূপ। আমি ব্রহ্ম রূপ। সেই সৎ ব্রহ্ম তুমি। এবং এই আনন্দরূপ প্রজ্ঞাননামা জীবাত্মা ব্রহ্মরূপ। ইতি।

হে অর্জ্জুন! এই পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান তন্মধ্যে ক্ষেত্র তো মায়া দ্বারা কল্পিত হওয়াতে রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা রূপ এবং সেই ক্ষেত্র রূপ ভ্রমের অধিষ্ঠান হওয়াতে এই ক্ষেত্রজ্ঞ নামা আত্মা পরমার্থ সত্য হন। এই প্রকারে যে সেই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান, সেই জ্ঞান মোক্ষের সাধন হওয়াতে

পরমেশ্বর যে আমি, আমার জ্ঞান ভিন্ন অন্য যত প্রকার লৌকিক বৈদিক জ্ঞান আছে তৎসমুদয় জ্ঞান অবিদ্যার বিরোধী নহে। সুতরাং সেই সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান, অজ্ঞানরূপে অনুমোদিত। অর্থাৎ আমি পরমেশ্বর সেই আমার জ্ঞানকে অবিদ্যার বিরোধী প্রকাশরূপে মানি। এই প্রকারের জ্ঞানরূপই পরমার্থ সত্য। এস্থলে কোন কোন টীকাতে তো "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি" এই বাক্যে যে 'চ'কার আছে সেই 'চ'কার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্রেরও গ্রহণ হইতে পারে; অর্থাৎ ক্ষেত্ররূপ এবং ক্ষেত্রজ্ঞরূপ উভয় রূপেই তুমি আমার স্বরূপ জানিও। তন্মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞ নামক জীবাত্মার ব্রহ্মরূপতা বিষয়ে তো পূর্ব্বেই শ্রুতি প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে; আর ক্ষেত্রের ব্রহ্মরূপতা বিষয়ে তো 'ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি অনেক শ্রুতিবচন প্রমাণরূপ দেওয়া যাইতে পারে। ইতি। ২।

অবতরণিকা—পূর্ব্বে দুই শ্লোকে সংক্ষেপে কথিত অর্থ এক্ষণে বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ কহিতেছেন;—

(মুঃ শ্লোঃ) তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৩

পদার্থ।—হে অর্জ্জুন, সেই শরীররূপ ক্ষেত্র যে স্বভাববিশিষ্ট এবং যেরূপ ইচ্ছাদি ধর্ম্মসম্পন্ন এবং যে যে ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত এবং যে ক্ষেত্ররূপ কারণ হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয় এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যে স্বভাববিশিষ্ট এবং যেরূপ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যযোগে প্রভাবসম্পন্ন, সেই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ আমার নিকট তুমি সংক্ষেপে শ্রবণ কর।

টীকা—হে অর্জ্জুন! "ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে" এই পূর্ব্বোক্ত বচন দ্বারা কথিত যে দেহ ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণ ইত্যাদি ষড়্ বর্গরূপ ক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্র স্ব-স্বরূপতঃ যেরূপ জড় দৃশ্য পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি স্বভাবসম্পন্ন এবং সেই ক্ষেত্র যেরূপ ইচ্ছা দ্বেষাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট এবং সেই ক্ষেত্র যে যে ইন্দ্রিয়াদি বিকারবান্ এবং সেই ক্ষেত্ররূপ কারণ হইতে যে কার্য্য উৎপন্ন হয়; অথবা "যতশ্চযৎ" এই বাক্যের এই অন্য অর্থ করা যায় যথা—সেই ক্ষেত্র যে প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং যে যে স্থাবর জঙ্গমাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় ইতি।

এতাবৎ ক্ষেত্রের স্বরূপ বিচারিত হইল। এক্ষণে ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বিচার করা যাইতেছে—"স চ ইতি" হে অর্জ্জুন! "এতৎ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ" এই বচন দ্বারা পূর্ব্ব-কথিত যে ক্ষেত্রজ্ঞ, সেই ক্ষেত্রজ্ঞও স্ব-স্বরূপতঃ যেরূপ স্বপ্রকাশ চৈতন্য আনন্দ স্বভাবসম্পন্ন এবং উপাধিকৃত যে শক্তিরূপ

প্রভাবসম্পন্ন ইতি। সেই সর্ব্ব-বিশেষণবিশিষ্ট ক্ষেত্রের যথার্থ স্বরূপ এবং ক্ষেত্রজ্ঞের যথার্থস্বরূপ, হে অর্জ্জুন! তুমি, আমি পরমেশ্বরের বচন হইতে সংক্ষেপে শ্রবণ কর, অর্থাৎ সেই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ শ্রবণ করিয়া তুমি তাহাদিগকে নিশ্চয় কর। ইতি।৩।

অবতরণিকা—হে ভগবন্! পূর্ব্বশ্লোকে আপনি ইহা কহিয়াছিলেন যে সেই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ তুমি আমার বচন হইতে সংক্ষেপে শ্রবণ কর ইতি। আপনার সেই বচন সম্ভব হইতে পারে যদি ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ পূর্ব্বে কেহ বিস্তারপূর্ব্বক কথন করিয়া থাকেন। কারণ যে অর্থ পূর্ব্বে কেহ বিস্তারপূর্ব্বক কথন করেন, সেই অর্থ ই পশ্চাৎ সংক্ষেপে কথিত হইতে পারে। পূর্ব্বে বিস্তারপূর্ব্বক কোন বিষয় কথিত না হইলে সংক্ষেপে কথন করা সম্ভব নহে। অতএব এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ পূর্ব্বে কোন্ মহাত্মা বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন? যাহাকে এক্ষণে আপনি সংক্ষেপে বর্ণন করিতে চাহিতেছেন। এরূপ অর্জ্জুনের শঙ্কা হওয়াতে শ্রীভগবান্ শ্রোতা পুরুষের বুদ্ধিতে সেই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বিষয়ে প্রীতি উৎপাদন করিবারনিমিত্ত সেই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপের স্তুতিপূর্ব্বক কহিতেছেন।

(মূঃ শ্লোঃ) ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভি বিনিশ্চিতৈঃ॥ ৪ ॥

পদার্থ।—হে অর্জ্জুন! সেই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃকও নানাপ্রকারে নিরূপিত হইয়াছে। এবং নানাপ্রকারে ঋগাদি বেদ দ্বারাও ভিন্ন ভিন্ন রূপে কথিত হইয়াছে। এবং তাঁহারা যুক্তিবিশিষ্ট ও অসন্দিগ্ধ অর্থ প্রতিপাদক বিবিধ ব্রহ্মসূত্র পদ দ্বারাও সেই স্বরূপ নানাপ্রকারে বর্ণন করিয়াছেন।

টীকা—হে অর্জ্জুন! এই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বশিষ্ঠাদি ঋষিগণও যোগশাস্ত্রে ধারণা ধ্যানের বিষয়রূপে নানাপ্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন। ইহা কহিয়া শ্রীভগবান্ সেই স্বরূপ বিষয়ে যোগশাস্ত্রপ্রতিপাদত্ব কথন করিয়াছেন। এবং বিবিধ ছন্দও সেই স্বরূপকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে নিরূপণ করিয়াছেন। অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মাদি যে ঋগাদি বেদের মন্ত্রভাগে ও ব্রাহ্মণভাগে বিশদরূপে বর্ণিত আছে, তাহাতেও ভিন্ন ভিন্ন রূপে সেই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। ইহা কহিয়া শ্রীভগবান্ সেই স্বরূপ বিষয়ে কর্ম্ম-কাণ্ড দ্বারা প্রতিপাদত্ব কথন করিয়াছেন। এবং ব্রহ্মসূত্র পদও সেই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ নানাপ্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন। এখানে 'ব্রহ্ম' এই পদের 'সূত্র' এই পদের

সহিত এবং 'পদ' এই পদের সহিত অন্বয় করিলে 'ব্রহ্মসূত্র' ও 'ব্রহ্মপদ' এই দুই প্রকার বচন সিদ্ধ হয়। সেখানে বেদের যে সকল বাক্য কিঞ্চিন্মাত্র ব্যবধান-পূর্ব্বক ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছে সেই সকল বাক্যের নাম ব্রহ্মসূত্র। যথা,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তৎ ব্রহ্ম"। অর্থ।—যাহা হইতে এই সর্ব্বভূত উৎপন্ন হয় এবং উৎপত্তি হইবার পর যাঁহা দ্বারা সর্ব্বভূত জীবিত থাকে এবং বিনাশপ্রাপ্ত হইলে সর্ব্বভূত যাহাতে লয়-প্রাপ্ত হয় তিনিই ব্রহ্ম ইতি। ইত্যাদি ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ প্রতিপাদক যে সমস্ত উপনিষদ্‌বাক্য সেই সকল বাক্যের নাম ব্রহ্মসূত্র। আর যে সকল বেদবাক্য সাক্ষাৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করে,সেই সকল বাক্যের নাম ব্রহ্মপদ। যথা—ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ প্রতিপাদক "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি উপনিষদ্বাক্য। এরূপ ব্রহ্মসূত্ররূপ বাক্য দ্বারাও সেই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ অনেক প্রকারে নিরূপণ করা হইয়াছে। সেই ব্রহ্মসূত্রপদরূপ বাক্য কিরূপ—হেতুমৎ অর্থাৎ ইষ্ট অর্থের সাধক অনেক যুক্তির প্রতিপাদক। সেই সমস্ত যুক্তি এই :—ছান্দোগ্য উপ নিষদে উদ্দালক ঋষি তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতুকে এই বাক্য বলিয়াছেন,—"সদেব সৌম্যেদমগ্রমাসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"। অর্থ।—হে প্রিয়দর্শন শ্বেতকেতো! এই দৃশ্যমান্ জগৎ আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎরূপ হইয়াছিল। সেই সৎ এক অদ্বিতীয় রূপ হইয়াছিল ইতি। এই প্রকার উপক্রমপূর্ব্বক পশ্চাৎ এই বচন কহিয়াছিলেন—"তদেক আহুরসদেবেদমগ্রমাসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সদজায়ত"। অর্থ।—কোন কোন বাদী তো এইরূপ কহিয়া থাকেন—এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ হইয়াছিল। সেই অসৎ এক অদ্বিতীয় রূপ হইয়াছিল। সেই অসৎ কারণ হইতে এই সৎকার্য্য উৎপন্ন হইয়া-ছিল। ইতি। এই বচন দ্বারা নাস্তিকগণের মত কথনপূর্ব্বক তদনন্তর সেই উদ্দালক ঋষি এই প্রকার বচন কহিয়াছিলেন।—"কুতস্তু খলু সৌম্যেব স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েত"। অর্থ।—হে প্রিয়দর্শন শ্বেতকেতো! এই নাস্তিকদিগের বাক্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু সম্ভব হইতে পারে না। যেহেতু অসৎ কারণ হইতে সৎ কার্য্যের উৎপত্তি কথনই হইতে পারে না। যদি কথন অসৎ হইতেও সতের উৎপত্তি সম্ভব হইত তবে অসৎ বন্ধ্যাপুত্র হইতে সৎপুত্রের উৎপত্তি দেখা যাইত। কিন্তু তাহা কথনই হয় না। ইত্যাদি নানাপ্রকার যুক্তিপ্রতিপাদক সেই সকল ব্রহ্মসূত্রপদরূপ বচন দেখা যায়। পুনঃ কিরূপ সেই ব্রহ্মসূত্রপদরূপ বচন?

বিনিশ্চিত—অর্থাৎ উপক্রম উপসংহার বাক্যের একবাক্যতা দ্বারা নিঃসংশয় অর্থের প্রতিপাদক। এই প্রকার ব্রহ্মসূত্রপদরূপ বাক্য দ্বারাও সেই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ নানাপ্রকারে নিরূপিত হইয়াছে। ইহা কহিয়া শ্রীভগবান্ সেই ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞানকাণ্ড প্রতিপাদ্যত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। এইরূপ পূর্ব্বে বশিষ্ঠাদি ঋষি এবং ঋগাদি বেদের মন্ত্রভাগ এবং ব্রহ্মসূত্রপদ যে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের যথার্থ স্বরূপ অত্যন্ত চিন্তাপূর্ব্বক কথন করিয়াছেন, সেই স্বরূপ আমি (কৃষ্ণ ভগবান্) তোমাকে (অর্জ্জুনকে) সংক্ষেপে বলিতেছি ; তুমি তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। ইতি। অথবা "ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ" এই বচনে যাহা ব্রহ্মসূত্র তাহাই পদ এই কর্ম্মধারয় সমাস করিবে। এখানে "আত্মেত্যে-বোপাসীত"। অর্থ,—"এই অধিকারী পুরুষ সর্ব্বত্র ব্যাপক আত্মা আমি হই" এই প্রকার চিন্তা করিবেন। ইত্যাদি বাক্য তো বিদ্যাসূত্র নামে অভিহিত হয়। আর "ন স বেদ যথা পশুঃ"। অর্থ,—আপনার আত্মা হইতে দেবতা-দিগকে ভিন্ন জ্ঞান করিয়া যে ব্যক্তি সেই দেবতাদিগকে উপাসনা করে, সেই ভেদদর্শী পুরুষ পশুর ন্যায় কিঞ্চিন্মাত্রও জানে না। ইত্যাদি বচন তো অবিদ্যাসূত্র নামে অভিহিত হয় ইতি। আর কোন কোন টীকাতে "ব্রহ্মসূত্র-পদৈঃ" এই বচন দ্বারা "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইত্যাদি বেদান্তসূত্র গৃহীত হইয়াছে ইতি। ৪ ॥

অবতরণিকা—এই প্রকার ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বিষয়ে অর্জ্জুনের রুচি উৎপন্ন করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ নিম্নলিখিত দুই শ্লোক দ্বারা প্রথমে অর্জ্জুনকে ক্ষেত্রের স্বরূপ বলিতেছেন।

(মূঃ শ্লোক) মহাভূতান্যহংকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ।
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬ ।

পদার্থ।—হে অর্জ্জুন! পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং অব্যক্ত এবং দশ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় এবং এক মন এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি পঞ্চ, এবং ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ সংঘাত চেতনা ধৃতি এই সর্ব্ব বিকার সহিত সংক্ষেপে ক্ষেত্ররূপ উক্ত হইল।৫।৬॥

টীকা—হে অর্জ্জুন! পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ এই যে পঞ্চ মহাভূত এবং সেই পঞ্চ মহাভূতের কারণরূপ যে অভিমান লক্ষণ অহঙ্কার, এবং সেই

অহঙ্কারের কারণরূপ যে অধ্যবসায় লক্ষণ মহত্তত্ত্ব নামা বুদ্ধি এবং সেই মহত্তত্ত্ব নামা বুদ্ধির কারণরূপ এবং সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক যে প্রধান রূপ অব্যক্ত, যে অবক্ত সকলেরই কারণরূপ হন কাহারও কার্য্যরূপ নহেন ; এই মহাভূত হইতে অব্যক্ত পর্য্যন্ত অষ্ট প্রকার প্রকৃতি কথিত হইয়া থাকে। এই অর্থ সাংখ্য-মতানুসারে কথিত হইল। এক্ষণে বেদান্ত অনুসারে অর্থ করা যাইতেছে ;—সেখানে অব্যক্ত শব্দ দ্বারা তো অনির্ব্বচনীয় অব্যাকৃত গ্রহণ করিবে। সেই অব্যাকৃতকে "মম মায়া দুরত্যয়া" এই বচন দ্বারা শ্রীভগবান্ মায়া নামা পরমেশ্বরের শক্তিরূপ কথন করিয়াছেন। আর বুদ্ধি শব্দ দ্বারা তো সৃষ্টির আদিকালে স্রষ্টব্য প্রপঞ্চ বিষয়ক মায়ার বৃত্তি রূপ 'ঈক্ষণ' গ্রহণ করিবে। "স ঐক্ষত" হাত শ্রুতি আর অহঙ্কার শব্দ দ্বারা তে সেই ঈক্ষণের অনন্তর ভাবী সেই মায়ার বৃত্তিরূপ অনেক হইবার সংকল্প ("বহুস্যাং প্রজায়েয়") গ্রহণ করিবে; সেই সঙ্কল্পের পর আকাশাদি ক্রমে মহাভূতের উৎপত্তি গ্রহণ করিবে ইতি। আর সাংখ্যশাস্ত্রসিদ্ধ যে অব্যক্ত মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার এই তিন তত্ত্ব আছে সেই তিন তত্ত্ব বেদান্তসিদ্ধান্ত মতে অঙ্গীকৃত নহে। তদ্বিপরীতে ("ঈক্ষতে র্না-শব্দং") ইত্যাদি সূত্রের ব্যাখ্যাতে শ্রীভাষ্যকার সেই সংখ্যশাস্ত্র কল্পিত প্রধানাদি পদার্থ বহু বিস্তারপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। সেখানে ("মায়াস্তু প্রকৃতিং বিগ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্") (" তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ ") শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত যে মায়া নামক পরমেশ্বরের শক্তি, সেই মায়া শক্তিই এখানে শ্রীভগবান্ অব্যক্ত শব্দ দ্বারা কথন করিয়াছেন। আর "তদৈক্ষত" এই শ্রুতি দ্বারা কথিত যে স্রষ্টব্য জগৎ বিষয়ক মায়ার বৃত্তিরূপ ঈক্ষণ, সেই ঈক্ষণই এখানে শ্রীভগবান্ বুদ্ধি শব্দ দ্বারা কথন করিয়াছেন। আর "বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" এই শ্রুতি দ্বারা কথিত যে সেই মায়ার বৃত্তিরূপ অনেক হইবার সংকল্প, সেই পরমেশ্বরের সং-কল্পই এখানে শ্রীভগবান্ অহঙ্কার শব্দে কথন করিয়াছেন। তদনন্তর "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনো আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্বায়ুর্ব্বায়োগ্নিরগ্নেঃ রূপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" এই শ্রুতি যথাক্রমে আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি কথন করিয়াছেন। ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণসিদ্ধ এই বেদান্তপক্ষই শ্রেষ্ঠ ইতি। আর শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু রসনা ঘ্রাণ এই যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, তথা বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই যে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয় মিলিত হইয়া দশ ইন্দ্রিয় হইতেছে। এবং সংকল্প বিকল্পরূপ যে এক মন এবং সেই শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়ের যে শব্দ স্পর্শ রূপ

রস গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়; তন্মধ্যে শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তো এই শব্দাদি পঞ্চ জ্ঞাপ্যত্ব রূপে বিষয়; আর বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের তো সেই শব্দাদি পঞ্চ কার্য্যত্বরূপে বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বকথিত অষ্ট প্রকার প্রকৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়. পঞ্চ বিষয়, এক মন এই সকলকে সাংখ্যশাস্ত্র-বেত্তাগণ চব্বিশ তত্ত্ব কহিয়াছেন। ইতি। আর সুখ বিষয়ে এবং সুখের সাধন বিষয়ে এই সুখ আমার প্রাপ্তি হউক এবং এই সুখের সাধন আমার প্রাপ্তি হউক এই প্রকার স্পৃহারূপ যে চিত্তের বৃত্তিবিশেষ,যাহাকে শাস্ত্রে কামও কহে এবং রাগও কহে,তাহার নাম ইচ্ছা। আর দুঃখ বিষয়ে এবং দুঃখের সাধন বিষয়ে এই দুঃখ আমার প্রাপ্তি না হউক এবং দুঃখের সাধন আমার প্রাপ্তি না হউক এই প্রকার যে পূর্ব্বোক্ত স্পৃহার বিরোধী চিত্তের বৃত্তিবিশেষ, যাহাকে শাস্ত্রে ক্রোধও কহে এবং ঈর্ষ্যাও কহে, তাহার নাম দ্বেষ। আর নিরুপাধিক ইচ্ছার বিষয়ীভূত এবং যাহার অসাধারণ কারণ ধর্ম্ম এবং পরমাত্ম সুখের অভিব্যঞ্জক এরূপ যে চিত্তের বৃত্তিবিশেষ, তাহাব নাম সুখ। আর নিরুপাধিক দ্বেষের বিষয়ীভূত এবং যাহার অসাধারণ কারণ অধর্ম্ম এরূপ যে চিত্তের বৃত্তি বিশেষ, তাহার নাম দুঃখ। আর পঞ্চ মহাভূতের পরিণামরূপ এরূপ যে ইন্দ্রিয় সহিত শরীর তাহার নাম সংঘাত। আর স্বরূপ জ্ঞানের অভিব্যঞ্জক এবং যাহার অসাধারণ কারণ প্রমাণ এরূপ যে প্রমাজ্ঞাননামা চিত্তের বৃত্তিবিশেষ, তাহার নাম চেতনা। আর ব্যাকুলতা প্রাপ্ত হইলে যে প্রযত্ন দ্বারা দেহ ইন্দ্রিয় স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম ধৃতি।

এখানে ইচ্ছাদি গ্রহণ অন্তঃকরণের সর্ব্ব ধর্ম্মের উপলক্ষণ। সেই অন্তঃকরণের ধর্ম্ম শ্রুতিতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। শ্রুতি—"কামঃ সঙ্কল্পোবিচিকিৎসা শ্রদ্ধা-শ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব"। অর্থ,—ইচ্ছা, সঙ্কল্প, সংশয়, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, বৃত্তি, জ্ঞান, ভয়, এই সমস্ত মনোরূপই হয় ইতি। শ্রুতিবচন 'মৃদ্‌ঘটঃ' এই বাক্যের ন্যায় মনোরূপ উপাদান কারণের সহিত কামাদি কার্য্যের অভেদ কথন করিয়া, সেই কামাদি কার্য্য বিষয়ে মনের ধর্ম্মত্ব কথন করিয়াছেন অর্থাৎ কামাদি কার্য্য মনেরই ধর্ম্ম। এইরূপ পঞ্চভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত পূর্ব্বকথিত যত প্রকার জড় পদার্থ আছে, সেই সমস্ত জড় পদার্থ ক্ষেত্রজ্ঞ নামা সাক্ষী দ্বারা ভাস্যমান (প্রকাশ্যমান) হওয়াতে সেই ক্ষেত্রজ্ঞ সাক্ষী হইতে ভিন্ন। এইরূপে এই সমস্ত জড়পদার্থ আমি সংক্ষেপপূর্ব্বক 'ক্ষেত্র' এই নামে কথন করিলাম। এবং ক্ষেত্ররূপ সর্ব্ব পদার্থ ভাস্য অচেতন রূপ।

শঙ্কা।—হে ভগবন্, শরীর ইন্দ্রিয়ের সংঘাতই চেতনরূপ হওয়াতে ক্ষেত্রজ্ঞ।

এইরূপ লোকায়তিকগণ মানেন। আর চেতনরূপ ক্ষণিক বিজ্ঞানই আত্মা। এই প্রকার সুগত মানেন। আর ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ জ্ঞান এই সমস্ত আত্মার লিঙ্গ। এই প্রকার নৈয়ায়িকগণ মানেন। সুতরাং পঞ্চ মহাভূত হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত এই সমস্ত ক্ষেত্ররূপ এই যে আপনি বলিতেছেন, তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

এরূপ অর্জ্জুনের শঙ্কা হওয়াতে শ্রীভগবান্ ক্ষেত্রের লক্ষণ কহিতেছেন। (সবিকারমিতি) এখানে জন্ম আদি বিনাশ পর্য্যন্ত যে পরিণাম তাহার নাম বিকার। যাহা সেই বিকারবান্ তাহার নাম সবিকার। অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশাদি বিকারবানের নাম সবিকার। এখানে পঞ্চ ভূতাদি হইতে ধৃতি পর্য্যন্ত যে যে পদার্থ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সেই সমস্ত পদার্থ সবিকাররূপ। সুতরাং সেই সর্ব্ব পদার্থ সেই বিকারের সাক্ষী হইতে পারে না। কারণ আপনার নিজের উৎপত্তি বিকাশ কেহ নিজেই দেখিতে পায় না। আর সেই উৎপত্তি বিনাশ ভিন্ন অন্য ও যত প্রকার আপনার ধর্ম্ম আছে সেই সকল ধর্ম্মের ও আপনার দর্শন বিনা সম্ভব নহে। যে হেতু ধর্ম্মীর দর্শনের পরই তাহার ধর্ম্মের দর্শন হইয়া থাকে। সেখানে যদি কদাচিৎ আপনার দ্বারাই আপনার দর্শন মানা যায়, তবে সেই দর্শনরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং কর্ম্ম আপনাতেই ঘটিবে। কিন্তু একই বস্তু বিষয়ে একই কালে একই ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং কর্ম্ম হওয়া অত্যন্ত বিরুদ্ধ। সুতরাং সবিকার বস্তু সেই উৎপত্তি বিনাশাদি বিকারের সাক্ষীর হইতে পারে না। কিন্তু নির্ব্বিকার বস্তুই সেই সর্ব্ব বিকারের সাক্ষী সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং এই সিদ্ধ হইল যে বিকারিত্ব ক্ষেত্রের চিহ্ন, অর্থাৎ যে যে পদার্থে বিকারিত্ব লক্ষিত হয়, সেই সেই পদার্থকেই ক্ষেত্ররূপ জানিবে। কোন নাম লইয়া গণনা করা ক্ষেত্রের চিহ্ন নহে। ইতি। ৫।৬।

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

সাহিত্যসম্মেলন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বাঙ্গালা সাহিত্যের উদয়।

আরবিক-পারস্য ভাষার প্রবল সংঘর্ষে সংস্কৃত ভাষা নববলে জাগরিত হইয়া উঠে। এই জাগরণের ফলে, বিজয় নগরে সায়ণ-মাধবের ন্যায় বৈদিক ও মীমাংসক পণ্ডিত এবং মিথিলায় গঙ্গেশ ও পক্ষধরের ন্যায় নৈয়ায়িক এবং বাচস্পতি ও মেধাতিথির

ন্যায় ধর্ম্মশাস্ত্রকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এই জাগরণ না হইলে বাঙ্গালা দেশে বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় তার্কিক প্রাদুর্ভূত হইতেন না, রঘুনন্দনের ন্যায় স্মার্ত্ত জন্মিতে পারিতেন না, শ্রীচৈতন্যের ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারক অসম্ভব হইত, এবং কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের ন্যায় সাধক দেখিতে পাইতাম না। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সংস্কৃত ভাষার যেরূপ অভ্যুদয় হইয়াছিল, বাঙ্গালা প্রভৃতি কথিত ভাষাসমূহও সেইরূপ স্ব স্ব ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল।

মুসলমানগণও অনেক স্থলে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎসাহ দিয়াছিলেন। শুনা যায় অনুমান খ্রীষ্টীয় ১৩০০ অব্দে গৌড়ের বাদসাহ নসিরা শাহের আদেশে মহাভারতের প্রথম বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন হয়। হুসেন সাহ, পরাগল খাঁ, ছুটী খাঁ প্রভৃতি মুসলমান শাসকগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্যক্ উৎসাহ দিয়াছিলেন

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য।

আজকাল বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সকল পুস্তক পরিদৃষ্ট হয় উহার প্রায় সমস্তই মুসলমান অধিকারের পরে লিখিত হইয়াছিল। যাঁহারা বলেন রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ মুসলমান যুগের পূর্ব্বের গ্রন্থ, তাঁহাদের দেখান উচিত ঐ পুরাণে মুসলমান ধর্ম্মের কথা কি করিয়া আসিল। মুসলমানের কথা যে অংশে উল্লিখিত আছে ঐ অংশ পরবর্ত্তীকালে যোজিত হইয়াছিল—একথাও নিশ্চিতভাবে বলিতে পারা যায় না, কারণ শূন্যপুরাণের সকল অংশেরই ভাষা প্রায় একরূপ। মাণিকচন্দ্রের গান খ্রীষ্টীয় ১১শ বা ১২শ শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। ঐ গানের মূল বিষয় নিশ্চয়ই ১১শ বা ১২শ শতাব্দীতে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু উহাতে বহু পারস্য শব্দের ব্যবহার দেখিয়া অনুমান হয় মাণিকচন্দ্রের গান মুসলমান-রাজত্বকালে বর্ত্তমান আকারে পরিণত হইয়াছিল। সংপ্রতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই মহোদয় নেপাল হইতে কতকগুলি দোঁহা ও গীতি কবিতা-মূলক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বলিয়া বোধ হয়। উহাদের প্রকৃত বয়ঃক্রম নির্ণয় করা সুকঠিন। ঐ সকল গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুদিত হইয়া তেঙ্গ্যুরের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। তেঙ্গ্যুর

বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ।

গ্রন্থের সঙ্কলয়িতার নাম বুতোন্, তিনি টাসি-হ্লুন্-পো বিহারের সন্নিহিত সালু নামক স্থানে ১২৮৮ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে তেঙ্গ্যুরের সঙ্কলন কার্য্য আরম্ভ হয়। অতএব শাস্ত্রী মহাশয়ের সংগৃহীত গ্রন্থগুলি ১৩২৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল। ঐ সকল গ্রন্থের রচয়িতা অনেক—যথা, নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব, কৃষ্ণপাদ, দীপঙ্কর, শান্তি, দারিক, ডোম্বী, কুক্কুরিপাদ, নাড়পণ্ডিত প্রভৃতি। ইঁহাদের মধ্যে নাগার্জ্জুন ও আর্য্যদেব খ্রীষ্টীয় ১ম বা ৩য় শতাব্দীতে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বয়ং বাঙ্গালা ভাষায় দোঁহা ইত্যাদি লিখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাদের সম্প্রদায়ের কোন অধস্তন শিষ্য ঐ সকল লিখিয়া গুরুর নামে প্রচার করিয়া থাকিবেন। শান্তির অপর নাম রত্নাকর শান্তি। নাড় পণ্ডিত তিব্বতে নারোপা নামে খ্যাত। ইহাঁরা উভয়ই মহা পণ্ডিত এবং উভয়ই খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষ ও ১১শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বাররক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। দ্বারিক ও ডোম্বী নারোপার শিষ্য। কুক্কুরিপাদ বাঙ্গালাদেশের লোক। জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি যোগ অভ্যাস করিবার জন্য একটী রমণীকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ রমণী পূর্ব্বজন্মে লুম্বিনী বনে কুকুরী ছিল! কথিত আছে কৃষ্ণপাদ বা কাহ্নুপাদ কুক্কুরিপাদের পূর্ব্বের লোক। দীপঙ্কর বঙ্গদেশীয় বিক্রমপুরের লোক। তিনি ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে উপস্থিত হন। উল্লিখিত গ্রন্থরচয়িতৃগণের মধ্যে অধিকাংশ খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষ ও ১১শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণপাদ প্রভৃতির গ্রন্থেও মুসলমান ধর্ম্মের উল্লেখ আছে যথা—

> আলি এঁ কালি এঁ বাট রুন্ধেলা।
> তা দেখি কাহ্নু বিমন ভইলা॥
> কাহ্নু কহি গই করিব নিবাস।
> জো মন গোঅর সো উআস॥ (চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়)॥

ক্রমশঃ।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

"নাস্তী সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৫ম ভাগ।] মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২৩। [১০ম ও ১১শ সংখ্যা।

নির্ভাবনা।

দয়াল হরির সখা মোরা
 আমাদের কি ভয় আছে গো?
(আমরা) হেসে খেলে বেড়াই ভবে
 মনটি রেখে তাঁর পায়ে গো॥
ইন্দ্রিয়দের মাতামাতি
 তাতে আর তো ডরাই নাকো।
যাঁর হুকুমের চাকর তারা
 তিনিই মোদের বন্ধু যে গো॥
বৃথা কেন ভাবিস্ বসে
 তুফান, দেখে ডরাস্ মিছে
দেখনা ভবের পাকা মাঝি
 হাল ধরে সে বসে আছে,
আসুক তুফান ডুবুক তরি
 তাতেও মোরা নাইকো ডরি,
অকূল ভবের যে কাণ্ডারী
 (তাঁর) চরণ পরশ পেয়েছি গো॥

কাম ক্রোধ কুম্ভীরাদি
যতই করুক গরজন,
নির্ভাবনায় তাদের সাথে
করছি সুখে বিচরণ ;
কেবা শুনে তাদের কথা,
কে যেতে চায় তাদের সেথা,
(আমরা) তাঁর কথাতে মগ্ন হয়ে
জগৎ ভুলে আছি যে গো।
কখন কাঁদি কখন হাঁসি
কখন ছুটি কখন বসি,
যে দিকে সে বাজায় বাঁশী—
সেই দিকেত চলেছি গো,
ভাসান্ দিয়ে স্রোতের কোলে
চলেছি তাঁর চরণ তলে
দেখব মোরে না নিয়ে তুলে
থাক্‌তে কেমন পারে সে গো॥

ভূপেন্দ্রনাথ—

ভাগবতের উপদেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে কয়েকটী ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা চক্ষের সম্মুখে রাখিলে আমাদিগের শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমের অন্বেষণ-পথে কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে কর্ত্তৃত্ব বোধটী দূর করিয়া, কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বের ভাষা ভুলিয়া যাইয়া, যাহাতে পিপাসু সাধক নিত্য, স্থির, অবিকৃত, স্বত্বার আভাস পান, সেই জন্যই শাস্ত্রের উপদেশ ও লক্ষ্য। এত করিয়া বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীভাগবত বলিয়া ফেলিলেন "বাপু হে সৃষ্টির ভাষায়, প্রাকৃতিক কর্ত্তৃত্বের ভাণ লইয়া সাবধান যেন ভগবান্‌কে দেখিতে যাইও না।" * মায়ার

* ভাগবৎ ২।১০।৪৪।৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

খেলা কর্ত্তৃত্ব প্রতিষেধের জন্য। এই কথাটি প্রবন্ধান্তরে বিশেষরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিব। সৃষ্টির অগ্রে ভগবানই আছেন, সৃষ্টির মধ্যেও তিনি এবং শেষেও তিনি। এই তথ্যটি অঙ্কপাত করিয়া বুঝিতে গেলে (১=ক+খ+গ+ঘ+......... ইত্যাদি=•)। ভগবান্ এক ও অদ্বিতীয় মধ্যে যে ব্রহ্মাদি অণুপরমাণু পর্য্যন্ত সৃষ্ট হইল ও সেই সৃষ্ট জীব-শক্তি ও সত্তাসমূহের মধ্যে কত প্রকার খেলা হইল তাহাতেও একমাত্র তিনিই সত্য। আবার যখন প্রলয়কালে সমস্ত লীন হইয়া আমাদিগের জ্ঞান শূন্যাকারে পরিণত হয়, সেই শূন্যের মধ্যেও সেই একই থাকে। এই জ্ঞান লাভ করা আমাদের পক্ষে বড়ই দুরূহ। উপলব্ধি ত হয় না এবং করিতেও ইচ্ছা করে না। তবে এইটুকু আমরা সকলেই চেষ্টা করিতে পারি যে সকল খেলার মধ্যে, যে ভাবেই যে থাকি না কেন, সকল খেলারই একমাত্র বাচ্য যে তিনি ইহা যেন না ভুলিয়া যাই। পুত্র-বিয়োগে শোকের মধ্যেও বুদ্ধি যেন না ভুলে "যে খেলার ভাষায় শোক সত্য বলিয়া অনুমিত হইলেও ইহার ভিতর সেই অবসানামৃত ভগবান্ একজন আছেন ; দেখি কোথায় এই শোকের খেলা অবসান হয়! আনন্দের খেলার মধ্যেও বস্তু ও ক্ষুদ্র আমিটীকে না দেখিয়া বুদ্ধিকে ভগবানের উপলব্ধির জন্য উদ্‌গ্রীব রাখিতে হইবে। ভেদের ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনার মধ্যে বুঝিতে হইবে যে, এ গুলি শিশুমানবের "বেলে খেলা"। বুঝিতে হইবে যে—

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ নচান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥

ভাগ ২।৫।১৪

বুঝিতে হইবে যে দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব, জীব, প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত শব্দনিচয় ও matter, motion, sensation, indeviduality প্রভৃতি পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের পদসমূহ এক ভগবান্‌কেই বুঝায়। এই শব্দসমূহের ভিতর চিত্ত স্থির হইলে দেখিতে পাইবে যে, এই সকলই সেই পরম একত্বের অবভাসক, চিত্তের আরোহণের জন্য কৌশলও ভগবানেরই পদচিহ্ন। আজকালকার তথাকথিত সাধুগণ ত সে কথা বলেন না। সকলেই ত স্ব স্ব বিপণীর মহিমা ও বিশিষ্ট মত স্থাপনার প্রয়াস করিয়া থাকেন। এত 'বেদান্ত' ও শীলপ্রমুখ বাবুগণের 'বেদাগ্র' দর্শনের মধ্যে কেহই ত এই ভাষাটি আমাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহেন না! এক দেখা যায়, নদীয়ার সেই মহা পাগল এই কথা বলিতে যাইয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া কি আশ্চর্য্য লীলামৃত ঢালিয়া দিয়াছে। আর দেখি বালক 'আচার্য্য'

সর্ব্বশাস্ত্রেরই অন্তরালে এই এক রস অনুভব করিবার কৌশলে ইঙ্গিত করিয়া যাইতেছেন।

দ্বিতীয় কথাটি এই যে, প্রাকৃতিক খেলার মধ্যে যতগুলি ভাষা আছে—যাহাকে আমরা তত্ত্বনামে অভিহিত করি—তাহাতে এমন কোনও ভাষা নাই, যাহাতে ভগবানের বিশেষ অনুভূতি সিদ্ধ হয়। প্রকৃতির সর্ব্বাত্মিকা ও মহামায়ার বিদ্যাভাবের খেলা হইলে—তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে, সামান্যরূপে ভগবৎসত্তার আভাস পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার বিশেষ—শেষশূন্য অক্ষয় পদের উপলব্ধি হইতে পারে না। খেলার ভিতর, খুব সুরসিক হইলে—গায়ত্রীর শিরোমন্ত্রে অভ্যস্ত হইলে—খেলাগুলিকে তাঁহার বলিয়া জানা যায়। বিপদের মধ্যে পতিত সাধক তাঁহার মধুসূদন ভাবের আভাস পাইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি ঘটিবে না। প্রকৃতিতে তিনি সামান্য ভাবে অনুপ্রবিষ্ট ;—তাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে, প্রকৃতির তত্ত্বজ্ঞান হইলেও, তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না। আধুনিক সাংখ্য মতটি দেখ, 'আমি'কে দ্রষ্টা করিয়া সাধক তত্ত্বসমূহের আভাস পান ও সেই সকলই যে সর্ব্বাত্মক অর্থাৎ সকল আমিরই সামান্য ভাবের খেলার ভাষা ইহা বুঝিয়া বিশিষ্টাভিমানী সাধক উহা ত্যাগ করেন। এইরূপে তত্ত্বনিচয় আর তাঁহাকে চালাইতে পারে না ও তিনি নিষ্ক্রিয় অথচ ভেদ ভাবের বিশেষ পুরুষ জ্ঞানে আপনাকে মুক্ত বলিয়া মনে করেন। কই, তিনি ত তত্ত্বের ভিতরে ভগবান্‌কে দেখিতে পান না ; তিনিত তত্ত্বজয়ী হন না! কেবল প্রকৃতি দয়া করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন, তাই তাঁর এত বড়াই। তত্ত্বের সামান্য জ্ঞানের যে প্রমা তাহার ভিতর ভগবান্‌কে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা বলিয়া উঠেন "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ"। 'আমি'র দ্রষ্টৃত্ব লইয়া তাঁহারা এতই ব্যস্ত যে 'আমি'র অভ্যন্তরে প্রেরককে দেখিতে পান না। বহু পুরুষসমূহ কি করিয়া থাকিতে পারে ও একই প্রকৃতি কি করিয়া ভোগাপবর্গসাধনতৎপরা ? এই তথ্যনিচয়ের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে তাঁহারা হয়ত শ্রীভগবানের একটু ইঙ্গিত পাইতেন। সেইজন্য বলি যে আধুনিক সাংখ্য—প্রকৃত সাংখ্য নহে ; ভাগবতেই প্রকৃত সাংখ্যের আভাস দেওয়া আছে।

বেদান্ত ও ভাগবতের পন্থা অন্যরূপ। এক কল্প ধরিয়া কেবল প্রকৃতির খেলা দেখা ভীষণ অত্যাচার বলিয়া মনে হয়। পাঠককে যদি জোর করিয়া দুইটা ঘণ্টা কাল বায়স্কোপ দেখান যায় তা' হইলে বোধ হয় জীবনেও তাঁহার আর বায়স্কোপ দেখিবার সাধ থাকিবে না। আর সাংখ্য মুক্তযোগী একটা কল্প যাবৎ এই

প্রাকৃতিক বায়স্কোপ দেখিয়া যে হাঁফাইয়া উঠেন তাহা কি এত অসম্ভব? আমরা যেমন বায়স্কোপের অত্যাচারে একটু 'আমি'র ভিতরে থাকিতে ইচ্ছা করি,—সংসারের দুনিয়াদারীর মধ্য অনেক সময়ে ক্লিষ্ট হইয়া আমাকে 'আমি'র ভিতরে রাখিতে ইচ্ছা হয়, আর বাহিরে চাহিতে ইচ্ছা করে না, সাধকও সেই রূপে সাংখ্যের সার্ব্বজনীন তত্ত্বনিচয়ের খেলায় বিরত হইয়া কিসে খেলা একেবারে বন্ধ হয় তাহার জন্য আকুল হইয়া উঠেন। সমস্ত দিন খাটিয়া শুইতে চাই কেন, জান? খেলার ভাষায় আমিটিকে পুরি বা প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত দেখিয়াই ত আমাদিগের হৃদয়ের ভিতরকার অপরিস্ফুট ভাবে অভিব্যক্ত পরাশান্তির আকাঙ্ক্ষা মিটে না? অথচ বুঝিতে পারি না যে 'আমি' পুরুষ, নিত্য পরিপূর্ণ, খেলার অতীত স্থির স্বত্বা! নিদ্রা, মৃত্যু প্রভৃতির ভিতর কোন শক্তি খেলিতেছে, দেখ। যাঁহারা sensation শব্দবাচ্য নিত্য নূতন রসবোধের আকাঙ্ক্ষায় জীবনকে অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কোন্ প্রাণে ঘুমাইতে যান? ও রসে ত পুরুষ তৃপ্ত হয় না! তাই যখন পৌরষেয় শক্তির ক্রিয়া হয় এত সাধের প্রকৃতির ক্রিয়াগুলি পড়িয়া যায়—আমি ঘুমাইয়া পড়ি। সেই প্রকারে 'ব্যক্তের' অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বয়োবৃদ্ধ মাত্রেই কেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে জান? এই আকাঙ্ক্ষা হয়ত প্রতিনিয়ত খেলার কামনায় অভিভূত হইয়া যায় ও পরক্ষণেই আমরা আবার খেলিতে ছুটি; কিন্তু তাহা হইলেও মানব যে ক্ষণমাত্রও "খোলা ঘরের খেলা" ভাঙ্গিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে ইহাতেই পৌরষেয় শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ব্রহ্মার অত্যাচারে জীবগণ যখন ক্লান্ত হয় তখনই প্রলয় আরম্ভ হয়।

এক্ষণে আমাদের আমি জ্ঞানটীকে অনুশীলন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, আমিটী প্রকৃতপক্ষে খেলার পদার্থ নহে। যেস্থানে খেলার অবসান হয় সেই স্থানেই আমির অভিব্যক্তি। বাহিরের ধনরাশি দেখিয়াই ত তৃপ্ত হওয়া উচিত; কি বলিয়া উহা আমার করিতে চাও! খেলার ভাষা সত্য হইলে আমরা অপরের ধনৈশ্বর্য্য দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু আমির সহিত না মিশিলে ত প্রকৃতির কোনও খেলারই রস বোধ হয় না! প্রকৃতির পরতন্ত্রতা দূর করিয়া তাহাকে মানব-চৈতন্যের বশীভূত করিবার দিকেই পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের গতি। বুদ্ধি অর্থে প্রাকৃতিক খেলার অবসান গতি। আপেলের ভূপতন খেলা যখন নিউটনের বুদ্ধিতে অবসিত হইয়া গেল তখন ভিতর হইতে বিধি, নিয়ম বা Low বলিয়া আর একটী ভাষা ফুটিয়া উঠিল এবং তাহাতেই

মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার হইল। অপেক্ষাকৃত ভিতরের ভাষার না বুঝিলে কোন বিষয়েই জ্ঞান হয় না। আনন্দানুভবের সময়ও দেখ বস্তুর অস্তিত্ব ভাবটী থাকে না। সমস্ত বিশ্বই কি এক অন্তর্মুখী কি এক একত্বাভিমুখী, অথচ খেলার লয়কারী এক অভিনব গতির পরিচয় প্রদান করিতেছে; ইহা খেলা অপেক্ষা 'পর'; কেন না খেলার ভাষা ইহার এক অংশে স্থিত। নিয়ম, বস্তুর স্বভাব, রোগের বীজাণু প্রভৃতির অনুসন্ধানের মধ্যেও ঐ দেখ—ত্যক্ত খেলার পশ্চাতেও সত্যের বা শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যে—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।" মোট কথা এই যে প্রাকৃতিক জ্ঞান ও পুরুষবুদ্ধি এতদুভয়েব মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। প্রাকৃতিক জ্ঞান তিন গুণ অবলম্বনে থাকে। উহা কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্ব-ভাবে বিন্যস্ত। শিল্পীর শিল্পকার্য্য দর্শনে তাহার স্বরূপের জ্ঞান হয় না; তাহার বুদ্ধির বিকাশ, তাহার কর্ম্মনিপুণতা পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। মনে করুন, একখণ্ড সুন্দর ঢাকাই মস্‌লিন দেখিলেন, রাম তাহার শিল্পী; বস্ত্রখণ্ড দেখিয়া আপনার রামের নৈপুণ্য ও বুদ্ধি সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মিল। নৈপুণ্য অর্থে কেবল বস্ত্রবয়নের নিপুণতা; এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্য অর্থেও কেবল ঐ ব্যাপারেই রামের বুদ্ধিবিনিয়োগের আভাস মাত্রই পাওয়া যায়। রাম হয়ত খুব ধার্ম্মিক, হয়ত সে সংসারে সন্তানবিয়োগজনিত ক্লেশসম্পাতে বাধ্য হইয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বস্ত্রখণ্ড দেখিয়া কি রামের এই সকল ভাব বুঝিতে পারা যায়? না বস্ত্রের ভিতর দিয়া তাহার কার্য্যে যতটুকু কর্ত্তৃত্ব ও কারণ ভাব তাহাই বুঝা যায়? তাহার নৈপুণ্য ও বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষাকৃত উচ্চগুণসম্পন্ন হইলেও আমরা কি তাহার পরিমাণ করিতে পারি? রামের ঐ গুণদ্বয় প্রাকৃতিক হইলেও আমরাত উহার সবটুকু বুঝি না; কেবল বস্ত্রবয়নে যত-টুকু পরিস্ফুট হয় ততটুকুই ধরিতে পারি। রাম কেন যে বস্ত্রবয়ন করিল, বা তাহার কামনা বা উদ্দেশ্য পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি না। সুতরাং বস্ত্রবয়নসম্বন্ধীয় জ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও ঐ জ্ঞানটী বস্ত্ররূপ স্থূল ভাবেই অবস্থিত। উহাতে আর ঊর্দ্ধগতি নাই। বস্ত্রবয়নের জন্য যতটুকু মন ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন সেই জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু সেই জ্ঞানে প্রকৃত পরাগতি নাই। তারপর ঐ জ্ঞানে কার্য্যভাবেরও স্থৈর্য্য নাই। রামের নৈপুণ্য ও বুদ্ধিপ্রাখর্য্য কেবল মস্‌লিন বুনিয়াই স্থির হইতে পারে না, অন্যান্য কার্য্যেও তাহার প্রকাশ হয় ও হইতে পারে। তারপর ঐ জ্ঞান সামান্য জাতীয়; অর্থাৎ সকল জীবেরই

উহা সম্ভবে। এই ভাবে যে শৃঙ্খলা ও নিয়মের পরিজ্ঞান হয় তাহাও সামান্য। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সামান্য জ্ঞান সকলেরই আছে কিন্তু উহার যে বিশেষ মূর্ত্তি কি তাহা এখনও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অধিগম্য হয় নাই।

এইরূপে প্রাকৃতিক তত্ত্ববিজ্ঞানেও পরাগতি নাই। উহা একদিকে ব্যক্ত খেলা ও অপরদিকে ব্যক্ত বিলাসের সূক্ষ্ম কারণ পর্য্যন্ত দেখিয়াই তৃপ্ত। উহাতে আমাদিগের পৌরষেয় বুদ্ধির তৃপ্তি হয় না। অতৃপ্ত পুরুষ খেলা ফেলিয়া উপরে থাকিতে চাহেন ইহাই সাংখ্য ও পাতঞ্জল শাস্ত্রের কৌশল। মনে করুন, বাসনার ক্ষেত্রে কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বের শৃঙ্খলা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইলে উহা সাধারণ কলকব্জার মত বোধ হয়। এখন যেমত আমরা বাসনাতে আমিকে দেখিতে পাইয়া তৃপ্তির ও আনন্দের আশা করি, বাসনার প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রচারিত হইলে দেখিতে পাইব যে উহা কলের খেলা, উহা সকল জীবেরই সামান্য ও সর্ব্ব জীবের সামান্য ভাব আশ্রয় করিয়া থাকে, দার্শনিক এবং কামুক উভয়েই এক পর্য্যায়ে পতিত হন। এরূপ বোধ হইলে আমাদের বিশেষাভিমানী 'আমি' আর ঐ খেলাতে তৃপ্ত হয় না ; উহাতে বিশেষ রসাস্বাদ না পাইয়া উহাপেক্ষা উর্দ্ধতর তত্ত্বে আরোহণ করিতে প্রযত্নপরায়ণ হয়। কিন্তু ইহাতেই কি আমির স্বরূপ বোধগম্য হইল? ইহাতে 'আমি কি নহি' তাহার আভাস পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমির স্বরূপোপলব্ধি কি প্রকারে হইবে? আমি ইহা নহি বলিলেও যে আমার দৃষ্টি ইহাতেই থাকিয়া যায়! হয়ত সমস্ত প্রাকৃতিক ভাবকে নিরাশ করিলে পুরুষে অবস্থান ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও পুরুষের স্বরূপ বিজ্ঞান কি প্রকারে হইবে? তারপর সাংখ্য "আমি প্রকৃতি নহি" এই পর্য্যন্ত দেখাইয়া দেন কিন্তু আমির ভাব বা অংশ প্রকৃতিতে না থাকিলে কিরূপে প্রকৃতি দ্বারা আমার ভোগ বা অপবর্গ সাধিত হইতে পারে তাহা ত বুঝাইয়া দেন নাই! বাসনার ভিতর আমি না থাকিলে আমি কি বাসনার তৃপ্ত হয়? শুধু কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বের খেলায় ত আমি তৃপ্ত হয় না! বাসনার সহিত খেলিতে খেলিতে ত বেশ অভিন্ন, একরস আমির বোধ হইত ; এবং তাহা হইত বলিয়াই "আমি"তে এবং বাসনাতে ভেদ দেখিতে পাইতাম না। এক্ষণে সাংখ্যোক্ত পুরুষ ভাবে 'আমি' অবস্থিত থাকিলেও তাহাতে বাসনা, মন, প্রভৃতি তত্ত্বের ভিতর যে আমির ভাব রহিয়া গিয়াছে তাহাত সংগৃহীত হইল না। উহাত পুরুষ-আমির সহিত মিশান হইল না। তোমার আমিটী একটী ছোট পুরুষ বুদ্ধিতে সামান্য ভাবে রহিল।

ও বুদ্ধিটী ছোট ও সামান্য, কেন না সাংখ্য মতে বহু পুরুষ। সাংখ্যের পুরুষ যেন প্রকৃত পুরুষোত্তমের অংশ, কলা মাত্র! প্রত্যেক পুরুষই স্বতন্ত্র, কিন্তু সাংখ্যও বলিতে পারেন না যে এই স্বতন্ত্রতা কি লইয়া? প্রকৃতি নাই; সুতরাং প্রাকৃতিক ভেদের জন্যও এই স্বতন্ত্রতা নহে, কাযেই বলিতে হইবে যে পুরুষের ভিতরেও এরূপ কিছু শক্তি বা জ্ঞানমাত্রা থাকে যাহাতে মুক্ত পুরুষগণও পৃথক্ না হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং সাংখ্যমতের পুরুষটী কেবল কথায় মাত্র বলিয়াই মনে হয়, তাহার বিশেষত্বও প্রকৃতিকে লইয়া; তাহা তাহার স্বরূপ বিশেষত্ব নহে। এই বিশেষ ভাবটী পুরুষে নাই বলিয়া সাংখ্য পুরুষ ভগবান্‌কে দেখিতে পায় না; শুধু প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত হইয়া "আমি মুক্ত" এই অভিমানে বিরাজ করে। তাহার নিষ্ক্রিয়তাও কৃত্রিম। তাহাতে ক্রিয়ার অতীত, প্রকৃতির পর স্বস্থা নাই; কেবল প্রকৃতি হইতে আপনাকে পৃথক্ করিয়া সাময়িক স্বতন্ত্রতা লাভ করে মাত্র।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে অপরা বিদ্যামাত্রেই প্রকৃত পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না। উপাধি বা ক্ষেত্র লইয়া যে বিদ্যা তাহাকে অপরা বিদ্যা বলে। এমন কি বেদ পর্য্যন্ত ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির উপর অধিষ্ঠিত। কেবল উপনিষৎ ভিন্ন বেদের অন্য অংশে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পুরুষের প্রতি লক্ষ্য না থাকাতে বেদও প্রাকৃতিক। পরাবিদ্যা, পরাপ্রকৃতি প্রভৃতি শব্দে 'পর'পুরুষাভিমুখী গতির ইঙ্গিত করা হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেও এই পরাপ্রকৃতি নাই। পাশ্চাত্য শারীর-বিজ্ঞান শরীরকে তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ত পুরুষকে দেখাইতে পারে না। জাগতিক শক্তি ও খেলাসমূহকেই সত্য বলিয়া শরীরকে সেই খেলার যন্ত্র বলিয়া বুঝাইয়াছে, আত্মার অতি মনোহর মন্দির বলিয়াত দেখা হয় নাই! কিন্তু বাউল সম্প্রদায়ের দেহ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে তাহা হইতে কতকটা পুরুষের জ্ঞান জন্মে। সুতরাং পরা ও অপরাবিদ্যা আর গতি অত্যন্ত ভিন্ন। দেহের সম্বন্ধে, ডাক্তার-দিগের ন্যায় বিশেষ বিজ্ঞান না থাকিলেও 'আমি দেহ নহি' এই বোধ অবলম্বন করিতে পারিলে সাধক পাশ্চাত্য ভাবের বিদ্বান্ না হইলেও আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞানের পথে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। আধুনিক পরাবিদ্যাসমিতির শিক্ষার মূলেও এই দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির ক্ষেত্র লইয়া তন্ন তন্ন করিয়া তাহার তথ্য নির্ণয়ে সভ্যগণ যেরূপ ব্যাপৃত, আত্মতত্ত্ব নিরূপণে সেরূপ পরামর্শ নাই।

যথার্থ পরাবিদ্যার লক্ষণ কি? এই প্রশ্নটির সমাধান না করিলে আর চলে

না। প্রকৃতির দিকে চাহিয়া শুধু খেলা দেখিলে বা প্রাকৃতিক নিয়মের পরিজ্ঞান সিদ্ধ হইলেই হইবে না; প্রকৃতিকেও আত্মশক্তির খেলা বলিয়া জানিতে হইবে। আত্মা হইতে বিবিক্ত করিয়া প্রকৃতিকে বুঝিলে হইবে না। প্রকৃতিকে "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং" বলিয়া জানিতে হইবে। ইহাই বেদান্তের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। যাহা কিছু 'ইদং' যাহা কিছু 'দৃশ্য' তাহার ভিতরেই ভগবান্‌কে ব্রহ্মভাবে দেখিতে হইবে। সকল দিকেই 'আমি'টিকে শুধু প্রকৃতি হইতে বিবিক্ত করিয়া দেখিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। 'অহং'এর ভিতর 'পরপুরুষ' বা 'স'কে দেখিতে হইবে। বিশেষ প্রাকৃতিক জ্ঞানে অহংকে না রাখিয়া তাহার ভিতর পরাভিসারিণী গতি চিনিতে পারিয়া সেই যে 'স' ইহা বুঝিতে হইবে। সে যে সামান্য প্রাকৃতিক ভাব নহে, কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বের খেলার ক্রীড়নক ও এমন কি দ্রষ্টা মাত্র নহে—তাহার সহিত যে প্রকৃতির ও গুণের সম্বন্ধই নাই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। দ্বৈত, অদ্বৈত যে ভাবেই হউক না কেন, এই পরাভাবের অববোধ না হইলে সকলই বৃথা হইয়া যায়। এই দুইটি কথা আগামী বারে আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি রহিল। তাহার পর বুঝিতে পারা যাইবে যে ভাগবতের শিক্ষা ও গতি প্রাকৃতিক নহে। প্রকৃতির মানযন্ত্র লইয়া ভাগবত বুঝিতে যাওয়াতে কেবল মোহের সৃষ্টি করত আত্মার অবনতি আনয়ন করে। ভাগবত ত্রিগুণের উপরের কথা, ভগবানের কথা! পর ও অদ্বিতীয় বিশেষ পুরুষোত্তমের কথা!!

বিদ্যা শব্দের অর্থ কি? জানা মাত্রই ত বিদ্যা নহে। এ বিষয়ে বোধ হয় শ্রীভগবানের স্বীয় উক্তিতে সন্তুষ্ট হইবেন। উদ্ধবের প্রশ্নে ভগবান্ বলিলেন,—"বিদ্যাত্মনিভিদাবাধঃ"। আমির ভিতর যে ভেদবুদ্ধির সংস্কার থাকে তাহার বাধা বা নাশই বিদ্যার গতি। সুতরাং জানা মাত্রকেই বিদ্যা বলে না। কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তি বা বস্তু জানিলে ও তাহাদিগকে প্রয়োগ করিতে পারিলে পাশ্চাত্যমতে তত্তৎবিদ্যা লাভ হইল বটে, কিন্তু ইহাতে'ত সেই বস্তু বা শক্তিসমূহের সহিত আমার ভেদবুদ্ধি দূর হইল না। একটি গর্দ্দভকে শুধু পশু বলিয়া জানা অনেকেই জ্ঞান মনে করেন। অপর এক দল গর্দ্দভের কার্য্য কারণ ও কর্ত্তৃত্বের ভাবনিচয় অবগত হইয়াই তৃপ্ত হন। আরও উচ্চতর সাধক গর্দ্দভকে তদধিষ্ঠাত্রী শীতলাদেবীর সহিত বাহনভাবে যোজিত করিয়া চৈতন্যের আধারভূত বলিয়া জানেন। কিন্তু ইহাও ত বিদ্যা নহে; ইহাতে ত অভেদ-দৃষ্টির স্ফুরণ হইল না।

তবে বিদ্যা শব্দের অর্থ কি ? লৌকিক বিদ্যার ভিতর দিয়া দেখিলেও বুঝা যায় যে, আমির সহিত বস্তুর সম্বন্ধ জ্ঞানই বিদ্যার মৌলিক গতি। আমিটীকে শরীরাবচ্ছিন্ন ভাবিলে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ ব্যতীত বস্তুর সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় না। সে জন্যই প্রথম স্তরে ইন্দ্রিয়জ পরিণতি জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। তাহার পর যথন মানব দেখিতে পায় যে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সম্বন্ধ অতি ক্ষণস্থায়ী, তখন বাসনার সহিত বস্তুর সম্বন্ধ দর্শন করিতে আরম্ভ করে ও বস্তুসমূহকে অনুকূল ও প্রতিকূলভাবে বিভক্ত করিয়া দ্রব্যরূপে দেখে। এইরূপে মানব যখন মানসিক ভিত্তিতে উপনীত হয় তখন সঙ্কল্প ও বিকল্প প্রভাবে বস্তুর গুণ, ও অপর বস্তুর উপর তাহার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াদি ভাব সমুদয় পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক গুণ ক্রিয়াদি একত্রিত করিয়া বস্তুজ্ঞানরূপে অভিহিত করে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বস্তুগুলি এই ভাবে অনুভূত শক্তি ও গুণের সমষ্টি ও তাহাদের প্রচারের (synthesis) দ্বারা বিশেষিত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কামনা হইতে বিশ্লেষিত করিয়া মানসিক সঙ্কল্পাদি সাহায্যে বস্তু ও ধর্ম্মের সাহায্য করে। তাই আমির বিশিষ্টভাব সমুদয় বস্তু ও শক্তির উপর আরোপিত হইয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চক্ষে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়। সেই জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পুরুষার্থ সিদ্ধির বীজ অতি অল্পই নিহিত আছে। তাহার মতে আমি থাকি আর যাই নিহত হইলেই জয় হইবে। মানবের মানবত্ব না থাকিলেও জেপেলিন আবিষ্কৃত হইলেই বিজ্ঞানের উচ্চতম স্তর অধিকৃত হইল।

তারপর বৌদ্ধিক জ্ঞানের স্তর। বৃত্তিনিচয়ের অবসানকেন্দ্র দেখাই বুদ্ধির ধর্ম্ম। খেলা সমুদয় যে স্থান হইতে উদ্ভূত, যাহাতে স্থিত ও যাহাতে লীন হয় সেই কেন্দ্রস্থান দর্শনই বুদ্ধির কার্য্য। যে জীবাণু হইতে ডিপথরিয়া নামক কতকগুলি বিশিষ্ট শারীরিক চিহ্ন বা লক্ষণ প্রকাশিত হয়, সেই বীজাণুকে ধরিতে পারিলে রোগেরও শান্তি হইবে বলিয়া যে চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে উহাই বুদ্ধির খেলা। প্রকাশিত ব্যক্তভাবগুলি যাহা হইতে উদ্‌গত তাহাতে তাহার নিবৃত্তি করিবার চেষ্টাই বুদ্ধিগত প্রযত্ন। ইহাই প্রকৃতির প্রকৃত শিক্ষা। প্রকৃতির শিক্ষায় কামপরায়ণতার ফলে শান্তনুনন্দন বিচিত্রবীর্য্যকে সহবাসে মৃত্যুরূপ খেলার অবসান দেখাইয়া তাঁহাকে বুদ্ধিপরায়ণ করা হইল। আমাদিগের শাস্ত্রে যমরাজের শাসন প্রণালী যেরূপভাবে বর্ণিত, তাহাতে পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণের মনে শ্রদ্ধার আবির্ভাব হয় না। চুরি কর, পরদারাভিমর্ষণ কর, সকল পাপেই একমাত্র করাবাস শাস্তি আধুনিককালে বিহিত হইয়াছে ;

ইহাতে পাপ বা অসংযত বৃত্তি বিকাশের সহিত শাস্তি বা অবসান মাত্রার সহিত কোন নিকট সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় না। মনুর মত অন্যরূপ। গ্রহণের ইচ্ছা হইতেই যে হস্তেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি আধুনিক পাশ্চাত্যগণও স্বীকার করিবেন। অসংযত গ্রহণেচ্ছা চৌর্য্যের উৎপাদক, সুতরাং চোরের প্রতি যে হস্তাদি কর্ত্তনরূপ মনুর শাসনবিধি প্রচলিত আছে তাহাতে বৃত্তি, তাহার প্রকাশ ও অবসান এই ভাবত্রয়ের সমাবেশ হইতে পারিত ও তদ্দ্বারা চোরের হৃদয়েও প্রাকৃতিক নিয়মের পরিজ্ঞান বদ্ধমূল হইত। পাপের প্রতিকূলে ঋষগণ যে অভিশাপ প্রদান করিতেন তাহার মূলেও এই বুদ্ধিগত ভাবটি নিহিত থাকিত। অহল্যা পাষাণী হইলেন কেন? তাঁহার প্রতি ব্যভিচারের স্থূল শাস্তি কেন প্রযুক্ত হইল না? কারণ, ইন্দ্রিয় ও কামনার ক্ষেত্রে অহল্যার পাপ হয় নাই। যেহেতু ইন্দ্রিয় ও কাম ইন্দ্রকে গৌতম মূর্ত্তিতেই দেখাইতেছিল।

কিন্তু অহল্যা তাপসী, তাঁহার হৃদয়ে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির উন্মেষ হইয়াছে, তিনি ইন্দ্রিয় মন ও কামের ভাষা উপেক্ষা করিয়াও বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিতে সক্ষম। এই বুদ্ধি তাঁহাকে জানাইয়াছিল যে গৌতমমূর্ত্তি হইলেও ছদ্ম বাসব স্বামী নহেন। এই অবসানাত্মিকা বুদ্ধির অবমাননা-প্রযুক্ত তাঁহার বোধ অপহৃত হইল। ঋষির প্রেম কেবল কায়িক ভালবাসা নহে। তিনি পত্নীর মঙ্গল-উদ্দেশ্যে, যাহাতে অহল্যা আর কদাপি অন্তরাত্মার সেই অপরিস্ফুট বাণীর হেলন না করেন,—শুধু তাই কেন? যাহাতে বোধ শক্তির ব্যবহার আর কেবল বাহিরের বৃত্তিতে অভিনিবিষ্ট না থাকিয়া উহা প্রকৃতভাবে আত্মার গ্রহণ-শীলতায় পর্য্যবসিত হয়, বাহ্য গ্রহণভাব পাড়য়া যাইয়া অভিরাম আত্মার অভিনব ভাব গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় সেই জন্য পাষাণী অহল্যাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির ভাষা শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিলেন ও সেই জগদভিরাম শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে যে বুদ্ধির প্রকৃত পরিণতি ও বিকাশ তাহাই বুঝাইবার জন্য শাপাবসানের উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। গৌতমের শিক্ষা প্রকৃত বুদ্ধির ভাষায় প্রতিষ্ঠিত। যোগিগণ ত প্রতিনিয়তই এইরূপ পাষাণ হইবার নিমিত্ত সাধনা করিতেছেন ও একবার মাত্র পুরুষোত্তমের পদরেণু লাভের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। তবে এই ব্যাপারে অহল্যার শাস্তি দেখিতেছ কেন ভাই? তবে কেন জীবনের রাশীকৃত বিপদে ও প্রিয়জনবিয়োগে, জড়া ও বার্দ্ধক্যরূপ আত্মার অবসান-লীলার বিকাশে অশুভ দর্শন করত শিহরিত হও। চিরকালই কি খেলায় মত্ত থকিয়া যাইবে, খেলার অবসানামৃতরূপ পুরুষোত্তমকে কি দেখিতে শিখিবে না! তাই

"উষতিরিব মাতরঃ" প্রকৃতি মুগ্ধ সন্তানকে ঘরে ফিরাইয়া লইবার জন্য এইরূপে খেলেন!

তারপর চৈত্তজ্ঞান। চিত্ত (consciousness) যে কেবল পুরুষাভিমুখী হইয়া খেলে, পুরুষকে দেখানই যে তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহাই বুঝাইবার জন্য,—বুদ্ধির অবসান-কেন্দ্রটী যে পুরুষ উহা যে 'আমি,' ইহা শিখানই এই বিদ্যার গতি। যাহা কিছু বাহিরে দেখিতেছ—ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি যাহার অংশ মাত্র গ্রহণ করিতে পারে—তাহা যে বাহিরের পদার্থ নহে, সে যে পুরুষ মূর্ত্তি ইহাই প্রকৃত 'চৈত্তবিদ্যা।' প্রহ্লাদ এই স্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়াই অগ্নি. জল, হলাহল প্রভৃতিতেও ভগবানেরই ইঙ্গিত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই প্রকৃতিদেবী তাঁহাকে ভোগরূপ ফল না দিয়া অপবর্গরূপ ফল প্রদান করিয়াছিলেন।

কিন্তু ইহাও ত পরাবিদ্যা নহে। খেলার ভিতরে ভগবান্‌কে দেখা, আর তাঁর দ্বিতীয়শূন্য, নিষ্কল, প্রকৃতির লেশহীন, শুদ্ধ স্বরূপ দেখা ত এক নহে! এ ভাবে খেলাও আছে, ভগবান্‌ও আছেন। তাই বুঝি প্রহ্লাদের ভগবদ্দর্শনের পরেও খেলার অধিকারী হইতে হইয়াছে। তার পক্ষে ভগবানের খেলা হইলেও তবুও তাহাতে একটু বাহ্যের স্পন্দনও ত আছে! চিত্তের উপর ত এ খেলা একটু নির্ভর করে। বস্তু ত এখনও স্বতন্ত্র হয় নাই, একটুও চিত্ততন্ত্র আছে ত! পরাগতি থাকাতে এ বিদ্যাকে সেই পরাভাবের ক্রম বলিয়া গ্রহণ করিতে পার, কিন্তু ইহা পূর্ণ পরাভাব প্রাপ্ত নয়। যে ভাবে ভগবান্‌কে দেখিলে, হৃদয়গ্রন্থি পর্য্যন্ত ছিন্ন হইয়া জীবাশয়ের আত্যন্তিক নাশ হয় এখনও ত সেরূপ দেখা হয় নাই! শাস্ত্রোক্ত অপরাবিদ্যাসমূহের অন্তরালে ভগবানাভিমুখী প্রবৃত্তি আছে অথচ খেলাও আছে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষে জ্যোতিষ্কনিচয় বাহিরের সৌর-জগতে অবস্থিত স্থূল, পরিচ্ছিন্ন, জড়পিণ্ড মাত্র। হিন্দুজ্যোতিষে তাহারা আত্মার বিলাসভাবের এক একটী আধার বা ক্ষেত্র। ঐ ভাব গ্রহণ বা অবলম্বন করিয়া আছে বলিয়াই উহারা গ্রহ নামে অভিহিত। (Principal of manifestative.)

পাশ্চাত্য জ্যোতিষে পরাগতি বা পুরুষ বুদ্ধি নাই। হিন্দুজ্যোতিষে তাহা আছে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষ সৌরজগতে অবস্থিত বৃহস্পতিকে (Jupitor) একটী জড়পিণ্ড ও পৃথিবীর সহিত সামান্য কয়েকটী আলোক রেখার সম্বন্ধে সম্বন্ধিত দেখিলেন কিন্তু হিন্দু সেই বৃহস্পতিকে জীবের বুদ্ধিক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতা

রূপে দেখিতে পাইয়া জাতকের জন্মমুহূর্ত্ত হইতে তাহার জাতদণ্ডের লগ্ন ও রাশিমানের সহিত গুরুরূপী বৃহস্পতির সম্বন্ধ নির্ণয়পূর্ব্বক তাহার চিরজীবন-ব্যাপী বুদ্ধিবৃত্তির একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বজীবের ও বিশ্বের সহিত ক্ষুদ্র মানবশিশুর সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিলেন। এইরূপে দেখাইলেন যে মানব তনু-ধনাদি যে কয়টী মুখ্যভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করে তাহার সকলগুলিই এই নবগ্রহ কর্ত্তৃক বিশ্বের সহিত সমানুপাতে বিধৃত রহিয়াছে। একটু বিবেচনাপূর্ব্বক দেখিলে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই তনু-ধনাদি দ্বাদশটী ভাবের অতিরিক্ত ব্যক্ত জীবের অন্য কোনও ভাব নাই। হিন্দু অপরাবিদ্যার ভিতরও যে পুরুষাভিমুখী প্রবৃত্তি আছে তাহা মন্ত্রবর্ণেও দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্যই মন্ত্রের প্রয়োগ। আমিকে পাইবার জন্যই সমস্ত সাধনা। ইহাই মন্ত্রের বিনিয়োগ বা প্রয়োগ। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শুধু প্রাকৃতিক নিয়ম পরিজ্ঞানে সন্তুষ্ট কিন্তু হিন্দুর অন্তরতম ভাব এই যে প্রত্যেক প্রাকৃতিক শক্তি বা নিয়মের সহিতই 'আমি'র ঘন সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ-জ্ঞানটী অবশ্য অবস্থানুসারে বিভিন্ন হয়। বাহ্য বস্তুকে আমির ব্যক্তভাবে প্রয়োজনসিদ্ধির বলিয়া যখন দেখা যায়, মানব চৈতন্যের যে অবস্থায় বাহ্য ভাব-নিচয়ের মধ্যে আমির ইষ্ট সিদ্ধির উপায়, ক্ষেত্র বা কারণ বলিয়া দেখে, সেই প্রকার জ্ঞানপ্রবৃত্তিকে অর্থ বলে। তারপর চৈতন্যের যে ভাবে অবস্থিতি হইলে বস্তুর ভিতর দিয়া জীব স্বীয় আনন্দময় ভাবের অনুভূতি লাভ করে তাহাকে কাম বলে। চৈতন্যের যে স্তরে সমস্ত বিশ্বকে এক মহান্ অবয়বরূপে দেখিতে পাওয়া যায় ও সেই অবয়বের অবয়বীরূপ ঈশ্বরকে জানিতে প্রবৃত্তি হয় সেই অবস্থাকে ধর্ম্ম বলে। এই তিনটীই ব্যক্ত খেলা বা প্রকৃতির বিলাসের ভিতর দিয়া দেখা যায়। ইহার ভিতরে পরাভাবের ইঙ্গিত আছে বটে; কিন্তু বাহ্য দৃষ্টিও বিদ্যমান রহিয়াছে। সেইজন্য ইহাদিগকে অপরাভাবের খেলা বলে। চৈতন্যের কিছু অংশও বাহিরে থাকিয়া যায়, সেইজন্য জীব এই সকল ভাবে ক্ষেত্রকে অতিক্রম করিতে পারে না, ক্ষেত্রের ভিতর ভগবানের বিলাস দেখিতে পায়।

পরাবিদ্যার গতি অন্যরূপ। বাহ্য খেলা মাত্রই ভেদবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া থাকে। অগ্নির ভিতর ভগবানের ইঙ্গিত পাওয়া অর্থে অগ্নিরও অস্তিত্ব থাকিয়া যায়, তবে অগ্নিকে কেবল জড় ভাবে না দেখিয়া উহা ভগবচ্চৈতন্যের বিলাস বলিয়া দেখা যায়। সুতরাং ঐ দেখার ফলটুকু সম্পূর্ণরূপে আমিতে মিশিতে পারে না। শ্রীরাধার আলিঙ্গনে তমালের বৃক্ষত্বের লেশ মাত্রও নাই, বৃক্ষের

স্পর্শ নাই, উহা ভগবানের স্পর্শ; বৃক্ষের রূপ নাই, ভগবানের রূপ; আর ভগবান্‌ও বাহিরের, সাধনার বা পূজার বস্তু নহেন। তিনি তখন শ্রীরাধার প্রাণের প্রাণ আমির আমি। তবে একটু বিলাস আছে; সেটুকু বিরহের জ্বালায় পড়িয়া গেলে আপদ্ চুকিয়া যায়। পরাবিদ্যার লক্ষণ এই যে, এই বিদ্যার ক্ষেত্র বাহ্য বস্তু বা শক্তি নহে। আমি বা আত্মাই ইহার ক্ষেত্র। সাধারণ বৃক্ষ দৃষ্টিতে জ্ঞানের ভিতর বাহ্য সংস্কার থাকিয়া যায়। আমি বৃক্ষ দেখি; বৃক্ষত আমি হয় না! বাহ্য কামে বস্তুকে আমার করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু বস্তুটী যদি সম্পূর্ণরূপে আমিতে মিশিয়া যায় তাহা হইলেও আর কাম থাকে না! তাহাকে সম্পূর্ণ আমারও করিব ও একটু বাহিরেও থাকিবে ইহাই আধুনিক বৈষ্ণবগণের ভাষা। কিন্তু ভগবান্ বলিলেন— "বিদ্যাত্মনিভিদাবাধঃ।" আমি রূপ অধিকরণে সমস্ত ভেদবুদ্ধির বাধ হওয়ার নাম বিদ্যা। সুতরাং বুঝা গেল যখন 'আমি' ক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়—যখন বাহ্যভাব ত্যাগ করিয়া আমরা আমি রূপ শ্যামল সাগরে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হই— যখন আমির ভিতর কি এক পরা, বিশ্বাতিগ পদার্থে সূচনানুভব করত ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহঙ্কারাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক আমির ভিতরে অনুসন্ধান আরম্ভ হয়— তখনই পরাবিদ্যার অভিব্যক্তি হয় 'আমি'ই ইহার নিম্নতমক্ষেত্র আর ভগবান্‌ই ইহার পরিসমাপ্তি। 'সোঽহং' ইহার মূলমন্ত্র। আমির ভিতরে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। তাই ভাগবত বলিলেন "দৃষ্টেবাত্মনীশ্বরে"।

দিনান্তে।

মেঘের সরা ঢাকলো ধরা আসলো আঁধার হয়ে,
এই বেলা যাও কাজ সেরে নাও দিন যে গেল বয়ে।
এমনি করে রইলে পড়ে দিন চালাবে কে?
আপন দোষে অবশেষে কাঁদতে হবে যে।
(লও) কাঁথা, কম্বল, পথের সম্বল গলায় মালা থলে,
বাঁচবে যদি অই ও নদী পার হয়ে যাও চলে।
খেলার ধূমে, তন্দ্রা ঘুমে, কাটিয়ে দিলে বেলা.
এই বেলা যাও চোখ মুছে নাও আর কর না হেলা।

মেঘের সাজে দীঘির মাঝে কালো ঢেউয়ের মেলা,
আসছে বাদল, নামলে ও জল আর ববে না বেলা।
তখন বসিয়া হতোহস্মি করবে দিবা রাতি,
সব ফুরাবে ব্যবসা যাবে জ্বালবে ঘিয়ের বাতি।

শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত।
এম, এ, বি, এল্,

"রুদ্ধ দুয়ার খুলে"

যেদিন আছিল অতুল বিভব
লোক জন ছিল ঘিরে।
আছিল যে দিন সে রূপ যৌবন
চাহিলে না নাথ ফিরে॥
সকলি যে ছিল শুধু প্রিয়তম
তুমি ছিলে মোরে ভুলে'।
আজি অসময়ে কোথা হ'তে নাথ
আসিলে দুয়ার খুলে'?
আমি সব খোয়াইয়া আপনারে নিয়া
আপনার ঘরে একা।
ছিনু অনশনে রুক্ষ নয়নে
যাচিনি তোমার দেখা।
শুধু আপনার মনে রহি যে বিভোর
কি যেন ধেয়ানে রত
বুঝিনি তাহাও, জীবন থাকিতে
ছিনু যে মৃতের মত।
মরণের কালে এ কিগো পীরিতি
এসে কোলে নিলে তুলে'।
বুঝি না কেমনে গৃহে প্রবেশিলে
রুদ্ধ দুয়ার খুলে'॥

শ্রীশশধর মৈত্র, বি, এ।

অভিমান।

আমি আকুল পরাণে চাতকের মত ডাকব না
আর ডাকব না।
মোর আদর সোহাগে প্রাণে ব্যথা পাও সাধব না
আর সাধব না।
তুমি যথা ল'য়ে রাখ রব সেই খানে
অতি নিবিড় কাননে ভূধরে বিমানে
আমি নীরবে কাঁদিব প্রাণ নাহি মানে
মোর মরমের ব্যথা বলব না কারে বলব না।
তুমি পতিত পাবন দয়ার আধার
তব অনন্ত শক্তি মহিমা অপার
তবু কুণ্ঠিত যদি এ দীনের ভার
আমি নিতে অনুরোধ করব না আর করব না।
তুমি আমিত্বেরে গলে দিয়েছ বাঁধিয়া
তাই ভাবি কত সুখ আমিত্বে সাধিয়া
তবু থেকে থেকে প্রাণ উঠে যে কাঁদিয়া
আমি ভুলিতে তোমায় পারব না আর পারব না।
ওহে দয়াময় মোরে হইলে নিদয়
তবু কঠিন বলিতে পরাণে না সয়
মোর পুড়ুক পরাণ জ্বলুক হৃদয়
তব স্মৃতি বুকে হ'তে ছাড়ব না কভু ছাড়ব না।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস ভক্তিবিনোদ বি, এ।

দাসত্ব কি প্রভুত্ব।

আসুন বিচার করিয়া দেখি আমরা দাস কি প্রভু? অধীন কি স্বাধীন? প্রাতঃকালে মনে মনে স্থির করিলাম আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, দ্বেষ, ভীরুতা, দুশ্চিন্তা, অভাববোধ, বিষণ্ণতা, আলস্য প্রভৃতির বশীভূত হইব না। আর কখন মিথ্যা বলিব না ও প্রতারণা আচরণ করিব না। কোনপ্রকার লোভ ও ভোগবিলাসদ্বারা আকৃষ্ট হইব না। রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে সমস্ত দিবসের মানসিক ভাব ও কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া দেখিলাম আমাদিগের প্রাতঃকালের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহুকার্য্য করিয়াছি এবং সময় সময় বহুতর অবিশুদ্ধভাব মনে স্থান দিয়াছি। এরূপ কেন হইল? আমরা স্বাধীন হইলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেন কার্য্য করিলাম? যে সকল মানসিক ভাবগুলিকে অবিশুদ্ধ মনে করি, কেন তাহাদিগকে আমাদিগের মনোমন্দিরে প্রবেশ করিতে বাধা দিলাম না? এইরূপে প্রতি দিবস ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেছি। জীবন কি এই প্রকারেই চলিবে? ইহার কি কোন প্রতীকার নাই? আমরা কে? ইচ্ছা করি একরূপ, হয় অন্যরূপ। আমরা যদি স্বাধীন হইতাম তাহা হইলে ইচ্ছাও আমাদিগের অধীন হইত। এ সকল ঘটনাদৃষ্টে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইতেছে আমরা স্বাধীন নহি, পরাধীন। কাহার অধীন? আত্মপরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিব আমরা অভ্যাসের অধীন। ঘটনাচক্রে কাহারও অভ্যাস কুপ্রবৃত্তি পোষণ করা ও কুকার্য্য করা। কাহারও অভ্যাস সৎপ্রবৃত্তি পোষণ করা ও সদাচরণ করা। অধিকাংশ লোকের অভ্যাস কখনও সৎ, কখনও অসৎ প্রবৃত্তি পোষণ করা এবং কখনও সৎ, কখনও অসৎ কার্য্য করা। রোগের মূল নির্ণয় না করিতে পারিলে রোগ আরোগ্য করা কঠিন। অভ্যাসের মূল কারণ নির্ণয় করিতে না পারিলে অভ্যাসের মূল উচ্ছেদ করা সাধ্যাতীত হইবে। অভ্যাসই নিয়তি। অনেকের বিশ্বাস নিয়তি খণ্ডন করা যায় না। প্রত্যক্ষ দেখা যায়, যাহার তামাক খাওয়া অভ্যাস হইয়াছে সে তামাক খাওয়া দূষণীয় বুঝিতে পারিলেও তামাক খাইবেই খাইবে। যাহার সুরাপান অভ্যাস হইয়াছে সে সুরাপানের নানাবিধ বিষময় ফল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেও সুরাপান করিবেই করিবে। যে ব্যক্তি লম্পট অশীতিবর্ষ বয়োবৃদ্ধ হইলেও তাহার লাম্পট্য বিদূরিত হয় না। এইভাবে যে যেরূপ অভ্যাসের দাস হইয়াছে,

অভ্যাস তাহাকে বাধ্য করিয়া সেইরূপ কার্য্যই করাইতেছে। আমরা এইক্ষণ অভ্যাসের দাস। আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা অতি শোচনীয় দাসত্ব।

প্রবল ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আমাদিগের মন নানাবিধ বাহ্যবস্তুর প্রতি সর্ব্বদা আসক্ত হইতেছে। এইরূপে আমাদিগের মনে নানাবিধ অভ্যাসের সৃষ্টি হইতেছে। মনের স্বভাবই এই যে, অতি সহজেই এক একটা অভ্যাসের সৃষ্টি করিয়া ফেলে। স্থূল কথা এই যে, আমরা প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপরসাদিতে আকৃষ্ট হইয়া নিজেরাই প্রবল অভ্যাস প্রস্তুত করিতেছি এবং পরিণামে ইচ্ছা করিলেও অভ্যাসের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। শশধর বাবু প্রাতঃকালে মনোবিজ্ঞান পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। হঠাৎ তাঁহার সহধর্ম্মিণীর কথা তাঁহার মনে পড়িল। কিছুকাল এইভাবে গেল। পুনর্ব্বার পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এক ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতেই, দুর্গাপূজার বন্ধ নিকটবর্ত্তী হইয়াছে মনে পড়িল। এইরূপ হয় কেন? শশধর বাবুর একাগ্রতা অভ্যাস হয় নাই। তিনি নানাবিধ চিন্তার অভ্যাসের দাস। কালিদাস বাবু মান সম্ভ্রম বিদ্যা বুদ্ধি সর্ব্বপ্রকারে সমাজের শ্রেষ্ঠলোক। কিন্তু আপন ভার্য্যা ব্যতীত অপর একটি স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার প্রণয় আছে। বৈঠকখানায় একটি পণ্ডিত আসিয়া কালিদাস বাবুকে মোহমুদ্গরের শ্লোক শুনাইতেছেন। কালিদাস বাবু মনে মনে তাঁহার প্রণয়িনীর চিন্তা করিতেছেন। কেন এইরূপ হয়? কালিদাস বাবু ইন্দ্রিয়ের দাস।

সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেন্দ্রস্থান হইতে বিচ্যুত হওয়ার পর হইতে আমরা মহামায়ার মোহদ্বারা মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। সেই হইতে ক্রমোন্নতির অখণ্ডনীয় নিয়ম দ্বারা বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়াছি। এই জন্মে আমাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার লুপ্ত হইয়া যায় নাই। সমস্ত জন্মের সংস্কারই বর্ত্তমান জন্মে বীজস্বরূপে বর্ত্তমান আছে। প্রকৃতির সৃষ্টি রক্ষার্থ জীবদিগের মধ্যে যে জীব সৃষ্টি করার সংস্কার আছে, সেই সংস্কার জন্মজন্মান্তর হইতে আমাদিগের মধ্যে নিহিত আছে। উদ্ভিজ্জ জগতেও এ সংস্কার সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। আমরাই এই সংস্কারের সৃষ্টি করিয়া এইক্ষণ তাহার দাসত্ব করিতেছি। যখন পশু ছিলাম, তখন উৎপন্ন করার প্রবল নৈসর্গিক শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া আমার ন্যায় আরও কয়েকটি পশুর সৃষ্টি করিয়াছিলাম। এই শক্তি অতি প্রবল, অদম্য। ইহার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অতি বিরল। অন্যান্য জন্মে আমাদিগের বিচারশক্তি ছিল না। মানব-

জন্মে বিচারশক্তি জন্মিয়াছে। আমাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের বিচারশক্তি আছে অথচ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাসবশতঃ পশু-ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারাও কার্য্যতঃ পশু। যাঁহাদিগের বিচারশক্তি জন্মিয়াছে, ভালমন্দ বিচার করিয়া পশু-জন্মের অভ্যাস পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন নূতন উৎকৃষ্ট অভ্যাসের সৃজন করিতে-ছেন, কেবল তাঁহারাই মনুষ্যনামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। যিনি লম্পট তিনি পশু। যিনি জিতেন্দ্রিয় তিনি মনুষ্য। দেখুন কাহারও কোন অপরাধ নাই। পশুজন্মে ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়াতে কোন অপরাধ হইত না। মানবজন্মে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হওয়াতে অপরাধ হইল কেন? বিচারশক্তি প্রাপ্ত হইয়া সেই শক্তির পরিচালনা না করায় একটি অপরাধ হইল। এখন ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগের প্রভু, আমরা তাহাদিগের দাস। এই দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই আমরা স্বাধীন হইতে পারি।

ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষা অতি প্রবল বটে। এই আকাঙ্ক্ষার অভ্যাসটী বহুজন্মার্জ্জিত। বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ এই আকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া আমরা নিরতিশয় ক্লেশ ভোগ করিতেছি। শরীর জীর্ণ, শীর্ণ, রুগ্ন, দুর্ব্বল। মন নিস্তেজ, অপ্রফুল্ল, নিরুৎসাহ। ইহার উপায় কি? আমরা কি করিব? এই চির-অভ্যাসের দাসত্ব হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করিব? মুক্তিলাভ অতি দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু মানবশক্তির অতীত নহে। ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নিত্যানন্দস্বরূপ কেন্দ্রস্থান হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এইক্ষণ ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারেই পুনর্ব্বার সেই কেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতে পারিব। ভয় নাই। আশা করি যাঁহারা বহুচেষ্টা করিয়াও ইন্দ্রিয়ের দাসত্বশৃঙ্খল ভঙ্গ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা এই প্রবন্ধ পাঠের পর হইতে ক্রমশঃ স্বাধীনতার সুমধুর আস্বাদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন।

প্রথম উপায়ঃ—যদ্রূপ বৃক্ষ, লতা, জল, বায়ু প্রভৃতি বাহ্য-জগতের পদার্থ, তদ্রূপ কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি মানসিক জগতের পদার্থ। মনের প্রত্যেক ভাবই এক একটী পদার্থ। স্মরণ রাখিবেন জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির ন্যায় ইহাদিগেরও উৎপত্তি, স্থিতি ও কার্য্যকারিতা শক্তি আছে। অগ্নির যেরূপ দাহিকা শক্তি আছে, কামরিপুরও সেইরূপ দাহিকাশক্তি আছে। শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সকল কামাগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইহজন্মের ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অভ্যাসানুসারে যখনই কামভাব উদিত হইবে তৎক্ষণাৎ কোন ইতস্ততঃ

না করিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিবেন। কোনরূপ শারীরিক অঙ্গপরিচালনার কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। মনের স্বভাব এই যে, মন এক সময়ে যুগপৎ দুইটী বিষয় চিন্তা করে না। আপনার মন বিষয়ান্তরে অভিনিবিষ্ট হইলেই কামরিপুস্বরূপ দস্যু আপনার মনোমন্দির হইতে পলায়ন করিবে।

দ্বিতীয় উপায়ঃ—সহস্র বৎসরের তিমিরাচ্ছন্ন-গৃহে আলোক প্রবেশ করিবামাত্র অন্ধকার তিরোহিত হয়। জ্ঞান জন্মিলেই অজ্ঞান নষ্ট হয়। অভ্যাসও পরিবর্ত্তিত হইতে অবশ্য হয়। জ্ঞান জন্মিলে মস্তিষ্কে জ্ঞানের রেখা পড়ে। মন যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে, মস্তিষ্ক হইতে স্নায়ুমণ্ডল দ্বারা সেই বিশ্বাস সমস্ত শরীরে বিস্তৃত হয় এবং প্রত্যেক অঙ্গের অধিপতি পৃথক্ পৃথক্ মন সেই বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। জগতে বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, তামা, কাঁসা, সোণা, রূপা সকলই মনোময় পদার্থ। মন ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্ব এই জগতে নাই। জড়বাদিত্ব পৃথিবী হইতে দিন দিন লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। অমাবস্যা চিরকাল থাকে না। ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে পৃথিবী দীর্ঘকাল আবৃত ছিল। পুনর্ব্বার পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদিত হইতেছে। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণ সেই সেই কমনীয় প্রভাতের পূর্ব্বলক্ষণ সকল অনুভব করিতেছেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মনোময় পদার্থ। মানবদেহ একটী অনন্ত জ্ঞাননির্ম্মিত অত্যাশ্চর্য্য মনোময় যন্ত্র। মস্তিষ্কে একটী হেড্ আফিস আছে। মন বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাহার আফিস মস্তিষ্কে। প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আফিস এই হেড্ আফিসের অধীন। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আফিসেরও পৃথক্ পৃথক্ মন আছে। শরীরের পরমাণু বলিলে আমরা যাহা বুঝি, এইরূপ কোটি কোটি পরমাণু ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আফিসের কর্ম্মচারিস্বরূপে অবিরত স্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। কপাট বন্ধ করিতে হঠাৎ হাতের আঙ্গুলে একটা কঠিন আঘাত লাগিল, তৎক্ষণাৎ আহত স্থানের ক্ষুদ্র আফিস হইতে আমাদিগের পরিজ্ঞাত মনের হেড্ আফিস—মস্তিষ্কে টেলিগ্রাম গেল। তৎক্ষণাৎ হেড্ আফিস হইতে টেলিগ্রামকারী ক্ষুদ্র আফিসে কি প্রকারে আহত অঙ্গুলির চিকিৎসা করিতে হইবে তাহার সদুপদেশ প্রেরিত হইল। ঐ ক্ষুদ্র আফিসের কর্ত্তা তদনুসারে তাঁহার অধীনস্থ কার্য্যকারক পরমাণুগণদ্বারা আহত স্থান চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে আস্তে আস্তে অঙ্গুলির নখটি মরিয়া স্থানচ্যুত হইয়া গেল এবং সেই স্থলে একটী নূতন মনোহর শিশু-নখ উৎপন্ন হইয়া কালক্রমে অন্যান্য নখের সদৃশ দৃঢ় হইল। এইরূপ ঘটনা

হয় ত আপনার জীবনে কখন হইয়াছে, নতুবা বন্ধুবান্ধবের জীবনে লক্ষ্য করিয়াছেন। আমরা যাহাকে মন বলি তাহা জ্ঞাত মন (Conscious mind), এবং যে মনের বিষয় আমরা কিছুই পরিজ্ঞাত নহি তাহা অজ্ঞাত মন। (Subconscious mind) এই ভাবে আমাদিগের দেহে দুইটা মন বিদ্যমান আছে। পরিজ্ঞাত মনটী শতাংশের পঞ্চাংশ মাত্র। শরীর-যন্ত্র রক্ষা করা ও পোষণ করার ভার অজ্ঞাত মনের উপর ন্যস্ত আছে। জ্ঞাত মন যাহা বিশ্বাস করেন, অজ্ঞাত মন তাহা বিশ্বাস করিতে বাধ্য। বহুজন্মের অভ্যাসবশতঃ জ্ঞাত মনে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, সেই বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করিতে অজ্ঞাত মন সহসা ইচ্ছুক না হইতেও পারে। তথাপি অবিরত জ্ঞাত মন হইতে বিশ্বাসের স্রোত অজ্ঞাত মনে আসিতে থাকিলে, অজ্ঞাত মনের পূর্ব্ববিশ্বাস লুপ্ত হইয়া সেই স্থলে জ্ঞাত মনের নূতন বিশ্বাসই স্থাপিত হইবে। এই সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে অন্য প্রবন্ধে লিখিত হইবে। কিন্তু অজ্ঞাত মনের বিষয় কিছু না জানিলে অভ্যাস পরিবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য। সাধারণতঃ অসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

যাহা অভ্যাস হইয়া যায় তাহাই অজ্ঞাত মনের অধিকারভুক্ত হয়। দীর্ঘকাল তামাক খাইয়া তামাক খাওয়ার যে অভ্যাস জন্মিয়াছে, এই অভ্যাস অজ্ঞাত মনে পরিণত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ অজ্ঞাত মনকে অভ্যাস-মন বলিলে দূষণীয় হইবে না। কেহ কেহ অজ্ঞাত মনকে অভ্যাস-মন বলেন। জ্ঞাত মন দ্বারা তামাক খাওয়ার ইচ্ছা না করিলেও অজ্ঞাত অর্থাৎ অভ্যাস-মনে তামাক খাওয়ার প্রবৃত্তি জন্মিবে এবং তৎক্ষণাৎ জ্ঞাত মনে ঐ প্রবৃত্তির উদ্রেক হইবে। এই অভ্যাস মনের প্রতি কিরূপে আধিপত্য স্থাপন করা যায় তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারিলেই আমরা অভ্যাস মনের দাসত্ব হইতে মুক্ত লাভ করিয়া স্বাধীন হইতে পারিব। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ভীরুতা, সন্দেহ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি সমস্ত অবাঞ্ছনীয় মানসিক ভাবগুলির উপর আমাদিগের একাধিপত্য সংস্থাপিত হইবে।

আহারান্তে রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রকার চিন্তা বিদূরিত করিবেন। তৎপর মনোরূপ দেবমন্দির হইতে ঝাটা দ্বারা আবর্জ্জনা বাহির করিয়া মন্দিরটী পরিষ্কৃত করিতেছেন, এই ভাব মনে রাখিয়া ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সর্ব্ববিধ চিন্তা মন হইতে বহিষ্কৃত করিবেন। ক্রমে আপনার মন অপেক্ষাকৃত শান্তভাব ধারণ করিবে। সাবধান। ঘুমাইয়া পড়িবেন না। তৎপর আপনার অজ্ঞাত মনকে

সম্বোধন করিয়া বলিবেন যে, অজ্ঞাত মন! জন্মজন্মান্তর হইতে যে নিষ্ঠুর, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য কাম-প্রবৃত্তি, আমার উপর প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়া আমাদ্বারা ক্রীতদাসের ন্যায় কার্য্য করাইতেছে; যে কু অভ্যাসের বশীভূত হইয়া আমি বর্ত্তমান জন্মে ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বহুবিধ জঘন্য ও বীভৎস ব্যবহারে কলুষিত হইয়াছি, সেই কু অভ্যাসের বন্ধন হইতে আমাকে অদ্য রাত্রিতে মুক্ত করিয়া দাও। এইরূপ তিন চারিবার বলিয়া শেষবারে 'মুক্ত করিয়া দাও' এই বাক্যটীর উপর অধিকতর জোর দিয়া সাত আট বার বলিবেন—মুক্ত করিয়া দাও, মুক্ত করিয়া দাও, মুক্ত করিয়া দাও। মুক্ত করিয়া দিতেই হইবে, মুক্ত করিয়া দিতেই হইবে, মুক্ত করিয়া দিতেই হইবে। কেন মুক্ত করিবে না? কেন মুক্ত করিবে না? অবশ্যই মুক্ত করিতে হইবে, অবশ্যই মুক্ত কবিতে হইবে, অবশ্যই মুক্ত করিতে হইবে। তৎপর অজ্ঞাত মনকে সম্বোধন করিয়া বলিবেন,—আগামী কল্য প্রাতে যেন জিতেন্দ্রিয় হইয়া গাত্রোত্থান করি। তাহার পর অবিলম্বে *সর্ব্বচিন্তা-শূন্য হইয়া শান্তিপ্রদায়িনী নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।* অজ্ঞাত মনকে আর কোন অনুরোধ কবিবেন না। কোন উপযুক্ত কার্য্যদক্ষ ক্ষমতাশালী কর্ম্মচারীকে এক কার্য্যের নিমিত্ত বার বার ত্যক্ত বিরক্ত করিলে প্রভুর প্রতি তাহার ভক্তি থাকে না। কোন বীজ রোপণ করিয়া প্রতি ঘণ্টায় মৃত্তিকা খনন করিয়া বীজ অঙ্কুরিত হইল কি না পুনঃপুনঃ পর্য্যবেক্ষণ করিলে সে বীজ কখন অঙ্কুরিত হইবে না। কোন রোগের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিলে সে রোগ হইতে মুক্তিলাভ সহজ ব্যাপার হয় না। ক্রোধ, লোভ, ভীরুতা, সন্দেহ প্রভৃতি কু-অভ্যাসগুলিকেও এই ভাবে উচ্ছন্ন করা যায়। যে ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে বঙ্গদেশ উৎসন্ন যাইতেছে, বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা বিধ্বস্ত হইতেছে, অধিকাংশ বাঙ্গালী যুবকদিগের পরিণীতা যুবতিগণ অব্যক্ত মানসিক ক্লেশে জীবন যাপন করিতেছেন, যে ব্রহ্মচর্য্য শত চেষ্টা করিয়াও আপনারা লাভ করিতে পারিতেছেন না, সহস্র অনুতাপ করিয়াও যে অভ্যাসের কঠিন শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় না, উল্লিখিত প্রণালীতে মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক নিদ্রাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে সে ব্রহ্মচর্য্যও দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইবে। ইচ্ছাও চাই, উপায়ও চাই। উপায় ব্যতীত কেবল ইচ্ছা দ্বারা কার্য্য-সিদ্ধি হয় না। অভ্যাসরূপ মনের পরিবর্ত্তনই এই সাধনার উপায়। কামপ্রবৃত্তি দমন করার নিমিত্ত কত ঈশ্বর-উপসনা করিয়াছেন, কত অনুতাপ করিয়াছেন, কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, কতবার ঘৃণিত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কত কষ্ট

পাইয়াছেন, সমাজে কত কলঙ্কিত হইয়াছেন, কিছুতেই এই ভীষণ শত্রুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু পারেন নাই বলিয়া যে পারিবেন না তাহা কে বলিল? পারিবেন। লোকে যাহা দেখে নাই ও শুনে নাই, তাহাও দেখিবে ও শুনিবে। যদি এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কিছুকাল জীবন পরিচালিত করেন, তাহা হইলে ফল লাভ করিয়া হর্ষপ্রফুল্লচিত্তে আমার নিকট পত্র লিখিতে ইচ্ছা হইবে।　　　　(ক্রমশঃ)

শ্রীরজনীকান্ত ঘটক চৌধুরী।

পরপারে।

মাঝি ধীরে সেথা চলরে
মথিয়া শমিত অমিত সিন্ধু
　　নীল বারিধি পারে।
যাহার পুণ্য বিশ্ব পরশে
হৃদয়ে শান্তি মোক্ষ বরষে
　　সেই মহাপারে চলরে।
হৃদয়-জগৎ-বহ্নি জুড়াতে
(যেথা) আছে বসন্ত মলয় সাথে
　　সেথায় ল'য়ে চলরে।
যেথা সংসারেরি করুণবাণী
নাহিক দীনের হাহা ধ্বনি
　　সেই মহাতীরে চলরে।
যেথা নাহিক দুঃখ নাহিক বারণ
আছে বসন্ত চির-শাসন
　　সেথায় ল'য়ে চলরে।

শ্রীজীবনধন চক্রবর্ত্তী।

বেদান্ত দর্শন অথবা ব্রহ্মসূত্রসারসংগ্রহ।

ভাবার্থপ্রকাশিকা ভাষা-টীকা সহিত।

ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ। ওঁ শঙ্করাচার্য্যেভ্যো নমঃ। ওঁ কেশবানন্দায় নমঃ। ওঁ কাশীবিশ্বেশ্বরাভ্যাং নমঃ॥

এই গ্রন্থের চারি অধ্যায়। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে সকল বেদের ব্রহ্ম বিষয়ে তাৎপর্য্য সিদ্ধ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সকল বাদিগণের শঙ্কা দূর করিয়া সকল বেদের ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য সিদ্ধ করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে নানা প্রকার সাধনের বিচার করা হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে দুই প্রকার বিচার কথিত হইয়াছে। সেই চারি অধ্যায়ের প্রত্যেক অধ্যায়ে চারি চারি পাদ।

তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে স্পষ্টলিঙ্গযুক্ত বাক্যসমূহের বিচার আছে। দ্বিতীয় পাদে অস্পষ্টলিঙ্গযুক্ত বাক্যসমূহের বিচার আছে। সেই সকল বাক্য উপাস্য ব্রহ্মের বোধক। তৃতীয় পাদে জ্ঞেয় ব্রহ্মবোধক অস্পষ্ট লিঙ্গযুক্ত যে বাক্য তাহাদের বিচার আছে। চতুর্থ পাদে সন্দেহযুক্ত যে সমস্ত পদ তদ্বিশিষ্ট যে বাক্য তাহাদের বিচার আছে। তাহার মধ্যে প্রথম পাদে একত্রিংশটী সূত্র আছে। যাহার অক্ষর অল্প কিন্তু অর্থ মহান্ তাহাকে সূত্র কহে। সেই সূত্র দুই প্রকার। এক অধিকরণ রূপ, দ্বিতীয় গুণরূপ অর্থাৎ (১) অধিকরণ সূত্র ও (২) গৌণী সূত্র। এই প্রথম পাদে ত্রয়োদশ অধিকরণ সূত্র এবং বিংশতি গৌণী সূত্র আছে। যথা—

সূত্র সংখ্যা	অধিকরণ	গুণ	প্রসঙ্গ
১	অঃ	+	ব্রহ্মমীমাংসা বিধান।
২	অঃ	+	ব্রহ্মলক্ষণ বিচার
৩	অঃ	+	সর্ব্বজ্ঞতার প্রমাণ
৪	অঃ	+	সমন্বয় বিচার
৫	অঃ	+	সাংখ্যমত খণ্ডন
৬	+	গুঃ	ঐ
৭	+	গুঃ	ঐ

সূত্র সংখ্যা	অধিকরণ	গুণ	প্রসঙ্গ
৮	+	গুঃ	সাংখ্যমত খণ্ডন
৯	+	গুঃ	ঐ
১০	+	গুঃ	ঐ
১১	+	গুঃ	ঐ
১২	অঃ	+	শুদ্ধবাক্য বিচার
১৩	+	গুঃ	ঐ
১৪	+	গুঃ	ঐ
১৫	+	গুঃ	ঐ
১৬	+	গুঃ	ঐ
১৭	+	গুঃ	ঐ
১৮	+	গুঃ	ঐ
১৯	+	গুঃ	ঐ
২০	অঃ	+	সূর্য্যনেত্রগত পুরুষ বিচার।
২১	+	গুঃ	ঐ
২২	অঃ	+	আকাশশব্দ বিচার।
২৩	অঃ	+	প্রাণশব্দ বিচার।
২৪	অঃ	+	জ্যোতিঃশব্দ বিচার।
২৫	+	গুঃ	ব্রহ্মচ্ছন্দ নিষেধ।
২৬	+	গুঃ	গায়ত্রীব্রহ্ম গ্রহণ।
২৭	+	গুঃ	জ্যোতির্ব্রহ্ম গ্রহণ।
২৮	অঃ	+	প্রাণশব্দ বিচার।
২৯	+	গুঃ	ঐ
৩০	+	গুঃ	ঐ
৩১	+	গুঃ	ঐ
৩১	১১	২০	

যে সূত্রে বিষয় (১) সংশয় (২) পূর্ব্বপক্ষ (৩) উত্তরপক্ষ (৪) প্রয়োজন (৫) এই পাঁচ কথিত হয় তাহাকে অধিকরণরূপ সূত্র কহে। তদ্ভিন্ন যে সূত্র

তাহাকে গুণরূপ (গৌণী) সূত্র কহে। যাহাতে সন্দেহ থাকে তাহাকে বিষয় কহে। এই গ্রন্থে (সূত্রার্থ বিচারে) সূত্রের অক্ষরার্থ মাত্র লিখিত হইবে। এই অর্থের উপযোগী অর্থাৎ যতটুকু লিখিলে সূত্রের অক্ষরার্থ স্পষ্ট হয় এবং অনায়াসে ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ হয় ততটুকু বিষয় বাক্যাদি লিখিত হইবে। শাঙ্কর-ভাষ্য পণ্ডিতমণ্ডলীর পক্ষে অতি সুললিত এবং অধিকারী অর্থাৎ সুকৃত ও ভগবৎ-কৃপাবান্ লোকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগী হইলেও এত বিস্তর এবং এত কঠিন যে অনেক স্থলে সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। সুতরাং সকলের পাঠোপযোগী নহে। এই অভাব দূরীকরণার্থ যাহাতে ব্রহ্মসূত্র একটি ভয়ানক বস্তু বলিয়া পাঠকমণ্ডলী পাঠে বিরত না হন তজ্জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি। সকল অধিকরণের বিষয় সংশয় ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ ইহাতে লিখিত হইবে না এবং তাহাদিগকে যথাক্রমেও লেখা যাইবে না ; কেবল যে টুকু শ্রুতিপ্রমাণ সমেত সূত্রের অর্থবোধক এবং অধিকারিজনের পক্ষে জ্ঞেয় ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগী সেই টুকুই লিখিত হইবে।

অবতরণিকা—ইহলোকের এবং পরলোকের ফলভোগ হইতে বিরত এবং মোক্ষের ইচ্ছাবান্ অধিকারী পুরুষের নিমিত্ত পরম কৃপালু মুনি ব্যাস ভগবান্ সর্ব্ববেদের সারভূত এই বেদান্ত শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন এবং আচার্য্য শঙ্কর ভগবান্ তাহার ভাষ্যে সূত্রের প্রকৃত অর্থ নিষ্কাষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চরণযুগলে আমার কোটী কোটী নমস্কার।

"শঙ্করং শঙ্করাচার্য্যং কেশবং বাদরায়ণং।
সূত্রভাষ্যকরৌ বন্দে ভগবন্তৌ পুনঃপুনঃ॥"

তাহার প্রথম সূত্র এই।—

"অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা"—।১। অথ। অতঃ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এই শব্দে 'ব্রহ্ম" "জ্ঞা" "সন্" এই তিন পদ আছে। অথ শব্দের অর্থ সাধনচতুষ্টয় (অর্থাৎ ইহ অমুত্র ফল-ভোগবিরাগ (১) আত্মানাত্ম-বিবেক (২) শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি (৩) এবং মুমুক্ষত্ব (৪) প্রাপ্তির অনন্তর। অতঃ এই পদ হেতুবাচক অর্থাৎ যে হেতু ভোগের অনিত্য ফল এবং মোক্ষের-নিত্য ফল সেই হেতু। ব্রহ্ম পদ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পূর্ণ চেতনের বাচক। 'জ্ঞা' এই পদ জ্ঞানমাত্রের বাচক। 'জ্ঞা' পদে অজহৎ লক্ষণা স্বীকার করিয়া বিবরণ-মতাবলম্বী (বিদ্যারণ্য স্বামী) পণ্ডিতগণ 'জ্ঞা' এই পদ অভেদ জ্ঞানের বাচক স্বীকার করিয়াছেন। 'সা' এই পদ ইচ্ছার বাচক ; সেই 'সা' পদের

বিচারে জহৎ লক্ষণা অঙ্গীকার করেন। 'সা' পদের পরে বিবরণমতানুসারিগণ 'কর্ত্তব্য' পদের অধ্যাহার করিয়াছেন। কর্ত্তব্য পদ হইতে নিয়ম বিধির অঙ্গীকার করিয়াছেন। আর আচার্য্য শ্রীবাচস্পতি-মতানুসারী পণ্ডিতগণ 'কর্ত্তব্য' পদের অধ্যাহার করেন নাই এবং বিধিও মানেন নাই।

সূত্রবাক্যার্থ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে। বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে "ন বারে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বারে জায়ায়াঃ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বারে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।" ইহা কহিয়া তাহার পরে এই বাক্য আছে ঃ—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" ইতি। ইহা এই সূত্রের বিষয়বাক্য। শ্রুত্যর্থ।—হে মৈত্রেয়ি! আত্মা দর্শনের যোগ্য, শ্রবণের যোগ্য, মননের যোগ্য এবং চিন্তনের যোগ্য ইতি। এই বচনে আত্মার সাক্ষাৎকার কর্ত্তব্য কিরূপে? শ্রবণেন, মননেন, নিদিধ্যাসনেন। এই বাক্যে আত্মার সাক্ষাৎকারার্থ জ্ঞানের সাধনরূপ শ্রবণের বিধান করা হইয়াছে। সর্ব্ব উপ-নিষদের অদ্বিতীয় ব্রহ্মে যে তাৎপর্য্য-নিশ্চয়-অনুকূল-যুক্তি-বিচার তাহাকে শ্রবণ কহে। সেই যুক্তি বিচার রূপ বেদান্ত শাস্ত্র আরম্ভ করিবার যোগ্য কি অযোগ্য ইহা এই সূত্রে সন্দেহ। সর্ব্ব স্থলে পূর্ব্বপক্ষ এবং সিদ্ধান্ত পক্ষের যুক্তি এই দুই সংশয়ের বীজ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পূর্ব্বপক্ষ এই কি যাহাতে সন্দেহ হয় তাহাকে বিষয় কহে। ব্রহ্মে সন্দেহ নাই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই বাক্যে ব্রহ্মরূপে ব্রহ্ম প্রসিদ্ধই আছেন, আর "অহং" প্রতীতি হইতে জীবরূপে ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ আছেন। সুতরাং ব্রহ্মের নিশ্চিত থাকাতে তাহাকে বিষয় কহা যাইতে পারে না এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে পরও মুক্তি হয় না অর্থাৎ জ্ঞান হইলে পরও সংসার বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং শাস্ত্রের কিছু প্রয়োজনও প্রতীত হইতেছে না। অতএব শাস্ত্র আরম্ভ করিবার যোগ্য নহে। এই পূর্ব্বপক্ষ হইতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে "অহং অহং" এই প্রতীতি হইতে যে ভেদ ভান হয় আর "তত্ত্বমসি" এই বাক্য হইতে যে অভেদ ভান হয়, তদ্দ্বারা সংশয় সম্ভব হইতেছে; আর প্রারব্ধের ভোগ হইতে সোপাধিক ভ্রমবশতঃ সংসার প্রতীতিও সম্ভব হইতেছে। সুতরাং জ্ঞান হইবার পরও অজ্ঞান নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ প্রয়োজনও সম্ভব; অতএব শাস্ত্র আরম্ভ করিবার যোগ্য। ইতি। উক্ত শ্রোতব্য শ্রুতি অনুসারে সূত্রের এই বাক্যার্থ নিশ্চিত হইল যে, চতুষ্টয়সাধনসম্পন্ন অধি-

কারী পুরুষের পক্ষে কর্ম্মফল অনিত্য হওয়াতে ব্রহ্মজ্ঞানার্থ বিচার কর্ত্তব্য হইতেছে। ইতি। এতদ্দ্বারা জ্ঞানের মোক্ষ সাধনতা এবং বেদান্তের বিচার্য্যত্ব সিদ্ধ হইবে, তাহা অঙ্গীকার করাতে সূত্রের এই অর্থ হইলে যে, কর্ম্মফল অনিত্য হওয়াতে অধিকারীর মোক্ষসাধনরূপ ব্রহ্মজ্ঞানার্থ বেদান্তবিচার কর্ত্তব্য হইতেছে। ইতি। আর বাচস্পতি মিশ্রের মতে কর্ম্মফল অনিত্য হওয়াতে সাধনচতুষ্টয়ানন্তর ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা হইবে। জ্ঞান বিচারসাধ্য, সুতরাং বিচারের কর্ত্তব্যতা সিদ্ধ হইতেছে। ইতি। এই বেদান্ত শাস্ত্রের বিচার যাঁহারা অঙ্গীকার না করেন তাঁহাদের মতে অপর সাধনসাধ্য মুক্তি সূত্রের ফল। সিদ্ধান্ত মতে বিচারের সম্ভব থাকাতে ব্রহ্মজ্ঞানসাধ্য মুক্তি সূত্রের ফল। অথবা গ্রন্থের আরম্ভ ও অনারম্ভ সিদ্ধান্ত ও পূর্ব্বপক্ষের ফল হইতেছে। ১॥

অবতরণিকা—প্রথম সূত্রে ব্রহ্মমীমাংসার বিধান করা হইয়াছে। সেই মীমাংসালক্ষণ বিচার প্রমাণবিচার, সমন্বয়বিচার, সাধনবিচার এবং ফল-বিচার ভেদে অনেক প্রকার। তন্মধ্যে ব্রহ্মের প্রাধান্য থাকাতে প্রথমে ব্রহ্মের বিচার করা যাইতেছে।

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২ ॥

জন্ম। আদি। অস্য। যতঃ। ইতি পদচ্ছেদঃ।

এই সূত্রে তৎ পদের অধ্যাহার করিয়া তাহার এই অর্থ হইতেছে যে এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি স্থিতি ও ভঙ্গ যাঁহা হইতে হয় তিনিই ব্রহ্ম। ইতি।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসম্বিসন্তি তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তৎ ব্রহ্ম।"। ইহা এই সূত্রের বিষয় বাক্য।

অর্থ —যে বস্তু হইতে এই সর্ব্বভূত উৎপন্ন হয়, যাহাতে স্থিত হয়, পরে মোক্ষান্তে মরণানন্তর যাহাতে প্রবেশ করে তাহাকে তুমি জিজ্ঞাসা কর, তিনিই ব্রহ্ম। ইতি। এই শ্রুতিতে যে জন্মাদি কথিত হইয়াছে তাহাই ব্রহ্মের লক্ষণ অথবা তাহা ব্রহ্মের লক্ষণ নহে। তথায় ইহাই সংশয়। জন্মাদি প্রপঞ্চের ধর্ম্ম, ব্রহ্মের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ নাই। সুতরাং জন্মাদি ব্রহ্মের লক্ষণ নহে; এই পূর্ব্বপক্ষ। তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, যে জন্মাদি কথিত হইয়াছে তাহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ এবং "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই সত্যাদি ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ, সুতরাং উক্ত দোষ সম্ভব নহে। যাহা প্রথম অধিকরণের ফল তাহা এই অধি-করণেরও ফল। যেখানে কর্ম্মে লক্ষণা প্রাপ্ত হয় সেখানে প্রয়োজন বলা যায়

না। "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এখানে কর্ম্মে ষষ্ঠী, সুতরাং প্রথম সূত্রের যে প্রয়োজন তাহাই এই সূত্রের প্রয়োজন। ইতি। ২॥

অবতরণিকা—পূর্ব্বসূত্রে ব্রহ্মকে জগতের কারণরূপে কথিত হইয়াছে। সেই কারণতা সর্ব্বজ্ঞতা বিনা সম্ভব নাহে। সুতরাং ব্রহ্মে সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধ হইতেছে। সেই অর্থাৎ সিদ্ধ সর্ব্বজ্ঞতা নিম্নলিখিত হেতু হইতে সিদ্ধ করা যাইতেছে।

শাস্ত্রযোনিত্বাং। ৩॥ শাস্ত্র। যোনিত্বাৎ। ইতি পদচ্ছেদঃ।

অর্থ—শাস্ত্রপদ বেদের বাচক, যোনি অর্থ কারণ; বেদের যে যোনি হইবে তাহাকেই বেদযোনি কহে অর্থাৎ বেদের ঈশ্বর (কর্ত্তা)। অতএব বেদের কর্ত্তা হওয়াতে ও ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ। বৃহদারণ্যকোপনিষদে—"এতস্থ মহতো ভূতস্থ বিশ্বসিতমেবৈতৎ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণং শ্লোকো ব্যাখ্যানান্যনুমানানি প্রমাণভূতানি" এই শ্রুতি এই সূত্রের বিষয় বাক্য। শ্রুত্যর্থ।—এই নিত্যসিদ্ধ যে ব্রহ্ম তাঁহার নিশ্বাস হইতে উৎপন্ন ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্ববেদ, অঙ্গিরস ইতিহাস পুরাণ শ্লোক ব্যাখ্যান অনুমান এবং প্রমাণভূত হইতেছে ইতি।

ব্রহ্ম বেদের কর্ত্তা কিংবা কর্ত্তা নহে। ইহা তথায় পুনরায় সংশয় হইতেছে।

"বাচা বিরূপনিত্যয়া" এই শ্রুতিতে বেদের নিত্যত্ব শুনা যাইতেছে। সুতরাং ব্রহ্ম বেদের কর্ত্তা নহে। বিরূপ অর্থ—হে দেব! নিত্য যে বাক্ তদ্দ্বারা স্তুতিকে প্রেরণা কর। ইহা শ্রুতির অক্ষরার্থ ইতি। তাহার সিদ্ধান্ত এই—"তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে" এই শ্রুতিতে যজ্ঞপদে ব্রহ্ম এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহা হইতে বেদের উৎপত্তি কথিত হইতেছে। সুতরাং ব্রহ্ম বেদের কর্ত্তা। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি যে বেদকে নিত্য কহিয়াছেন তাহা অর্থবাদ বাক্য। সুতরাং বেদ নিত্য হইতে পারে না। এই তৃতীয় সূত্রের দ্বিতীয় অর্থ এই যে, শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ, যোনি অর্থ প্রমাণ হইবে যাহাতে তাহাকে শাস্ত্রযোনি কহে। "তন্তোপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম উপনিষদ্ দ্বারা বেদ্য প্রতীত হন। আরও "ন অবেদবিৎ মনুতে তং বৃহন্তং" ব্রহ্ম অনুমান-প্রমাণ-সিদ্ধ নহেন কিন্তু তিনি কেবল বেদপ্রমাণ সিদ্ধ হন। বেদৈকগম্য ইতি। কেবল শুষ্ক তর্কমাত্র অনুমানের অনুকূল। ইতি। উপরিউক্ত সূত্রে সর্ব্বজ্ঞতা সিদ্ধি সিদ্ধান্ত পক্ষের ফল এবং সর্ব্বজ্ঞতার অসিদ্ধি পক্ষের ফল ইতি।

অবতরণিকা—উপনিষদে অধিকারীর প্রবৃত্তি হওয়া, ইহা সিদ্ধান্ত পক্ষে পর (উত্তর) অধিকরণের ফল; পূর্ব্বপক্ষ কহেন--উপনিষদে অপ্রবৃত্তি হওয়াই চতুর্থ

অধিকরণের ফল। পরন্তু প্রথম অধিকরণ 'ত্বং' পদের শোধক, দ্বিতীয় অধিকরণ 'তৎ' পদের শোধক, চতুর্থ অধিকরণ "তৎ ত্বং" পদের একতা বোধক; তৃতীয় অধিকরণ প্রমাণ স্বরূপ। এক্ষণে সর্ব্ব বেদান্ত কর্ম্ম-কর্ত্তাদির বোধক অথবা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য ব্রহ্মের বোধক এ বিষয়ে সংশয় হইতেছে যে, ব্রহ্ম তো গ্রহণ ত্যাগের যোগ্য নহে এবং নিত্যসিদ্ধ। বেদান্তকে তাঁহার বোধক মানিতে গেলে নিষ্প্রয়োজনত্ব এবং সাপেক্ষত্ব রূপ দোষ প্রাপ্ত হইবে; সুতরাং উক্ত দোষের পরিহারের জন্য বেদান্তকে কর্ম্মকর্ত্তার বোধক এবং দেবতা দ্বারা কর্ম্মের বোধক মানা উচিত। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হওয়াতে ভগবান্ সূত্রকার স্ব সিদ্ধান্ত কহিতেছেন।

তত্তু সমন্বয়াৎ॥ ৪॥

তৎ। তু। সমন্বয়াৎ। ইতি পদচ্ছেদঃ।

অর্থ।—তু শব্দ পূর্ব্বপক্ষ নিষেধার্থক। সম্যক্ যে অন্বয়, তাহাকে সমন্বয় কহে। অর্থাৎ সর্ব্ব-বেদান্তের ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য। সুতরাং তৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্ব-বেদান্ত দ্বারা প্রতিপাদ্য। কর্ম্ম-কর্ত্তাদি বেদান্তপ্রতিপাদ্য নহে। রজ্জু সর্পের ন্যায় স্ব-স্বরূপের জ্ঞান হইতে অনর্থ নিবৃত্তি অনুভবসিদ্ধ। আর ব্রহ্মরূপাদিরহিত বেদান্তবিনা অপর প্রমাণের বিষয় নহেন। অপর প্রমাণের বিষয় হইলে তো বেদান্ত বচনের সাপেক্ষত্ব রূপ দোষ ঘটিবে। ব্রহ্ম অপর প্রমাণের বিষয় নহেন সুতরাং নিষ্প্রয়োজনতা আর সাপেক্ষতা রূপ দোষ কল্পনা অসঙ্গত। অতএব ষট্ লিঙ্গদ্বারা (উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ, ও উপপত্তি) সর্ব্ব বেদান্তের ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য। যথা—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" "একমেবা-দ্বিতীয়ং" ইহা ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ প্রপাঠকে কথিত আছে। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ইহা ঐতরেয় শ্রুতির প্রারম্ভে কথিত হইয়াছে। "তদেতৎ ব্রহ্ম অপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যং অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ ইত্যনুশাসনং" ইহা বৃহদারণ্য-কের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে। "ব্রহ্মৈব ইদং অমৃতং" (মোক্ষরূপং পুরস্তাৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চ উর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং (ব্যাপ্তং) ব্রহ্মৈব ইদং বিশ্বং ইদং বরিষ্ঠং" ইহা দ্বিতীয় মুণ্ডকের ষোড়শাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

শ্রুত্যর্থ।—হে সৌম্য হে প্রিয়দর্শন শ্বেতকেতো এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিতেছ তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে সত্যস্বরূপ যিনি ইহার কারণ তৎস্বরূপে বিদ্যমান ছিলেন। এক অর্থাৎ সত্য হইতে ভিন্ন অপর কার্য্য কিছু মাত্রও ছিল না। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' অর্থাৎ স্বজাতীয় এবং স্বগতভেদরহিত। যেরূপ মৃত্তিকা হইতে তাহার নিমিত্তকারণ কুলাল ভিন্ন, সেইরূপ সত্য হইতে ভিন্ন কিছু থাকিবে এই

শঙ্কার নিষেধার্থ অদ্বিতীয় বলা হইয়াছে। ইতি। আত্মা অর্থ ব্যাপক অততি ব্যাপ্নোতি ইতি আত্মা ইতি। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে আত্মাই ছিলেন। এই যে চরাচর তাহা ব্রহ্মরূপ, সেই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্ব কারণ যাঁহার নাই তাঁহাকে অপূর্ব্ব কহে অর্থাৎ অকার্য্যরূপ। অপর অর্থাৎ কার্য্যের জন্য যিনি নহেন তাঁহাকে অনপর কহে অর্থাৎ অকারণরূপ। অনন্তর (জাতিরহিত) শব্দে একরস; বাহ্য অর্থ অনাত্মা, তাহা যাঁহার নাই তিনি অবাহ্য অঙ্গীকৃত।

অর্থাৎ ইহাতে অদ্বিতীয়ের গ্রহণ হইতেছে। অয়ং পদ অপরোক্ষতাবোধক। এই অপরোক্ষ আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ। যিনি সকলকে অনুভব করেন তিনি সর্ব্বানুভূঃ। পুরস্তাৎ অর্থাৎ অজ্ঞানকালে অজ্ঞানীর অব্রহ্মের ন্যায় ভাণ হইয়াছিল সেই এই সকলে সর্ব্বদিকে সর্ব্বকালে অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ইতি। কর্ম্ম-কর্ত্তাদি অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম ও যজমানাদি কর্ত্তা দ্বারা বেদান্তকে যে কর্ম্মবোধক মানা হইয়াছে পূর্ব্বে তাহার মত খণ্ডন করিয়া পরে বেদান্তকে উপাসনা-বোধক মানিয়া যে উপাসনা হইতে মুক্তি মানা হইয়াছে তাহার মত খণ্ডন করা যাইতেছে।—"তত্তু সমন্বয়াৎ" ইতি। ব্রহ্মে সকল বেদান্তের সমন্বয় হইতেছে সুতরাং তৎব্রহ্ম সাক্ষাৎ বেদান্ত প্রতিপাদ্য হইতেছেন। ইতি। মোক্ষ, উপাসনা দ্বারা সাধ্য নহে, কারণ উপাসনাতে অনেক প্রকার ন্যূনাধিকতা আছে সুতরাং মোক্ষেও সেই ন্যূনাধিকতা আসিবে সুতরাং অনিত্যতা সিদ্ধ হইবে। কর্ম্মের ফলভোগ কালে শরীর অবশ্য থাকা উচিত, কারণ শরীর বিনা ভোগ হইতে পারে না, সুতরাং মোক্ষকালে শরীর অবশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু "অশরীরং বাব সন্তং (আত্মানং) ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে। "অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষু অবস্থিতং মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি" ইহা কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীতে উক্ত হইয়াছে। "অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ" ইহা বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে জনক রাজার প্রতি কথিত হইয়াছে। উক্ত বচনে স্বাভাবিক শরীররহিত আত্মা ভান হইয়া থাকে। সুতরাং ধর্ম্মজন্য যদি শরীররহিত কহা যায় তাহা সম্ভব নহে। শ্রুত্যর্থ।—আত্মা শরীররহিত, তাহাকে সুখ-দুঃখ স্পর্শ করে না। তোমার মতে মোক্ষ ধর্ম্মের ফল, তাহা প্রিয় শব্দের অর্থ, শ্রুতিতে তাহা নিষেধ করিয়াছে। সুতরাং তাহা মানিলে শ্রুতি-কথিত নিষেধ অসঙ্গত হইবে। ইতি। বাস্তবিক আত্মা স্থূলশরীর-রহিত; অনিত্য শরীরে অবস্থিত থাকিয়া নিত্য। সেই মহান্ বিভু আত্মাকে অবগত হইয়া ধীর পুরুষ অজ্ঞান-উপলক্ষিত শোক করেন না। ইতি। এক মূর্ত্ত

পদার্থ অন্য মূর্ত্ত পদার্থের সহিত সংযোগসম্বন্ধবান্ হইয়া থাকে। আত্মা পরিপূর্ণ এবং মূর্ত্ত পদার্থ নহে। সুতরাং মূর্ত্তরূপ স্থূল সূক্ষ্ম কোন পদার্থের সহিত সম্বন্ধবান্ হন না; সুতরাং আত্মা অকর্ত্তা। ইতি। স্বাভাবিক অশরীর মোক্ষ রূপ ব্রহ্ম বিষয়ে সুখ-দুঃখস্পর্শাভাব নিম্নলিখিত শ্রুতি দেখাইয়াছেন। "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ অন্যত্র ভূতাশ্চ ভব্যাশ্চ যৎতৎ পশ্যসি তদ্বদ" ইতি। এই শ্রুতি কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীতে আছে। অর্থ।—ধর্ম্ম হইতে এবং ধর্ম্মের ফল সুখ হইতে এবং অধর্ম্ম হইতেও অধর্ম্মের ফল দুঃখ হইতে কৃত অর্থাৎ কার্য্য হইতে এবং অকৃত অর্থাৎ কারণ হইতে, ভূত অর্থাৎ অতীত হইতে, ভব্য অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান হইতে অন্যত্র অর্থ অন্যৎ অর্থাৎ ইহাদের সকলের স্পর্শরহিত এইপ্রকার যে স্বরূপকে তুমি দেখিয়াছ, তাহার বিষয় আমাকে বল। ইহা যমরাজার প্রতি নচিকেতার বচন। ইতি। কিন্তু।—মোক্ষকে যদি কর্ম্মের ফল মানা যায়, তাহা হইলে যেরূপ স্বর্গাদি, অধিকারী লোকের গ্রহণযোগ্য নহে সেইরূপ মোক্ষও উপাদেয় নহে। কিন্তু ইহা সিদ্ধ নহে এবং তাহাতে উভয় শ্রুতিবচনের বাধ হইবে। "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"। এই বচন তৃতীয় মুণ্ডকে উক্ত হইয়াছে। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"। ইহা দ্বিতীয় মুণ্ডকবাক্য। "আনন্দং ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনঃ"। ইহা তৈত্তিরীয়কের নবম অনুবাকে উক্ত হইয়াছে। "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূৎ বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ" ইহা ঈশাবাক্যে কথিত হইয়াছে। "তদ্ধৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবম্ সূর্য্যশ্চ"। ইহা আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে। শ্রুতি অর্থ।—যিনি ব্রহ্মকে স্ব-স্বরূপ রূপে অবগত হইয়াছেন তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হন। পর যে হিরণ্যগর্ভাদি তাঁহারা হন অবর যাহা হইতে তাহা পরাবর অর্থাৎ এতদ্দ্বারা পরমাত্মার গ্রহণ হইতেছে। সেই পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করিলে পর, সেই আত্মবেত্তার হৃদয়গ্রন্থি অর্থাৎ চিৎ জড়গ্রন্থি নিবৃত্ত হইয়া যায়। এবং সর্ব্বসংশয় বিনাশ হইয়া যায়, আর যে কর্ম্মের ফলভোগ হয় নাই, সেই সমস্ত কর্ম্ম বিনাশ হইয়া যায়। ইতি। ব্রহ্মের স্বরূপানন্দ অবগত হইলে কাহারও হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না। ইতি। যে অবস্থায় আত্মবেত্তার সর্ব্বভূত আত্মস্বরূপই হয়, তৎকালে সেই আত্মা হইতে একত্ব নাম অভেদদর্শী পুরুষের শোক মোহাদি সংসারের অভাব হয়। ইতি। তৎপদের লক্ষ্য যে ব্রহ্ম প্রত্যক্‌রূপে স্থিত সেই

অহমস্মি এই প্রকার দর্শনকারী ঋষি বামদেব এই দর্শন হইতে অবিদ্যা নাশ দ্বারা পরব্রহ্মকে প্রতিপেদে অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই দর্শনে স্থিত হইলে আমি মনু হইলাম, আমি সূর্য্য এইরূপ মন্ত্র কহিয়াছিলেন। ইতি। উপরি উক্ত সমস্ত বচন জ্ঞানকালেই মোক্ষ কহিয়াছেন; পরন্তু কর্ম্মের ফল কালান্তরে হয়। ইতি। কিঞ্চ ত্বং হি নঃ পিতা যো অস্মাকং অবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি"। ইহা প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে কথিত হইয়াছে, "সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিৎ এবাস্মি ন আত্মবিৎ শ্রুতং হি এব মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ তরতি শোকমাত্মবিৎ সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মাং ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু।" ইহা ছান্দোগ্যের সপ্তম প্রপাঠকের প্রারম্ভে কহিয়া সমাপ্তিতে এই কহিয়াছেন, "তস্মৈ মৃদিত কষায়ায় (দূরীকৃত রাগদ্বেষায়) তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ" এই পূর্ব্বোক্ত বচন দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে, অবিদ্যা নিবৃত্তিপূর্ব্বক, মোক্ষকারণতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অবিদ্যা নিবৃত্তি জ্ঞান বিনা হয় না। সুতরাং মুক্তি উপাসনা দ্বারা সাধ্য নহে। শ্রুতি অর্থ।— ভরদ্বাজাদি ষট্ ঋষি পিপ্পলাদ গুরুকে বন্দনা করিয়া কহিলেন, যে আপনি আমাদের পিতা, বিদ্যা দ্বারা অজর অমর ব্রহ্মরূপ দেহের (স্বরূপের) জনক, সুতরাং অবিদ্যারূপ সমুদ্র হইতে পর অর্থাৎ অপুনরাবৃত্তিরূপ পারে বিদ্যারূপ নৌকা দ্বারা আমাদিগকে লইয়া যান। ইতি। শ্রীনারদ মুনি সনৎকুমারকে কহিয়াছিলেন যে, হে ভগবন্ আমি সর্ব্ববিদ্যা পাঠ করিয়াছি; আমি নিজে মন্ত্রবেত্তা আছি, কিন্তু আত্মবেত্তা নহি। আমি আপনার ন্যায় মহাত্মার নিকট শুনিয়াছি যে, আত্মবেত্তা সকল শোক হইতে উত্তীর্ণ হন। অতএব আমি অনাত্মবেত্তা হওয়াতে শোক করিতেছি; সুতরাং শোকবান্ আমাকে শোকসাগর হইতে পার করুন্। এইপ্রকার নারদকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সনৎকুমার বিশুদ্ধ চিত্তবান্ নারদকে অবিদ্যার পর পরমাত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন। ইতি। যদ্যপি ব্রহ্ম, বেদ ইত্যাদি বাক্যের কর্ম্ম প্রতীত হয়; অতএব ব্রহ্মকে বিধেয় মানা উচিত তথাপি ব্রহ্ম, প্রযত্ন (কৃতি) সাধ্য নহে, সুতরাং বিধেয় নহে এবং ব্রহ্মকে কর্ম্ম বলাও সম্ভব নহে; কারণ ব্রহ্ম জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম বা উপাসনারূপ ক্রিয়ার কর্ম্ম এই উভয় পক্ষ শ্রুতি নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং উভয়ই সম্ভব নহে। তথাহি—"অন্যদেব তৎ বিদিতাৎ অথো অবিদিতাদধি" ইহা কেনোপনিষদের প্রথম খণ্ডে কথিত হইয়াছে। ইহাতে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম্মত্বের নিষেধ করা হইয়াছে। এবং সেই স্থানেই "যদ্বাচা অনভ্যুদিতং; যেন বাগভ্যুদ্যতে তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদ-

মুপাসতে"। এই বাক্যে উপাসনা ক্রিয়ার কর্ম্মত্বের নিষেধ করা হইয়াছে। 'তৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম বিদিত যে কার্য্য ও অবিদিত যে কারণ এই উভয় হইতে অন্যৎ। যাহা জ্ঞানের বিষয় তাহাকে বিদিত কহে। অথো এই পদ এবং অধি এই পদ নিশ্চয় বাচক। যাহাকে বাণী দ্বারা কহা যায় না, বাণীকে যিনি প্রকাশ করেন তাহাকে তুমি ব্রহ্ম জান। যে উপাধিবিশিষ্ট দেবতাদি উপাস্য তাহাদিগকে তুমি ব্রহ্মরূপ জানিও না"। ইতি। আরও উত্তরবাক্য দ্বারাও ব্রহ্মকে কর্ম্ম কহা অসঙ্গত। "যস্যামতং (যস্য অধিকারিণঃ ভিন্নত্বেন দৃশ্যত্বেন অমতং) তস্যমতং মতং (ভিন্নত্বেন দৃশ্যত্বেন) যস্য ন বেদ সঃ অবিজ্ঞাতং বিজানতাং (দৃশ্যত্বেন) বিজ্ঞানমবিজানতাং"। ইহা কেনোপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডের বাক্য। "যেন ইদং সর্ব্বং বিজানাতি, তং কেন বিজানীয়াম্; বিজ্ঞাতারমরে কেন (করণেন) বিজানীয়াম্" এই বাক্য বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে। উক্ত বাক্যেও ব্রহ্মকে জ্ঞানের অবিষয় রূপে বলা হইয়াছে। শ্রুতি অর্থ।—ব্রহ্ম অবিষয় ইহা যাহার নিশ্চয় হইয়াছে, তাহার ব্রহ্ম সম্যক্ জ্ঞাত আছে। আর ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় এরূপ যাহার নিশ্চয় আছে, ব্রহ্ম তাহার অজ্ঞাত। এই অর্থ অর্দ্ধ শ্রুতির অনুবাদ। ইতি। হে মৈত্রেয়ি! যে বস্তু দ্বারা এই চরাচর জ্ঞাত আছে তাহাকে কোন্ করণ দ্বারা জানা যাইবে? বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানা যাইতে পারে? অর্থাৎ তাঁহাকে কোন্ করণ দ্বারা জানা যাইতে পারে না। ইতি। কিঞ্চ মোক্ষ স্বরূপতঃ অনাদি সুতরাং বিধেয় ক্রিয়া উপপাদ্য নহে (যেরূপ যাগাদি) গীতাতে অবিকার্য্য (অচ্ছেদ্য অবাহ্য অবিকার্য্য) কথিত হইয়াছে, সুতরাং বিকার্য্য (উৎপত্তিবিশিষ্ট) নহে। নিত্যপ্রাপ্ত সুতরাং আপ্য নহে; নির্গুণস্বরূপ সুতরাং সংস্কার্য্যরূপ নহে। নির্গুণ নির্দোষে এই প্রমাণ:—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ"। ইতি শ্বেতাশ্বতরের ষষ্ঠ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। "স পর্য্যগাৎ শুক্রং অকায়ং অব্রণং অস্নাবিরং শুদ্ধং অপাপবিদ্ধম্" ইহা ঈশাবাক্যে কথিত হইয়াছে। শ্রুতি অর্থ।—শিবাদিত্রয় মূর্ত্তি নাই কিন্তু এক, জড় নহে কিন্তু প্রকাশস্বরূপ, সর্ব্বভূতে মায়া দ্বারা গূঢ় অর্থাৎ গোপ্য, সুতরাং প্রতীত হন না; সর্ব্ব পদার্থে ব্যাপক, তটস্থ নহেন কিন্তু সকলের অন্তর আত্মাস্বরূপ, সর্ব্বভুতে স্থিত তথাপি ক্রিয়ার কর্ত্তা নহেন কিন্তু কর্ম্মের সাক্ষী, সর্ব্বভূতের অধিবাস, অর্থাৎ অধিষ্ঠান, সর্ব্ব কর্ত্তারূপ জীবনেরও (অর্থাৎ সাভাস চেতনেরও) সাক্ষী, চেতা অর্থাৎ চেতনস্বরূপ, জ্ঞানাদি গুণরহিত, কেবল

দৃশ্য বস্তু হইতে রহিত। ইতি। সেই আত্মা পর্য্যগাৎ অর্থাৎ ব্যাপক, শুক্র অর্থাৎ দীপ্তিমান্. অকায় অর্থাৎ কারণশরীর ও লিঙ্গশরীর রহিত, অব্রণ অর্থাৎ ছিদ্ররহিত, অস্নাবির অর্থাৎ নাড়ীসমূহ রহিত (স্থূল দেহ রহিত), অব্রণ ও অস্নাবির এই দুই বিশেষণ দ্বারা এই স্থূলদেহ রহিত কথিত হইয়াছে। শুদ্ধ অর্থাৎ রাগাদিগুণরহিত, অপাপবিদ্ধ অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মরহিত ইতি। পূর্ব্ব শ্রুতিতে সংস্কাররূপ মোক্ষের নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং কর্ত্তব্য যে বিধি তাহার অঙ্গরূপে ব্রহ্মের উপদেশ সম্ভব নহে। ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদবিষয়ক যে জ্ঞান তাহাকে স্বতন্ত্র মোক্ষের কারণতারূপে শ্রুতি দেখাইয়াছেন সুতরাং বিধির অপেক্ষা নাই। তথাহি—"আত্মানং চেৎ বিজানীয়াৎ অহমস্মীতি পুরুষঃ" "কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ" এই বাক্য বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে। অর্থ।—"এই পরমাত্মা 'অহং অস্মি' এই প্রকার অপরোক্ষরূপে যদি কেহ জানে তবে সে আপনা হইতে ভিন্ন কি ফল ইচ্ছা করিয়া কিসের কামনার জন্য শরীরকে কষ্ট দিবে। ইতি। যদ্যপি শরীর কালে অশরীরত্বের অভাব আছে এ জন্য মোক্ষকে ধর্ম্মজন্য কহা সম্ভব হয় বটে তথাপি শরীরত্ব মিথ্যা কল্পিত, সুতরাং স্বভাবতঃ অশরীরত্ব হওয়াতে মোক্ষ ধর্ম্মজন্য নহে। তথাহি শ্রুতিঃ—"তৎ যথা অহিনির্ব্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীত এবমেব ইদং শরীরং শেতে অথ অয়ং অশরীরো মৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এবেতি।" ইহা বৃহদারণ্যেকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে জনক রাজার প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য মুনির বচন। "স-চক্ষুরচক্ষুরিব, স-কর্ণো অকর্ণ ইব স-প্রাণোঽপ্রাণ ইব স-বাগবাগিব স-মনা অমনা ইব" ইহা অন্যত্র কথিত হইয়াছে।

অর্থ।—জীবন্মুক্ত পুরুষ দেহকে জানে তথাপি তাহার পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ অজ্ঞান কালের ন্যায় সংসার থাকে না। এতদর্থে শ্রুতি দৃষ্টান্ত দ্বারা বলিয়াছেন—"যেরূপ সর্পের কঞ্চুক বিলমধ্যে প্রত্যস্তা অর্থাৎ পরিত্যক্ত হইলে মৃতা অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ আত্মরূপে গৃহীত হয় না, উহা পড়িয়া থাকে, সেইরূপ আত্মবেত্তার শরীর পূর্ব্ববৎ আত্মরূপে গৃহীত না হইয়া কেবল মিথ্যারূপে অবস্থিত থাকে। কঞ্চুকের ন্যায় শরীরকে কহিয়া আত্মবেত্তার সর্পতুল্যতা শ্রুতি দেখাইতেছেন। যেরূপ পরিত্যক্ত ত্বক্‌কে অহং এইরূপে সর্প মানে না, অথ অর্থাৎ সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষও দেহকে, আমি দেহরূপ এরূপ মানেন না। সুতরাং আত্মবেত্তাকে অশরীর বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহলোকে দেহের অভিমানবশতঃ মৃত্যু হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানীর দেহাভিমান নাই সুতরাং তিনি অমৃতরূপ: কেবল জীবের ন্যায়

চেষ্টা করিয়া থাকেন। এ জন্য জ্ঞানীকে প্রাণ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। প্রাণ অর্থাৎ সাক্ষী, তিনিই ব্রহ্মরূপ, তেজঃ অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ। এই শ্রুতিতে স্থূল দেহকে মিথ্যা দেখান হইয়াছে। ইতি। অপর শ্রুতির অর্থ।—বাস্তবিক চক্ষুরহিত তথাপি বাধিত (মিথ্যা) নেত্রাদি অনুবৃত্তি (সম্বন্ধ) বশতঃ নেত্রবান্ প্রতীত হইয়া থাকেন। এইরূপ উত্তর (পর) ভাগের অর্থও জানিবে। এই শ্রুতিতে লিঙ্গ-দেহকে মিথ্যারূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্ব বেদান্তের ব্রহ্মেই তাৎপর্য্য। বিধি বা কর্ম্ম দ্বারা সিদ্ধ নহে।

অবতরণিকা—পূর্ব্বোক্ত চারি সূত্র দ্বারা ব্রহ্মকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎকারণ বেদান্তপ্রতিপাদ্য কথন করা হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম চেতন বা অচেতন ইহা এক্ষণে সংশয় হইতেছে। তথায় ইহা সাংখ্যের পূর্ব্বপক্ষ এই যে, ব্রহ্ম ত কূটস্থ সুতরাং জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিবান্ নহেন, সুতরাং তিনি জগৎ-কারণ হইতে পারেন না, পরন্তু প্রধান ত্রিগুণরূপ। ত্রিগুণরূপ হওয়াতে তাহাতে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সম্ভব হইতেছে; সুতরাং প্রধান জগতের কারণ। সেই প্রধান সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ তাহারই সর্ব্ববেদান্ত অনুবাদ করেন। ভগবান্ সূত্রকার এই মতের খণ্ডন করিতেছেন।

ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥ ৫ ॥

ঈক্ষতেঃ। ন। অশব্দম্। ইতি পদচ্ছেদঃ।

অর্থ।—সাংখ্যপরিকল্পিতং প্রধানং জগৎকারণং ন সম্ভবতি। অশব্দত্বাৎ অর্থাৎ অবেদপ্রামাণিকত্বাৎ। অবেদপ্রামাণিকে হেতু কহা যাইতেছে। সাংখ্যপরিকল্পিতং প্রধানং অবেদং প্রামাণিকং ভবতি। ঈক্ষতেঃ অর্থাৎ ঈক্ষিতৃত্বশ্রবণাৎ। ইতি। "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়।" এই শ্রুতি দ্বারা ঈশ্বরের অভিন্ননিমিত্তোপাদানকারণত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। এই ছান্দোগ্য শ্রুতি ঈক্ষিতৃত্বের প্রমাণ। ঈক্ষিতৃত্ব ইচ্ছা বা জ্ঞানবিশেষ। প্রধান জড়, জড়ে ইচ্ছাদি সম্ভব নহে। সুতরাং প্রধান বেদপ্রামাণিক নহে। বেদপ্রমাণ বিনা তাহাকে জগৎকারণ সম্ভব নহে। ইতি। পূর্ব্বপক্ষমতে প্রধান উপাসনা এই অধিকরণের ফল। আর ব্রহ্মাত্মা অভেদ জ্ঞান সিদ্ধান্ত মতে ইহার ফল। ইতি।

অবতরণিকা—ননু ইচ্ছামাত্রবশতঃ যদি ব্রহ্মকে জগতের কারণ মানা যায় তাহা হইলে প্রধানেও জগৎকারণতা সম্ভব। তথাহি—"তত্তেজ ঐক্ষত, তা আপ ঐক্ষন্ত" এই শ্রুতিতে অচেতনরূপ তেজ ও জলে ইচ্ছা শুনা যাইতেছে। এ জন্য

জড় প্রধানে গৌণ ইচ্ছা মানিয়া প্রধানকে জগতের কারণ মানা যাইতে পারে। সূত্রকার ব্যাস এই শঙ্কার সমাধান করিতেছেন।

গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥ ৬ ॥

গৌণঃ। চেৎ। ন। আত্মশব্দাৎ। ইতি পদচ্ছেদঃ।

অর্থ।—চেৎ অর্থাৎ যদি সাংখ্য প্রধানে গৌণ ইচ্ছা মানেন তাহা সম্ভব নহে। ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ প্রপাঠকে শ্বেতকেতুর পতি উদ্দালক মুনির এই বচন আছে। "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" "তত্তেজঃ অসৃজত" 'তত্তেজ ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" "তদাপোঽসৃজত" "তা আপ ঐক্ষত বহ্বঃ স্যাম প্রজায়েমহি" "তা অন্নং অসৃজন্ত" ইহা দ্বিতীয় খণ্ডে কহিয়া তৃতীয় খণ্ডে এই কহিতেছেন—"সা ইয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্তাহং ইমাঃ তিস্রোদেবতা অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি।" ইতি। অর্থ।—"তদৈক্ষত" এই শ্রুতির পূর্ব্বে 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" এই বাক্য আছে। ইহাতে যাহা 'সৎ' পদের বাচ্য তাহা "তদৈক্ষত" এই শ্রুতিতে 'তৎ' পদরূপে গৃহীত হইয়াছে। তাহাতে 'আমি এক আছি, অনেক রূপ হইব,' এই ইচ্ছা হইয়াছিল। তাহা হইতে তেজ রচনা করিলেন। সেই তেজে ইচ্ছা হইয়াছিল যে আমি এক হইতে অনেকরূপ হইব। তাহা হইতে জল উৎপন্ন করিলেন। সেই জলে ইচ্ছা হইল যে আমি এক হইতে অনেকরূপ হইব। তখন জল হইতে অন্ন উৎপন্ন হইল। ইতি। সেই দেবতার ইচ্ছা দ্বারা এক্ষণে অর্থাৎ মহাভূত উৎপত্তির পরে আমরা তিন দেবতা অনেন অর্থাৎ পূর্ব্ব-সৃষ্ট অনুভূত প্রাণদ্যুতি হেতুবশতঃ জীবেনাত্মনা অর্থাৎ 'তৎ' রূপে প্রবেশ করিয়া দেবতাদিগকে উৎপত্তি করিয়া নামরূপকে প্রকট করি। ইতি। এই শ্রুতিতে আত্মা শুনা গিয়াছে। যদি পূর্ব্ব ভূতত্রয়ের উৎপত্তি হইতে 'প্রধান' গ্রহণ করা যায় তবে 'জীবেনাত্মনা প্রবিশ্য' ইহা বলা অসঙ্গত হইবে। কারণ আত্মা শব্দ স্বরূপের বাচক। চেতন জীবের অচেতন প্রধান আত্মা হইতে পারে না কিন্তু ব্রহ্মে জীববাচক আত্মা শব্দের প্রয়োগ সম্ভব। পরে শেষে "স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যং ইদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"। এই বাক্যে শ্বেতকেতুকে জীবের আত্মা হইতে তাদাত্ম্য উপদেশ করা হইয়াছিল। সুতরাং চেতন হইতে চেতনের অভেদ শঙ্কা কিছুমাত্রও নাই।

শ্রুতি অর্থ।—যিনি সত্যবস্তু তিনি এই অণিমা অর্থাৎ অণু। এতৎ অর্থাৎ এই চেতন হয় আত্মা যাহার তাহাকে 'এতদাত্ম্য' কহা যায়। অর্থাৎ এতদ্দ্বারা জগতের গ্রহণ হইতেছে এই সর্ব্বচরাচরের আত্মা, চেতনই হইতেছে; সেই

আত্মা সত্য অর্থাৎ পরমার্থ স্বরূপ; তিনিই সকলের আত্মা, হে শ্বেতকেতো! তুমিও সংসারী নহ কিন্তু সেই সত্য পদের বাচ্য ব্রহ্ম তুমি হও। ইতি। উক্ত শ্রুতিতে আত্মা শব্দ গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং তেজ জলের ন্যায় প্রধানে গৌণ ইচ্ছা সম্ভব নহে। পূর্ব্বে যে শ্রুতিতে জল তেজ বিষয়ে ইচ্ছা কথিত হইয়াছে সেখানে তেজ জল উপাহিত পরমাত্মাতে ইচ্ছা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। মুখ্য তেজ ও জলে ইচ্ছা মানিলে চেতন হইতে সর্ব্ব সৃষ্টি কথন অসঙ্গত হইবে। ইতি।৬॥

অবতরণিকা—নন্থ যদ্যপি আত্মা শব্দ মুখ্য বৃত্তি অনুসারে প্রধানের বাচক নহে তথাপি গৌণ বৃত্তি অনুসারে প্রধানের বাচক মানিলে হানি নাই। এই শঙ্কা হওয়াতে সূত্রকার কহিতেছেন।

"তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ" ॥৭॥

তৎ। নিষ্ঠস্য। মোক্ষোপদেশাৎ। ইতি পদচ্ছেদঃ।

অর্থ।—"তত্ত্বমসি" বাক্য দ্বারা চেতন শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মনিষ্ঠার উপদেশ দিয়া এই উপদেশ করা হইয়াছিল "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন মোক্ষিষ্যে অথ সম্পৎস্যে" 'তস্য' যদি অচেতনকে সৎ শব্দের বাচ্য মানা যায় তবে "তত্ত্বমসি" বাক্যের এই তাৎপর্য্য সিদ্ধ হইবে যে, হে শ্বেতকেতো! তুমি চেতন, অচেতন রূপ হও। ইহা শুনিয়া অহং অচেতনোঽস্মি এই প্রকার চিন্তন করিতে করিতে মোক্ষ হইতে পতিত হইত এবং মহান্ অনর্থ প্রাপ্ত হইত। সুতরাং শাস্ত্র উন্মত্ত-প্রলাপ মাত্র সিদ্ধ হইত। তাহা মহান্ অনিষ্টজনক। সুতরাং আত্মা শব্দ চেতনের বাচক; জড় প্রধানের বাচক নহে। শ্রুতি অর্থ।—আত্মবেত্তার সেই পর্য্যন্তই চির অর্থাৎ দেহাদি থাকে যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ থাকে। অথ অর্থাৎ অনন্তর, প্রারব্ধ ক্ষয়ের পর সম্পৎস্যে অর্থাৎ বিদেহ কৈবল্য প্রাপ্ত হয়। ইতি ॥৭॥

অবতরণিকা—নন্থ স্থূলারুন্ধতী ন্যায় অনুসারে প্রধানের উপদেশ দ্বারা আত্মারই উপদেশ মানা উচিত। এই শঙ্কার উত্তর কথিত হইতেছে।

হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥৮।

হেয়ত্ব। অবচনাৎ। চ। ইতি পদচ্ছেদঃ।

অর্থ।—স্থূলারুন্ধতী ন্যায় দ্বারা উপদেশ হইতে পারে। কিন্তু অনাত্মা প্রধানকে সৎ শব্দের বাচ্য মানিয়া "যিনি আত্মা তিনিই তুমি" এই প্রকার উপদেশ দিয়া সেই উপদেশ শ্রবণ দ্বারা অনাত্মবেত্তা হইয়া, সেই অনাত্মা প্রধানে

নিষ্ঠাবান্ হইবে না এই জানিয়া মুখ্য আত্মার উপদেশের ইচ্ছাতে 'হেয়ত্ব' রূপে শাস্ত্র কহিতে পারিত কিন্তু প্রধানের নিষেধক কোন বচন প্রতীত হইতেছে না। সুতরাং প্রধানের উপদেশ দ্বারা আত্মার উপদেশ সম্ভব নহে এবং তাহা হইলে একের বিজ্ঞান হইতে সকলের বিজ্ঞান হয় এই প্রতিজ্ঞার বিরোধ হইবে। তথাহি "উত্তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাহশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং"। "কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতি" ইতি। "যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইতি এব সত্যং ইতি"। এই বাক্যে একের বিজ্ঞান হইতে সকলের বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। প্রধানের জ্ঞান দ্বারা যে সকল বিকারের জ্ঞান হইবে তাহা সম্ভব নহে। শ্রুতি অর্থ। -হে শ্বেতকেতো! যে বস্তুর শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করিলে অশ্রুত শ্রুত হয়, তাহাকে তর্ক দ্বারা মনন করিলে অমত অর্থাৎ যাহাকে মনন করা যায় নাই তাহাও মনন হয়, যাহাকে জানিলে অবিজ্ঞাত বস্তুও জ্ঞাত হওয়া যায় সেই উত্তমাদেশ অর্থাৎ শাস্ত্রগম্য বস্তুর উপদেশ অপ্রাক্ষঃ অর্থাৎ তোমার গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? ইহা পিতার বাক্যের অর্থ। হে ভগবন্ এক বস্তুকে শুনিলে সর্ব্ব বস্তু শ্রবণের উপদেশ কিরূপে হইবে? একের জ্ঞান হইতে অপরের জ্ঞান হইতে পারে না, এই শ্বেতকেতুর বচনের তাৎপর্য্য। তদ্বিষয়ে পিতার উত্তর।—হে সৌম্য! যেরূপ এক মৃত্তিকা-পিণ্ডের জ্ঞান হইতে মৃত্তিকার সর্ব্ব বিকার অর্থাৎ কার্য্য জ্ঞাত হওয়া যায়, যদ্যপি মৃত্তিকা-পিণ্ডের জ্ঞান হইলেও তৎকার্য্যের জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে তথাপি যাহা বিকার অর্থাৎ কার্য্য তাহা বাচারম্ভণ অর্থাৎ বাক্যাবলম্বন মাত্র, বাস্তবিক বাণী হইতে ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নহে; নামধেয় এই তথায় হেতু নামধেয় অর্থাৎ নাম মাত্র অর্থাৎ অর্থ রহিত। যদ্যপি ঘটের মৃত্তিকা হইতে অভেদ মানিলে ঘটনাশ হইবার পর মৃত্তিকা নাশ হওয়া উচিত তথাপি ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন বস্তু নহে কিন্তু অভিন্ন, পরন্তু মৃত্তিকা ঘট হইতে ভিন্ন সুতরাং দোষ নাই। উক্ত অর্থ শ্রুতিতে "মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যং" এই বাক্য দ্বারা কথিত হইয়াছে। ইতি। ৮॥

(ক্রমশঃ।)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

———

মধ্যস্থের বিপদ্।

(১)

ঘুসোঘুসির মধ্যে পড়িয়া ঝগড়া মিটাইতে গেলে অনেক সময় দুই পক্ষের ঘুসিই মধ্যস্থের পৃষ্ঠে পড়ে। রাজায় রাজায় বিবাদের সময় চলিত কথায় আছে উলু খড়েরই প্রাণ গিয়া থাকে। পুরাকালে হিন্দুর সৎকর্ম্মের সাক্ষী দেবদেব হুতাশনের এইরূপ এক বিপদ্ ঘটিয়াছিল।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পুলোমা মহর্ষি ভৃগুর সহধর্ম্মিণী। পুলোমা তৎকালে গর্ভবতী। মহর্ষি আশ্রমে নাই, স্নানার্থ গমন করিয়াছেন। এই অবসরে ভৃগুপত্নী নামধারী এক রাক্ষস তথায় উপস্থিত হইল। অতিথি সৎকারের ত্রুটী না ঘটে এই নিমিত্ত ভৃগুজায়া তাঁহাকে যথাযোগ্য ফলমূল আনিয়া দিলেন এবং বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন।

রাক্ষস পুলোমা চাহিয়া দেখিল এই রমণীর সহিতই তাহার পূর্ব্বে বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু কন্যার পিতা ভৃগুকে তাহার অপেক্ষা উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া সেই বিবাহে সম্মতি না দিয়া ভৃগুকেই কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই মনোহারিণী অন্যের অঙ্কলক্ষ্মী এই ভাবিয়া রাক্ষস ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, পুলোমার অনুগ্রহ তাহার নিকট নিগ্রহ বোধ হইল।

(২)

রাক্ষস পুলোমার পিতৃকৃত অপরাধের প্রতিশোধ লইতে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হইলেন এবং পুলোমাকে হরণ করিতে সংকল্প করিলেন। দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই। রাক্ষস তখন আশ্রমপ্রজ্বলিত অগ্নির সমীপস্থ হইয়া কহিলেন,—হে হুতাশন, তুমি দেবপ্রধান। দেবতাগণ তোমার দ্বারা যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। তুমি সর্ব্বদা সর্ব্বজীবের শরীরে পাপ-পুণ্যের সাক্ষীস্বরূপে বিরাজমান, তুমি সত্য করিয়া বল এই কামিনী আমার হইতে পারে কি না। আমি ইতঃপূর্ব্বে ইহাকে বরণ করিয়াছিলাম, কিন্তু ভৃগু তথাপি ইহাকে বিবাহ করিয়াছে। আমি তোমার নিকট প্রকৃত অবস্থা শ্রবণ করিয়া পুলোমাকে হরণ করিব।”

পুরাকালে অগ্নিও কথা কহিতেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে উভয় সঙ্কট উপস্থিত। সত্য কথা বলিলে ভৃগু নিশ্চয়ই অভিশাপ দিবেন, এ দিকে মিথ্যা কথা বলাও

সঙ্গত নহে। হুতাশন তখন সকল দিক্ রক্ষা করিবার অভিলাষে বলিলেন, "আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারি না। তুমি এই রমণীকে বরণ করিয়াছিলে সুতরাং বিচারমতে ইনি তোমারই হইতে পারেন, কিন্তু মহর্ষি ভৃগু আমার সমক্ষে ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ তোমার এ যুবতীতে অধিকার নাই ”

অগ্নির এই উত্তর শুনিয়া রাক্ষস আর কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে বিবেচনা করিয়া দুরন্ত বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভৃগুপত্নীকে লইয়া পলায়নপর হইল। ক্ষোভ লজ্জা ও ভয়ে পুলোমা এক অপূর্ব্ব তেজস্বী নবকুমার প্রসব করিলেন। ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে নিসৃত হইয়াছিলেন তাই ইঁহার নাম হইল চ্যবন। পুলোমার অশ্রুধারায় এক নদী বহিয়া গেল, এই নদী 'বধূসরা" নামে খ্যাতা। রাক্ষস চ্যবনেব দৃষ্টি মাত্রে বিনষ্ট হইল।

মহর্ষি স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়া অগ্নি রাক্ষসের নিকট পুলোমার পরিচয় দিয়াছেন জানিতে পারিলেন ও ক্রোধান্বিত হইয়া 'তুমি অদ্যাবধি সর্ব্বভক্ষ হইবে" অগ্নিকে এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন।

হুতাশন ইহাতে বড়ই বেদনা অনুভব করিলেন। ভৃগুকে কহিলেন, "দেখুন আমি সত্য ভিন্ন মিথ্যা কহি নাই। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা বলে সে যেরূপ পাপী, যথার্থ জানিয়াও যে কোন কথা প্রকাশ না করে সেও সেইরূপ পাপভাগী। অতএব আমাকে শাপ দেওয়া ভাল হয় নাই। আমি সর্ব্বদা ব্রাহ্মণদিগকে মান্য করি, সুতরাং আপনাকে প্রত্যভিশাপ দিলাম না।"

এই বলিয়া ভৃগুশাপগ্রস্ত হুতাশন সমস্ত যজ্ঞ হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। দেবগণ ইহাতে বড়ই বিব্রত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে, ব্রহ্মা তদবধি সকল দ্রব্য অগ্নিসংযোগে শুচি হইবে এই বিধান করিলেন এবং অগ্নিকে পূর্ব্ববৎ যাগ যজ্ঞে দেবভাগ ও আত্মভাগ গ্রহণ করিতে বলিয়া দিলেন।

সেই অবধি অগ্নি সমস্তই ভক্ষণ করেন, তাই তাঁহার অপর নাম হইয়াছে "সর্ব্বভুক্।"

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল।

সর্ব্বানন্দ।

ধূমাবতী।

সর্ব্ব—

পুণা দাদা, একি দৃশ্য
বিধুমিত সর্ব্ব বিশ্ব
    পুড়িয়া সকল কিরে হ'ল ছারখার,
ধূমে অন্ধকার সবি
লুপ্ত গ্রহ চন্দ্র রবি
    একমাত্র ধূমাবতী নিখিল সংসার।—
মাগো একি বেশ   বৃদ্ধা সবিশেষ
    ধূমাকার সব ধূসর মূরতি।
বিশীর্ণ উসর   কঠিন ধূসর
    কদাকার কাকধ্বজ রথে স্থিতি,
মরি মরি ত্রাসে,   কুলোর বাতাসে
    ধুন্ধুকার তারা নিরখি নয়নে,
বিগলিত বেণী   বিলম্বিত স্তনী,
    বিরল দশনা বিকট বদনে,
বুভুক্ষা-কাতর-   কায়া থর থর
    মিটি মিটি আঁখি পশিয়া কোটর,
শৃক্কণি লেহিত,   রসনা স্পন্দিত,
    খাদ্য আহরণে ব্যগ্র নিরন্তর !!
ধূনিয়া জগৎ   করি ধূম্রবৎ
    ধূম্রদেহ তব গড়েছ কিবা,
কামরসহীন   শুষ্ক সুকঠিন
    অশিবা মূরতি ধরিতে শিবা ?

তেজে করি লয়　　　ক্ষিতি জলাশয়
শূন্যেতে উড়াও করি বাষ্পময়,
সর্ব্ব তেজাধার　　　জ্যোতি পারাবার
কোথায় শঙ্কর মঙ্গল আলয় ?
বিষম সন্দেহে　　　দেহ কাম দহে
মন বুদ্ধি চিত্ত করে টলমল,
কোথা শুদ্ধজীব　　　রুদ্ররূপী শিব ?
জঠরে তাহারে পূরেছ কি বল ?
ক্ষুধার তাড়নে　　　যা কিছু ভক্ষণে,
ভাবনা কি তব আপন পর,
বিধবা মূরতি　　　ধরিয়াছ সতি,
পরি' কি মলিনা মলিন অম্বর !
হয়ে বৃদ্ধা অতি,　　　হলে ভীমরথী,
না বুঝিয়া সতি পতি কি' পর,
খাও পতি সুত　　　একি অদভুত,
ধূমাবতি দেহরথি, সম্বর সম্বর ॥

পূর্ণানন্দ—

সর্ব্ব ! দেখিয়াছ যা'রে,
সর্ব্বে বিশ্বে, জীবাধারে,
পরাপরা লীলারসে কত লীলা করে,
এ যে দেখ এও সেই
কেবল প্রভেদ এই
খেলিতেছে লীলাময়ি দেহরথ ধরে !
বাহিরের শত্রুনাশি,
ধূমাবতী রূপে আসি,
শুদ্ধজীবে সঙ্গোপনে ধরিয়া অন্তরে
আকাশে মেঘোঘ সম,
রস-সারে নিরুপম,
মলিনা এ স্থূলতর জীবাবাস গড়ে।

(তাই) নাহি বাল্য, প্রগল্‌ভতা,
স্নেহরসে বৃদ্ধা মাতা,
সংযমেতে পক্ককেশী, দশনবিহীনা,
বিলম্বিত পয়োধরে,
সর্ব্ব ক্ষুধা তৃপ্ত করে,
দেহ কোষে ব'লে তারে দেখায় মলিনা।
কাকধ্বজে নিম্নস্তরে
দেখিতেছ স্থর্পকরে,
কুল কুণ্ডলিনী দিয়ে কুলোর বাতাস,
কুলশীল মানে তোষি
আমিরে যতনে পোষি,
ঊর্দ্ধপথে ল'য়ে চলে ক্ষুদ্র কবি নাশ!
ঐদেখ— ক্ষুদ্রনাশি, রুদ্রঋষি,
ধূংবীজের হুঙ্কারে
ত্রিষ্টুপ্‌ ছন্দে মহানন্দে
ব্যক্ত দেহ সংহারে—

সর্ব্বানন্দ—

কি মহান্‌ মন্ত্রে বাজে রুদ্রের বিষাণ,
ধূঁ ধূঁ রবে ত্রিষ্টুভেতে পূরাইয়া তান
সৃষ্টি স্থিতি লয় বুদ্ধি করিয়া স্তম্ভিত
পরপথে শুদ্ধবোধ করিছে চালিত!
হুঙ্কার কীলকে শক্তি করিয়া ধারণ,
সর্ব্ব ক্ষুদ্র দেহ ভাব করি আহরণ
দয়াবতী ধূমাবতী দেবী মূর্ত্তিমান্‌
বিনাশিয়া রিপুদল করিছে কল্যাণ!
(বিনাশি রিপুত্ব সর্ব্ব করিছে কল্যাণ)
বহির্ভাবে যাহা শত্রু মিত্র করি তা'য়
শুদ্ধচিত্তে আমিরূপে তাহারে দেখায়,
হৃদয় নিকুঞ্জে নিত্য শ্যামকুণ্ডতীরে
পৌর্ণমাসি যোগমায়া লয়ে চলে ধীরে—

তখন—(যত) প্রখর মুখর
দুর্জ্জন নিকর
যেন শারদ ভাস্কর প্রায়,
(হয়ে) প্রবল প্রতাপ
দিতে চাহে তাপ
লাগেনা সে তাপ তার গায়
কৃষ্ণনব জলধর
ধূমাবতী কলেবর
বিস্তারিয়া আতপত্র মাথার উপরে
শীতলিয়া ছায়াদানে
প্রেমামৃত বরষণে
স্নিগ্ধ করি লয় পরপুরুষ গোচরে।

তাই— রথশিরে রস-সার,
বাষ্পরূপে ধ্বজা তার,
দেহ-রথোপরে যথা পদ্মসহস্রার,
কাকধ্বজ রথে চড়ি'
সূর্পযন্ত্র করে করি'
দয়ায় ধরিলে দেহে চরণ তোমার;
ইন্দ্রিয় বাসনা গ্রাহ্য
রসরূপী যা' তা' আজ্য
অশন করিয়া নিজে হয়ে ধূমাকার
ধূম রাত্রি কৃষ্ণপক্ষ
দক্ষিণ অয়নে রক্ষ'
আপন বক্ষেতে ধরি সন্তানে তোমার!
পিতৃযান পথ হ'তে
ল তে সুষুম্না পথে
ধরি' ধূমাবতীমূর্ত্তি পরাৎপরা তারা,
অবয়ব করি চূর্ণ,
অবয়বী ভাবে পূর্ণ
করিয়া সন্তানে করি অহমিকা হারা

দেখা'তে তাহারে তোর
হৃদয়ের ননী-চোর
পরম পুরুষ যিনি অদ্বয় মহান্
'আমি'রূপে জীবে এ' যে
ক্ষেত্রজ্ঞ সে শুদ্ধ নিজে
পর-পুরুষের এই নিত্য প্রতিষ্ঠান !
ইন্দ্রিয় বাসনা মন
যাহা করি আলিঙ্গন,
ভাবিয়া আনন্দকন্দ মজিবারে ধায়
বিধূনন কর তায়,
খোষা ভুষি উড়ে যায়,
দেখাতে সর্ব্বার্থ সার রয়েছে কোথায় ?
(মাখি) ধোঁয়া মলা নিজ অঙ্গে
পর-সঙ্গ পরসঙ্গে
পরাঙ্গ সঙ্গমে জীবে লহ পরপথে
বাহিরে মা ধূমাবতী
হৃদে মূর্ত্তিমতি প্রীতি
পরমা জননী স্নেহে এলি দেহরথে ॥
তবে ভয় কিবা আছে
তুমি যে রয়েছ কাছে,
ধুইতে ধুনিতে নিত্য ধূমাবতী রূপে
যা'ই মাখি কাদা ধূলি,
কোলে লবি ধুয়ে তুলি,
না হয় কাঁদিব ভুলে ডুবে ভ্রমকূপে !
তাতে কিবা যায় আসে
আছি তোর কোলে বসে,
এই শান্তি,—এ বিশ্বাস থাকুক অটল
তোরি'ত স্নেহের হাতে,
নয় দু'ঘা দিবি মাথে,
তাহাও'ত তোরি দেওয়া করুণা কেবল ! !

শ্রীচিন্তাহরণ ঘটক চৌধুরী।

শেষে।

কি নিমিত্ত বল কবহ বিবাদ

কাহাব বিষয় নিয়ে ?

সত্য মিথ্যা চাও বুঝাইতে কারে

তর্ক-যুক্তিজাল দিয়ে ?

সকলই মিথ্যা সকলই ভুল

বলে যে হাঁকিছ ভাই,

সাধনের মন্ত্র অতলে ভাসিয়ে

(কেবল) কথাব কব লড়াই !

বেদান্ত পড়ছ ভালই করছ,

কিন্তু— গীতা পথে চলছ কি ?

শাস্ত্রে চর্চ্চা করিতেছ সত্য—

কিন্তু— কেবল বিদ্যা দেখাতে,

ধর্ম্ম সমন্বয় করিতেছ ভাই

কেবল— সকল ধর্ম্ম হারা'তে।

সাধনা বিহীন ধর্ম্ম-আলোচনা

কোন কাজের নয়,

শাস্ত্র সমাচার হইলে রাখিতে

শাস্ত্রপথে (ই) যেতে হয়।

২

'নূতন কিছু করবার' জন্যই

বেদ বেদান্তের হয় নাই সৃষ্টি,

কথা কাটাকাটি করলেই জেনো

সকলেই পাবনা ক দিব্যদৃষ্টি।

'ভগবান্ করান' বলিলে (ই) শুধু

ভগবানের করান ত হয় না,

বিলাসের জন্য ভগবৎ নাম

ধর্ম্মেতে তাহাও অবশ্য সয় না !

ভুল, ভুল বলিলেই মুখে ওগো
ভুল ত ভাঙ্গিয়া যায় না'ক হায়!
অসার অসার অসার ভেবেই
সার জিনিষটাই হারিয়ে যায়!
সাকার নিরাকার কেন বিচার?
সাকার নিরাকার সবই "সেই",
সাধনা ব্যতীত ভগবৎ-তত্ত্ব
বোঝ না'ক বুঝিতে বুঝাতে নেই।

৩

গুণাতীত সেই গুণাশ্রয়কে
গুণকষে কিহে বোঝা যায়?
বাক্যাতীতকে বাক্যেতে আনিয়া
কার সাধ্য কে বা বুঝায়?
ভুল বলে ভোলায় যাচ্ছ ভুলে
ভাঙ্গ্‌তে ত ভুল পারছ না।
'অসার' 'অসার' বলে সবই
মাত্র সারাৎসারেই পাচ্ছ না।
যতই কর জ্ঞানের গরব,
যতই তোমার অহঙ্কার,
বদ্‌লে যাবে সকল মতই
বাজবে যবে হৃদয়তার।
টান দিয়ে তোমার হৃদি-তারে
হৃদয়নাথ ডাক্‌বে যবে,
যুকতি তোমার ফুরিয়ে যাবে,
বাক্যও তোমার হরে যাবে;
বোঝা'তে কিছুই পারবে না'ক,
আর—বোঝা'তে কিছুই চাইবে না,
হেসে কেঁদেই নাচবে শুধুই
হাসাতে কাঁদাতে যাইবে না।

হৃদয় মাঝে তোমার যেদিন
আসবে ওহে প্রেমের বান
বোঝা তোমার ভেসে যাবেই
প্রাণেশে মিশে যাবেগ প্রাণ।
দেখ্‌বে—'তোমাতে' সত্য "তোমাতে"ই ওহে
'এই' 'সেই' সারাৎসার আছে—
তুমি মরছ 'যারে' খুঁজে খুঁজে,
ফিরছে 'সেই' তোমার পাছে।
ভুল ভেঙ্গেত যাবেই 'তোমার'
কিন্তু 'বুদ্ধি'ও ফিরে পাবেই না,
পাগল মাতাল ফিরবে ছুটে,
সংসার তোমায় চা'বেই না।

শ্রীঅনাদিনাথ রায়।

প্রাণায়াম।

শাস্ত্রকার বা মুনিঋষিগণ যে সকল ধর্ম্মবিধি বা স্বাস্থ্যনীতি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রত্যক্ষ ফল না দেখিলে বা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মুখে পুনরাবৃত্তি না শুনিলে, আমাদের (নব্য-শিক্ষিত যুবকগণের) তাহাতে বিশ্বাস বা নির্ভরতা জন্মে না। পাতঞ্জলাদি দর্শনে যোগ বা প্রাণায়াম সম্বন্ধে যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব দৃষ্ট হয় তাহা ধারণা করিবার শক্তি বা সুযোগ অনেকেরই নাই। পণ্ডিতগণের মুখে ইহার ব্যাখ্যা শুনিলে অথবা সন্ন্যাসী বা পণ্ডিতগণকে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে দেখিলে, তাহা বৃদ্ধ বর্ব্বরগণের (old fools) কার্য্য বলিয়া নব্য যুবকগণ উপহাস করিয়া থাকেন। ইহা বড়ই ক্ষোভের বিষয়। আমাদের ধারণার অতীত বিষয়সমূহকে ভ্রমাত্মক মনে করিয়া লওয়াই মূর্খতা।

ব্রাহ্মণাদি জাতির প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা করিবার নিয়ম আছে। সন্ধ্যা পূজাদিতে প্রাণায়াম করিবার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণ-সন্তানই সন্ধ্যা-পূজাদি নিত্যকর্ম্ম যথাযথরূপে করিয়া থাকেন। এজন্য সমাজে অধুনা শারীরিক

ও মানসিক রোগ ও দৌর্ব্বল্যাদি বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক ফলাদি গণনার মধ্যে না আনিলেও, অন্ততঃ শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রতিদিন পূজা সন্ধ্যাদির সহিত প্রাণায়াম করা আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

প্রাণায়াম করিবার প্রণালী অনেকেই জানেন বা জানেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত প্রণালী পাঠ যথেষ্ট নহে, সদ্‌গুরুর উপদেশ একান্ত প্রয়োজন। প্রাণায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে নিম্নে কিছু বলিবার পূর্ব্বে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কি ভাবে প্রকারান্তরে প্রাণায়াম করিবার উপদেশ করেন তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। জারমেণের অন্তর্গত লাইপজিক (Leipsic) নগরবাসী লুইকুহ্‌নি (Louis kuhne) নামক (সুস্থ ও রোগী ব্যক্তিগণের উপদেষ্টা) মহোদয়ের নিকট কোনও রোগ সম্বন্ধে উপদেশ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অন্যান্য বিষয়ের সহিত প্রতিদিন দুইবেলা ৭।৮ মিনিট প্রাণায়াম করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কেহ ইচ্ছা করিলে ইঁহার স্বহস্তলিখিত পত্র আমাদের নিকট দেখিতে পারেন। ইউষ্টেস্ মাইলস্ (Eustace miles) প্রিভেনসন্ এণ্ড কিউর (Prevention & Cure) নামক গ্রন্থে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য প্রতিদিন বহুবার গভীর ও পূর্ণ শ্বাস প্রশ্বাস (deep and full and rhythmical breathing) করিতে উপদেশ করেন এবং বলেন, যাহারা এরূপ করে তাহাদের রাগ, দ্বেষ, অশান্তি ও অস্থৈর্য্য থাকিতে পারে না, তাহাদের মস্তিষ্কের রক্তসঞ্চালন কার্য্য ইচ্ছামত চলিতে পারে। (He, who can maintain deep and full and rhythmical breathing, can not be angry, can not worry; he regulates the circulation in his brain, he can not lose his self control")। শীতপ্রধান সাইবেরিয়া প্রদেশে প্রহরিগণ রাত্রিকালে শরীর গরম করিবার জন্য এবং অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য গভীর ও পূর্ণ শ্বাস প্রশ্বাস করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য রমণীগণ কেশবৃদ্ধি, রক্ষা ও পোষণের নিমিত্ত সময় সময় গভীর ও পূর্ণ শ্বাস প্রশ্বাস করিয়া থাকেন; ইহাতে মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চালন কার্য্যের সহায়তা হয় ও চুলের পোষণশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা প্রাণায়ামের প্রকারান্তর বলা যাইতে পারে। দুঃখের কথা, পাশ্চাত্য লোকের মুখে প্রাণা-য়ামের উপকারিতার কথা না শুনিলে, উহাতে আমাদের বিশ্বাস ও নির্ভরতা হয় না।

প্রাণায়াম শব্দের অর্থ প্রাণের আয়াম অর্থাৎ বায়ুকে সঙ্কোচন করা (যাহাতে ক্রিয়া না হয় এরূপ করা)। প্রাণায়ামই চিত্ত স্থৈর্য্যের কারণ, বায়ুকে স্থির

রাখাই প্রাণায়াম। পাঃ ২ সূ ৩৪—"প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য"—নাসাবন্ধ্র দ্বারা অন্তরের বায়ু নিঃসারণ বিধারণ অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা চিত্তস্থৈর্য্য সম্পাদন করিবে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে যোগিচিকিৎসা নামাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, "সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতিকে ধীরভাবে পরিচর্য্যা করিলে যেরূপ তাহারা বশ্যতা স্বীকার করে সেইরূপ ধীরে ধীরে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে যোগীদিগেরও প্রাণ বশ্য হইয়া থাকে। মাহুত যেরূপ নিজের ইচ্ছানুসারে হস্তীকে চালাইয়া থাকে, সেইরূপ যোগী প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুকে ইচ্ছামত চালিত করেন। সিংহ পোষ মানিলে মৃগদিগকেই বধ করে, মনুষ্যদিগকে বধ করে না, সেইরূপ প্রাণায়াম দ্বারা স্থিরীকৃত বায়ু মনুষ্যদিগের পাপকেই নষ্ট করে, কিন্তু শরীরকে নষ্ট করে না। পর্ব্বতস্থ মলিন ধাতু (গৃহে আনিয়া তাহাকে) অগ্নিতপ্ত করিলে যেরূপ তাহার মলিনতা দূরীভূত হয় সেইরূপ প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দোষ দূরীভূত হইয়া থাকে।" অগ্নিপুরাণ পাঠে জানা যায় যে, "প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইলে প্রাণবায়ু স্থির হয়, প্রাণবায়ু স্থির হইলে তাহা হইতে অগ্নি বা তেজ উৎপন্ন হয়, এবং এই অগ্নি বা তেজ হইতে জল হয়, এই তিনের সমীকরণে (কেশ হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত) সর্ব্বশরীর পবিত্র বা নীরোগ হইয়া থাকে। প্রাণায়াম দ্বারা শরীর দোষ সকল বিনষ্ট হইয়া শরীর সুস্থ থাকে। যেমন উচ্চগৃহে আরোহণ করিতে হইলে, ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধির অভ্যাস করা উচিত। তাহা না হইলে ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। জলপিপাসু ব্যক্তি যেরূপ ঘটী হইতে অল্প অল্প করিয়া জল পান করিয়া থাকে, সেইরূপ উৎসাহশীল যোগী ধীরে ধীরে বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে যোগীর চঞ্চলতা দূরীভূত হয়, নিষ্ঠুরতা থাকে না, এবং শরীর নীরোগ হয়, তাহার মূত্র ও বিষ্ঠা অল্প পরিমাণে হয়; সুন্দর কান্তি ও চিত্তের প্রসন্নতা এবং সুমধুর স্বর হইয়া থাকে। যে সময়ে প্রাণায়াম-র ব্যক্তিকে (যোগীকে) দেখিয়া জনগণ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয় এবং পরোক্ষে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকে এবং কোন প্রাণীই তাঁহাকে দেখিয়া ভীত হয় না, অতি উগ্র শীত গ্রীষ্ম দ্বারা তাঁহার কোনরূপ পীড়া হয় না এবং তিনি অন্য কাহাকেও দেখিয়া ভীত হন না, সেই সময় তিনি প্রাণায়ামে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন অর্থাৎ যথার্থ প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়াছেন ইহা মনে করিতে হইবে।" 'প্রাণায়াম দ্বারা চিত্ত স্থির (সমাধি) হইলে অণিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি লাভ করা যায়"—পাতঞ্জল দর্শন।

শ্রীহরকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

দিগম্বরী।

কে বলে মা নেংটা মোদের মা যে মোদের দিগম্বরী
বিশ্বরাজের ঘরণী যে তাই ত মা যে বিশ্বেশ্বরী।
দুষ্ট যারা কষ্ট সদা শাণিত কৃপাণ তাহার পানে
শান্ত যে গো ভক্ত যারা পালেন সবে অভয় দানে।
স্বেচ্ছাচারী অসুরদলে সংহারিতে মহেশ-বামা
শক্তিরূপে বিনাশি পাপ উদ্ধারিছে অসিত শ্যামা।
মা যে মোদের শক্তিরূপা মা যে মোদের ভয়ঙ্করী
ভীতিরূপে তনয়েরে তাই মা মোদের শুভঙ্করী।
মায়ের খেলা বুঝতে নারি পাগল ভোলা বিশ্বনাথ
সে ওঙ্কারের ঝঙ্কারেতে নৃত্য করে দিবস রাত।
বিপদে মা রক্ষা করে তাই মা মোদের বিপদ্-তারা
অসৎ পথে লৌহ নিগড় কে আছে আর মায়ের বাড়া।
শক্তি মায়ের ভক্ত ছেলে দেয় পরিচয় শাক্ত বলে
কর্ম্মী তারা তাদেব ডাকে মায়ের পূজাব আসন টলে।
কে বলে মা নেংটা মোদের মা যে মোদের দিগম্বরী,
মা যে মোদের শক্তিরূপা মা যে মোদের ভয়ঙ্করী।

শ্রীকমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাপিয়া।

(১)

কেনরে পাপিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া
উড়িছ ডাকিছ পিয়া পিয়া বলে'
এমন রজনী এমন চাঁদনী
এমন আকাশ অনন্ত কোলে।

এমন মৃদুল　　　　　মলয়-হিল্লোল
　　হেলিয়া দুলিয়া বহিছে হায় ;
শরত-নীরদ　　　　　উড়ানীর মত
　　ঢাকিছে শরীর রজত কায়,
উজ্জ্বল কখন　　　　　কখন মলিন
　　স্বভাবসুন্দর অমৃতময়
জ্বলি' মিটি মিটি　　তারা কোটী কোটী
　　গাইছে প্রকৃতি অনন্ত জয় ।
কি রসে মাতিয়া　　　কাহার লাগিয়া
　　নীরব যামিনী দুপুর কালে
কেনরে পাপিয়া　　　ঘুরিয়া ঘুরিয়া
　　উড়িছ ডাকিছ পিয়া পিয়া বলে ।

(২)

শোনরে পাপিয়া　　কেবা তোর পিয়া
　　এমন উতলা কাহার লাগি ?
আপনায় ভুলি　　　একঘেয়ে খালি
　　পিয়া পিয়া বুলি নিশীথ জাগি ;
শুনেছি উতালা　　　সরলা অবলা
　　পিয়ার কাঁদুনী বিরহ ভরে ;
শুনেছি শিশুর　　　কাঁদনের সুর
　　মা মা বলে' হায় মায়ের তরে ;
শুনেছি উতালা　　পুত্র শোকাকুলা
　　শোকের রোদন মরমবাতী ;
শুনেছি নবীনা　　　বৈধব্য-যন্ত্রণা
　　করুণ বিলাপ সারাটী রাতি ।
সকলেই হায়　　　বেদনা জানায়
　　ভৌতিক কালিমা মাখিয়া গায়,
তোমার মতন　　　বিভোর মগন
　　সরলতাময় দেখিনি হায় ।

(৩)

শুনেছি কবির ভাব সুগভীর
প্রেমের রচনা সরস মনে ;
শুনেছি গাথক ভক্তি রসাত্মক
মালসী কীর্ত্তন ললিত তানে।
শুনেছি আচার্য্য রোদন অধৈর্য্য
উপসনা যবে করেন তিনি।
শুনেছি সাধুর নাম সুমধুর
ভাবেতে মগন প্রেমের ধ্বনি ;
শুনেছি কোরাণ, অনেক পুরাণ,
বাইবেল গীতা বেদান্ত বেদ ;
তোমাতে তাহাতে অধীনের মতে
আছেরে পাপিয়া অনেক ভেদ !
শ্মশান-বৈরাগ্য ভাব উপভোগ্য
উন্মেষ যখন তখনি লয়,
তোমার মতন নিয়ত মগন
তাহাত ভাবী কখনো নয় !

(৪)

শুনেছি পবন গভীর স্বনন
উন্মাদ যখন নিদাঘ কালে ;
শুনেছি সাগর সুগভীর স্বর,
জলদ গর্জ্জন আকাশ-কোলে।
শুনেছি তটিনী কল কল ধ্বনি
যবে পাগলিনী মিলন তরে ;
শুনেছি নির্ঘাত সলিল প্রপাত
ভীম সিংহনাদ যখন ঝরে ;
সকলি উতালা সকলি বেতালা
সকলি ডাকিছে পিয়ার তরে ;
তবুরে পাপিয়া কিসের লাগিয়া
তোমার মতন মনে না ধরে !

শুনিয়ে যখন তাদের গর্জ্জন
ভুলে যাই সব প্রেমের তান ;
পাপিয়া কেনরে তোর পিয়া সুরে
উঠিছে নাচিয়া তৃষিত প্রাণ ?

(৫)

তাহারাও সবে উদ্বেলিত ভাবে
প্রেমের আবেগে গভীর রাগে
বলিছে ডাকিয়া মানবে দেখিয়া
"রহিলে পড়িয়া উত্তর ভাগে,
চলিনু ভাসিয়া যাইব মিসিয়া
ধরেছি যে গান এ গান গেয়ে
থাকিবে তোমরা গা'বে নানাধারা
পুছিবে শরীর উঠিবে নেয়ে'।
জানি না বিজ্ঞান অবোধ অজ্ঞান
পারিনে ধরিতে মহান্ তান,
তাইবে পাপিয়া ও গান শুনিয়া
ভয়বিহ্বলিত আকুল প্রাণ।
পিপাসু হইয়া খুঁজিয়া খুঁজিয়া
বিধির বিধানে হেথায় আস
শুনিনু পাপিয়া তোর পিয়া পিয়া
সাধনার সুর মোহন বাঁশী।

(৬)

শোনরে পাপিয়া এমন অমিয়া
পিয়া পিয়া সুর কোথায় পেলি ?
মোহ তৃষ্ণা ভয় সব হ'ল লয়
গেলরে ঘুচিয়া মনের কালি।
হ'ল জাগরিত গভীর নিদ্রিত
মোহ তন্দ্রাঘোরে অবোধ প্রাণ,
মেলিয়া নয়ন ভাঙ্গিল স্বপন
কাটিল অশান্তি মায়ার ভাণ।

কেরে কৃপা করে' শিখাইল তোরে
এমন মধুর উদাস ভাব
সাধনায় যার শান্তির আধার
অক্ষয় অনন্ত মিলন লাভ।
দেওরে পাপিয়া আমায় বলিয়া
কেবা তোর পিয়া কোথা সে রয়
আমি তোর মত গাইব সতত
তাঁহারি মহিমা অনন্ত ময়।

(৭)

ক্ষুদ্র তুমি তাই ক্ষুদ্র আমি চাই
মহতের ঠাঁই সদাই ভীরু,
তাইরে আমার শিক্ষার দীক্ষার
করিনু পাপিয়া তোমায় গুরু।
থাকে যেন তোর ভাবের লহর
নিয়ত আমার স্মৃতিতে আঁকা
থাকে যেন তোর পিয়া পিয়া সুর
অবিরত মোর শ্রবণে মাথা।
চাহি না মানব কৃপণ স্বভাব
ব্যাধ দ্বিজ ভেদ গুরুর ঠাই,
পরম্পরাগত গুরু নিয়োজিত
ভাবের অভাব দেখিতে পাই।
সব গুরু ছাড়ি তোরে গুরু ধরি
ভাসানু তরণী পিয়ার লাগি।
ভাসিয়া ভাসিয়া সে নাম গাহিয়া
থাকিব দিবস রজনী জাগি।

(৮)

শোনরে পাপিয়া যদি বা ঘুরিয়া
পড়িবে আসিয়া মায়ার কুমে
ধরি পিয়াতান গেও নাম গান
হাল ছেড়ে দিয়ে থেকো না ঘুমে।

যখন ভুলিব তখন ডাকিব
ভুল চুকময় মানব চিত
তুমিরে পাপিয়া বিপথ দেখিয়া
পিয়া পিয়া পিয়া গাই ও গীত।
অই যে প্রপাত জলদ মারুত
সাগর তটিনী প্রলয় গান
বড় আশা মনে উহাদের সনে
তোমার গুরুত্বে মিলাব তান।
শোনরে পাপিয়া পিয়ার লাগিয়া
ভাসায়ু তরণী তোমার বলে
গাও পিয়া পিয়া গাই পিয়া পিয়া
লাগে যেন তরী চরণমূলে।

শ্রীরমেশচন্দ্র খাসনবীশ।

মোক্ষ।

সুখ ও দুঃখ এক একটা মানসিক অবস্থা,—অনুভূতি মাত্র; ইহারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-গোচর নহে, অতএব বস্তু নহে। সুখ দুঃখ কেহ স্পর্শ করিয়া দেখিতে পারে নাই যে সুখে শরীর শীতল হয় বা দুঃখে শরীব পুড়িয়া উঠে। ইহারা "মাত্রা স্পর্শাঃ" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সহিত পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংযোগজনিত। এই সংযোগস্মৃতি মনে মনে নীত হইয়া যে কেমন একটা অভিনব অব্যক্ত আঘাত করে—সেই আঘাতে যে মনের ক্রিয়া হয় তাহাই অনুভূতি। এবং এই অনুভূতি যখন প্রীতিপ্রদ তখনই আমরা বলি সুখ, যখন অতৃপ্তিকর তখনই বলি দুঃখ। অতএব সুখ দুঃখ সৃষ্টি করিতে মনই কর্ত্তা—এবং এই সংযোগই প্রধান উপাদান। যখন স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে এই সংযোগ চিরস্থায়ী নহে। তখন সুনিশ্চিত এ সুখ দুঃখও ক্ষণিক, চিরদিনের নহে।

আমি তোমাদের সুখও চাহি না, দুঃখও চাহি না। উভয়ত্রই চাঞ্চল্য বর্ত্তমান; কেহ চিরদিনের নহে, উভয়ই দুই দিনের। দুইদিনের জিনিষ লইয়া আমি কি করিব? আজ সুখ, কাল দুঃখ—এ আছেই আছে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে

সুখানি চ দুঃখানি চ" এ ধ্রুবসত্য। আজ হাসিলে কাল কাঁদিতেই হইবে। এ উন্মাদ ভাব কি মানুষকে লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারে? যদি বল তোমাকে চিরন্তন সুখ দিব, আমার উত্তর—তোমার সুখ ও দুঃখ উভয়ই বস্তুতঃ দুঃখময়। দুঃখ যে দুঃখময় তার আর প্রমাণ নাই। কিন্তু সুখও দুঃখময়; কেননা, সুখও ভোগ করিতে হয়—যাহার ভোগ আছে তাহাতেই চেষ্টাজনিত ক্লেশ ও শ্রান্তি বোধ আছে। অতি সুখে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে ইহা সকলেই জানে। বিশেষতঃ সুখ দুঃখে এত নিকট সম্বন্ধ যে সুখে থাকিলেও দুঃখের ছায়া পশ্চাতে থাকিয়া স্বচ্ছন্দতার বিঘ্ন জন্মায়। যতই তীব্র আলোকের প্রদীপ হউক না কেন, তাহার নীচে অন্ধকারও তত গাঢ় হইয়া বর্ত্তমান থাকে। তেমনি যত সুখের কোলেই তুমি লালিত হও না কেন—নিকটেই তত ভয়ঙ্কর দুঃখের কবন্ধ তোমার ভীতি উৎপাদন করিবে। যে উচ্চে আছে তাহার মাঝে মাঝে পড়িয়া যাইবার ভয় হওয়া স্বাভাবিক বই কি! তাই বলিতেছিলাম,—আমি তোমাদের সুখও চাই না, দুঃখও চাই না। আমি চাই শান্তি। বলিয়া রাখা ভাল শান্তি ও সুখ এক নহে,—আকাশ পাতাল প্রভেদ। শান্তিতে সুখের চাঞ্চল্য, তার ভোগ, তার ভীতি কিছু নাই—এ সুখ দুঃখের গণ্ডীর বাহিরে একটা চিরশান্ত, স্থির, অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা—সেখানে গাম্ভীর্য্যের পূর্ণাধিকার। সে অবস্থাটা কতকটা বাত্যাহীন অতল সুনীল সমুদ্রের অবিক্ষুব্ধ বক্ষের মত—তাহাতে সুখের মৃদুল পবন-হিল্লোলও নাই—দুঃখের ঘোর বাত্যাজনিত পর্ব্বতপরিমাণ তরঙ্গ সহকারে ভীমগর্জ্জনও নাই। আছে শুদ্ধ একটা বিরাট্ স্তব্ধতা, একটা সুমহতী উদারতা, আর আছে সর্ব্বোপরি একটা অশ্রান্ত পরিতোষ—যাহার জন্য মানব সর্ব্বদা কস্তূরী-মৃগের মত ঘুরিয়া মরে। বাস্তবিক পক্ষে মানব সব সময়েই চায় এই পরিতোষটাকে, কিন্তু না পাইয়া শেষে সম্মুখে সজ্জিত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সুখটাকে এই পরিতোষ ভ্রমে ধরিয়া বসে। কিন্তু এ সুখত তাকে সে পরি-তোষ দিতে পারে না—তাই মানুষ কেবল আসক্তিতে জড়ায়। কিন্তু মানুষ ভুল করে ঐ বাহিরে খুঁজিতে যাইয়া—তাই ত কস্তূরীমৃগের কথা বলিলাম। কস্তূরীমৃগ যেমন নিজের নাভিস্থিত কস্তূরীর সুগন্ধে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত বাহিরটা ছুটিয়া বেড়ায়, কিন্তু নিজের নাভিমূলটা একবারও খুঁজিয়া দেখে না—আমরাও ঠিক চাই সেই আসল পরিতোষটী—তার গুণ আমরা জানি, তাই মুগ্ধ হইয়াছি, তাহার সুরভিও আমরা পাইয়াছি। তাই সমস্ত সংসারপ্রাঙ্গণটা ঘুরিয়া আসিয়াও যখন সেটী পাই না তখন হতাশ হই। সংসারের সুখত এ হতাশ

এ দুঃখ নিবাইতে পারে না—তাই বলিয়াছি এ সুখও দুঃখ।—এ যে বড় ভিতরের হতাশ; বাহ্যিক সুখ কি ইহা নিবাইতে পারে? কিন্তু এ হতাশের দোষ আমাদের অনুসন্ধানের। আমরা সমস্ত বাহিরটা না খুঁজিয়া, একবার নিজের নাভিমূলে মনটা ন্যস্ত করিয়া দেখি না কেন যে সে পরিতোষ-কস্তুরী যে আমারই কাছে? সেটা যে বড় ভিতরের— তাই বড় নিকটের— বাহিরের অনুসন্ধানে ত তাহা মিলিবে না!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সুখ দুঃখের অতীত অবস্থাটীই শান্তি। এখন সেই সুখ-দুঃখাতীত অবস্থাটী কিরূপে সহজ-প্রাপ্য হয়? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগে ও মনের কর্তৃত্বে সুখ-দুঃখরূপ মানসিক ক্ষণিক অবস্থাটী উৎপন্ন হয়। এখন কোন উপায়ে এই সংযোগ ছিন্ন করিতে পারিলেই এ দুইটী অবস্থার হাত এড়াইতে পারা যায়। কিন্তু যেটা যাহার ধর্ম্ম তাহা ঘটিবেই;—কাঁচে আলোক প্রতিফলিত হয় এটা ধর্ম্ম, ইহার অন্যথা নাই—কাজেই ইন্দ্রিয়-বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের গোচর হইলেই সংযোগ হইবে। অতএব সংযোগের হাত এড়ান যায় না। কিন্তু মনে রাখা কর্ত্তব্য সংযোগেই সুখ দুঃখের জ্ঞান জন্মে না—অনুভূতি চাই—এ অনুভূতি মন-সাপেক্ষ। মনটা ত আমারই, অতএব অনুভূতিও আমার অধীন। এখন আমার মনটাকে যদি আমি আমার উপর প্রভুত্ব করিতে না দেই, আমার ইচ্ছা মত যদি ইহাকে ভাবিতে বাধ্য করি, তোমরা যাহাকে সুখ দুঃখ বল যদি ইহাকে সেগুলার অনুভব করিতেই না দেই; তবেই ত আমি সুখ-দুঃখ--অতীত, শান্তি-প্রাপ্ত, সেই পরম পরিতুষ্ট পুরুষ, আমি যাহার জন্য ঘুরি, তাহা পাইলাম?

এখানে হয়ত আমাকে কেহ প্রশ্ন করিবেন—অনুভব করিতে দিবে না? অনুভবই ত মনের ধর্ম্ম। এই না বলিলে যাহা ধর্ম্ম তাহার অন্যথা নাই। মনের চিন্তা ও অনুভব ব্যতীত অস্তিত্ব কোথায়? মনকে সুখদুঃখ অনুভব না করিতে দেওয়ার অর্থ মনকে জগতের কথা ভাবিতে না দেওয়া, কারণ জগতিক সর্ব্ব অনুভূতিই এই পঞ্চেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় বিষয়ের সংযোগের পরিণাম। প্রত্যেক অনুভূতিই সুখদুঃখময়। মনকে জগতের অনুভূতিতে রহিত করা আর মনকে রহিত করা অতএব একই কথা। মনকে তুমি তাহা হইলে রহিত করিয়া মানবকে শান্তি দিবে অর্থাৎ মানুষকে মারিয়া তাহার শান্তি বিধান করিবে? পাগল!

পাগলের উত্তর এই—মনকে ত আমি অনুভবহীন করিতে চাহি না—যাহা সকল হইতে গরীয়ান্, সকল হইতে মহিমময়, সকল বস্তু অপেক্ষা তৃপ্তিপ্রদ,

যাহার অবিরাম অনুভব, মহাশান্ত যিনি, তাঁহার চিন্তায়, তাঁহার অনুভবে সেই অতীন্দ্রিয় বিষয়ে আমি মনটাকে ঊর্দ্ধে নিযুক্ত করিয়া রাখিতে চাই। একবার সম্পূর্ণ তৃপ্তির অনুভূতির স্বাদ পাইলে আর কি মন ক্ষণিক, সুখদুঃখচঞ্চলতা মাখা, জড়াশ্রিত, পাপমলিন অনুভূতির জন্য নীচে নামিয়া আসিতে চাহিবে ?

আমি অজ্ঞ, তোমাদের দর্শন প্রভৃতি আমি জানি না, জানিয়া আমার প্রয়োজনও নাই,—কারণ দর্শনের যুক্তি অনেক সময় শুদ্ধ বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করে। আমার বিশ্বাস মোক্ষের অর্থ যদি মোচন হয় তবে এই সুখ-দুঃখের শৃঙ্খল মোচনই বাস্তবিক মোক্ষ। কিন্তু জাগতিক ইন্দ্রিয়বিষয়ের অনুভূতি রহিত না করিলে সুখ দুঃখের হাত এড়ান যায় না—তাই মনকে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ে নিযুক্ত করিতে হয়। মন সেই ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের অপূর্ব্ব অনুভূতিতে মাতিয়া যায়, আর এ ইন্দ্রিয়বিষয়ের নীচ অনুভূতি তাহার মনে থাকে না—সে তন্ময় হইয়া সেই অতীন্দ্রিয় পরমাত্মাকেই ভাবিতে থাকে। তেলাপোকা যেমন কাঁচপোকাকে ভাবিতে ভাবিতেই নিজে তেলাপোকা হইয়া যায়। তেমনি এই জীবাত্মা সেই পরমাত্মাকে ভাবিতে ভাবিতে পরমাত্মত্ব লাভ করে। তখনই বাস্তবিক আত্মা সুখদুঃখ মুক্ত—তখনই বাস্তবিক মোক্ষ। তাহা হইলে এক কথায় বলিতে গেলে সেই পরম স্থির, অতি অবিক্ষুব্ধ, অনন্ত গম্ভীর সমুদ্রস্বরূপ, ষড়ৈশ্বর্য্যময়, সর্ব্বগুণোপেত, সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়, জ্যোতিম্ময় পরমেশ্বর পরমাত্মাতে যে আত্মার ঐকান্তিক স্থিরতা ও তাহার সহিত যে তন্ময় অন্তহীন মৌন মহাচুম্বন—তাহাই মোক্ষ। এই তন্ময়তার গভীরতার তারতম্যানুসারে সারূপ্য সাযুজ্যাদি চতুর্ব্বিধ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

বেল পাক্‌লে কাকের কি ?

১ম। কি বল চাটুজ্যে, লোকটা বেশ বল্লে নয় ? শাস্ত্রজ্ঞানও খুব।

২য়। তা আর একবার বলতে। অগাধ পাণ্ডিত্য। দেখলেনা একধার থেকে বেদ বেদান্ত ন্যায়শাস্ত্রগুলো নিয়ে যেন ত্রস্তন্যস্ত করতে লাগলো। একবারে পটাপট শাস্ত্র থেকে শোলোক সব আওড়াতে লাগল! কি মুখস্থই করেছে বাবা!

১ম। লোকটা বলে কেমন, এই মনে কর ব্রহ্মজ্ঞান কত সহজে হতে পারে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ধূর্ত্ত কপট বামুনগুলো সকলের চোখে ধূলো দিয়ে অমন সহজ সুন্দর ব্রহ্মজ্ঞানটাকে একেবারে বেমালুম সকলকে ফাঁকি দিয়ে এযাবৎ নিজেদের দখলে রেখেছিল !

২য়। তা বটেই তো হে, এত সোজা ব্যাপারকে কি কটমটই করে রেখেছে। তার পর ঐ আশোলার ঠ্যাঙের মত সংস্কৃত অক্ষরগুলো কি ভয়ঙ্কর, পড়তে গেলেই চোখে ঝাপসা ঠ্যাকে। এ সব ভারী অন্যায়। তবে কিন্তু কি জান ভায়া ঐ পূর্ব্ব পুরুষকে অমন করে গাল দেওয়া -সেটা কিন্তু কেমন কেমন লাগে।

১ম। বাঃ গাল দেবেনা ? বেটাদের ভণ্ডানি দেখ দেখি ! বলে কিনা শুদ্দুরদের বেদ পড়তে নাই। যাই হ'ক লোকটার বক্তৃতা শুনে আমাদের বিদ্যাবাগীশমশায় পর্য্যন্ত থ হয়ে গেলেন ! বড় বড় পণ্ডিত সব উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কারও মুখ থেকে একটি কথাও বেরুল না। আচ্ছা চাটুজ্যে, মোটের উপর বক্তামহাশয় কি বল্লেন বল দেখি ! বোঝালেন যা, তাতো অতি উত্তম। কিন্তু ব্যাপারটা কি বুঝালেন বল ত হে ?

২য়। আরে ব্যাপারটা আর কি বুঝতে পার নি ? ব্যাপারটা এই যে হচ্ছে কিনা সে এক চমৎকার ব্যাপার !

১ম। হ্যাঁ হে, আমিও তো তাই বলছি। বোঝালে যা তা অতি চমৎকার। কিন্তু ওই যে কি শেষ পর্য্যন্ত হলো, তার নাম কি -সেটা বেশ স্মরণ করতে পারচি না।

২য়। আরে ছাই একবার স্মরণ করেই দেখনা। লোকটা অতক্ষণ ধরে বল্লে—আর বল্লেও বেশ। জলের মত বুঝিয়ে গেল ! বলনা সেই যে সংস্কৃত শ্লোকটা কি বল্লে ?

১ম। তুমিও তো বুঝেছ ভাই, তুমিই বলনা কি বল্লে !

২য়। হুঁ, যা বল্লে তার ভাবটা বুঝা গ্যাছে।—কিন্তু আজকাল কি আর আমাদের সে বয়স আছে যে, সব কথা মনে থাকবে ! তবে বল্লে কি জান ? তুমি, আমি, রামকান্ত সবাই নাকি ব্রহ্ম।

১ম। তাই ত হে আমরা সবাই ব্রহ্ম নাকি ?

২য়। বাঃ রামকান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্ম, আর আমরা ব্রহ্ম নাই—তাও কি কখন হয়। আমরা সবাই ব্রহ্ম বলে ব্রহ্ম—একেবারে ব্রহ্মদত্তি বল্লেই হয়।

নিকটে বসেছিল গদাধর চক্রবর্ত্তী। লোকটা বড় রাগী। কিন্তু একটু বোধ-শোধ আছে। কেউ কেউ বলে, তিনি নাকি প্রত্যহ গীতা ভাগবত পাঠ করেন। পূজাটা আসাটাও রোজ করেন। সে বল্লে—এই দেখ আমার খুল্লতাত, তিনি বলতেন ব্রহ্ম তাঁর কাপড়ের খুঁটে। অথচ যথানিয়মে লোকের সর্ব্বস্বহরণ, মিথ্যাভাষণ, পরনিন্দা, পরগ্লানি করে বেড়াতেন। কিছু কারও মন্দ না করে জলগ্রহণ করেছেন এ অপবাদ তাঁকে কেউ দিতে পারত না। একদিন আমাদের চাকর সদা বাগদী তাঁকে মুখের উপর বলেছিল "ঠাকুর তুমি তো মুখেই বেহ্ম বেহ্ম কর, দুনিয়া শুদ্দ‚কে বেহ্ম বানাও, কিন্তু কিসে কার মন্দ হয়, এই অনবরত করে বেড়াও কেন? পরের জিনিষটি ঘরে তুলতে পারলে ছাড় না।" শুনে গম্ভীর ভাবে আমার খুড়ো বল্লেন "সদা, ব্রহ্মজ্ঞান হ'লেই এই রকম হয়, তখন কি আর আপন পর ভেদ থাকেরে ব্যাটা?" শুনে সদা বল্লে "ভাল যুক্তি ঠাকুর, তবে তুমি যে ঐ বলদ যোড়াটি দেড়শো টাকা দিয়ে কিনে এনেছ, তোমার গোয়াল থেকে খুলে নিয়ে গিয়ে আমার চাষে লাগিয়ে দেব—কেমন? তোমার তো আপন পর মিটে গ্যাচে?" ঠাকুরের শুনে তো চক্ষু স্থির। বল্লেন "সদা, অমন কর্ম্ম করিসনে। ব্রহ্মস্বের প্রতি নজর করলে তোর ভাল হ'বে না।" সদা তখনই খুড়োমহাশয়ের মুখের সামনে স্পষ্ট বলে দিল—"ঠাকুর, ও জ্ঞানটা বুঝি তবে কেবল তোমারই সুবিধের জন্য। হা হরি! এই বুঝি আপনার বেহ্মজ্ঞান? বেহ্মজ্ঞান মাথায় থাকুন। এর চেয়ে অজ্ঞান থাকা ঢের ভাল।" এই সব মিথ্যাবাদী নকল ব্রহ্মবাদিগণের সংখ্যা ক্রমশঃ এত বেড়ে উঠচে যে আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হয়েছে। তোমাদের যেমন বুদ্ধি আর ঐ অকালপক্ক বক্তা ব্রহ্মবাদীটিরও তেমনি! কি স্পর্দ্ধা, দু'এক ঘণ্টা বক্তৃতা করে আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়ে দিবেন। আরে আমার কপাল। যা হাজার হাজার বছর আলোচনা করেও মুনিঋষিরা লাভ করতে পারতেন না, তপস্যা করতে করতে হাড় পাঁজরা বেরিয়ে যেত, গায়ে বল্মীকের বাসা হয়ে যেত, শরীরটা হতে মাংস খসে খসে পড়তো—অস্থি মাত্র সার হ'ত, তাঁরাও বলতেন এই ব্রহ্মজ্ঞান অতি গুপ্ত তত্ত্ব, আর আমরা কিনা দু'টা শ্লোক আউড়েই তা ঠিক করে ফেলবো! ব্রহ্মজ্ঞান এত সহজ হলে আর ভাবনা ছিল না, তা হলে নিমে ডোম আর মাথায় করে হাটে তেঁতুল বিক্রী না করে একটা টোল খুলে বসত, আর তোমাদের মত অকাল কুষ্মাণ্ডদের দলগুলি গুটি গুটি তার টোলে ভর্ত্তি হয়ে যেত! বামুনদের যে গাল পাড়চ তাঁদের মতন শক্তি, তাঁদের মত তপস্যা,

তাঁদের মতন ত্যাগ, তাঁদের মতন বিষয়ে নিস্পৃহা—এখন একটা ব্রহ্মজ্ঞানীরও আছে বলতে পার ? কেবল চোখে চশমা দিয়ে পক্ষের মত বসে থাকলেই হয় না বা তত্ত্বসভার সভ্য হলেই হয় না। তাঁদের বিদ্যা বুদ্ধি মান কিছুরই অভাব ছিল না, তবে কেন সব ত্যাগ করে ভিক্ষা সার করলেন ? রাজ্য, রাজপ্রাসাদ ছেড়ে দিয়ে বনে জঙ্গলে কুটীর বেঁধে বসে থাকতেন, তাঁদের বলের কিছু কম ছিল ? যখনই রাজারা প্রজার প্রতি অত্যাচার করতো যখন পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের সম্ভাবনা হ'ত তখনই তাঁরা সহরের মধ্যে এসে, রাজা প্রজা মন্ত্রী সকলকেই সদুপদেশ দিয়ে মঙ্গলকার্য্যে দীক্ষিত করতেন। তাঁদের বারেক ভ্রূকুটী ভঙ্গিতে রাজা মহারাজার সিংহাসন টলে যেত, একথা গুলো গল্পেও কি শোন নি ? এমন নিঃস্বার্থ, পরোপকারব্রতী, সর্ব্বজীবের মঙ্গলাকাঙ্খী কুশাগ্রবুদ্ধি স্থির প্রতিভাসম্পন্ন তাঁদের মত মানব,—পৃথিবীতলে কখনও কোন কালে কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করেছে কি ? আর তাঁরাই হ'ল ভণ্ড কপট, আর তোমরা হ'লে পরম সাধু! বাহাদুরী তোমাদের দুর্ব্বুদ্ধির! শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর! খুব লোককে জ্ঞানী ঠাউরেচ। তোমাদের একটা হিতকথা বলি শুন। ও সব বকামি ছেড়ে দেও, ওসব বকামি করার চেয়ে সেই কয় দণ্ড মনুসংহিতার পাতা ক'খানা উল্টালে কাজ দেখে! দু'দণ্ড "রাম রাম" করলে আরও অধিক লাভ হয়। অন্ততঃ মাথা থেকে ভূত নামে। রোগীদের সেবা শুশ্রূষা করলে তো কথাই নাই, এমন কি নিজের বাগানে মাটি কোপালেও বেশী জগতের কাজ করা হয়। কিন্তু এসব কাজে ব্রহ্মবাগীশদের এগুতে বড় দেখা যায় না! এই দেখ যা তোমরা শুনে এসেছ, তার এক কড়াও তোমরা বুঝতে পার নাই। তোমরা না হয় মুখ্যু, কিন্তু যাঁরা পণ্ডিত তাঁরাও ছাই বুঝেন। কেবল পুঁথির লেখা কথা কয়টা আউড়ে যান বৈত নয় ? জ্ঞান তাঁদেরও নাই। পুঁথির জ্ঞান চাই না বলছি না—তা তো চাই, তবে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হ'লে অনেক তপস্যা চাই। বহু তপস্যা সাধ্য সাধনার ফলে, পূর্ব্বসঞ্চিত বহুপুণ্য থাকিলে আপনাআপনি তবে মানুষের সে জ্ঞান জন্মায়—এ কেউ শিখিয়ে দিতে পারে না। একটা মোটামুটি কথা বলি। যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী অপরের জিনিষ লইতে কিছুমাত্র যেমন তাঁর সঙ্কোচ হয় না, সেইরূপ একজন সর্ব্বস্ব যদি তাঁর চক্ষের সামনে দিয়ে নিয়ে যায়, তবুও তিনি নিষেধ করতে যাবেন না। তাঁর পর আপনার বোধ নাই, শরীরে অভিমান নাই। মারলেও কিছু বলেন না, গাল দিলেও হাসেন,

প্রশংসা করলেও হাসেন। সে সব লোকের এক সৃষ্টি ছাড়া স্বভাব হয়, লোকে পাগল মনে করে।

১ম। বল কি চক্রবর্ত্তী মশায়, ব্রহ্মজ্ঞান এই রকম নাকি? আমি বলি ও কথাগুলো ভাল। আরে আমার রামকালী যে কেবলই ব্রহ্ম ব্রহ্ম করে রাস্তায় ঘাটে বক্তৃতা করে বেড়ায়। তাইত এসব বড় গোলমেলে ব্যাপার দেখছি, এখন মোটামুটি তার সংসার জ্ঞানটা থাকলে যে আমি বাঁচি!

চক্রবর্ত্তী। ওহে বোসজা এই আমিও ওই কথাই বলছিলাম। ওসব বেফয়দা বকর বকর করে লাভ কি? তবে কি জান ভায়া, ও কথাগুলোর খুব চটক আছে। অসীম, অনন্ত, অব্যক্ত, ব্রহ্মানন্দ, বিশ্বপ্রেম, সবাই সমান, বামুনে চণ্ডালে ভেদ নেই, বাঘ কুকুর শেয়াল সবই একবর্ণ-নির্ব্বিশেষে বিয়ে আর স্ত্রী-স্বাধীনতা—এইরূপ গোটাকতক বাঁধাবুলি তাঁরা বলে বেড়ান। তাতে লোককে খুব ভুলানো যায়। একবারে টবাং করে এক লাফে সপ্ত স্বর্গের চুড়োয় উঠানও যায়। কিন্তু বাবা, অত লাফালা ফতে কাজ কি? পাটা ভেঙে গেলে তখন এই মর্ত্ত্য লোকেও টেকা যে দায় হবে। নিজেরা তো পশু, মনের বেগকে থামাবার শক্তি নেই, অথচ স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য লাফালাফি কত! যদি সত্য সত্যই ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য তোমাদের চিত্ত আকুল হয়ে থাকে, সে বেশ ভাল কথা, এবং সুখের কথা। তাই ওদিকের বিদ্যার হাতে খড়ি হ'ক, চিত্তকে শ্রদ্ধালু কর, শরীর ও মনের খেয়াল গুলোকে একটু থামিয়ে রাখ। ভাব-টাবগুলোকে একটু সাত্ত্বিক করবার চেষ্টা কর। খাওয়া দাওয়া পরণ-পরিচ্ছদ একটু যাতে কম রাজসিক হয় তাহা কর। সকল দিক্ দিয়ে সংযম-সাধনা করবার জন্য একটু প্রযত্ন কর। দিনান্তে দু'একবার সন্ধ্যাটা আসটা করতে অভ্যাস কর। পাঁচ জন সাধু সজ্জনের কাছে ঘোর। অভিমান দর্পগুলো একটু কমে যাক। চিত্তকে বিচারবান্ করে আন। তবে তো ক্রমশঃ সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন হইতে পারবে। তারপর না ভাব বিশুদ্ধ হয়ে বৈরাগ্য ফুটবে। তখন মৈত্রী করুণা মুদিতা উপেক্ষা—আপনা আপনিই তোমার স্বভাবের মধ্যে বাসা বেঁধে বসবে। তখন ব্রহ্ম কি, ব্রহ্ম জ্ঞান কি, এসমস্ত বড় বড় কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার হবে। তখন উত্তর দেওয়াও সুবিধা হবে বুঝাতে পারাও সহজ হবে। এখন বকে বকে মুখ ভোঁতা হয়ে গেলেও কেউ বোঝাতে পারবে না। আর তা বুঝবার জন্য মাথা ঘামিয়ে মাথা ফেটে মরলেও, ব্রহ্মজ্ঞানের একটি আঁকড়িরও রেখাপাত তোমার মস্তিষ্কের মধ্যে হবে না। এ একবারে

অত্যন্ত নিশ্চিত। শুধু শুধু বকে বকে মুখ তেঁতো করে ফল কি ? স্বপ্নে যত ধনই কুড়িয়ে পাও, বাস্তব জগতে তা যেমন কোন কাজে লাগে না, তদ্রূপ মুখের ব্রহ্মজ্ঞানে সত্য জ্ঞান কিছু মাত্র ফুটে উঠে না। বরং অহঙ্কার বাড়ে, স্পর্দ্ধা বাড়ে, ভবিষ্যতের পথ আরও তমসাচ্ছন্ন হয়, অবরুদ্ধ হয়। ভায়া হে, আমাদের এযে মাথা এতে একটা চুলের বিচার হয় না তা আর ব্রহ্ম সাকার না নিরাকার—জীবে ব্রহ্মে ভেদ না অভেদ, বুঝবে কি করে বল ?

২য়। আচ্ছা মশায়, যাতে ভবিষ্যৎও মাটি না হয়, আর একটু ভগবানের দিকে এগুনো যায়, এমনতর কিছু উপায় নাই কি ?

চক্রবর্ত্তী। তা আছে বই কি? আছে বলেই তো এই সব বাজে কথায় সময় নষ্ট করতে বারণ করেছিলাম। নিজের ঘরের পানে তাকাও, উটের মত মুখ করে আকাশের দিকে তাকালে কি হবে? গুরু-সেবা, গুরু-শুশ্রূষা কর। মা বাপকে ভক্তি কর। নিজেদের ঘরে শিলা বিগ্রহ আছে, শ্রদ্ধা করে পূজা কর। লোকের দুঃখে দুঃখী হও। বেশী মিথ্যা কথা-গুলো বলো না, লোককে প্রবঞ্চনা করো না। ছাই ভস্ম যা-তা কতকগুলো কুকুর শিয়ালের মত খেও না। পিতৃ-পিতামহদের উদকপিণ্ডগুলো বন্ধ করে দিও না, বাহ্যেন্দ্রিয়গুলোকে একটু সামলে নিয়ে চলো। এই করেতো চলো; তারপর নারায়ণের ইচ্ছায় যা হবার তা হবে।

২য়। তবে আজ থেকেই সন্ধ্যা আরম্ভ করে দিব নাকি চক্রবর্ত্তী মশায়-? টিক রাখা, একাদশী করা, এসবও ভাল না কি ?

১ম। বাঃ তোমার যেমন কাণ্ড, জপ টপ করবে কর, ওসব কুসংস্কারগুলোকে আবার জড়ান কেন ?

চকবর্ত্তী। কি বল্‌লে, এ সব কুসংস্কার ? তবে সুসংস্কার কোন্‌গুলি শুনি? কেবল বেহ্ম বেহ্ম করে বেড়ালেই কিছু হবে না। এ গুলিও ব্রহ্মজ্ঞানেরই সাধন। সব ধীরে ধীরে হবে। সৎকর্ম্মের দ্বারা শুভ বাসনা হবে, সাত্ত্বিকতা বাড়বে। তখন পাপেচ্ছা চলে যাবে। তারপর ও ঢের পরে ওসব কথা। এখন ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু বলা, বাজে কথা কওয়া মাত্র, কোন ফল নাই।

১ম। কি বলেন মশায়! এসব গুরুগম্ভীর সত্য সনাতন ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনাকে আপনি বাজে আলোচনা বলতে সাহস করেন ?

চক্রবর্ত্তী। সাহস করি বই কি। বাপুহে, বেল পাক্‌লে কাকের কি ? ব্রহ্মজ্ঞান যত বড়ই হ'ক, যত পবিত্রই হ'ক, তাতে তোমার আমার কি ?

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

সাড়া।

নীল আকাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কালো কালো রাঙ্গা রাঙ্গা,
আজকে কেন জলদরাশি এমনি ছড়ান,
সাদা মেঘের কোলে বসি নেচে নেচে হাসছে শশী,
জোছনা ছড়ায় চারিদিকে ভুবন ভুলান।
ফুলের মত ফুটছে তারা কিসের যেন দিচ্ছে সাড়া
আস্‌ছে তাদের পিছনে কে জগৎ জীয়ান,
ইঙ্গিতে তার থাকি থাকি ধর্‌ছে বুলি বনের পাখী.
বইছে বাতাস দুলি দুলি গন্ধ মাখান।
'আস্‌ছে বুঝি বিশ্বপাতা' সোণায় মাখা বকুল পাতা
দিচ্ছে বলে ডেকে ডেকে—হৃদয় জাগান,
ঢেউয়ের রাশি বক্ষে তুলি যাচ্ছে ছুটি নদীগুলি
কল কল গেয়ে গেয়ে শ্রবণ জুড়ান।
সেই দিকে চাই নয়ন দুটি আজকে যেন উঠছে ফুটি
নূতন আলোয় বিশ্ব যেন নূতন সাজান,
কার যেন আজ প্রেমতরঙ্গে নাচছে ধরা রঙ্গে ভঙ্গে
অঙ্গে তাহার নূতনতর পুলক জড়ান।
(আজ) কূল ছাপিয়ে জল উঠেছে প্রেমের নদীর বাণ ছুটেছে
(তাই) বইছে আমার পাহাড় প্রাণে প্রেমের যমুনা,
রইলাম তোমার নামে পড়ে সারা জীবন এমনি করে
দেখি দয়াল পাই কি না পাই তোমার করুণা।

শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

মধুর রস।

অদ্য আমরা যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি সে বিষয়টী অতীব নিগূঢ় এবং গুরুতর এবং চিত্তের যে অবস্থায় উহা উপলব্ধি হইতে পারে সেই "প্রসন্নোজ্জ্বলচিত্ততা" আমাদের নাই, তবে এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের

পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদিতে যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন ও শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধে ব্রজবধূবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে ক্রীড়ারহস্য বর্ণিত আছে, তাহার সহিত সাধকভক্তগণের অনুভূতির সহিত তুলনা করিয়া যতটুকু বুঝিতে পারা যায় তাহাই এ স্থলে আলোচ্য।

ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবানের অবতার একথা আবালবৃদ্ধ বনিতা একরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় সে কথা মানুন বা না মানুন, বাংলার ঘরে ঘরে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ, মন্দিরে মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর হইতেই যে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ ভারতবর্ষে পূজিত হইতেছেন সে কথার আলোচনা পূর্ব্ব প্রবন্ধে করা হইয়াছে। কৃষ্ণলীলা প্রধান—শ্রীমৎ ভাগবতগ্রন্থ যে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রচারিত সে বিষয়ের আলোচনাও করা হইয়াছে। সুতরাং ঋষিসমাজে এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজা পরীক্ষিতের সভামধ্যে এই কৃষ্ণলীলা যে পঠিত হইয়াছিল ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কিংবা মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের স্বকপোলকল্পিত নূতন মত নহে, বরঞ্চ ইহা যে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত ইহাই মনে হয়।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেমের ধর্ম্ম, ভালবাসাই ইহার প্রাণ। ভক্তি যোগের মূলমন্ত্র ভালবাসা। এই ভালবাসা দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও কান্তা প্রভৃতি ভাবে ভক্ত-হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া তাহাকে তাহার বাঞ্ছনীয় বস্তুর সহিত মিলাইয়া দেয়। এই ভাবসকলের মধ্যে কান্তাভাবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহাদের পদাবলী, নাটক ও এক কথায় প্রায় সকল স্থলেই এই ভাবের প্রাবল্য দেখা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্য এই অভিনব ভাবে আমোদিত। জয়দেব, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ এই উজ্জ্বল রসের সাধক—তাঁহাদের বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণলীলা অপূর্ব্ব স্বর্গীয় বীণার ঝঙ্কার। বিদ্যাপতির "আত্মসমর্পণ", চণ্ডীদাসের "সহজ ভজন" যেমন সুললিত ও কোমল, তেমনি হৃদয়স্পর্শী এবং ভাবের উদ্দীপক।

শ্রীমদ্‌ভাগবতকে অবলম্বন করিয়া ইঁহারা রাধাকৃষ্ণের যে সম্ভোগলীলা বর্ণনা করিয়াছেন তাহার অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় যে অতীব উচ্চ, জগতের জীব তাহা বুঝিতে পারিল না। ভাগবতে যাহা নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, প্রাকৃতবুদ্ধির নিকট তাহাই মদনমহোৎব। ভাগবতের "আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ" "সাক্ষাৎ মন্মথ

মন্মথ" "আত্মারামোপ্যারীরমৎ" ইহা কেহ বুঝিতে চাহিল না, কেবল শ্রীরাধার পরকীয়াত্ব টুকু লইয়া আপনার মনের মত একটা যাহা কিছু কল্পনা করিয়া ফেলিল। তাই সেই লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণ জগতের জীবকে বুঝাইবার জন্য শ্রীমতী রাধার ভাব ও কান্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে প্রকট হইলেন। শ্রীমতীর রাধার প্রেম যে কিরূপ ত্যাগমূলক এবং সেই প্রেমের মাধুর্য্যই বা কিরূপ এবং শ্রীরাধা যে কিরূপ আকর্ষণ অনুভব করেন এই উদ্দেশ্য লইয়াই নবদ্বীপে অবতীর্ণ। সাধক বলরাম দাস শ্রীকৃষ্ণকে বক্তা ও শ্রীমতীকে শ্রোতারূপে কল্পনা করিয়া মহাপ্রভুর আগমনের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—

কৈছন তুয়া প্রেম কৈছন মাধুরিমা
কৈছন সুখে তুঁহু ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন ব্রজে নহিল পূরণ—
কি কহব না পাইয়া ওর॥
ভাবিয়া দেখিনু মনে তোঁহার স্বরূপ বিনে
এ সুখ আস্বাদ কভু নয়॥
তুয়া ভাব কান্তি ধরি তুয়া প্রেম গুরু করি
নদীয়াতে করব উদয়॥

তিনি আসিয়া আপনি আপনার স্বরূপ না জানাইলে কে সেই প্রেমের যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিত। ব্রজের সেই নির্ম্মল রাগ কিরূপে প্রাকৃত জীবের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইত। ব্রজগোপিকাদিগের প্রেম যে বাস্তব সত্য, কবিকল্পনা নহে; মহাপ্রভু তাহা আপনার জীবনে বিশেষ ভাবে দেখাইয়াছেন—তাই বাসু ঘোষ গাহিলেন—

যদি গৌরাঙ্গ নহিত, তবে কি হইতো কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা, প্রেমরস সীমা জগতে জানাত কে।
মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী ভাবের ভকতি শকতি হইত কার॥

সেই মহাপ্রভুর শক্তিসঞ্চারে রূপ গোস্বামীর গ্রন্থ প্রণয়ন, তাঁহার কৃপাগুণেই সনাতনের দিব্য দৃষ্টি, তাঁহার অনুগ্রহবলেই রামানন্দের হৃদয়োচ্ছ্বাস। সেই সকল মহাত্মারাই এ বিষয়ের পথপ্রদর্শক, তাঁহাদের চরণে প্রণাম করিয়া এ বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

ভক্তিতত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া আচার্য্যগণ ভক্তকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—১। বৈধী ভক্তি, ২। রাগানুগা। ভগবৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত উগ্র লালসা নাই, কেবল শাস্ত্রশাসনে ভগবানের অর্চ্চনার নাম বৈধী-ভক্তি। বাঞ্ছিত পদার্থে স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতার নাম রাগ, সেই রাগময়ী ভক্তির নাম রাগাত্মিকা—ব্রজবাসীদিগের এই রাগাত্মিকার অনুসারিণী যে ভক্তি তাহাই রাগানুগা বলিয়া পরিচিত।

দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন॥

এই শান্ত সখ্যাদির বিভাগ হইয়া পড়িয়াছে। চরিতামৃতকার বলেন—

ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চপরকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর॥
বাৎসল্যরতি মধুররতি পঞ্চবিভেদ
রতিভেদে কৃষ্ণ ভক্তিরস পঞ্চ ভেদ॥

এই পাঁচ প্রকার বিভেদের মধ্যে মধুর রসের শ্রেষ্ঠতা দেখান হইয়াছে। মহা-প্রভু রূপ গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন যে, যেমন আকাশ কেবল শব্দতন্মাত্রক, বায়ু শব্দ ও স্পর্শতন্মাত্রক, তেজঃ—স্পর্শ শব্দ ও রূপতন্মাত্রক, অপ্—শব্দ স্পর্শ রূপ ও রসতন্মাত্রক ও ক্ষিতি—শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধতন্মাত্রক, তেমতি মধুর রসে আত্মসমর্পণের সহিত বাৎসল্যের মমতা, সখ্যের বিশ্বাস, দাস্যের সেবা এবং শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা পূর্ণরূপে বর্ত্তমান।

আকাশাদির গুণ যেন পরপর ভূতে।
দুই এক গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ॥—চৈতন্য চরিতামৃত।

মধুর রসের আলোচনার সময় আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে রাগাত্মিকা ভক্তির স্থান শ্রীবৃন্দাবন।—

শ্রীমদ্ বৃন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দরসাশ্রয়ং
ভূমিশ্চিন্তামণি স্তোয়ং অমৃতং রসপূরিতং॥—পদ্মপুরাণ॥

সেখানে সবই আনন্দময় ভূমি চিন্তামণি, বৃক্ষ লতা সবই আনন্দের অভিব্যক্তি, সেখানকার সবই চিদানন্দময়। নরোত্তম ঠাকুরের বর্ণনা—"বৃন্দাবন রম্যস্থান—দিব্য চিন্তামণিধাম।" বৃন্দাবনের লীলা-বিলাস কেবল আনন্দের ব্যঞ্জনা। কেন

আপনি আপনার মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া আপনাকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া একটী মধুরলীলার অভিনয় হইল। একাত্মা ও অবিচ্ছেদ তত্ত্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলারস আস্বাদনের জন্য দুই ভাবে প্রকট হইলেন, বৃন্দাবনে যাহা কিছু তাহা সেই আনন্দ ভাবের অভিব্যক্তি—

যোগমায়া চিচ্ছক্তি শুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি
তার শক্তি লোক দেখাইতে।
এই রূপ রতন ভক্ত জনের গূঢ় ধন
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥

কথাটা একটু বুঝা যাউক—যেমন নাটককার একটী ভাব অবলম্বনে একখানি নাটক প্রণয়ন করিয়া আনন্দ আস্বাদন ও দর্শকমণ্ডলীর আনন্দ বিধান করিবার জন্য নীচের কতকগুলি লোককে ভিন্ন ভিন্ন সাজে সাজাইয়া সেই ভাবের অভিনয় করিয়া থাকেন—এ লীলাও ঠিক তদ্রূপ—একটু অনুধাবন করিয়া বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক—আপনারা সকলেই জানেন যে সনকাদি মুনিগণ এক সময়ে বৈকুণ্ঠনাথকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, বৈকুণ্ঠের দ্বারিদ্বয় তাহাতে বাধা প্রদান করেন; মুনিগণ তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, তোমরা অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ কর। পরিশেষে শ্রীভগবান্ বলিলেন, "তোমাদের ভয় নাই, ভালই হইবে; আমি ব্রহ্মশাপ নিবারণ করিতে পারি কিন্তু তাহাতে আমার ইচ্ছা নাই, এই যে অভিশাপ ইহা আমার অভিপ্রায় মতই হইয়াছে।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন তাহার ভাবার্থ এইরূপ—'যদ্যপি সনকাদি ঋষিগণের ক্রোধোদ্রেক সম্ভব নহে এবং ভগবৎ-পার্ষদদিগের তাঁহাদিগর প্রতিকূলতা সম্ভব নহে এবং ভগবানের ভক্ত উপেক্ষা হইতে পারে না এবং বৈকুণ্ঠগতদিগের পুনর্জ্জন্ম হয় না, তথাপি ভগবানের সিসৃক্ষার ন্যায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইল—যাঁহারা পার্ষদ তাঁহারা প্রায় তুল্যবল, তাই এই যুদ্ধইচ্ছা সফল করিবার জন্য তাঁহার এই দ্বারী দুই জনের হৃদয়ে ব্রাহ্মণ-নিবারণে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া এবং সনকাদির মনে ক্রোধ উদ্দীপন করাইয়া সেই শাপচ্ছলে পার্ষদদ্বয়কে প্রতিপক্ষ করিয়া যুদ্ধকৌতুক সম্পাদনের ব্যবস্থা করিলেন।" এ শত্রুত তাঁহার সাজান শত্রু—বৃন্দাবনলীলাও তদ্রূপ তাঁহার আনন্দ আস্বাদনের জন্য—তাই বৃন্দাবন-লীলার সবটাই আনন্দ, যা কিছু প্রতিকূল বোধ হয় সে কেবল আনন্দরস পুষ্টির জন্য। এই আনন্দলীলা প্রকাশের ইচ্ছাই "যোগমায়া"—সেই অভিন্না যোগমায়া আপনার হৃদয়নাথের আনন্দস্বরূপটী

অভিব্যক্ত করিবার জন্য বৃন্দাবনলীলারূপ অপূর্ব্ব একখানি চিত্রপট অঙ্কিত করিলেন। সে চিত্রের প্রত্যেক তুলিকাস্পর্শই সেই চিত্র অঙ্কনের জন্য। ভেদার্থক অহংকারের মোহে সেই প্রত্যেক তুলিকাস্পর্শের প্রতি লক্ষ্য করিলে ভেদই দেখা যাইবে, সে চিত্র হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে না। কেবল "রাগ"-চক্ষুতে, প্রেমদৃষ্টিতে সে লীলা দেখিবার চেষ্টা করিলে সে মাধুর্য্য অনুভব হইতে পারে।

কেবল যে রাগমার্গে ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে
তারে কৃষ্ণ মাধুর্য্য সুলভ।

(চৈতন্য-চরিতামৃত)।

ভগবান্ যে ঐশ্বর্য্যময় ইহা উপনিষদ্ আদিতে বিশেষভাবে উল্লিখিত থাকিলেও তাঁহার মাধুর্য্যভাবের ইঙ্গিত বহুস্থলে দেখা যায়। "আনন্দ তাঁহার স্বরূপ" "রসো বৈ সঃ" সংযদবাম (refuge of Love) বামনী (Lord of love) এ সব ত উপনিষদেরই কথা। কিন্তু বৃন্দাবনের স্বাভাবিক ভাবের দিকে যদি সমালোচকের ছুরিকা-হস্তে না গিয়া একটু অন্তর্দৃষ্টিতে ভালবাসার চক্ষে দেখিতে পারি, তাহা হইলে ইহার মধ্যে একটু বিশেষত্ব দেখিতে পাইব। তিনি বিধাতা, শাস্তা, জগতের নিয়ন্তা, সাধুর পরিত্রাতা, ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, সৃষ্টি স্থিতি-লয়কর্ত্তা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যভাবে তিনি বহুদূরে—এভাবে যেন একটু ভীতির সঞ্চার হয়—এ বিরাট্‌রূপের সম্মুখে যাইতে বড় ভয় হয়—নিজের কর্ম্ম স্মরণে বিলাপ করিতে হয়—ইহাতে কাতরতা থাকে, প্রার্থনা থাকে, কিন্তু দাবিদাওয়া নাই—প্রেমের বৃন্দাবনে সেই অদ্বয়তত্ত্ব—যিনি বাহিরে কালরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া মৃত্যু প্রদান করিতেছেন, আবার পুরুষরূপে হৃদয়ে অবস্থান করিয়া অমৃতময় বংশীনিনাদ করিতেছেন—তিনিই মায়ামনুষ্য সাজিয়া উদ্ধব অক্রূরের প্রভু, নন্দ যশোদার পুত্র, শ্রীদাম সুদামের সখা এবং গোপিকাগণের নাগর হয়েন। তখন উদ্ধব দাবী করিয়া বলিলেন—

নাহং তবাঙ্ঘ্রিকমলং ক্ষণার্দ্ধমপি কেশব।
ত্যক্তুং সমুৎসহে নাথ স্বধাম নয় মামপি॥

"এ হ'ল দাবির কথা—আমাকে নিয়ে যেতেই হবে আমি তোমার চরণকমল ছেড়ে ক্ষণমাত্রও থাকতে পারব না।" সখ্যভাবে দাবী আরও বেশী—ঐশ্বর্য্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই—ছোট বড় এ জ্ঞানের কণিকাও হৃদয়ে স্থান পায় না—রাখালবালকগণ কত জোড়ের সহিত বলিতেছেন—

মায়ের সোহাগে ভুলিয়া রহিলি, মায়ের কোলে ভাই।
মোরা কেন তোর দুয়ারে ঠারিব, নাই কি মোদের মাই।
হারেরে কানাই লকলেই মোরা আভিরী গোপছাবাল।
তুই ত নহিস ঠাকুরের পুত তবে কাহে ঠাকুরাল।
কত মারিধরি কাঁধে তোর চড়ি, * ঝুটফল দেই মুখে।
তাই কিবে কানু যাবি না গোঠেকে, রহিবি মায়ের বুকে॥

সখ্য প্রেমের কি মধুরভাব, অন্তরে সারল্যের ছবি—হৃদয়ে কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ—এক তিল না দেখিয়া থাকা যায় না—তাই রাখালবালকের উক্তি—

কিবা গুণ জ্ঞান জান সদাই অন্তরে টান
এক তিল না দেখিলে মরি।
(গোবিন্দদাস)

সখ্য প্রেমের পরিপাকে বাৎসল্য—বাৎসল্যরসে সেই জগৎপাতা আপনাকে আপনি কত ছোট কত আপনার করিয়াছেন - যাঁহার বাহির অন্তর ভেদ নাই, যিনি জগন্নাথ সেই পরব্রহ্ম বৃন্দাবনলীলায় যশোদা কর্তৃক উদূখলে বন্ধন, † সেই দামোদর যাঁহার উপরে ব্রহ্মাণ্ড তিনি ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য নবনীমাখন খাওয়ার জন্য নৃত্য করিতেছেন -

পায়ের উপর পানী থুয়ে নাচরে যাদুধন।
উদর পূরে খেতে দিব নবনী মাখন॥

আর কি দেখিতে চাহেন—সেই গোপালের রজ্জুবন্ধন, বামপদধূলী মস্তকে প্রদান, যাঁহার বিপদ্ভঞ্জন নামে জগতের স্তূপীকৃত বাধা বিদূরীত হয়, তিনি নন্দের বাধা বহিতেছেন। * এইবার রসরাজ মধুর রস—

সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।

রাধাকৃষ্ণের এই লীলামাধুর্য্যে পূর্ণ প্রকটতা শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত রাসলীলার প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ সভায় স্পষ্টই বলিয়াছেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েৎ যঃ।

---

* উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ॥ ১০।১৮।২৪

† তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।
গোপীকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা॥ ১০।৯।১২

ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্যকামং
হৃদ্রোগমাশু প্রহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

শ্রদ্ধা থাকা চাই—শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ—ব্যক্তভাবের অবসান যে লক্ষ্য বস্তুতে হইতে পারে এই বিশ্বাস। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে বাহিরে দেখিলে স্বরূপতত্ত্ব ফুটিবে না। যে ব্রজবধূর ক্রীড়া শুনিলে হৃদ্রোগ কাম অপসারিত হইবে, বুদ্ধি এক অদ্বয়াভিমুখী হইবে, সে লীলা শুনিবার শ্রবণ, অবশ্য আমাদের এই শ্রবণ-বিবর হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্। কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে এই লীলার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া কি এক ঘৃণিত স্রোত আজ কাল বৈষ্ণব-সমাজকে ছাইয়া ফেলিতেছে! তাঁহারা যেন ভুলিয়া যাইতেছেন যে তাঁহাদের উপাস্য শ্রীরাধারমণ ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি অতীত তুরীয়তত্ত্ব—বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সেই পরব্রহ্ম কেবল মানবদিগের মঙ্গলের জন্য জগতে অবতীর্ণ।* সেই "আত্মার আত্মা" "আমির আমি" আত্মারমণকারী শ্রীকৃষ্ণ জগৎ-হিতার্থ দেহীর ন্যায় প্রতীয়মান হন। রাধাকৃষ্ণের সে লীলায় প্রাকৃত কামের স্থান নাই—ঐ লীলা সম্পূর্ণ ভিতরের, বাহিরের অঙ্কিত করা কেবল আমাদের বুদ্ধির অনুকূল করিবার জন্য—ভাগবতে যে রাসলীলায় ব্রহ্মাদি প্রাকৃত দেবগণেরও প্রবেশাধিকার নাই, সেই লীলা যে ব্যক্তভাবের সংস্কার লইয়া প্রাকৃত দেহে অনুকরণ, ইহা অপেক্ষা মূর্খতা আর কি হইতে পারে। কামক্রীড়ার সাম্যে সেই তত্ত্ব বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে, কারণ প্রাকৃত জীবের অন্যভাবে বুঝিবার সাধ্য নাই—তাই

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম॥

নর-নারীর মিলনে কখন বিরহ কখন মিলন প্রভৃতি দশাসমূহ আছে তদ্দ্বারা যেমন ঘন একত্ব রসটী আরও ঘনতর হইয়া অভিব্যক্ত হয় ইহাও তদ্রূপ। কাম-বিলাসের বিশেষাবস্থায় নায়কনায়িকা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান থাকিলেও নিমেষ-মাত্র অবস্থান্তরভাণ তখন "তুমি আমি" এই ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া মনোবৃত্তি ও বিবিধ চেষ্টার বিলোপ হইয়া যায়—এই অবস্থান্তরভাণ রজ্জুসর্পবৎ বিবর্ত্ত। এই কামবিলাসের সাদৃশ্য দ্বারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত-বুদ্ধিতে ফুটিতে পারে। সে লীলার নায়ক—

* নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্য প্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ ১০।২০।১৩

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

আর যে লীলার নায়িকা—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা॥

সেই লীলার অনুকরণ প্রাকৃত জীবে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তাই ভাগবত বলিলেন—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাৎ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষং॥

১০।৩৩.৩০।

তাই সমাজের উক্তি—

শিব নৃত্য দেখি ভূতগণ নাচে, দেবের সমাজে হাস।
পারিজাত পুষ্প দেবের দুর্ল্লভ কপিতে কয়য়ে বাস॥
তেমনি নিত্য সহজ শুনিয়া সামান্য দেহেতে যজে।
না জানে মরম করে আচরণ কেবল রৌরবে মজে॥

যাহাই হউক, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই মধুর রস কিরূপভাবে আলোচনা করিয়াছেন দেখা যাউক। তাঁহারা ইহার সূক্ষ্মতত্ত্ব এরূপভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এ বিষয়ে আর কিছু অবশিষ্ট আছে এরূপ বোধ হয় না। এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট বর্ণনা "উজ্জ্বল নীলমণি"তে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই মধুর রস—

স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান।

স্বকীয়া নায়িকা পাণিগ্রহণ-বিধি অনুসারে বিবাহিতা পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী পাতিব্রত্য হইতে অবিচলিতা, আর যাহারা অনুরাগে আত্মসমর্পণ করিয়াছে ইহলোক ও পরলোক অপেক্ষা করে না এবং ধর্ম্ম অনুসারে গৃহীত হয় নাই—তাহারাই পরকীয়া। *

গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই ঔপপত্য লীলা পরমেশ্বরত্ব নিবন্ধন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন যে ঔপপত্য লীলা রসশাস্ত্রে অতিশয় ঘৃণিত সত্য কিন্তু সে হেয়ত্ব প্রাকৃত নায়ক সম্বন্ধে। রসনির্য্যাস আস্বাদনার্থ অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে নহে।

---

* স্বকীয় পরকীয়াশ্চ দ্বিধা তাঃ পারকীর্ত্তিতাঃ॥
করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ॥
পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়া কথিতা ইহ॥
রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণঃ।
ধর্ম্মেণ স্বীকৃতা যস্ত পরকীয়া ভবন্তি তাঃ॥

লঘুত্বমত্র যৎপ্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত নায়কে।
ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাসস্বাদার্থমবতারিণি ॥

হেয়ত্বের কারণও প্রধানতঃ অধর্ম্মের স্পর্শ—শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সে সম্ভাবনা নাই—কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্,ধর্ম্মাধর্ম্মের নিয়মত্ব বা বিধিনিষেধ তাঁহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না, কারণ—যত কিছু যবিশেষ ও ব্যক্ত ভাব লইয়া তাঁহার কাছে এস না কেন সকলি বিশেষ হইয়া—বোধশূন্য বাহ্যভাবের লেশশূন্য হইয়া তাঁহাতেই মিশিয়া যায়। তিনি অবতীর্ণ হইলে অগ্নির ন্যায় নিজ গুণে অসুরদিগের দ্বেষ্যবুদ্ধি, রমণীগণের বালকবুদ্ধি, গোপীদিগের জারবুদ্ধি পবিষ্কৃত করিয়া তাহাতেই আপনাকে দেখাইয়া দেন—সেই অনাবৃত ব্রহ্মের আগমনে সাধনার অবসর থাকে না, তাই কি ব্রজগোপী, কি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নী, কি অঘাসুর কি বালঘ্নী পূতনা —সকলেই তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইল। আমরা ভুলিয়া যাই যে যোগমায়া অবলম্বনে রাসলীলা। এই উপপতিভাব যোগমায়ার ক্ষেত্রে, মায়ার ক্ষেত্রে নহে, বিদ্যার ক্ষেত্রে—অবিদ্যার ক্ষেত্রে নহে ;—

মো বিষয়ে গোপীগণের উপপতি ভাবে।
যোগমায়া করিবেন আপন প্রভাবে॥
আমিহ না জানি তাহা না জানে গোপীগণ
দুঁহার রূপগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন॥

তাই যাহারা ভেদের মধ্যে গণ্ডীর মধ্যে ত্রিগুণের মধ্যে, যাঁহারা কামপরতন্ত্র শাস্ত্রবিধির অধীন, বিধি উল্লঙ্ঘনে তাহাদের অধর্ম্ম স্পর্শ হয় ; সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের তাহা সম্ভব নহে। এইরূপ যুক্তি দ্বারা হেয়ত্বের খণ্ডন করা হইয়াছে।

পরকীয়াত্ব বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ। "পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস"। কিন্তু তাহার সহিত ইহাও জানিতে হইবে—

ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।

এইটীই বড় বিপদের কথা। "সাধ যায় বৈরাগী হতে, মহোৎসব দিতে প্রাণ ফাটে॥" অবশ্য উপপতিভাব ও পতিভাবের মধ্যে—পতিভাব সহজ আয়াস-শূন্য ও সাপেক্ষ—উপপতিভাব দারুণ কণ্টকপূর্ণ ত্যাগাপেক্ষী, লোকলাজ বেদধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হয়। তবে উপপতিভাবের অনুরাগ অধিকতর বেগবান্ ও প্রবল।

ভাগবতের দশমস্কন্ধে এই পরকীয়া রস—এবং সাধকমণ্ডলীও সেই ভাবের আশ্রয় করিয়া ভগবানের সঙ্গলাভের চেষ্টা করিয়াছেন। লীলা শুক বিল্বমঙ্গল—"শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্বং" বলিয়া ভগবানের স্তব করিয়াছেন।

ব্রজলীলা অতিশয় দুর্ব্বোধ্য লীলা, সেলীলার পরিশিষ্ট নবদ্বীপে মহাপ্রভুর লীলা—সেখানে নায়ক-নায়িকার ভিতরে অভিব্যক্ত লীলা সম্বন্ধে বুঝিবার গোলযোগ হইতে পারে। এ লীলায় সে বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত। দেখা যাক্—রাধাভাবে বিভোর মহাপ্রভু সে অকৈতব প্রেম কিরূপে আস্বাদ এবং উপদেশ করিয়াছেন।

মহাপ্রভুও পরকীয়া ভাবের শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস—রূপ ও সনাতনের পত্রের উত্তরে তিনি একটী শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন। শ্লোকটী এই—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্ত নব সঙ্গরসায়নং॥

পর-পুরুষাসক্ত কামিনীর মন নবসঙ্গসুখলাভে আকৃষ্ট কিন্তু গৃহকর্ম্ম না করিলে নয় সুতরাং বাহিরে গৃহকর্ম্ম করিতেছে বটে, মন কিন্তু সেই পরপুরুষের নিকট পড়িয়া আছে। দেখা যাক আমাদের সহিত ইহার সাদৃশ্য কোথায়? আমাদিগকে আমরা একবার গোপনে জিজ্ঞাসা করি যে আমরা সমষ্টিরূপে বিষয়ের সহিত পরিণীত কি না—সংসারের ষোল আনা আজ্ঞানুবর্ত্তী কি না—সংসার আমাদিগকে অন্তঃপুরমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে কি না? উত্তর নিশ্চয়ই পাইবেন—'হঁা"। জাতি কুল প্রভৃতি শাখাপ্রশাখা এমন ভাবে আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে আমরা তাহাতেই একেবারে নিমগ্ন—এই স্বামি-সহবাসে রসবোধ আছে—এ রস পরিত্যাগ করিয়া চিত্ত অন্যদিকে লইতে গেলে—সে অন্যটী আরও রসময় হওয়া চাই—তাঁহার রসময়ত্ব দেখাইবার জন্যই ব্রজলীলা—ঘরের বাহির হইতে গেলে ঘরের সুখ চেয়ে আর একটা কিছু থাকা চাই। নতুবা "সর্ব্বস্ব" ছারিতে মন হইবে কেন—মোহনবংশী না শুনিলে বিশিষ্টতার প্রাচীর ছাড়িয়া উন্মাদিনী হইয়া বনপথে যাইবে কেন? কাজেই এই বিষয়াসক্ত জীবের যদি শ্রীকৃষ্ণে চিত্তের গতি ফিরে তাহারই নাম পরকীয়া। সুতরাং ভগবৎ উপাসনায় যাহাদের লোভ উৎপত্তি হইয়াছে অথচ বিষয়ের সহিত আবদ্ধ তাহাদের পথে এই পরকীয় বস্তুটী স্বাভাবিক ও সমীচীন।

ব্রজলীলার সম্বন্ধে গুরুমুখে একটী কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা আপনাদের নিকট না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না, তিনি বলিয়াছিলেন যে স্বামী হ্যাটকোট পড়িয়া বাড়ী ফিরিলে যে স্ত্রী স্বামিরূপে না দেখিয়া সাবেহরূপে দেখেন তিনি স্বামীকে ভালবাসেন না, রূপকে ভালবাসেন—কিন্তু স্ত্রীরূপে স্বামী নিষ্ঠাসিদ্ধ

হইলে তাহাদের এ ভ্রান্তি আর থাকে না। যখন মহাপুরুষগণের হস্ত পদাদি বা চিত্র আলেখ্যাদি স্পর্শ হইতে শিষ্য-হৃদয়ে গুরুচিত্তের বোধ সংক্রামিত হয়, তখন জারবুদ্ধিতে আগত গোপীগণ পূর্ণপ্রকট ব্রহ্মের যে কোন অঙ্গ স্পর্শ করিলে তাহাদের কি আর অন্য বুদ্ধি থাকিতে পারে। কাত্যায়নীদেবীর প্রসাদে চিত্তের পরাভাব সিদ্ধ হওয়ার পর যে রাসলীলা সেই লীলায় আমরা কামরূপ দেখি—এ আমাদের জন্মজন্মান্তরীণ সংস্কারের অভিব্যক্তি। উহার ভিতরে যে তত্ত্বের ইঙ্গিত আছে—যে লীলারসে ভক্ত ডুবিয়া থাকিতে চায়, সে ত অন্তরতম স্থলে অবস্থিত পরম পুরুষেরই। পরম পুরুষের বলিয়াই উহা ব্রহ্মার সৃষ্ট কাল পরিমাণাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ একদিন রাধাভাবে বিভোর হইয়া একটী প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার শ্লোক পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন * যতীন্দ্রপ্রবর মহাপ্রভুর মুখে আদিরসের একটী কবিতা শুনিয়া অনেকে ঠিক তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই। মহাপ্রভু তখন রাধাভাবে বহুদিন বিরহের পর কুরুক্ষেত্রে প্রাণ বঁধুয়ার সহিত মিলিত হইয়াছেন কিন্তু প্রাণ চায় বৃন্দাবনের সেই আনন্দকুঞ্জ—তাই চরিতামৃতে—

অবশেষে রাধাকৃষ্ণে কৈল নিবেদন।
সেই তুমি সেই আমি সে নবসঙ্গম॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে উদয় করাহ আপন চরণ॥

এ শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিলেন প্রভুর মর্ম্ম সহচর স্বরূপ দামোদর, আর বুঝিলেন প্রভুর একান্ত অনুগত কৃপাপাত্র শ্রীরূপ গোস্বামী; তাই তিনি সেই ভাবের অনুরূপ একটী শ্লোক লিখিয়া চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিলেন। মহাপ্রভু তাহাই দেখিয়া বলিলেন—

মোর অন্তর-বার্ত্তা প্রভু জানিল কেমনে।
স্বরূপ কহে জানি কৃপা করিয়াছ আপনে॥

যঃ কৌমারহরঃ স এব বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিতমালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র ব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবা রোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

রামানন্দ রায়ের সহিত আলোচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এই পরকীয়া রসই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের চরম সিদ্ধান্ত—ব্রজলীলার বিভিন্ন ভাব-সমুদ্রে মহাপ্রভু সদাই নিমগ্ন—তাই ইহা নিঃশংসয় বলা যাইতে পারে যে ইহাই আমাদের মহাপ্রভুর অভিমত ও আচরিত ভজনপদ্ধতি। পরবর্ত্তী গোস্বামিগণেরও ইহাই সিদ্ধান্ত—

পরকীয়া লীলা এই রূপের সম্মত।
নিশ্চয় করিয়া ভাই কহিলাম তত্ত্ব॥—বর্ণানন্দ।

এই স্বকীয়া ও পরকীয়া তত্ত্ব লইয়া আচার্য্যপ্রভুর পৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের সহিত একটী বিচার হইয়া তাহাতেও চরমসিদ্ধান্ত—

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা॥

মহাপ্রভুর জীবনের মধ্য ও অন্ত্যলীলা বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, কখনও তাঁহার প্রাণবঁধুর অমৃতায়মান স্পর্শসুখাতিশয্যে দেহাদির চৈতন্য একেবারে বিলুপ্ত, যেন সেই অপ্রাকৃত মদনজনয়িতার চিন্ময়বক্ষে নিদ্রামগ্ন—কখনও আবার সুষুপ্তির সেই গাঢ় স্তব্ধতা, মহাভাবের সান্দ্রনীরবতা যেন ভাঙ্গিয়া গেল—ধ্যানভঙ্গে অর্দ্ধবাহ্যদশায় স্বপ্নাতুর নেত্রপল্লব ঈষৎ উন্মীলন করিয়া আবার ধ্যানসাম্য প্রাপ্ত হইল। কখনও আবার সেই সমাধিকালীন সেই আনন্দস্রোত ভাঙ্গিয়া গেল—চিত্তের সে তন্ময়তা খণ্ডিত হইল—বাহ্যচেতনা ধীরে ধীরে দেহের কূলে আঘাত করিয়া যোগারূঢ় চিত্তের সে অপূর্ব্ব স্বপ্ন ভাঙ্গাইয়া দিল। তখন বহির্বাহ্য অবস্থায় বলিয়া উঠিলেন—

প্রভু কহে কৃষ্ণ মুঞি এখনি পাইনু।
আপনার দুর্দ্দৈবে পুন হারাইনু॥

ঐ দেখুন মহাপ্রভুর যেন ইন্দ্রিয়গণের রূপাদি বিষয়জমত্ততা নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, দেহের চেতনা বিলুপ্ত হইয়া ধ্যানসহায়ে দেখিতেছেন—

মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন।
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয় দ্রব হইয়া সেই রসে আবিষ্ট হইল, সেই চিরসুন্দরের প্রেমময় সহাস্য বদনকমল দেখিতে দেখিতে অনুরাগের প্রবল স্রোতে বাহিরের ইন্দ্রিয়জাল লুপ্ত হইল, সেই আজানুলম্বিত সুবর্ণবর্ণ হেমাঙ্গ কঙ্করভূমিতে লুটাইতে লাগিল—জ্ঞান এই মাত্র হইল—যে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইয়াছি—যে চিত্ত ঐ নর্ত্তনে

তন্ময় ছিল দেখিতে দেখিতে সেই তন্ময়তার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন অনির্দ্দেশ্য প্রেমময়ধামে একাঙ্গীকৃত হইয়া পড়িল—তখন সংসারের কোলাহল, দরদী সঙ্গিগণের সভয় কাতরধ্বনি শ্রুতির ভিতর দিয়া চিত্তের বাহ্যস্তরে আঘাত করিলেও নিগূঢ় মর্ম্মগহনে প্রবেশ করিতে পারিল না। প্রবর্ত্ত, সাধক, সিদ্ধ এই তিন অবস্থাতেই যে সব চিহ্ন পাওয়া যাইবে মহাপ্রভু নিজের জীবনে তাহা বেশ করিয়া দেখাইয়াছেন—কিছুই অবশেষ রাখেন নাই—তবে

অন্তরঙ্গ লইয়া করে রস আস্বাদন।
বহিরঙ্গ লইয়া করে নাম সংকীর্ত্তন॥

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ ও রসানন্দ রায়ের নাটক তিনি কেবল অন্তরঙ্গ কয়েকজন ভক্তের সহিত আলোচনা করিতেন। সাধারণ ভক্ত সে আলোচনায় যোগদান করিতে পারিত না—এমন পরকীয়া রসের কথা উঠিলে অনেক সময়ে তিনি সংগোপন করিতেন—কারণ

অধিকারী নহে ধর্ম্ম চাহে আচরিতে।
অচিরে বিনাশ পায় হাসিতে খেলিতে॥

এ পর্য্যন্ত না হয় বুঝা গেল যে শ্রীভগবান্ আনন্দলীলার অভিনয়ার্থ প্রকটরূপে ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন। সে প্রকটকালের সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা হয় না। এখন কিরূপে সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনকে উপাসনা করিতে হইবে। কি ভাবে তাঁহার উপাসনা করা যাইতে পারে, এ বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তানুকূল তত্ত্বের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহার দুইটী স্তর আছে। একটী বহিরঙ্গ, অপরটী অন্তরঙ্গ—

বাহ্য অন্তর ইহার দ্বিবিধ সাধন।
বাহ্য সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন॥
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥*

রাগানুগাভক্তি মনোধর্ম্ম বলিয়া এই ভক্তিতে স্মরণেরই প্রাধান্য। আমাদের যথাবস্থিত দেহই সাধকদেহ—এদেহে শ্রবণ কীর্ত্তনই কর্ত্তব্য আর সিদ্ধদেহ অর্থে "অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্ট তৎসেবোপযোগী" অর্থাৎ জীবের স্বরূপ দেহ বা "ক্ষেত্রজ্ঞ অহং" যাহাকে মহাপ্রভু তটস্থা শক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সেই দেহই আমার জাগ্রত স্বপ্নের অতীত সুষুপ্তিতে 'আনন্দভুক" দেহ। ইহা সাধনলভ্য। স্বভাবতঃ চঞ্চল মনের বহির্ম্মুখী ভাবনিচয়কে সম্যক্‌ভাবে একমুখী করিয়া দেহাভিমান

বিসর্জ্জন দিয়া সম্যক্‌ভাবে অনুস্মরণ করিতে পারিলে সেই সিদ্ধদেহে শ্রীকৃষ্ণসেবা সম্ভব। সেই সিদ্ধদেহ—স্বতঃই সিদ্ধ, তাহার সহিত ভগবানের নিত্য সম্বন্ধই রহিয়াছে—কিন্তু সে অহং এমন ভাবে ঢাকা পড়িয়া আছে যে কিছুতেই তাহার স্বরূপ প্রকাশ হইতেছে না। অর্থাৎ যতদিন জীব "জীব" থাকিবে, যতক্ষণ জীব প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বদর্শনে "অহম্ ইদমেব ইত্যভিমানেন" (শ্রীধর) আপনাকে ভেদবিশিষ্টতার বশে দেখিতে চায়, ততক্ষণ তাঁহার সিদ্ধদেহ আবৃত ইহাই বলিতে হয়। এই স্বরূপদেহ ভিন্ন অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান না ছাড়িয়া প্রকৃতি না হইয়া কেলিকুঞ্জে প্রবেশাধিকার নাই। গোপীভাব ভিন্ন অন্যভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দনের চরণসমীপে যাওয়া যায় না। কবিরাজ গোস্বামী কি বলেন শুনুন—

সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখীভাবে যেই তারে করে অনুগতি॥
রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবায় সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥

এস ভাই, একবার প্রাণে প্রাণে সেই বিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামা অন্যাভিলাষিতা-শূন্যা ব্রজবধূগণের পবিত্র ব্রজের-রজে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া গোপীগণ-সেবিত পন্থার অনুগমন করি—এ রজঃ ত সামান্য ধূলিকণা নয়—

এত ধূলা নয় ধূলা নয় গোপীর পদরেণু
এই রেণু মেখেছিল নন্দের বেটা কানু।

এই সাধনার মূলমন্ত্র অনুস্মরণ—গোপীদিগের সেই ত্যাগ সেই আত্মসমর্পণ সেই দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খল ছেদন মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে আপনি তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হইবে। যেমন গহ্বরমধ্যগত কীটবিশেষ পেশস্কৃত নামক ভ্রমর বিশেষের নিরন্তর পরিচিন্তায় পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া তৎসারূপ্য প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ চিন্তা দ্বারা সেই আবৃত স্বরূপতার আবরণ মুক্ত হওয়ায় বিচিত্রতা কি আছে?

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

"নাস্তী সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

৫ম ভাগ।] চৈত্র, ১৩২৩। [১২শ সংখ্যা।

কেন চাই ?

তোমাকে যে ভালবাসি তোমাকে যে চাহি এত,
স্তব স্তুতি করি তোমা কত মোর মনোমত।
সে কি শুধু তোষামোদ ধন রত্ন লভিবার,
তাহা ছাড়া অন্য কিছু নহে কি তা নহে আর?
তোমাকে যে ভালবাসা শুধু কি সকাম ছার?
তব সনে যে সম্বন্ধ শুধু সে কি পাইবার?
তোমার আমার মাঝে আছে একটি গুরুতর,
সুখ-সম্মিলন-আশা প্রণয় নিবিড়তর।
তাহাতেই ভোর আমি, মুখে যাহা চাই কেন
তোমাতেই সব আশা হয় অবসান যেন।
বলিতে জানি না কথা তাই হয়'ত ভুল করি,
প্রাণের বাসনা যা'ত জান অন্তর্য্যামী হরি।
অনন্ত যুগ হ'তে ছুটে প্রাণ তব পানে
নদী যথা ছুটে চলে মিলিতে সিন্ধুর সনে।
জননীর অসামান্য স্নেহ-উৎস পারাবার,
শিশুরও আছে তো কিছু হ'ক তাহা ক্ষুদ্রাকার।
জননী ঢালেন নিত্য সন্তানের শিরোপরে,
অসীম করুণামৃত অজস্র করুণাভরে।

শিশু তার আপনার ক্ষুদ্র দু'টি হাত লয়ে
আদরে মাতাকে তার প্রেমেতে বিহ্বল হয়ে।
হ'ক তার বুঝাবার শক্তি অতিমাত্র ক্ষীণ,
হ'ক সে অস্পষ্টভাষা তবু তা'তে আছে লীন—
কত যুগ সঞ্চিত প্রীতির আবেগ তার,
তাই মা'র মুখ ধরে কি যে বলে বার বার।
আমরাও সেইরূপ ভাবহীন ভাষাহীন
কখন্ কত কি বলি কাতর কণ্ঠে ক্ষীণ।
মোদের সে চপলতা অজ্ঞতা মোদের কভু
লও না লও না তুমি জানি তাহা জানি প্রভু।
ধূলার খেলায় মত্ত শিশু চিত্তে নিমগন
মনে হয় জননীর পানে তার নাহি মন।
কিন্তু এক মুহূর্ত্তেতে কি মনে হইবে তার
সব খেলা ভেঙে দিয়ে খুঁজিবে স্নেহাঙ্ক কার?
আমারও সেইরূপ মনে হয় বার বার
এই বিশ্ব খেলাঘরে কত খেলি অনিবার।
তবু একদিন হায় আসিবে সে শুভদিন
সহসা জাগিবে হৃদি বাজিবে প্রেমের বীণ।
তোমাকে পড়িবে মনে তব প্রেমমাখা মুখ,
কি অমৃত কি আনন্দ দেখ কি পরম সুখ।
তখন আপনা হতে তুচ্ছ হবে এই খেলা,
আপনার হাতে গড়া ভাঙিব খেলার মেলা।
তখন বুঝিব নাথ বুঝিব নিশ্চয় জানি,
কি প্রেমেতে পরিপূর্ণ তোমার হৃদয়খানি।
কত ভালবাসা তব জননী অধিক স্নেহ,
বুঝিব ও পদতলে মোর চিরন্তন গেহ।
মিটে যাবে সব কিছু হাসিকান্না গোলযোগ,
দুটি হৃদিমাঝে রবে এক নিরন্তর যোগ।
জানি না আসিবে কবে সেই শুভদিন মোর,
সেই আশাপথ চেয়ে আছি তবু হয়ে ভোর।

কাঞ্চীপুরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।) *

(৪) শিবকাঞ্চী—তীর্থবর্ণন। একাম্রনাথ—ক্ষিতিলিঙ্গ।

কাঞ্চীপুরী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত চিঙ্গলীপুট জেলায় অবস্থিত। কাঞ্চী সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের চিঙ্গলীপুত শাখার একটী ষ্টেশন; মান্দ্রাজ সহর হইতে প্রায় ৬০ মাইল এবং চিঙ্গলীপুত ষ্টেশন হইতে ২১ মাইল দূরবর্ত্তী। মান্দ্রাজ হইতে পশ্চিমাভিমুখে কয়েকটী ষ্টেশনের পর আরকোনাম জংসন, তথা হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বে ১৮ মাইল দূরে কাঞ্চী। মান্দ্রাজ হইতে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ॥৵০ মাত্র। আমরা মান্দ্রাজ হইতে কাঞ্চী গমন করি নাই, মান্দ্রাজগামী ইষ্টকোষ্ট রেলওয়ে লাইনের গুডুর ষ্টেশনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া কালহস্তী ও বেঙ্কটাচল তীর্থ দর্শন করত রেলিগুণ্টা ও আরকোনাম্ জংসনে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া শাখা লাইন দ্বারা ২৪শে ফাল্গুন (১৩১৫ সাল) প্রভাতকালে কাঞ্চী ষ্টেশনে পৌঁছি। সন্ন্যাসী পরিব্রাজকগণ বলেন, ভারতবর্ষে মোক্ষদায়িকা সপ্তপুরী মধ্যে ৩॥ পুরী বিষ্ণুর এবং ৩॥ পুরী মহাদেবের। অযোধ্যা, মথুরা, দ্বারাবতী পুরী বিষ্ণুর এবং মায়াপুরী (হরিদ্বার), কাশী এবং অবন্তিকা মহাদেবের; আর এই কাঞ্চীপুরী অর্দ্ধেক শিবের এবং অর্দ্ধেক বিষ্ণুর। তাই কাঞ্চী দুইভাগে বিভক্ত; শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী। সাহেবরা শিবকাঞ্চীকে Big Conjeveram এবং বিষ্ণুকাঞ্চীকে Little Conjeveram বলিয়া থাকেন। শিবকাঞ্চী হইতে বিষ্ণুকাঞ্চী দুই তিন মাইল মাত্র ব্যবধান। বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজ স্বামীর বিষ্ণুমন্দির এবং রামানুজ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের আধিপত্য; বিষ্ণুকাঞ্চীর পাণ্ডাগণ শ্রীবৈষ্ণব। শিবকাঞ্চীতে একাম্রনাথ মহাদেবের এবং কামাক্ষীদেবীর মন্দির প্রধান এবং শৈব-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য—শিবকাঞ্চীর পাণ্ডাগণ শৈব। বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুকাঞ্চীতে এবং শৈব ও শাক্তগণ শিবকাঞ্চীতে স্বকীয় মতানুযায়ী পাণ্ডার আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া বিষ্ণু ও শিবকাঞ্চীর তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া থাকেন। ষ্টেশনের বাহিরে আসামাত্র উভয়

---

* ১৩২২—কার্ত্তিক সংখ্যায় শিবকাঞ্চীর পৌরাণিক উৎপত্তি বিবরণ, পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছিল।

সম্প্রদায়ের পাণ্ডাগণ আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল। আমরা কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে, শিবকাঞ্চীতে অবস্থানই আমাদের পক্ষে সুবিধা; কারণ এখানকার পরাবিদ্যা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রাঘবাচার্য্য আইয়ার মহোদয়, যাঁহার নামে আমাদের নিকট পরিচয়-পত্র (Introduction letter) ছিল, তাঁহার গৃহ শিবকাঞ্চীতেই। বিশেষতঃ জগদ্‌গুরু মহাদেবের অর্চ্চনা করিয়া এবং ব্রহ্মবিদ্যা কামাক্ষীর প্রসাদ লাভ করত বিষ্ণুপূজাই শাস্ত্রীয় বিধি—তাই একজন ইংরাজী ও সংস্কৃত অভিজ্ঞ পুরোহিতকে পাণ্ডা স্বীকারে তাঁহার সহিত ঝটকা আরোহণে শিবকাঞ্চী চলিলাম।

পুরোহিত মহাশয়ের নাম দেবল্লা সুব্বিয়াকৃষ্ণ। ইনি ইংরাজীভাষায় বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে পারেন, সুতরাং আমাদের পক্ষে সুবিধা। ইনি আমাদের সহিত অতি ভদ্র-ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং সামান্য দক্ষিণা বিশেষ সন্তোষ সহকারেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবকাঞ্চী, ষ্টেশন হইতে ১॥ মাইল মাত্র, ঝটকা ভাড়া চারি আনা। কাঞ্চীর পথ ঘাট বড় সুন্দর ও পরিষ্কার। পথের দুই পার্শ্বে নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর ছায়ায় সুন্দর গৃহশ্রেণী। পথে যাইতে যাইতে বহু মুণ্ডিতমস্তক চন্দনলিপ্তাঙ্গ নগ্নপদ ব্রাহ্মণ এবং তন্তুবায়কুল রেশমবস্ত্র বয়ন করিতেছে দেখা গেল। শিবকাঞ্চীতে পাণ্ডাদিগের গৃহে এবং ছত্রম্‌ বা ধরমশালায় অবস্থান করা যায়। এখানে অনেকগুলি চৌলট্রি বা ধর্ম্মশালা এবং কয়েকটী ব্রাহ্মণ-পরিচালিত হোটেল আছে। আমরা একটী ছত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা সর্ব্বতীর্থে গিয়া তীর্থবিধি অনুসারে ক্ষৌরকর্ম্ম, স্নান, তর্পণ ও পূজাদি করিলাম। সর্ব্বতীর্থ একটী বিমল-সলিল প্রকাণ্ড সরোবর, চতুর্দ্দিকে গ্রেনাইট প্রস্তরে ধাপ্‌ বাঁধান। চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমন্দির ইহার শোভা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি করিতেছে। দেবী পার্ব্বতীর তপশ্চরণকালে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ এখানে মিলিত হইয়া-ছিলেন, তাই সর্ব্বতীর্থই কাঞ্চীর শ্রেষ্ঠ জলময় তীর্থ। একাম্বরনাথের জল-ক্রীড়োৎসব এই তীর্থে হইয়া থাকে। সর্ব্বাগ্রে এই তীর্থে স্নান ও পিতৃকার্য্য করিয়া একাম্বরনাথের দর্শন ও পূজা শাস্ত্রীয় বিধি। আমরা পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া একাম্রনাথ মন্দিরে যাত্রা করিলাম। মন্দিরের নিকটেই একটী মস্‌জিদ দৃষ্ট হইল। হিন্দু দেব-মন্দিরের মণ্ডপ ভাঙ্গিয়া ঐ মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। শুনিলাম, মুসলমান বিজেতারা কাঞ্চীর মন্দির ধ্বংসের উদ্দেশে আগমন করিলে, পাণ্ডারা দেবদেবীর উৎসব মূর্ত্তি এবং আভরণাদি রক্ষা করি-

বার উদ্দেশে খট্টাঙ্গে মৃতদেহের ন্যায় সাজাইয়া স্থানান্তরে পাঠাইয়া দেন এবং এই মণ্ডপটীকে মূল মন্দির বলিয়া দেন এবং বিশ্বাস উৎপাদনার্থ ঐ মণ্ডপে অতিশয় সমারোহে দেবতার পূজা করিতে লাগিলেন। মুসলমান সেনাপতি ঐ মণ্ডপটীকে ভঙ্গ করিয়া মস্‌জিদে পরিণত করিয়া দিলেন। একাম্রনাথই এখানকার শ্রেষ্ঠ দেবতা। শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—"কাঞ্চীতীর্থ পঞ্চযোজন বিস্তৃত"। মহাদেব কহিয়াছেন—"ইহার মধ্যে পূর্ব্ব পশ্চিমে ও উত্তর দক্ষিণে আড়াই ক্রোশ স্থানের মধ্যে আমি সর্ব্বদাই বিরাজমান থাকিব, এমন কি প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে উহা আমার ত্রিশূলের উপর রাখিব। অতএব ইহার কখনও বিনাশ নাই। কাঞ্চীতীর্থ আমার আকৃতিস্বরূপ জানিবে। কাঞ্চীপুরে বাস করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়।" কাশীর ন্যায় কাঞ্চী মুক্তিদায়িকা বিশ্বাসে দাক্ষিণাত্যের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ এই স্থানে আসিয়া জীবনের শেষাংশ অতিবাহিত করেন।

একাম্রেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটী একটী বিরাট্ ব্যাপার। প্রায় ৮০ বিঘা জমিতে এই বিশাল মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার বিশালত্ব, অদ্ভুত কারুকার্য্যসমন্বিত মন্দিরমণ্ডপম্ ও গোপুরম্ সমূহ দেখিয়া হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হয়। ধন্য সেই প্রাচীন হিন্দুগণ, যাঁহারা কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয় করিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ দ্বারা এই প্রস্তরমন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। কত বিজাতীয় হিংসা দ্বেষ, বিধর্ম্মীর শাণিত কৃপাণ এবং তোপের গোলা এবং কালের কঠোর কুঠারাঘাত সহ্য করিয়াও এই প্রস্তরগুলি উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হইয়া অব্যক্ত ভাষায় প্রাচীন হিন্দুদের ধর্ম্ম-প্রাণতা ও শিল্প গৌরব বিঘোষিত করিতেছে। কতবার ইহা ধ্বংসোন্মুখী হইয়াছে; কিন্তু হিন্দুজাতির ধর্ম্মপ্রাণতা আবার ইহাকে পুনঃ সংস্কার করিয়াছে। এখনও ইহা নাটকোটী বণিকগণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইতেছে। নাটকোটী বণিকগণ শৈব, ইঁহাদের আয়ের অর্দ্ধাংশ ইঁহারা মন্দির সংস্কার, ধরমশালা প্রতিষ্ঠা, অতিথি সেবা প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিয়া থাকেন। ধন্য ইঁহাদের উদারতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা। তাঁহারা কেবল একাম্রনাথের মন্দির সংস্কারেই গত ২০ বৎসরের মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করিয়াছেন। (১)

---

(১) Vast sums have been lavished on the temple of F. Rambares word from time to time; The Nattuqottai Chetties or merchant commerrity, having expended more than a hundred thousand Pounds, upon its restoration within the post two decacles. - Major H. A. Newells.

একাম্রেশ্বর দেবের মন্দির চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীরমধ্যে অবস্থিত। দক্ষিণাত্যের রীত্যনুসারে প্রাচীরের চারিদিকে চারিটী বৃহৎ গোপুরম্। একাম্রনাথের মন্দিরটী যেরূপ বিশাল, ইহার দক্ষিণদ্বারের উপরিস্থ বিরাট্-গোপুরম্‌টীও সেইরূপ বিশাল চূড়া সমন্বিত। গোপুরম্ সম্মুখে ষোড়শস্তম্ভ মণ্ডপ। এই মণ্ডপের কারুকার্য্য অতি রমণীয়। নানা দেবমূর্ত্তি ইহাতে খোদিত আছেন। কোন সাধকের নিকট শ্রুত ছিলাম, তিনি গঞ্জাম জেলার কূর্ম্মক্ষেত্র দর্শনের পর গুরু-কৃপায় সমাধিযোগে দর্শন করিয়াছিলেন যে, কূর্ম্মমূর্ত্তি হইতে চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি উত্থিত হইয়া তাঁহার দর্শনগোচর হইলেন। নিম্নভাগ কূর্ম্মাকৃতি। উপরে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি। এইরূপ একটী অর্দ্ধ-কূর্ম্ম অর্দ্ধ নারায়ণমূর্ত্তি একটী স্তম্ভে খোদিত দেখিয়া আমাদের প্রতীতি হইল, মন্দিরাদিতে খোদিত পৌরাণিক চিত্র ও লীলাবলী সমস্তই সাধকগণের ধ্যানগম্য এবং সাধকের ধ্যানপ্রত্যক্ষ মূর্ত্তিই বাহিরে মন্দিরাদিতে খোদিত হইত। উৎসবকালে দেবতার ভোগমূর্ত্তিকে নগর প্রদক্ষিণ করার পূর্ব্বে এবং পরে এই মণ্ডপে স্থাপন করা হয়। একাম্রনাথের রত্নালঙ্কারমণ্ডিত পুষ্পাভরণ-ভূষিত ভোগমূর্ত্তি সুবর্ণনির্ম্মিত বৃহৎ বৃষভারোহণে মঞ্চোপরি স্থাপিত হয়েন। দেবদাসীগণ সম্মুখে নৃত্য করিয়া শৈব আলোয়ার রচিত ভক্ত্যুদ্দীপক শিবমহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন এবং জনকোলাহলে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠে। এই মণ্ডপে প্রত্যহ পূজোপকরণ বিক্রয়ের বাজার বসে। আমরা এই বাজারে নারিকেল মিষ্টান্ন কর্পূর পুষ্পাদি দেবার্চ্চনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গোপুরমের উভয় পার্শ্বে বিঘ্নবিনাশন গণপতির এবং ময়ূরবাহন কার্ত্তিকেয়ের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দর্শন ও প্রণাম করিয়া দক্ষিণ গোপুরমে প্রবেশ করিলাম। গোপুরম্ বলিলে সচরাচর ফটক বা মন্দির বা দুর্গের প্রবেশদ্বার বুঝায়। ইহা সংস্কৃত কথা। দাক্ষিণাত্যের গোপুরম্ প্রবেশদ্বারোপরি ক্রমসূক্ষ্ম অতি উচ্চ চতুষ্কোণাকৃতি ২০।২৫ তালা মন্দিরবৎ অট্টালিকা বিশেষ। ইহার গাত্রে অসংখ্য দেবলীলার নানাবিধ মূর্ত্তি খোদিত থাকেন। এই মূর্ত্তিগুলির কারুকার্য্য এত মনোরম যে, দেখিতে প্রবৃত্ত হইলে চক্ষু ফিরান যায় না। প্রত্যেক তলাটী নীচের তলা অপেক্ষা পরিসরে ছোট, পরন্তু উচ্চতায় অল্প নহে। সুতরাং ইহা যত উচ্চ হইতেছে, ক্রমশঃ ততই সরু হইতেছে। শীর্ষপ্রদেশে একটী রাক্ষসের মুখের আকৃতি। রাক্ষস যেন মুখব্যাদান করিয়া গোপুরম্‌টী মুখ হইতে বাহির করিয়া ভূতলে রাখিয়া দিয়াছে। এই মুখের পরিচয়স্বরূপ উপরের দন্তপংক্তি ওষ্ঠ নাসিকা চক্ষুদ্বয় ও ভ্রূযুগল মাত্র বর্ত্তমান

থাকে। উহার উপর কিঞ্চিৎ কারুকার্য্য এবং তদুপরি ৫।৭টী সুবর্ণরঞ্জিত পিত্তল কলস উর্দ্ধমুখে শোভা পায়। প্রত্যহ রাত্রিকালে এই গোপুরমের সর্ব্বোচ্চ তালাতে এবং উৎসবকালে সকল তালাতে আলোক দেওয়া হয়। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরাবলীর মধ্যে শিবকাঞ্চীর ও মদুরার গোপুরম্ শ্রেষ্ঠ। শিবকাঞ্চীর গোপুরম্ উচ্চতায় এবং মদুরার গোপুরম্ শিল্পনৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠ। শিবকাঞ্চীর মন্দিরের দক্ষিণ দিকের গোপুরমটী ১৮৮ ফিট। ইহা বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরায়ানু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই জন্য ইহার নাম রায়ার গোপুরম্। এই গোপুরমের উপরে উঠিলে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য বড় মনোরম দেখা যায়। গোপুরমের সোপানের সংখ্যা শুনিলাম ১৫৫টী। ১৲ টাকা দিলে মন্দিররক্ষকেরা মসাল জ্বালিয়া পথ দেখাইয়া গোপুরম্-চূড়ায় লইয়া যায়। কর্ণাটীক যুদ্ধের সময় এই দেবালয় কখন সৈন্যনিবাস, কখন হাসপাতালরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল, গোপুরম্-গাত্রে একটী কামানের গোলাঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। তাহা নাকি হায়দর আলীর কাঞ্চী আক্রমণের চিহ্ন। নিকটেই মহাদেবের সুন্দর কারুকার্য্য-সমন্বিত প্রকাণ্ড কাষ্ঠনির্ম্মিত রথ। ইহার কারুকার্য্যও দর্শনযোগ্য। গোপুরম্ দিয়া প্রবেশ করিয়া প্রথম চত্বরে সহস্রস্তম্ভমণ্ডলম এবং তেপাকুল্লম্ নামক সরোবর। ইহার নাম সহস্রস্তম্ভমণ্ডলম্ হইলেও ইহার স্তম্ভসংখ্যা ৫৪০ এবং স্তম্ভগুলি কারুকার্য্যসমন্বিত। এই তেপাকুল্লম্ সরোবরেও দেবতার উৎসব-মূর্ত্তির জলক্রীড়া হয়। অতঃপর আমরা একাম্রেশ্বর ক্ষিতিলিঙ্গের মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। মহামায়া পার্ব্বতীদেবী-প্রতিষ্ঠিত এই সৈকতলিঙ্গের জলাভিষেক হয় না। অধুনা বালুকাময় লিঙ্গটী কৃষ্ণপ্রস্তরের ন্যায় দেখায়। কারণ প্রাচীনকাল হইতে গন্ধ তৈল ম্রক্ষণ করিয়া লিঙ্গটীকে প্রস্তরবৎ কঠিন ও মসৃণ করা হইয়াছে। ইহা অচলমূর্ত্তি। ইঁহার নিকটেই পঞ্চধাতুনির্ম্মিত চতুর্ভুজ সুন্দর ভোগমূর্ত্তি রহিয়াছেন। আমাদের পাণ্ডাজি আমাদের জন্য সহস্র বিল্বপত্র দ্বারা সহস্র নামার্চ্চনা করিলেন। পাণ্ডাজি এক একটী নাম উচ্চারণ করেন এবং পূজক এক একটী বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করিলেন। পূজার সময় বৈদিক রুদ্রাধ্যায়ের পাঠ চলিতে থাকে। অতঃপর কর্পূরালোকে আরাত্রিক হইলে আমরা অন্ধকারময়-গৃহে "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্ বিশ্ববিষ্ঠং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং বরদং" ক্ষিতিলিঙ্গকে দর্শন করিলাম। যাত্রিগণ মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে পান না, বাহির হইতেই দর্শন করেন, ইহাই দাক্ষিণাত্যের সকল মন্দিরের নিয়ম। ক্ষিতিলিঙ্গের যথারীতি পূজা করিয়া আমরা মন্দিরের

পশ্চাতে গিয়া একটী প্রকাণ্ড পুরাতন আম্রবৃক্ষ দেখিলাম। এই আম্রবৃক্ষের নাম হইতেই নাকি মহাদেবের নাম একাম্রনাথ। মহাদেব সমস্ত শাস্ত্র বা বেদকে আম্রবৃক্ষরূপে এবং আপনাকে লিঙ্গরূপী একাম্রনাথ নামে অভিহিত করিয়া কাঞ্চীপুরে অবস্থান করিতেছেন। এই পবিত্র বৃক্ষতলেই কামাখ্যাদেবী তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহার স্মারকস্বরূপ বৃক্ষতলস্থ একটী প্রস্তরের পূর্ব্বোক্ত পুরাণকথানুযায়ী তপস্যাপরায়ণ দেবীর মূর্ত্তি খোদিত আছেন। নিকটেই ক্ষুদ্র মন্দিরে সুবর্ণখচিত কামাখ্যাদেবীর বহুমূল্য রত্নালঙ্কারশোভিত অতি মনোহর উৎসব মূর্ত্তি। বোধ হয় ইহাই তন্ত্রোক্ত "কনককাঞ্চী"। এই মন্দিরের প্রকাণ্ড হাতায় ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে ও বারান্দায় বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি। আমরা প্রায় এক ঘণ্টা ভ্রমণ করিয়া দর্শন করিলাম। তন্মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি, (১) একাম্রেশ্বরের উৎসবমূর্ত্তি ধাতুবিগ্রহ, (২) বহুমূল্য বস্ত্রভূষণে সুসজ্জিতা পার্ব্বতী-দেবীর মূর্ত্তি, (৩) জগমোহনে ৬৪ যোগিনীর দণ্ডায়মান মূর্ত্তি, (৪) ১০৮ শিবলিঙ্গ, (৫) চিদম্বরমের শিব অর্থাৎ নটরাজ মূর্ত্তি, (৬) বালাজি অর্থাৎ তিরুপতির অনুরূপ চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি, (৭) দশভূজা কালীমূর্ত্তি, (৮) নবগ্রহ, (৯) কালভৈরব, (১০) শক্তিগণপতি, সৌভাগ্যগণপতি, সন্তানগণপতি প্রভৃতি গণেশ মূর্ত্তি, (১১) সুব্রহ্মণ্য বা কার্ত্তিকেয়, (১২) সহস্রলিঙ্গ (অর্থাৎ একটী কৃষ্ণপ্রস্তরের বিনির্ম্মিত লিঙ্গপাত্রে অসংখ্য লিঙ্গ খোদিত) ইত্যাদি। শিবরাত্রির সময় পঞ্চদশ দিবসব্যাপী এখানে মহোৎসব হইয়া থাকে। ঐ সময় ভোগমূর্ত্তিকে ভিন্ন ভিন্ন দিবস ভিন্ন ভিন্নরূপ যানবাহনে নগর প্রদক্ষিণ করান হয়; ব্রাহ্মণেরা সঙ্গে সঙ্গে বেদপাঠ করিতে করিতে চলেন। প্রথম দিন সিংহবাহনে, দ্বিতীয় দিন চন্দ্রসূর্য্যবাহনে, তৃতীয় দিন ভূতবাহনে, চতুর্থ দিন নাগ ও রৌপ্যষণ্ড বাহনে, (১) পঞ্চম দিনে নন্দী ও রাবণ বাহনে, ষষ্ঠ দিন বসন্তপালবক ও হস্তী বাহনে, (১) সপ্তম দিন রথবাহনে ভগবানের উৎসবযাত্রা সম্পাদিত হয়। দশম দিনে ভগবানের তাণ্ডবমূর্ত্তি সুবর্ণ-বৃষভা-রোহণে যাত্রা সম্পাদন করান হয়। এই দিনটীই উৎসবের প্রধান দিন, এই দিনই দেবী কামাখ্যার সহিত একাম্রনাথের বিবাহোৎসব সম্পন্ন হয়। এই সকল দর্শন করিতে বেলা প্রায় দুইটা হওয়ায় আমরা বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম। অন্যান্য মন্দির ও তীর্থ বৈকালে এবং পর দিন দর্শন করি।

---

(১) এই সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত যানবাহন-গুলির কারুকার্য্য চমৎকার। সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপের একটি কক্ষে রক্ষিত আছে ও অন্য সময়েও দেখা যায়।

৫। কাঞ্চীর সপ্ততীর্থ।

কাঞ্চীর সপ্তবারের সপ্ততীর্থ প্রসিদ্ধ। সকলগুলিই এক একটী সুবিশাল সরোবর। যে বারের যে তীর্থ, সেইবারে তাহাতে স্নানাদি করিলে অশেষ পুণ্যলাভ এবং পুরাণানুসারে নিম্নোক্ত ফল লাভ হয়।

শনিবার—সর্ব্বতীর্থ। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। জীব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।

রবিবার—ইষ্টসিদ্ধতীর্থ। কচ্ছপেশ্বরের মন্দিরের নিকট। দেহ কাঞ্চন বর্ণ হয়।

সোমবার—শিবগঙ্গাতীর্থ। একাম্রেশ্বরদেবের মন্দিরের হাতায়। ফল ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি।

মঙ্গলবার—মঙ্গলতীর্থ। একাম্রদেবের রথের নিকটবর্ত্তী সরোবর। ফল সর্ব্বকামনা সিদ্ধি।

বুধ—ইন্দ্রতীর্থ। বিষ্ণুকাঞ্চী যাইবার পথের নিকটবর্ত্তী। সর্ব্ব মনোবেদনা দূর হয়।

বৃহস্পতিবার—কায়ারোহণ তীর্থ। বেগবতী নদীর নিকটবর্ত্তী তীর্থ। ফল মোক্ষলাভ হয়।

শুক্রবার—পঞ্চতীর্থ। কামাক্ষীদেবীর মন্দিরে হাতায়। ফল জ্ঞান লাভ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপান্নালাল সিংহ।

ভাব।

(১)

ভাব ভবে ভাব সার
ভাব সর্ব্ব মূলাধার।
স্বয়ম্ভু অব্যয়
নির্গুণ চিন্ময়
নিরঞ্জন নিরাকার,

(২)

ভাবে গুণত্রয়
করিয়া আশ্রয়
বিশ্বরূপ মহাকার।

(৩)

ভাবে ভূতপঞ্চ
এ সৃষ্টিপ্রপঞ্চ
বিশ্বমঞ্চ সূচনার,

(৪)

স্বভাব সৃজন
ভাব প্রস্রবণ
সুপবিত্র চমৎকার।

(৫)

ভাবময় বিশ্ব
চরাচর দৃশ্য
ভাবপূর্ণ ভবাগার।

(৬)

স্বরগ সুষমা
ভাব অনুপমা
কবি-ভাব কল্পনার।

(৭)

ভাবে বদ্ধজীব
সে পরমশিব
কর্ম্ম-সূত্রে আপনার।

(৮)

মানব জীবন
নিদ্রা জাগরণ
ভাব সঙ্গ সমাচার।

(৯)

মন চিত্তবৃত্তি
সুখ-দুঃখ ভিত্তি
পাপপুণ্য ভাবাধার।

(১০)

ভাবে বিদ্যাবুদ্ধি
জ্ঞানের বিশুদ্ধি
বিজ্ঞানের সুপ্রচার।

(১১)

করম কারণ
ভাব উদ্ভাবন
জ্ঞানবুদ্ধি সংস্কার।

(১২)

ভাবের কুহকে
দেখ জ্ঞানালোকে
কত আশ্চর্য্য ব্যাপার ;

(১৩)

বাষ্পীয় বিমান
শকটাদি যান
শিল্প কত আবিষ্কার।

(১৪)

খনিয়া অবনী
বাহিরায় খনি
ধাতু যত মৃদঙ্গার।

(১৫)

জলধির তলে
রণতরি চলে
বিপক্ষ অজ্ঞাতসার।

(১৬)

যুদ্ধপ্রকরণ
নূতন নূতন
কৃষি বাণিজ্যপ্রসার।

(১৭)

ভাবেতে অভাব
অভাবেতে ভাব
ওতপ্রোত একাকার।

(১৮)

ভাবে যতহিত
অভাব বিহিত
স্বভাবের সুবিচার।

(১৯)

ভাবে করে কর্ম্ম
ভাবে ধরে ধর্ম্ম
ভাব নাম মমতার।

(২০)

প্রেম ভক্তি সখ্য
বাৎসল্য সাপেক্ষ
এ সংসার পরিবার।

(২১)

ভাবে ভোগে রতি
ভাবেই বিরতি
ভাবে বিবেক সঞ্চার।

(২২)

সংসার কানন
ত্রিদিব নন্দন
ভাবকল্পতরু তার।

(২৩)

ধর্ম্ম অর্থ কাম
মোক্ষ আত্মারাম
চতুর্বর্গ ফলাধার।

(২৪)

মানব স্বধর্ম্ম
ভাবে করে কর্ম্ম
সেই ভাব দ্বিপ্রকার।

(২৫)

স্বার্থ ও পরার্থ
যাহে পুরুষার্থ
হয় সদা সুবিস্তার।

(২৬)

স্বার্থেতে প্রবৃত্তি
পরার্থে নিবৃত্তি
আত্মসুখ কামনার।

(২৭)

সাধক সুজন
পরার্থে মগন
পরমার্থ লক্ষ্য যার।

(২৮)

যা' কিছু করম
করি ঈশার্পণ
ধ্বংস করে বাসনার।

(২৯)

কর্ম্মকাণ্ড ভাব
হ'লে তিরোভাব
জ্ঞানকাণ্ডে অধিকার

(৩০)

তাহাতে সমাধি
হ'লে ভবব্যাধি
একেবারে প্রতীকার।

(৩১)

তাই বলি মন!
কররে সাধন
ভাব ব্রহ্ম অনিবার,

(৩২)

ভাবময় ঈশ
ভাব পরবশ
ভাবেতে প্রত্যক্ষ তার।

(৩৩)

ভাবের আকারে
ভাবি নিরাকারে
ভাব সদা হৃদ্‌মাঝার

(৩৪)

ভাব সিংহাসনে
পূজরে যতনে
ল'য়ে ভাব উপচার।

(৩৫)

দেহ প্রাণ মনে
সহ রিপুগণে
দেহ বলী উপহার।

(৩৬)

ভাবের আবেশে
হের পরমেশে
সর্ব্বভূতে চারিধার,

(৩৭)

দেহের বিনয়ে
নিত্য নিরাময়ে
পাবে মোক্ষ নির্ব্বিকার
চির শান্তি পারাবার।

শ্রীকুঞ্জবিহারী মিশ্র—হেড্ পণ্ডিত।

অতঃপরং।

সপ্ততিবর্ষদেশীয় পিতামহ পঞ্চমবর্ষীয় পৌত্রের নিকট গল্প বলিতেছেন। দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার নিদর্শন তাঁহার মস্তকের তুষারশুভ্র কেশরাশি, সংসার-জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতির প্রকৃষ্ট অভিজ্ঞান, তাঁহার কুঞ্চিত ললাটের গভীর রেখা-রাজি। বৃদ্ধ গল্প বলিতেছেন—'এক দেশে এক রাজা ছিল, তাহার অনেক ধন দৌলত; হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়ার লেখাযোখা নেই। মণিমুক্তো হীরে জহরতের সীমে সংখ্যে নেই। কিন্তু রাজা আঁটকুড়ো। অনেক সাধ্য সাধনায় ছোটরাণীর এক ছেলে হ'ল। বড়রাণী হিংসে করে আঁতুড়ে ছেলেকে জলে ভাসিয়ে দিলেন। ছোটরাণী কেঁদে কেঁদে অন্ধ; রাজা শোকে পাগল। হাতী ঘোড়া ধনদৌলত রাজ্যি রাজপাট সব গেল। এদিকে সেই রাজার ছেলেকে পেয়ে একজনে মানুষ কল্লে। সে ছেলে মস্ত বীর হয়ে উঠ্‌লো। এক রাক্ষস মেরে একদেশের রাজার মেয়ে বিয়ে কল্লে; তারপর সে রাজা হ'ল। শেষে কোন রকমে সে বাপ মায়ের সন্ধান পেয়ে তাঁদের নিয়ে এল; আবার তাঁদের ধনদৌলত রাজ্যি রাজপাট সব হ'লো। রাজা বড়রাণীর সয়তানীর কথা সব জান্‌তে পেরে তারে মাটীতে পুতে মারলেন।'

শিশু নীরবে নিবিষ্টচিত্তে পিতামহের সব কথা শুনিল। কিন্তু বৃদ্ধ যখন গল্প শেষ করিয়া সজ্জিত কলিকাটীর দিকে হস্ত প্রসারণ করিতে যাইতেছেন, অমনি শিশু বাধা দিয়া বলিল—'তারপর?' বৃদ্ধ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন;—তারপর

আবার কি? কিন্তু শিশুর সেই একই সাগ্রহ প্রশ্ন—'তারপর?' বৃদ্ধ কলিকাটী হুঁকার মাথায় বসাইতে বসাইতে বলিলেন—'তারপর তারা সুখে সচ্ছন্দে ঘর সংসার করতে লাগল;—আর কি?' বৃদ্ধ হুঁকাটী মুখে তুলিতেছেন; শিশু আবার 'তারপর' বলিয়া সজোরে হুঁকাটী টানিল—কলিকা পড়িয়া গেল, আগুন ছড়াইয়া পড়িল। ঠাকুরদাদা আগুন নিবাইতে নিবাইতে কৃত্রিম কোপে বলিয়া উঠিলেন—'তবে রে, শালা পাজি!' শিশু ছুটিয়া পলাইল; 'তারপরে'র উত্তর আর তাহার শোনা হইল না, ঠাকুরদাদাও এক দায় হইতে মুক্ত হইয়া হুঁকা কলিকার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হইলেন। কিন্তু হুঁকাও যেন অবিশ্রান্ত 'তারপর' 'তারপর' করিয়া বৃদ্ধের বিরক্তি উৎপাদন করিল; তাই বোধ হয় তিনি হুঁকা রাখিয়া নামাবলিখানি গায়ে জড়াইয়া জপের মালাটী লইয়া চক্ষু মুদিয়া বসিলেন। এ কি তাঁহার ইষ্টনাম জপের চেষ্টা না সেই তারপরের সমাধানপ্রয়াস? আমি বুঝি বৃদ্ধের কেবলই মনে হইতেছিল যে তিনিও যখন তাঁহার পিতামহ বা পিতামহীর নিকট সেই রাজার গল্প শুনিয়াছিলেন, তখন তিনিও তাঁহার শিশু পৌত্রের ন্যায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'তারপর?' আর আজি তাঁহারই শিশু পৌত্র, তাঁহাকে সেই প্রশ্নই করিল। তিনি এ দীর্ঘ জীবনে কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিলেন, কত সমস্যার সমাধান করিলেন, কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর পুরুষানুক্রমে অমীমাংসিত রহিল! কি পরিতাপ!

পাঠক পাঠিকা সম্ভবতঃ 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি' সম্বন্ধীয় কিংবদন্তীর সহিত অপরিচিত নহেন। কিংবদন্তী বলে যে অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত পথিপার্শ্বে পতিত নরকপালে অদ্ভুত বিধিলিপি দেখিয়া 'অপরংবা কিং ভবিষ্যতি' (ইহার পরও আর কি হইতে পারে) জানিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছিলেন; এবং তজ্জন্য সেই নরকপালটী সযত্নে স্বগৃহে রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত-ঘরণী স্বামীর এবম্বিধ অদ্ভুত আচরণে ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া নরকপালটী চূর্ণ করত বিষ্ঠামধ্যে নিক্ষেপ করিলেন; পণ্ডিতের ও, অপরং বা কিং ভবিষ্যতি' জানা হইল। আমরা কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না যে পণ্ডিতের অনুসন্ধিৎসা ইহাতেই নিবৃত্ত হইল কি প্রকারে? এ পর্য্যন্ত কোন তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিই এ প্রকারে মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইতে পারিয়াছেন কি? তাহা যদি পারিতেন তাহা হইলে কল্পনাসর্ব্বস্ব কবির-কণ্ঠে 'তারপর' কি জানিবার জন্য আকুল আবেদন ফুটিয়া উঠিত না—দার্শনিকের ত কথায় নাই! পাঠকপাঠিকার মনে পড়ে কি ভাবপ্রাণ কবি শেলীর সেই করুন উচ্ছ্বাস?—

We look before and after,
And pine for what is not ;
Owr sincerest laughter
With some pain is fraught :
Our sweetest songs are those that
Tell of the soddest thoughts !

(কভু আগে কভু পাছে--দিকে দিকে চাই,
তারি তরে ঝুরে মরি কোথাও য নাই ;
মুখে যা'র ফুটে যেন অকপট হা'স
তারি বুকে গুমরিছে বেদনার রাশি ,
গভীর মরম ব্যথা মূর্ছিত যায়
সেই গানে আমাদের শ্রবণ জুড়ায় !)

চিন্তাশীল মনীষগণ যে কবিকে উচ্ছৃঙ্খল কল্পনাশ্রবণ আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন ইহা তাঁহারই হৃদয়বীণার করুণ ঝঙ্কার। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, যে কোন লোক যে কোন প্রকারেই জীবন যাপন করুক না কেন—যত বিলাসিতা, যত প্রণয়োন্মাদ তাহার হৃদয় অধিকার করুক না কেন—তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে কি এক অনালোচনায় ঔৎসুক্য। অপরিজ্ঞেয় চাঞ্চল্য সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। বিলাসবিভ্রমের কুসুম যবনিকার অন্তরাল হইতে সে যখন তখন 'উঁকি' দেয়, বিবেকাসনের কঠিন কবাটে তাহার করাঘাত মুহুর্মুহুঃ শ্রুত হয়। মুগ্ধ মানব সহসা তাহা লক্ষ্য করে না বটে কিন্তু তাহার জীবনে এমন একদিন আসিয়াই থাকে যেদিন সে আর উদাসীন থাকিতে পারে না।

নূতনের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ মানবের সহজাত ধর্ম্ম। শিশু যখন কোন নূতন ক্রীড়নক লাভে অতীব হৃষ্ট হয়, আনন্দাতিশয্যে যেন ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যায়, তখন জ্ঞানাভিমানী প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিশুর সে আনন্দ, সে আত্মবিস্মৃতি নিতান্ত অকারণ মনে করিয়া একটু অবজ্ঞার হাসি হাসেন। কিন্তু এই অন্ধ অনুরাগ, এই অকারণ আনন্দ সম্বন্ধে আমার ও আমার শিশু পুত্র বা পৌত্রের মধ্যে কোন তারতম্য আছে কি ? শিশু যখন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া একটী নূতন ক্রীড়নক পাইয়াছিল তখন তাহার আর আনন্দের সীমা ছিল না ; তাহার সেই ক্রীড়নক প্রাপ্তিতেই যেন তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল—

যেন তাহার সকল কামনার চরিতার্থতা সম্পাদিত হইয়াছিল। কিন্তু দেখা গেল মধ্যাহ্নে সেই ক্রীড়নকের প্রতি তাহার সে প্রবল অনুরাগ, সে 'প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তা' ভাব আর নাই; সে অন্যমনস্কভাবে ক্রীড়নকটী হাতে লইয়া ঘুরিতেছে, ও তাহার অন্তর যেন আর কিছু অন্বেষণ করিতেছে। এই ঔদাসীন্যের ফলে হঠাৎ ক্রীড়নকটী হস্তচ্যুত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল; শিশুরও যেন চমক ভাঙ্গিল। সে ভগ্নখণ্ডগুলি কুড়াইয়া লইয়া বিষণ্ণনয়নে সেগুলির প্রতি চাহিয়া দেখিল, পরে সহসা সেগুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু এই ক্রন্দন কেবল সেই প্রিয়বস্তুর বিয়োগের জন্যই কি? অবশ্য ইহাতে যে বিয়োগব্যথা আদৌ নাই এমন নহে; আছে—কিন্তু অতি সামান্য। এ ক্রন্দনের মুখ্য কারণ অবার কোন প্রলোভনের অভাব। এক্ষণে আমার জীবনের ক্রিয়াপরম্পরা বিশ্লেষণ করিলে কি দেখিতে পাই? শৈশবে যে খেলাঘর বাঁধিয়াছিলাম, যাহার সৌন্দর্য্যে জীবন অনাবিল আনন্দময় হইয়াছিল—যৌবনে তা আর তেমন মনোহর বোধ হইল না। তাহার কিয়দংশ ইচ্ছাকৃত অযত্নে নষ্ট হইল, কিয়দংশ বা যুবজনবাঞ্ছিত বিলাসবিভ্রমের নিষ্ক্রয়স্বরূপ ত্যাগ করিলাম। কি হারাইলাম, কি পাইলাম তাহা বিচার করিবার শক্তি ছিল কি না জানি না—কিন্তু প্রবৃত্তি আদৌ ছিল না তাহা বেশ জানি। শৈশবের সরলতার বিনিময়ে পাইলাম যৌবনের স্বার্থপর সতর্কতা। শৈশবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিতে শিখি নাই কিন্তু তাহাতে হৃদয় ভরিয়া যাইত। শৈশবে নদনদীর কলতান, আকাশে বাতাসে পাখীর গান, বনে বনে ফুলের হাসি, সুনীল গগনে তারার রাশি; জনক-জননী ভাই-ভগ্নীর অনাবিল স্নেহ; প্রতিবেশীর অসঙ্কোচ অকপট আনন্দ-সম্মিলন;—সমস্ত সংসার যেন প্রকৃতই একখানি অক্ষয় সুখময় খেলাঘর! যৌবনে এত সুখ, এত আনন্দও আর তেমন ভাল লাগিল না; ইহার অধিকাংশই অনর্থক, অপ্রয়োজন, এমন কি সুখের অন্তরায়স্বরূপ বোধ হইল। শিশুর হস্তচ্যুত অনাদৃত ক্রীড়নকের ন্যায় এ সুন্দর খেলাঘর অযত্নে ভাঙ্গিয়া পড়িল; যাহা বাকী রহিল, তাহা আপন হাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। কিন্তু যাহা গেল তাহার জন্য একটুও বেদনা বোধ করি নাই? কে বলিল করি নাই? যখন সর্ব্বপ্রথম শৈশবের সেই অবারিত দ্বার আনন্দ-কোলাহলমুখর ক্রীড়াগৃহ ধূলিসাৎ করিয়া যৌবনের সুসজ্জিত, বিধিনিষেধরূপ প্রাকার-বেষ্টিত, সভ্যতা শিষ্টাচার সতর্কতা স্বার্থপরতা প্রভৃতি প্রহরিরক্ষিত সোপানকক্ষে প্রবেশ করিতে যাই, তখন একবার মন যেন কেমন করিয়াছিল, চরণ যেন শৈশবের মুক্ত

ক্রীড়াক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সম্মুখে বড় তীব্র প্রলোভন; তাহার প্রভাবে সে আকস্মিক অবসাদ ঝটিতি দূরীভূত হইল। শৈশবের সে সাধারণ খেলাঘরে সকলে মিলিয়া যেন কেমন এক হইয়াছিলাম, আমার 'আমি'টীকে ভাল করিয়া চিনিতে পারি নাই; যৌবনের গোপন কক্ষে প্রবেশ করিতেই একজন আসিয়া আমাকে সাদর অভ্যর্থনা করিল। মনে হইল ইহা নিশ্চিতই একটি নূতন ক্রীড়নক; কিন্তু অতি সুন্দর, অতি অপরূপ। অত্যাশ্চর্য্য শিল্প-কৌশলসমন্বিত। শৈশবে কতজনে কত সুন্দর ক্রীড়নক দিয়াছিলেন,—কোনটি কল টিপিলে হাসে, কটাক্ষ বিক্ষেপ করে, কোনটি করতালি দেয়, কোনটি বা গমন করে। এ অপূর্ব্ব ক্রীড়নক কিন্তু আপনি হাসিল, বিলোল কটাক্ষপাতে আমাকে মোহিত করিয়া বলিল, 'আজি হইতে তুমি আমার, আমি তোমার।' আজি হইতে—এতদিন তবে আমি কাহার ছিলাম, কে আমার ছিল? তখন আর এ প্রশ্নের মীমাংসা করা হইল না; ভাবিলাম ইহাই প্রকৃত সুখ বটে—সেই হইতে 'আমি' 'তুমি' চিনিয়া লইলাম। আরও কত কি শিখিলাম, শুনিলাম, চিনিলাম। শৈশবে পথের ধারে আম্র-কাননে ফল পাড়িয়া সকল ক্রীড়াসঙ্গী ভাগ করিয়া খাইয়াছি—কাহার বাগান কে জানিত? যেখানে সুন্দর ফুল দেখিয়াছি, তুলিয়া সকলে মিলিয়া মালা গাঁথিয়াছি, ছিঁড়িয়াছি, ছড়াইয়াছি;—কাহার ফুল কেহই জিজ্ঞাসে নাই! আজি শিখিলাম—'এ আম্র বৃক্ষ আমার, তুমি ইহার ফল খাইবে কেন? এ পুষ্পোদ্যান আমার, তুমি ইহার ফুলে মালা গাঁথিয়া আনন্দ করিবে কেন?' তখন এই 'আমি' ও 'আমার' সংসারের সার বলিয়া বোধ হইল; শৈশবে যাহার সবই সকলের ছিল, তাহারই অনেক 'বাদছাদ' দিয়া অনেককে দূরীভূত করিয়া অবশিষ্ট একটি অংশ আমিত্বের 'বেড়া' দিয়া আমার করিয়া লইলাম; ভাবিলাম এইবার প্রকৃত কার্য্য করা হইল, এইবার অক্ষয় সুখের ভাণ্ডার নির্ম্মিত হইল, বেশ একটি মনের মত নূতন সামগ্রী হইল। আমির মোহে বিভোর হইয়া বেশ দিন কাটাইতেছিলাম। কিন্তু এ কি বিড়ম্বনা! ক্রমে ক্রমে আমার সেই সযত্নরক্ষিত আমিত্বের অধিকারে কোথা হইতে কত 'তুমি' আসিয়া উপস্থিত হইল; আমার বড় আপনার পত্নীও আর আমার রহিল না, দিব্যচক্ষে দেখিলাম আমারই অঙ্গোদ্ভব সন্তান ক্রমশঃ তুমি হইতে চলিল—আমার আমিত্বের প্রথর ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতর হইতে লাগিল। 'আমি' ও 'আমার' হইতে আর সুখের আশা রহিল না; যেন আবার নূতনের জন্য ব্যস্ত হইল।

তাই আজি ব্যর্থ যৌবনের পরপ্রান্তসমীপে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি—'অতঃপরম্ ?' যাহাদিগকে একদিনে দূরে সরাইয়া দিয়া আমিত্বের বেষ্টনী রচনা করিয়াছিলাম, আজি তাহাদিগকেই আকুল আগ্রহে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলাম—'ভাই, অতঃপরম্' ? তাহারাও আমারি মত আমিত্বের গণ্ডীর মধ্যে ব'সিয়া জীবন সার্থক করিবে ভাবিয়াছিল, এবং আজ তাহারা আমারি মত নূতনের অন্বেষণ কামনায় সেই গণ্ডীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার প্রশ্নে সকলে যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন ক'রিল—বলিল, 'তাইত ভাই, অতঃপরম্ ?'

তাইত ! কে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবে ? ভাবিলাম উপযুক্ত উপদেষ্টার সন্ধান করি, কিন্তু আপনার অক্ষমতায় তাহা পারিলাম না। সহসা মনে হইল—

অষ্টকুলাচলঃ সপ্তসমুদ্রাঃ ব্রহ্মদিনকরপুরন্দররুদ্রাঃ
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকঃ তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ।

অষ্টকুলাচল, সপ্তসমুদ্র, ব্রহ্মা, দিনকর, পুরন্দর, রুদ্র, আমি, তুমি, বা এ পৃথিবী এ সব কিছুই কিছুই নহে ; তবে শোক কি জন্য ?—বেশ কথা ত ! এ সব কিছুই নহে ? এতদিন যে আমি যাদ লইয়া এত কাণ্ড করিলাম তাহা কিছু নহে ? বুঝিতে পারিতেছি না ত ? যাউক—যদি আমি নাই বুঝিতে পারি ! কিন্তু শোক পরিত্যাগ করিব কি করিয়া ? শোকের প্রতিষেধক আনন্দ না পাইলে শোকের প্রতীকার হয় কৈ ? আনন্দই বা কোথা পাইব ? শৈশবে যে সুখময় নন্দনকাননে, যে আনন্দদ্রবময়ী মন্দাকিনীর তীরে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম তাহার পথ যে ভুলিয়া গিয়াছি ; এক্ষণে যে স্থান আমার পরিচিত তাহা আমিত্বের সর্ব্বশোষক মরুৎ সঞ্চারে চির-উষর ভূমিতে পরিণত : আর কোথাও আনন্দের সম্ভাবনা আছে কি ? আবার মনে হইল—

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে।

গোবিন্দের ভজন ভিন্ন অন্য পন্থা নাই। তবে আর চিন্তা কেন—এস মন, গোবিন্দের মকরন্দময় পদারবিন্দ ভজনা করি ! কিন্তু, হায়, অহঙ্কারের আবর্জ্জনামলিন হৃদয়ে গোবিন্দের পদারবিন্দ প্রস্ফুটিত হয় কৈ ? এখন দেখিতেছি এই সযত্নপোষিত 'আমি'ই আমার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। উপায় কি নাই ?—অবশ্য আছে, কিন্তু বড় কঠোর। সাধক বিল্বমঙ্গল যেমন

পরমার্থপরিপন্থী নয়নদ্বয়কে উৎপাটিত করিয়াছিলেন, আমাদিগকেও তেমনি 'আমি'টিকে হৃদয় হইতে উন্মূলিত করিয়া ফেলিতে হইবে। 'বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্'—বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। শৈশবের নির্ম্মল হৃদয়ে যাহার স্থান ছিল না, যাহাকে পরে চন্দনতরুভ্রমে সেই পুণ্যক্ষেত্রে রোপণ করা হইয়াছে—আজি তাহাকে বিষবৃক্ষ জানিয়া সমূলে উৎপাটিত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলে চলিবে না। যাহা ছিল না তাহাকে বিদায় দিতে বিষণ্ণ হইলে চলিবে না। মানব ফলকামনায় কর্ম্ম করে, ব্যবসায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে লাভালাভ বিবেচনা করে। তবেই ভাবিয়া দেখিতে হইবে এ কাজে কত লাভ! আমি তুমির কৃত্রিম ব্যবধান দূর করিয়া দিয়া আবার যদি সকলে শিশুর ন্যায় এক হইয়া যাই, তবে প্রথমতঃ এই অশান্তি, এই গুরু বেদনার ভার লঘু হইয়া যাইবে। এই ক্ষুদ্র 'আমি' স্বার্থপঙ্কিল 'আমি' দূরীভূত হইলে যে অনন্ত অসীম অনাবিল আমি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে তাহার পুণ্যস্পর্শে আবার সংসার মধুময় হইয়া উঠিবে, সিন্ধু মধুক্ষরণ করিবে; আর তাহাতে সেই চিরানন্দ-মকরন্দময় গোবিন্দচরণারবিন্দ ফুটিয়া উঠিবে। সে চরণারবিন্দের মকরন্দ নিত্য নবস্বাদময়। উদ্‌ভ্রান্ত মানসমধুকর আর তাহা ছাড়িয়া উড়িতে পারিবে না; আর বলিবার অবসর পাইবে না—"অতঃপরম্?"

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র প্রধান বি, এ।
নৈবেদ্য সম্পাদক।

অতিথি।

স্বপ্নহীন সুগভীর শান্ত নিদ্রা মোর
আজি যবে ভেঙ্গে গেল রজনীর শেষে,
নয়ন মেলিয়া দেখি হ'য়ে গেছে ভোর
গবাক্ষে ঊষার আলো পড়িতেছে এসে।
তখনো ওঠেনি রবি, জাগে নাই ধরা,
খেলিতেছে আধ আলো আধ অন্ধকার,

গৃহের বাহিরে দিক্ কুয়াসায় ভরা
আলস্যে নয়ন দুটি মুদিনু আবার।
সম্মুখে পড়িল ছায়া, শুভ্র স্বচ্ছবেশে
প্রশান্ত পবিত্র মূর্ত্তি দিব্য জ্যোতির্ম্ময়
অতিথি বিপুলকায় দাঁড়াইল হেসে,
নিমেষে বিস্ময়ে গেল ভ'রিয়া হৃদয়।
মুছিনু নয়ন, নিদ্রা ভাঙ্গিল আমার,
লজ্জার শয্যার অঙ্কে বসিনু উঠিয়া
পূজিতে অতিথিবরে, বরবপু তাঁর
নয়ন হল না তৃপ্ত দেখিয়া দেখিয়া।
সে পূত চরণ হ'তে করুণার ধার
বিদ্যুতের রেখারূপে আসিল নামিয়া
এপাপ হৃদয়ে যেন আলোকে তাঁহার
নিখিল জগৎ গেল মুহূর্ত্তে পূরিয়া।
নিমীলিত নয়নের সম্মুখে আমার
অপূর্ব্ব সে অতিথির দেহের কিরণে
প্রসন্ন হইল দিক্, দিব্য জ্যোতিঃ তার
ভরি দিল শূন্য পথ অপূর্ব্ব বরণে।
জাগিল আত্মার তৃপ্তি' ভকতি হৃদয়ে,
ভাসিলাম সুখনীরে, হল অহঙ্কার—
ভবিষ্য জীবন বুঝি মোর যাবে হ'য়ে
শুধু তৃপ্তিময় এই আশীষে তাঁহার।
হেরিনু কল্পনা-নেত্রে স্বরগের ছবি,
কি মোহে অতিথি পূজা গেলাম ভুলিয়া,
উঠিল উজলি ধরা গগনের রবি,
আবার অতিথি রবি গেল পলাইয়া।

শ্রীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত।
M. A. B. E.

———

আধ্যাত্মিক জীবন ও তাহা লাভের উপায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বহু ব্যক্তি অধ্যাত্ম-পথের পথিক না হইয়াও ঈদৃশী প্রেরণার বশে চালিত হইয়া থাকেন। এই কথাটী স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোনও মহাযুদ্ধ কালে যখন কোন বিপুল বাহিনী যুদ্ধসমাপ্তির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বীরাবক্রমে অগ্রসর হয়, তখন প্রায়শঃ জয় ও পরাজয় শব্দদ্বয় সম্পূর্ণ বিপরীতার্থ প্রকাশ করে বলিয়া বোধ হয়। কখন কখন হয় ত সামান্য সংখ্যক সৈন্য অনিশ্চিত ও সম্পূর্ণ অসম্ভব কার্য্য সাধনে প্রেরিত হয়। কোন কোন সময়ে হয়ত সেনাপতি মহাশয় অধস্তন সৈন্যাধ্যক্ষের প্রতি এমন আদেশ করিয়া বসেন যাহা পালন করা যে অত্যন্ত দুরূহ বা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয় ত তাহা তাঁহার অজ্ঞাত নহে। সেনাপতি আদেশ করিলেন—"অমুক স্থান অধিকার করিতে হইবে।" স্থানটী হয় ত কামান-শ্রেণীর দ্বারা সুরক্ষিত কোনও পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ; সৈন্যাধ্যক্ষ জানেন যে ঐ স্থান অধিকার করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার সৈন্যবল বহু পরিমাণে কমিয়া আসিবে, কিংবা যদি ঐ স্থানটী অধিকার করিবার জন্য সৈন্যগণ প্রাণপণ করে তাহা হইলে হয় ত তাহারা বিধ্বস্ত বা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু সৈন্য-সংখ্যা কমই হউক, আর ধ্বংসই হউক, রাজভক্ত সৈনিক তাহাদের বিশ্বাসের আধার সেনাপতির পালন বিষয়ে কি কোনও মতভেদ করেন?—কখনই নহে। সৈনিক ও সেনাপতির উপর যখন কোনও অসম্ভব কর্ম্মসাধনের আদেশ হয়, তাহা পালন করিতে কখনও তাঁহারা ইতস্ততঃ করেন না; সৈনিকগণ সেনাপতির আদেশ ও আপন কর্ম্মশক্তির উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ করে ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যে পর্য্যন্ত না শেষ সৈনিকটী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, যে পর্য্যন্ত সৈনিকের মৃত্যদেহ স্তূপীকৃত হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা যুদ্ধ করে। যাঁহারা যুদ্ধের অংশ মাত্র দেখিয়া ফলাফল সম্বন্ধে বাগ্‌বিতণ্ডা করেন, তাঁহাদিগের নিকট হয় ত ইহা লোকক্ষয়কর অনর্থক সংগ্রাম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু বহুস্থলে শত্রুগণের প্রখর দৃষ্টি ইহাদিগের উপরেই অধিক পরিমাণে পতিত হয়; ফলে, বিরুদ্ধপক্ষের অন্যান্য সৈন্যের গতিবিধি আর তাহাদের লক্ষ্যীভূত হয় না।

এই কারণেই বিজয়লক্ষ্মী বিরুদ্ধপক্ষেরই করায়ত্ত হয়। দেশবাসিগণ যখন বিজয়ী বীরগণের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতার কীৰ্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করে, তখন যাহাদের জীবন-ধ্বংসে, যাহাদের অকৃতকার্য্যতায় তাহাদের সমযোদ্ধাদিগের জয়লাভের সোপান রচিত হইয়াছিল, তাহাদের গৌরবগাথা তাহাতে সুবর্ণাক্ষরে খোদিত হয়। অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন মানবের পক্ষেও এই কথা। তিনি জানেন যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য কখনও বিফল হইতে পারে না। কর্ম্ম-সংগ্রামের প্রথমে যাহাই হউক না কেন, পরিণামে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তিগত কর্ম্মের বৈকল্যে প্রকৃত কর্ম্মীর কি আসে যায়? যিনি এক অখণ্ড সত্তাকে অবগত আছেন তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্ম যদি পার্থিব বিচারে নিরর্থক প্রতিপন্ন হয়, তাহাতে বস্তুতঃই কিছু আসে যায় না; কেন না, মানবজাতির মুক্তিই তাঁহার উদ্দেশ্য। আর ইহাতেই তাঁহার কর্ম্মের প্রকৃত পরিসমাপ্তি। এ সংসারে প্রতিপত্তিলাভ সময়োপযোগী কোন সদনুষ্ঠান তাঁহার উদ্দেশ্য নহে;—উদ্দেশ্য মানবজাতির মুক্তি। এই বিরাট্ অনুষ্ঠানে তাঁহার অনুষ্ঠেয় অংশ হয় ত সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত না হইতে পারে—হয় ত তাহা দৃশ্যতঃ সম্পূর্ণ অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু অনুষ্ঠিত কর্ম্মের নাশে প্রেরণার বিনাশ হয় না, বরং উহা অধিকতর শক্তিমতী হইয়া মূল অনুষ্ঠানের সফলতার আনুকূল্য করে।

কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ম্মকরার অর্থও এই। ভালমন্দ ফলাফলের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া কর্ম্ম করাই প্রকৃত কর্ত্তব্যসম্পাদন। এই প্রকারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিলে জীবনের কর্ম্মভার লঘু হয়; শান্তি, শক্তি, অপক্ষপাতিত্ব ও অকুতোভয়তা হৃদয়ে চির অধিকার স্থাপন করে; কেন না, প্রকৃত কর্ম্মী কোনও কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও তাহাতে আসক্ত রহেন না। কোনও কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে তাহাতে আর তাঁহার চিন্তা করিবার কিছুই থাকে না। সাধারণ সাংসারিক ব্যক্তি কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি লইয়া যেরূপ লাভা-লাভের বিচার করে, নিষ্কামকর্ম্মী কখনও সেরূপ করেন না। কারণ তিনি জানেন যে জীবন এক অদ্বিতীয় পূর্ণ পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিতেছে, সেখানে আবার ব্যক্তিগত লাভালাভ ফলাফল কি? কর্ম্মের ভিতর এই নিষ্কামতা, ফলাফলে এই অনাসক্তিই শান্তির গুপ্তনিবাস। আমরা ত অহরহঃই প্রত্যক্ষ করি, ফল কামী কর্ম্মী কর্ম্মসিদ্ধির আশায় কত না দুঃখকষ্ট, কত না উদ্বেগ আশঙ্কা সদাই সহ্য করেন! তিনি কখন শক্তি সামর্থ্য, কখন সুযোগ সুবিধা, আবার কখনও বা সম্ভাবনা ও অসম্ভাবনার চিন্তায় অস্থির। কিন্তু যিনি নিষ্কাম,

লাভালাভে যাঁহার দৃক্‌পাত নাই, কর্ত্তব্য বলিয়াই যিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি দৈবশক্তিতে শক্তিমান্, লক্ষ্য ও সিদ্ধি তাঁহার নিশ্চিত।

এই নিষ্কামতাই উন্নতির প্রথম ও প্রধান সোপান। এই সোপানে আরোহণ করিতে হইলে নিষ্কামতার মধ্যে যে গুপ্ত সত্য নিহিত আছে তাহা আমাদের স্মরণ করিতে হইবে; আমাদের সমস্ত কর্ম্মশক্তির অভ্যন্তরে শ্রীভগবানের সেই মহতী শক্তি ক্রিয়া করিতেছে,—আমরা যেন ক্রীড়নক, সেই লীলাময়ের অচিন্ত্য শক্তিই আমাদিগকে ক্রিয়াপর করিতেছে। এই রহস্যের নামান্তর "কর্ম্মে অকর্ম্ম।"

সংসারক্ষেত্রে যিনি প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা লাভে অভিলাষী তিনি কর্ম্মের মধ্যে অকর্ম্ম অর্থাৎ নিষ্কামতা দেখিবেন। ব্যবহারাজীবরা বিচারক যে কেহই হউন না কেন, তাঁহাকে কর্ম্মের মধ্যে ভগবৎ-সত্তার গুপ্ত শক্তি অনুভব করিতে শিক্ষা করা উচিত। তাহাকে মনে করা উচিত যে তিনি বিশ্ববিচারকের অবতার-স্বরূপ। কেহ হয় ত প্রশ্ন করিবেন "আমরা যে সকল বিধি ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহার প্রণেতা বা ব্যাখ্যাতা কি আপনাকে বিশ্ববিচারকের অবতার ভাবিতে পারেন?" হাঁ, তাহাই ভাবিতে হইবে, সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের প্রবর্ত্তিত বিধান যতই ভ্রমসঙ্কুল বা পক্ষপাতদুষ্ট হউক না কেন, উহা সেই সর্ব্বনিয়ন্তার অভ্রান্ত বিধানেরই অনুকৃতি এবং উহার চরম লক্ষ্য সর্ব্বপ্রকার ভ্রমপ্রমাদ অতিক্রম করিয়া সেই অভ্রান্ত আদর্শের স্বারূপ্যলাভ। সুতরাং যদি ব্যবহারাজীব বা বিচারক যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রয়াসী হয়েন, তবে তাঁহাকে অবশ্য মনে করিতে হইবে– "আমি এ সংসারে সেই বিশ্ববিচারকেরই প্রতিহস্ত, কারণ আমি ব্যবস্থাদাতা বা দণ্ডপ্রণেতার ভার গ্রহণ করিয়াছি।" এইরূপ সর্ব্বক্ষেত্রেই সকল মানবকে ঈশ্বরের অবতারস্বরূপ মনে করা উচিত। এখানে ধরুন ব্যবসায় বাণিজ্যের কথা। ইহা বিশ্বমানবের জীবিকানির্ব্বাহের মুখ্যতম উপায়—অর্থাৎ বিশ্বপিতার পালন-কর্ম্মের অঙ্গীভূত। সুতরাং যিনি বণিক্ তাঁহাকে মনে করিতে হইবে যে, যে সঞ্জীবনীশক্তি সমগ্র মানবকে এক পরিবারভুক্ত করিতেছে। তিনি সেই প্রাণশক্তিরই অংশবিশেষ। তিনি এই সংসারে সেই বিশ্ববণিকের প্রতিভূ এবং তাঁহার পালন-শক্তির মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ। যাঁহারা মানবজাতির শাসক এবং পরিচালক, তাঁহারাও ঐশীবিধির বিধায়ক প্রতিনিধি মাত্র। যখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে তাঁহারা শ্রীভগবানের অবতাররূপে তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া, তাঁহার সংসারে তাঁহারই

প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন, তখনই তাঁহাদের কর্ম্ম সুচারু ও সুফলপ্রসূ হয়। আমি জানি রাজনীতির ক্ষুদ্র দলাদলি ও সামান্য বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে এই অভয়বাণী কি অদ্ভুত। কিন্তু মানবের নৈতিক অবনতি ঈশ্বরের সত্তার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রত্যেক শাসকের মধ্যেই তা তিনি উচ্চ বা নিম্ন পদাধিরূঢ় হউন না কেন, ঐশী-শক্তি ক্রিয়াপরা এবং তাঁহার পূর্ণ প্রকাশেই মানবজাতির জীবন প্রকৃত মহত্ত্ব সুখ এবং পরিত্রাতার আধার হইবে। এই বিস্তীর্ণ সংসারক্ষেত্রের বিভিন্ন পথযাত্রী যদি কয়েকজন মাত্র ব্যক্তিও এইরূপ আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করেন;—যদি সর্ব্ববিধ ব্যক্তিগত কর্ম্মের ফলকামনা ত্যাগ করিয়া মনে করেন যে তাঁহারা ভগবানের কর্ম্মশক্তিতে শক্তিমান্, তাঁহারাই ভগবানের অনন্ত বিভূতির অনন্তরূপের মূর্ত্তিভেদ, তবে এ সংসারে মানবজীবন কতই না সুন্দর এবং কতই না মহান্ হইত!

গার্হস্থ্য জীবনেও এই কথা। বিশ্ব-সংসারে ভগবান্ যেমন সকলের রক্ষক ও প্রতিপালক, গৃহস্বামীও তদ্রূপ ভগবানের দ্বিতীয় মূর্ত্তিতে সংসারের সকলের রক্ষক ও প্রতিপালক। সুদূর অতীতেও এইরূপ কথিত হইত। একখানি হিন্দুধর্ম্মের পুস্তকে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্বয়ম্প্রকাশরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা বা শাসক। এ সংসারে গৃহস্বামীকে মনে করিতে হইবে যে, তিনি ঈশ্বরের প্রতিরূপ বা অবতার; স্ত্রী পুত্রাদি তাঁহার সুখ বা আনন্দের জন্য নহে। তিনি যাহাতে পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া পূর্ণ মানবত্বের—পরমেশ্বরের প্রতিনিধিত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে পারেন, সেই নিমিত্ত। তদ্রূপ মাতা ও স্ত্রীর মনে করা উচিত যে, তাঁহারা প্রকৃতির আর এক মূর্ত্তি, মহামায়া সংসারে নারীরূপে আবির্ভূতা; প্রকৃতি যেমন সন্তানবর্গের ক্ষয় নিবারণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য অকাতরে অবিশ্রান্তভাবে আপন ভাণ্ডার বিতরণ করিতেছেন, গৃহাশ্রমে মাতা ও স্ত্রীকে সেইরূপই করিতে হইবে। বিশ্বপিতা ও বিশ্বমাতা যে প্রকারে এ সংসারকে পালন ও রক্ষাবিধান করেন, যেখানে অধ্যাত্ম জীবনের বিকাশ হয়, সেখানেও পিতা মাতা সেই প্রকারে তাঁহার সন্তান সন্ততিগণের পালন ও রক্ষাবিধান করিয়া থাকেন। এই প্রকারে সকল জীবনই সুন্দর ও সুখময় হইতে পারে এবং স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে অধ্যাত্মজীবন যাপন করিয়া আপন পরিবার ও তৎসঙ্গে সমগ্র জগৎ সুখ ও শান্তির নিলয় করিতে পারেন।

অতঃপর মানবকে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে হইবে। যখন

মানব কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে কর্ম্ম করে, তখন সে তাহাতে বিমল আনন্দ পায়; ইহাই পরার্থে আত্মদান। যখন মানব আপনাকে এ সংসারে সেই পরমেশ্বরের প্রতিভূমাত্র মনে করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিবে না, অপিচ স্থির জানিবে যে, যে অখণ্ডসত্তার আত্মদানে এই বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি এবং ক্রমোন্নতি, সে তাঁহারই অংশ, তখনই তাহার প্রকৃত আত্মদর্শন হইবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে সেই অব্যয় আত্মার বিপরিণামেই এই বিরাট্ বিশ্বের উৎপত্তি এবং স্থিতি। সুতরাং যখন মানব বুঝিতে পারে যে, এই অতুলনীয় আত্মদানেই এই বিশ্বের জীবন প্রতিষ্ঠা, তখন সেই মহান্ দানযজ্ঞে আপনাকে উৎসর্গীকৃত করা অপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক, অধিকতর প্রাণোন্মাদ অনুষ্ঠান আর কি হইতে পারে? আপনার ক্ষুদ্র সত্তার উৎসর্গে এই বিপুল বিশ্বের প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা মহনীয় কার্য্য আর কে করিতে পারে? যাঁহারা প্রকৃতরূপে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই মুখে শোভা পায় "সেই অখণ্ডসত্তার সন্ধান পাইলে শোক দুঃখ মায়া মোহ আর কোথায় রহিবে?" আত্মবিদের আনন্দের মূলে এই রহস্যই বর্ত্তমান। বাহ্যতঃ তিনি সর্ব্বত্যাগী কিন্তু অন্তরে তিনি সর্ব্বেশ্বরের ঐশ্বর্য্যপূর্ণ।

আমরা বহুবার বক্ষ্যমাণ চিরন্তন সত্যসম্বন্ধে বলিয়াছি। ভৌতিক সত্তার পরিপুষ্টি—গ্রহণে, কিন্তু অধ্যাত্মসত্তার পরিপুষ্টি—বিসর্জ্জনে। আদর্শত্যাগী খৃষ্ট এই চিরন্তন সত্যের প্রতিধ্বনি করিয়াই বলিয়াছিলেন—"গ্রহণ অপেক্ষা ত্যাগই শ্রেষ্ঠ।" বস্তুতঃ যাঁহারা বিশ্বহিতের বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা আত্মসুখের উপকরণ আহরণে তিলমাত্র উৎসুক হয়েন না। আত্মবিসর্জ্জনের ফলে হৃদয়কন্দরে যে অনাবিল আনন্দ উৎস উচ্ছলিত হয়, তাহার চির নিবৃত্তিকর অমিয়ধারা পানে তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। যদি আমরা আমাদের অন্তরস্থ ঐশী প্রেরণা আত্মসুখান্বেষণে নিযুক্ত রাখিতাম, তাহা হইলে বিমলতোয়া গিরিতরঙ্গিণী পর্ব্বতকন্দরে নিরুদ্ধ হইয়া যেমন শীঘ্রই কলুষিত হয়, আমাদেরও অধ্যাত্মজীবনেরও সেইরূপ অবস্থা হইত। কিন্তু যে জীবন ঐশী প্রেরণায় পরিচালিত, সে আপনাকে এরূপে সীমাবদ্ধ করিতে পারে না; সে যতই আপনাকে বিশ্বহিতে বিলাইয়া দেয়, ততই তাহার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। অতএব বিসর্জ্জনের নামে ভীত হইও না।

আমরা যে পরিমাণে পরার্থে আত্মত্যাগ করিতে সমর্থ হইব, আমাদের অধ্যাত্মজীবনও সেই পরিমাণে পূর্ণতা লাভ করিবে। এই ভেদমূলক ভৌতিক

জগতে সকলেই দেখে যে, দানে বস্তুমাত্রই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু হে অধ্যাত্ম-পথের পথিক! তুমি এই দৃশ্যে বিমুগ্ধ হইও না। অবশ্য যে বিপুল বিভবের অধিকারী, অবিরত দানে সেও শীঘ্রই নিঃস্ব হইয়া যায়, কিন্তু অধ্যাত্মজগতে এ নিয়ম কার্য্যকর নহে; অধ্যাত্মবিভব দানে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, অপিচ অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমরা যত দান করি, আমাদের ভাণ্ডার ততই প্রসারলাভ করে। সুতরাং আমাদের অন্তঃসার শূন্য হইবার ভয় কোথায়? আমার অস্তিত্ব ত আমার ব্যক্তিগত সত্তাটুকুই নহে; অপর সকলের ব্যক্তিগত সত্তাও যে আমার সহিত একই অধ্যাত্মসংযোগে চির সংযুক্ত। একবার যদি আমরা এই অনুভূতির অধিকারী হই, একবার যদি বুঝিতে পারি যে, এই ক্ষুদ্র আমির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, উহা সেই অখণ্ড অব্যয় সত্তার অংশমাত্র, তাহা হইলে মানব-জীবনের প্রকৃত আনন্দের আস্বাদ পাই, এবং আপনাকে সেই অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী জানিয়া চির নিবৃত্তিলাভ করিতে পারি। তখন সংসারের যে সকল তুচ্ছ প্রলোভনে আমাদিগকে একদা আকৃষ্ট করিত, তাহারা সেই সচ্চিদানন্দের চির প্রোজ্জ্বল জ্যোতিতে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে এবং তখনই আমরা বুঝিব যে, বক্ষ্যমাণ মহাবাক্যই চরম সত্য;—"যে এ সংসারে আপনার জীবনকে বিলাইয়া দেয়, সে তাহাকেই অনন্ত জীবনে সঞ্চিত দেখিতে পাইবে।"

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

কৃষক।

ফসল যদি ফলাতে চাও, তবে কৃষক হতে হবে। আসল যাকে কৃষক বলে তাই হতে হবে। যারা বিশ্বকুড়ে, তারা কখন ভাল কৃষক হতে পারে না। ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, কাদা, শীত কিছুতেই মজবুত চাষাকে দমাতে পারে না। চাষার প্রখর দৃষ্টি তাহার কাজের উপর, সে সুবিধা অসুবিধা লাভ লোকসান কড়াক্রান্তির বড় হিসাব রাখে না। ফসল ফল্‌লেই সে বুঝে, তাহার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে, কতটা পরিশ্রমে কতটা ফসল হইলে তবে ঠিক লাভ হইতে পারে, এ সব সূক্ষ্ম হিসাব বেণেদের হয়ে থাকে। চাষা অত সূক্ষ্ম হিসাবের ধার ধারে না। সে জানে দেবতা যদি দয়া না করেন, তবে সব শ্রম তার ব্যর্থ হবে,

তবুও সে শ্রম না করে শোয়াস্তি পায় না। কারণ দেবতা দয়া করলেও কোন ফল হবে না, যদি সে ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করে না রাখে। এ কথা সে জানে বলেই কোন দিন তার পরিশ্রমে কামাই নাই, ক্ষেত্রের পারিপাট্য সাধনে তার আলস্য নাই। তার এই আনন্দ ও সান্ত্বনা যে আমার কর্ম্মদোষ যেন দেবতার দয়া ব্যর্থ না যায়।" তাই সে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, সমস্ত প্রাণটি দিয়ে পরিশ্রম করে এবং উপরের দিকে দয়ার জন্য তাকিয়ে থাকে। ঈশ্বরের দয়ার দাবী সেই করতে পারে, যে অকপট ও নিরমল। আলস্যপরায়ণ বিমূঢ় ব্যক্তি ভগবানের নিকট দয়ার প্রার্থী হইবে কোন্ মুখে? যদি দুর্ব্বৎসরও হয় অর্থাৎ অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈব দুর্য্যোগ অবশ্যম্ভাবী রূপে এসে উপস্থিত হয়, তবুও সাধু কৃষককে কখন একেবারে হতাশ হতে হয় না। যদি দেবতা ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে ফসল ভাল ফলে, তবে তার যে কি আনন্দ সে বর্ণনাতীত বল্লেই হয়। তখনও কিন্তু এই শুভ সংযোগের জন্য সে নিজে গর্ব্ব অনুভব করে না, বরং এই সফলতার জন্য সে দেবতাকেই ধন্যবাদ দেয়।

সাধনার ক্ষেত্রেও মানুষকে ঠিক এই প্রকার কৃষক হতে হয়। এইরূপ অভিমানশূন্য অনলস ভক্তিযুক্ত সাধকের সাধনাই প্রকৃত সাধনা। আলস্য ও অভিমান হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে না পারিলে, সাধনার চাষ কেহ বজায় রাখিতে পারে না। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করতে হবে, অথচ ফলসন্ধানরহিত হয়ে। ফল যে কি ফল্‌বে, তাহা ফলবিধাতাই জানেন। কিন্তু এ কথা মনে করে শিহরিয়া উঠিলে চলিবে না, বা কোন প্রকার দীনতা দেখাইলেও চলবে না। কিছু না হলেও চাষ বজায় করে যেতে হবে, ভয় পেয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাক্‌লে চলিবে না। কেবল এইটুকু বিশ্বাস রাখতে হবে যে দেবতার দয়া এক দিন না এক দিন আস্‌বেই, আমাকে নিরুদ্যম দেখে তাঁকে যেন হতাশ হয়ে ফিরে যেতে না হয়। এটুকু মনের বল যার নাই, তার সাধনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াই বিড়ম্বনা। সাধনভূমির যে কৃষক ঔদ্ধত্য, অভিমান তাহার পক্ষে একান্তই অযোগ্য। এক দিন নবীন উষার আলোকচ্ছটায় যখন দিগ্‌দিগন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে, যখন মুহুর্ম্মুহুঃ শঙ্খনির্ঘোষে রাজাধিরাজের আগমনবার্ত্তা প্রচার কর্‌বে, তখন ভক্ত সাধক বিনম্রহৃদয়ে ধীরে ধীরে বিশ্বসভার এক অলক্ষিত প্রান্তে আসিয়া তাঁহার কৃপালাভার্থ অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। দেবতার কৃপাপ্রার্থীদের ভিড় যখন কমিয়া যাইবে, তখন দেবতার সম্মুখে আসিয়া ভক্ত সাধক করযোড়ে তাঁহার আদেশের অপেক্ষা করিয়া ভক্তিবিহ্বল-

চিত্তে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিবে। বসন্তাগমে ফুলের নব মঞ্জরীর ন্যায় একটি নব ভাবের গন্ধ বিকশিত হইয়া ভক্তের প্রাণ আকুল করিয়া তুলিবে। তখন বিহ্বল ভক্তের চিত্ত গাহিয়া উঠিবে—

"আমি আসিয়াছি আমায় দিতে,
কে লইবে মোরে হাত পেতে।
মলয় বায়ু ধীরে বহে যায়, সে কোন দেশেতে ধায়
ফুলের সুবাস নিয়ে ও কার চরণে লুটায়
সে আমায় নিয়ে যায় না কেন দিতে তাঁরি পায়
কে আমার নিবি হয়ে, গোপন-পথে আয় দেখিরে
আমি বসে আছি কত যুগ তারি আশাতে॥

শ্রীভুপেন্দ্রনাথ।

পঞ্চীকরণাখ্য জীববাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

উপরি উক্ত বিয়াল্লিশ তত্ত্বের যদি একটী কম হয় তাহা হইলে জাগ্রত অবস্থায় সেই পরিমাণে কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। শয্যা হইতে উঠিয়া শয়ন পর্য্যন্ত যত কার্য্য হয় সে সকলকে জাগ্রত ক্রিয়া কহে। হে শিষ্য! তুমি ঐ সমস্ত কার্য্যের জ্ঞাতা, অতএব তুমি উহাদিগের হইতে ভিন্ন।

জাগ্রত অবস্থার স্থান নেত্র, কারণ জাগ্রত ব্যবহার সমস্ত কার্য্য প্রধানতঃ নেত্র দ্বারাই হইয়া থাকে। জাগ্রত অবস্থার বৈখরী বাণী। ১ কণ্ঠ, ২ তালু, ৩ জিহ্বামূল, ৪ দন্ত, ৫ ওষ্ঠ, ৬ নাসিকা, ৭ হৃদয়, ৮ মস্তক,—এই আট স্থান দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয় বলিয়া তাহাকে বৈখরী বাণী কহে। এবং ঐ বৈখরী বাণী জাগ্রত ব্যতিরিক্ত স্বপ্নাদি অবস্থায় উচ্চারিত হইতে পারে না, এজন্য উহা জাগ্রত অবস্থারই বলিতে হইবে।

স্থূল ভোগ অর্থাৎ প্রকাশ্য সুখ দুঃখাদি যে সমস্ত ভোগ সে সমস্ত জাগ্রত অবস্থায়ই হইয়া থাকে।

জাগ্রত অবস্থায় শরীরের ক্রিয়ারূপ যে সমস্ত প্রসিদ্ধ ব্যবহার হয় তাহাকে ক্রিয়াশক্তি কহে। রজোগুণ অর্থাৎ অভিমান দ্বারা রাগদ্বেষাদি প্রযুক্ত যে রাজসিক ব্যবহার হয় তাহা এই অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। অকার মাত্রা—

বিশ্ব অভিমান অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায় বুদ্ধিতে আত্মার যে আভাস পতিত হয় তাহা বৈশ্বানর নামে খ্যাত। তাৎপর্য্য এই যে জাগ্রত অবস্থায় জীব (চিদাভাস) কর্ত্তা ভোক্তা অভিমানী থাকেন।

হে শিষ্য! এই সমস্ত তত্ত্বের তুমি জ্ঞাতা, এজন্য উহা তুমি নহ এবং সে ঐ সব তত্ত্ব জাগ্রত অবস্থার সম্বন্ধী, অতএব তোমার নহে। তুমি ঐ সকলের দ্রষ্টা সাক্ষী।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথমোক্ত ক্রোধাদি পঁচিশ স্থূলদেহের তত্ত্ব এবং শেষোক্ত জাগ্রতাদি আটতত্ত্ব সর্ব্বশুদ্ধ তেত্রিশ তত্ত্ব স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। হে শিষ্য! তুমি উহাদের দ্রষ্টা এবং উহারা তোমার দৃশ্য। এজন্য উহারা তোমার নহে। তুমি উহাদের হইতে সদাই ভিন্ন। তুমি উহাদের একটু লেশ মাত্রও নহ। এ বিষয়ে বেদের প্রচুর প্রমাণ আছে এবং শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বাক্যবৃত্তি নামক গ্রন্থে দেহ হইতে আত্মা ভিন্ন নিরূপণ করিয়াছেন।

শ্লোক :—"ঘটদ্রষ্টা ঘটাদ্ভিন্নঃ সর্ব্বথা ন ঘটো যথা।
দেহদ্রষ্টা তথা দেহো নাহমিত্যবধারয়েৎ॥"

অর্থ :—যে প্রকার ঘট দ্রষ্টা ঘট হইতে ভিন্ন, সে কদাপি ঘট (দৃশ্য) হইতে পারে না, সেই প্রকার দেহ দ্রষ্টা যে আমি দেহ হইতে ভিন্ন, আমি কদাপি দেহ হইতে পারি না এই প্রকার অবধারণ কর।

যে প্রকার ঘট পঞ্চভূত হইতে নির্ম্মিত এজন্য জড় ও দৃশ্য, সেইরূপ এই তোমার দেহ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন অতএব জড় ও দৃশ্য, সুতরাং ঘটেরই তুল্য। ইহার দ্রষ্টা তুমি চৈতন্য।

শিষ্য :—হে গুরো! ঘট যে ভাবে নির্ম্মিত হয় সেই ভাবেই থাকে কিন্তু এই শরীর ত উৎপন্ন হইবার পর ক্রমেই বাড়িয়া যায়, গমনাগমন করে এবং নানাপ্রকার ক্রিয়ায় রত থাকে। ইহার চৈতন্য অনুভূত হয় সুতরাং উহা ঘটের ন্যায় জড় কিরূপে হইতে পারে?

গুরু :—হে শিষ্য! দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এজন্য যে উহাকে চেতন কহিবে তাহা নহে। যেমন গৃহের ভিত্তির উপর প্রতিদিন ইট গাঁথিলে উহা ক্রমশঃই উচ্চতায় বাড়িয়া যায়, এবং জমির উপর ক্রমাগত জঞ্জাল ফেলিতে ফেলিতে উহা

ক্রমশঃ বড়িয়া যায়, একারণ যে উহা চেতন হইবে তাহা নহে; সেইরূপ দেহেতে ত প্রতিদিন অন্ন, জল, শাক, মেওয়া প্রভৃতি নানা বস্তু খাদ্যরূপে দত্ত হয় সুতরাং উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এ কারণ উহাকে চৈতন্য কহিতে পার না। যেরূপ উত্তপ্ত লৌহ অগ্নিসংযোগে দহনশক্তি প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার চৈতন্য আত্মার সংযোগে দেহে চৈতন্যতা অবলোকিত হয়, বাস্তবিক উহা স্বয়ং চেতন নহে সুতরাং উহা জড়। তুমি তাহার দ্রষ্টা অতএব উহা হইতে ভিন্ন, অজর, অমর, চৈতন্য, নির্বিকার আত্মা।

শিষ্য :—হে গুরো! আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং একদিন অবশ্য মরিয়াও যাইব, তথাপি আপনি আমাকে অজর, অমর, কেন কহিতেছেন?

গুরু :—হে শিষ্য! যাস্ক নামক আচার্য্য দেহে জন্মাদি ষড় বিকার নিরূপণ করিয়াছেন। উহা আমি তোমাকে বলিতেছি শুন। দোহা যথা—

"জায়তে অস্তি বৰ্দ্ধতে, বিপরিনমতে জোয়।
অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি, ষট্ বিকার কহি সোয়॥"

টীকা :—জায়তে (জন্মায়) অস্তি (জন্মের পর থাকে) বৰ্দ্ধতে (জন্মের পর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়) বিপরিনমতে (যুবাবস্থা প্রাপ্ত হয়) অপক্ষীয়তে (বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়) অবশেষে বিনশ্যতি (মরিয়া যায়) দেহের এই ষড়বিকার।

উপরি উক্ত জন্মাদি ছয় বিকার এই স্থূল দেহের, কিন্তু তুমি সেই স্থূল দেহ নহ। তুমি স্বয়ং নির্বিকার আত্মা। দেহ বিকারী হইলেও আত্মা বিকারী নহে। যে প্রকার মৃত্তিকা হইতে ঘট নির্ম্মিত হয়। এক্ষণে ঐ ঘটের মধ্যে যে আকাশের অংশ থাকে, তাহাকে ঘটাকাশ কহে। সেই আকাশ কিছু নূতন ত উৎপন্ন হয় নাই; পরন্তু উহা ত ঘট উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ছিল এবং ঘট নামের পরও থাকিবে। কিন্তু ঘট উৎপন্ন হইবার পর "ইহা ঘট" এই প্রকার অনুভব হয়। প্রথমে ঘট জন্মায়, তৎপরে উহাকে পিটিয়া বাড়ান যায়। অগ্নিতে পক্ক হইবার পর পূরা সমস্ত ঘট হইলে পরিণাম অবস্থায় আইসে। পশ্চাৎ ঠোকর লাগিয়া ছিদ্র হইলে ত বৃদ্ধ হইয়া নাশ প্রাপ্ত হয়। এই ঘট ত নানাপ্রকার বিকার প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে নাশ হইয়া যায়, কিন্তু উহার ভিতরের আকাশ তাহার কিছু বিকার আইসে কি? কিছুই নহে; কারণ আকাশ নিরবয়ব অসঙ্গ এবং নির্লিপ্ত।

উহার ন্যায় :এই দেহ (পিতার দেহ হইতে মাতৃগর্ভে) জন্মগ্রহণ করে, তৎপরে জন্ম লইয়া মাতৃগর্ভে থাকিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, পরে জন্ম গ্রহণ করে, পরে

যৌবনকাল প্রাপ্ত হয়, অবশেষে বৃদ্ধাবস্থা ধারণ করিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়; কিন্তু তুমি আত্মা এই সমস্ত বিকার হইতে রহিত, নির্বিকার, নিরবয়ব এবং অসঙ্গ।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—
আত্মা জন্মাদি ছয় বিকার হইতে রহিত।

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

অর্থ:—এই অপরোক্ষরূপ আত্মা কখনও জন্মানও নাই ও মরেনও না কিংবা জন্মগ্রহণ করিয়া যে অস্তি আদি নানাপ্রকার বিকার প্রাপ্ত হন তাহাও নহে কিন্তু তিনি অজ (অজন্মা) নিত্য (বিপরিণাম রূপ চতুর্থ বিকার রহিত একরূপ) পুরাণ (বৃদ্ধি বিকার রহিত অনাদি সিদ্ধ) শস্ত্রাদি দ্বারা শরীরের নাশ হয় কিন্তু আত্মার নাশ কদাপি হয় না।

এজন্য হে শিষ্য! গুরুর বচনে বিশ্বাস করিয়া এরূপ নিশ্চয় কর যে "আমি আত্মা অসঙ্গ এবং নির্বিকার"। এই অনুভব দৃঢ়রূপে অন্তঃকরণে ধারণ করিলেই তোমার জন্ম মরণ রূপ বন্ধন নিবৃত্তি হইয়া যাইবে।

এই প্রকারে যখন গুরু স্থূল দেহ হইতে আত্মা ভিন্ন সিদ্ধ করিয়া সেই স্থূল দেহ হইতে শিষ্যের অহংতা মমতারূপ অধ্যাস নিবৃত্তি করিলেন, তখন শিষ্য শঙ্কা করিতে লাগিল যে স্থূল দেহ ত আমি নহি পরন্তু স্থূল দেহ হইতে ভিন্ন সূক্ষ্ম দেহ ত আমি হইতে পারি?

সূক্ষ্মদেহবর্ণন—

শিষ্য:—শিষ্য কহিল, হে গুরো! আপনার উপদেশে আমি নিশ্চয় করিয়াছি যে আমি স্থূল দেহ নহি কিন্তু সূক্ষ্ম দেহ হইতে পারি এরূপ বোধ হইতেছে।

তখন গুরু উত্তর করিলেন—

গুরু:—হে শিষ্য! সূক্ষ্ম দেহও তুমি নহ। লিঙ্গ (সূক্ষ্ম) দেহও তোমার দৃশ্য। তুমি উহার দ্রষ্টা—সৎচিদানন্দ স্বরূপ।

গুরু সূক্ষ্ম দেহ বিষয়ে পূর্ব্বোক্তপ্রকার কহিয়া "লিঙ্গদেহ তুমি নহ" এইরূপে লিঙ্গদেহ হইতে শিষ্যের অধ্যাস নাশ করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিলেন কিন্তু বিস্তারপূর্ব্বক লিঙ্গদেহের স্বরূপ বর্ণন করিলেন না, এজন্য শিষ্য পুনর্ব্বার লিঙ্গদেহকেই আত্মা জ্ঞান করিয়া গুরুকে প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

শিষ্য কহিল, হে গুরো! স্থূল দেহ ত আমি নহি, কারণ পঞ্চভূতের কার্য্য

পঁচিশ তত্ত্বের সমষ্টি রূপ যে স্থূল দেহ উহা ভৌতিক এবং পিতা মাতার শুক্র শোণিত হইতে ইহার উৎপত্তি এবং অস্থি মাংস রক্ত মল মূত্র কফ প্রভৃতি অত্যন্ত অপবিত্র পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ। ইহার নবদ্বার হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল, মূত্র, কফ প্রভৃতি নিত্য বহির্গত হইতেছে। এই পর্য্যন্তই নহে, পরন্তু ইহাতে নানাপ্রকার মেওয়া মিষ্টান্ন প্রভৃতি পবিত্রপদার্থ প্রদান করিলে অবিলম্বে পরিবর্ত্তন হইয়া বিষ্ঠা রূপে পরিণত হয়। অতিউত্তম পবিত্রবস্ত্রাদি শরীরের সংস্পর্শে অপবিত্র ও দুর্গন্ধ ও মলিন হইয়া যায়। এই প্রকার অত্যন্তমলিন এবং নানা প্রকার বিকারের মূলীভূত এই স্থূল দেহ আমি নহি। উহা দৃশ্য, আমি দ্রষ্টা। যখন আমি স্থূলদেহ নহি তখন ইহার ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণ, এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমও আমার নহে। এইরূপ স্থূল, কৃশ, গৌর, বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, প্রভৃতি স্থূল দেহের যে যে ধর্ম্ম তাহার একটীও আমাতে নাই। এই সমস্ত আমি অনুভব পূর্ব্বক অবগত আছি। কিন্তু স্থূল দেহের ভিতর যে সূক্ষ্ম দেহ আছে তাহাত আমিই বটে। যে হেতু স্থূল দেহে গমন আগমন ভ্রমণ শ্রবণ ইত্যাদি যে সকল ব্যবহার হইয়া থাকে সেই সমস্ত সূক্ষ্ম দেহরূপ আধার হইতেই হইয়া থাকে। যে হেতু স্থূল দেহে দর্শন ক্রিয়া চক্ষু হইতে, শ্রবণ ক্রিয়া শ্রোত্র হইতে, শব্দ উচ্চারণ বাক্‌শক্তি হইতে ইত্যাদি যত প্রকার স্থূল দেহের ব্যবহার সে সমস্তই সূক্ষ্ম দেহেস্থিত ইন্দ্রিয় হইতেই জন্মিয়া থাকে। ঐ প্রাণ বলে সূক্ষ্ম দেহ হইতে স্থূল দেহ জীবিত থাকে, যে হেতু প্রাণ বহির্গত হইয়া গেলে স্থূল দেহ কালগ্রাসে পতিত হয়। এই হেতু স্থূল দেহে সূক্ষ্ম দেহেরই মুখ্যতা আছে। আরও দেখ যে পর্য্যন্ত স্থূলদেহে সূক্ষ্ম দেহ আছে সেই পর্য্যন্তই স্থূল দেহে মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি সর্ব্বসম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। যখন সূক্ষ্ম দেহ স্থূল শরীর হইতে বহির্গত হয় তখন সমস্ত সম্বন্ধ বিলীন হইয়া যায় এবং ইহাকেই উক্ত সম্বন্ধবান লোক (অপবিত্র জ্ঞানে) প্রজ্বলিত করিয়া ভস্মাবশেষ করিয়া ফেলে। এই হেতু "আমি সূক্ষ্ম দেহ" ইহা বোধগম্য হইতেছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত আমি বলিতেছি, আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি ক্ষুধিত, আমি পিপাসিত, আমি সুখী, আমি দুঃখী ইত্যাদি অহং প্রত্যয়ও সূক্ষ্ম দেহে প্রত্যক্ষ অবলোকিত হইতেছে। ইহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে আমি সূক্ষ্ম দেহ ভিন্ন আর কিছুই নহি।

গুরু—হে শিষ্য! তুমি সূক্ষ্ম দেহ কিরূপে হইবে? উহাও ভৌতিক,

জড় ও দৃশ্য। তুমি উহার দ্রষ্টা ও সাক্ষী। একারণ তুমি সূক্ষ্ম দেহ নহ। এবং সূক্ষ্ম দেহও পঞ্চভূতের, এজন্য উহা তোমার নহে। তুমি উহার সাক্ষী। এই বাক্য যাহাতে তোমার অনুভবে আইসে এজন্য তুমি যে প্রকার স্থূল দেহের ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের বিচার করিয়া উহা হইতে আত্মাকে ভিন্ন রূপ অবগত হইয়াছিলে, সেই প্রকারে সূক্ষ্মদেহের তত্ত্ব সমুদায়ের বিচার করিয়া উহাকে বুঝিয়া লও এবং আপনাকে সূক্ষ্ম দেহ হইতে ভিন্ন জানিয়া উহার জালে জড়ীভূত হইও না।

শিষ্য—হে স্বামিন্! সূক্ষ্মদেহের কত গুলি তত্ত্ব এবং কোন্ কোন তত্ত্ব কোন্ কোন্ ভূত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা বিস্তারপূর্ব্বক বলুন।

গুরু—হে শিষ্য! সূক্ষ্ম দেহের পঁচিশ তত্ত্ব। পাঁচ অন্তঃকরণ, পাঁচ প্রাণ, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পাঁচ বিষয়। এই পঁচিশ তত্ত্ব আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ্ ও পৃথ্বী এই পঞ্চ মহাভূত হইতে আনুপূর্ব্বিক উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে উহার সুচারু রূপে বোধসৌকর্য্যার্থে এক কোষ্টক নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা উহা হইতে সূক্ষ্ম শরীরের নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে।

সূক্ষ্ম দেহের কোষ্টকের স্পষ্টীকরণ।

উপরিউক্ত কোষ্টকে নিম্নলিখিত প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় প্রক্রিয়ায় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম এবং যথাক্রমে পাঠ করিয়া তত্ত্ব সকলের বিচার অবগত হইবে। এবং চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম প্রক্রিয়ায় উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং যথাক্রমে পাঠ করিয়া তত্ত্ব সকলের বিচার অবগত হইবে।

প্রথম প্রক্রিয়া।

আকাশের—অন্তঃকরণপঞ্চক; (১) অন্তঃকরণ, (২) মন, (৩) বুদ্ধি, (৪) চিত্ত, (৫) অহঙ্কার।

বায়ুর—প্রাণ পঞ্চক; (১) ব্যান, (২) সমান, (৩) উদান, (৪) প্রাণ, (৫) অপান।

তেজের—জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক; (১) শ্রোত্র, (২) ত্বক্, (৩) চক্ষু, (৪) জিহ্বা, (৫) ঘ্রাণ।

জলের—কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চক; (১) বাক্, (২) পাণি, (৩) পাদ (৪) শিশ্ন, (৫) গুহ্যদেশ।

পৃথিবীর—বিষয় পঞ্চক ; (১) শব্দ, (২) স্পর্শ, (৩) রূপ, (৪) রস,
(৫) গন্ধ।

হে শিষ্য! এই সমস্ত তত্ত্বকে তুমি জান, এজন্ম উহা তুমি নহ। তুমি উহাদিগের হইতে ভিন্ন। এই সমস্ত তত্ত্ব পঞ্চভূতের, এ কারণ উহারা তোমার নহে। তুমি এই সমস্ত তত্ত্বের দ্রষ্টা সাক্ষী।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া।

শিষ্য—হে গুরো! এই যে পঁচিশ তত্ত্বের নাম আপনি কহিলেন তাহা আমি জানি ; কিন্তু ইহাদের স্বরূপ যথার্থ অবগত হইবার নিমিত্ত এই সকল তত্ত্বের রূপ এবং উহাদের ক্রিয়া আপনি স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করুন।

গুরু—হে শিষ্য! আমি এক্ষণে সমস্ত তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া কহিতেছি, তুমি শুন।

অন্তঃকরণ—ইহার অভিপ্রায় এই যে শরীরের ভিতরের জ্ঞান যদ্দারা হয় তাহাকে অন্তঃকরণ কহে। সুখ আদির সাধনরূপ করণ (ইন্দ্রিয়) উহার স্বরূপ, প্রথম স্ফুরণ। অর্থাৎ কাজ কর্ম্ম করিবার জন্য সকলের প্রথমে যে স্ফূর্ত্তি জন্মে তাহাকে অন্তঃকরণের কার্য্য কহে। অন্তঃকরণের দেবতা বিষ্ণু, তাঁহা হইতেই স্ফুরণ হয়।

মন—উপরিউক্ত অন্তঃকরণের স্ফুরণানুসারে কার্য্য করা হইবে কি না ইহার বিচার যে ইন্দ্রিয় দ্বারা হয়, তাহাকে মন কহে। ইহাকেই সঙ্কল্প-বিকল্প কহে। মনের দেবতা চন্দ্রমা। চন্দ্রমা দ্বারাই সঙ্কল্প বিকল্প হইয়া থাকে।

বুদ্ধি—মনের সঙ্কল্প বিকল্পের উপর একমাত্র নিশ্চয়াত্মক যে ইন্দ্রিয় তাহাকে বুদ্ধি কহে। ইহার দেবতা ব্রহ্মা, যিনি নিশ্চয় করিয়া থাকেন।

চিত্ত—যে কার্য্য করা স্থির হইয়া গেল তদ্বিষয়ে এই প্রকার চিন্তা করা যে "এই কার্য্য কি রূপে করিলে উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইবে" যে ইন্দ্রিয়দ্বারা এই প্রকার চিন্তা করা যায় তাহাকে চিত্ত কহে। চিত্তের দেবতা নারায়ণ, ইঁহা দ্বারা স্মরণ (চিন্তন) হইয়া থাকে।

অহঙ্কার—এই কার্য্য আমি করিব। এই অভিমানকে অহঙ্কার কহে। ইহার দেবতা রুদ্র, তাঁহা দ্বারা অহঙ্কার (অভিমান) হয়। দেহমধ্যে ইনিই অহঙ্কারের (অহংজ্ঞানের) কর্ত্তা।

অন্তঃকরণ প্রকৃতপক্ষে, একই কিন্তু স্ফুরণ, সঙ্কল্প-বিকল্প, নিশ্চয়, চিন্তন ও অভিমান নামক উহার পাঁচবৃত্তি উৎপন্ন হইলে তাহাদিগের মন আদি পাঁচ

ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে। যে রূপ একটি ব্রাহ্মণ ; তিনি যদিও স্বরূপতঃ একই, কিন্তু যখন পাকাদি ক্রিয়া করেন তখন তাঁহাকে পাচক কহা যায় ; যখন পাঠ করেন তখন পাঠক, যদি জ্যোতিষ জানেন ত তাঁহাকে জ্যোতিষী কহা যায় ; আবার যখন নাড়ী দেখিয়া রোগনির্ণয় করেন, তখন তাঁহাকে বৈদ্য সংজ্ঞা দেওয়া যায়। সেইরূপ একই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে মন বুদ্ধি আদি ভিন্ন ভিন্ন অনেক নাম প্রাপ্ত হয়। হে শিষ্য ! এই সমস্ত অন্তঃকরণ মন আদির তুমি সাক্ষী, উহাদের হইতে ভিন্ন এবং উহাদের দ্রষ্টা। তুমি অন্তঃকরণাদি নহ। উহা বিচার করিয়া দেখ।

পঞ্চ প্রাণ।

ব্যান—এই বায়ু শরীরের সর্ব্বত্র থাকিয়া সন্ধিস্থান সকলকে আলোড়িত (মোচড়) করে।

সমান—ইহা নাভিস্থানে থাকে। প্রাণী মাত্র যে অন্নপানাদি ভক্ষণ করে তাহা জঠরাগ্নিতে পরিপাক হয়। ঐ জীর্ণ অন্ন সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মসার ভাগে পরিণত হইয়া হৃদয়স্থানে যাইয়া মন বুদ্ধিকে পরিপুষ্ট করে। পরে জলের যে সারভাগ উহা প্রাণকে পরিপুষ্ট করে। অন্নজলের পরিশিষ্ট কিছুভাগ অসার মলমূত্রাদি রূপে পরিণত হয়। উহা মলদ্বার, লিঙ্গ ও লোমকূপ দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়। উক্ত দুই প্রকার ক্রিয়ান্তে অবশিষ্ট মধ্যম রসরূপ ভাগকে সমান বায়ু নাড়ীসমূহ দ্বারা সমস্ত শরীরে লইয়া যায়। এই রসেই পরিণামরূপ রক্ত মাংস প্রভৃতি দ্বারা সমস্ত শরীর পুষ্ট হয়। যে রূপ উদ্যানের মালী কূয়া হইতে জল তুলিয়া আবশ্যক মত সমস্ত ক্ষেত্রাদিতে সিঞ্চন করত বৃক্ষ লতাদি সতেজ হরিৎ বর্ণ করিয়া রাখে ও তদ্দ্বারা বৃক্ষাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ শরীররূপ উদ্যানে সমান বায়ুরূপ মালী, অবয়ব এবং লোমরূপ বৃক্ষ ও কেয়ারিকে অন্নের রস-রূপ জলকে নাড়ীরূপ নালা দিয়া সিঞ্চন করিয়া সমস্ত দেহ পরিপুষ্ট করে। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে এ বিষয় (ভুক্তান্নের ক্রিয়া) স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। "অসিতমন্নং ত্রিধা বিধীয়তে·· ·······"

উদান—এই বায়ু কণ্ঠে থাকিয়া মনুষ্য যে অন্ন জল ভোজন ও পান করেন উহা ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ করিয়া দেয়। এবং কণ্ঠে যে হিতা নামক অত্যন্ত সূক্ষ্ম নাড়ী আছে, তাহাতে যে হিচ্‌কী এবং নিদ্রাবস্থায় যে স্বপ্ন উৎপন্ন হয় তাহা এই উদান বায়ুর কার্য্য।

প্রাণ—ইহা হৃদয়স্থানে থাকে। ইহার কার্য্য দিবারাত্রে ২১৬০০ শ্বাসোচ্ছ্বাস।

অপান—ইহা বস্তিস্থানে থাকে। এবং মলবিসর্জ্জনে সহায়তা করে। এই প্রকার পাঁচ বায়ু ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া করে। হে শিষ্য! তুমি উহাদের দ্রষ্টা, এ জন্য তুমি পাঁচ বায়ু নহ। উহাদের ক্রিয়ার তুমি জ্ঞাতা, এ কারণ তুমি ক্রিয়ারূপও নহ। ঐ পাঁচ বায়ু পাঁচ ভূতের, অতএব উহারা তোমার নহে। তুমি ঐ সকলের সাক্ষী নির্ব্বিকার নির্লেপ আত্মা।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়।

শ্রোত্র—কর্ণেন্দ্রিয়ের কার্য্য শব্দশ্রবণ। ইহার দেবতা দিক্, তাহা দ্বারা শব্দ শ্রুত হয়। যদি দিক্ না থাকে তবে শব্দ শুনা যায় না।

ত্বক্—ত্বক্ দ্বারা শীত উষ্ণ কোমল কঠিন প্রভৃতি জ্ঞান হয়। ইহার দেবতা বায়ু।

চক্ষু—চক্ষু দ্বারা রূপের জ্ঞান হয়। ইহার দেবতা সূর্য্য। সূর্য্য বিনা কোন পদার্থের রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না।

জিহ্বা—জিহ্বা দ্বারা অম্ল মধুর লবণ কসায় প্রভৃতি রসাস্বাদন হয়। ইহার দেবতা বরুণ।

ঘ্রাণ—নাসিকা দ্বারা সুগন্ধ, দুর্গন্ধ প্রভৃতি গন্ধ অনুভূত হয়। ইহার দেবতা অশ্বিনীকুমার।

হে শিষ্য! এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে তুমি জান। ইহাদের ক্রিয়াও তুমি জান, এ জন্য তুমি জ্ঞানেন্দ্রিয় নহ। এবং ইহারা পঞ্চভূতের, অতএব তোমার নহে। তুমি ইহাদিগের দ্রষ্টা সাক্ষী, সুতরাং ইহাদিগের হইতে ভিন্ন।

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়।

বাক্ :—বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য বাক্যকথন। ইহার দেবতা অগ্নি, এই দেবতা বিনা বাক্যস্ফুরণ হয় না।

পাণি :—হস্তেন্দ্রিয়ের কার্য্য আদান প্রদান। ইহার দেবতা ইন্দ্র।

পাদ :—গমনাগমন এই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য। ইহার দেবতা উপেন্দ্র (বামন)।

শিশ্ন :—উপস্থেন্দ্রিয়ের কার্য্য মূত্রত্যাগ এবং রতিভোগ। ইহার দেবতা প্রজাপতি। এই দেবতা বিনা (অর্থাৎ প্রজাপতি উপস্থ হইতে চলিয়া গেলে) জীব নপুংসকত্ব প্রাপ্ত হয়।

মলদ্বার :—পায়ু-ইন্দ্রিয়ের দেবতা যম। বিষ্ঠাত্যাগ ইহার কার্য্য।

হে শিষ্য! এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের তুমি জ্ঞাতা, এ জন্য এই সকল ইন্দ্রিয় দৃশ্য, তুমি উহাদিগের দ্রষ্টা। এবং ইহারা পঞ্চভূতের, সুতরাং তোমার নহে। তুমি ইহাদের সাক্ষী জ্ঞাতা, সদা ইহাদিগের হইতে ভিন্ন।

পঞ্চ বিষয়।

হে শিষ্য! এই প্রকার শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ইহারা পাঁচ বিষয়। এই সকল বিষয় অবলম্বন করিয়া অন্তঃকরণ ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়। ইহাদিগের হইতে তুমি আত্মা সদাই ভিন্ন, তুমি বিষয় নহ। ইহাদের দ্রষ্টা সাক্ষী ও জ্ঞাতা। এই পাঁচ বিষয়ে আসক্ত হইয়া প্রাণী মাত্রই দুঃখ ও বন্ধন প্রাপ্ত হয়। অতএব ইহাদের সঙ্গ সর্ব্বদা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এ কারণ হে শিষ্য! তুমি ইহাদিগকে আপনার জ্ঞান করিও না। দেখ, যখন এক এক বিষয়ে আসক্ত এক এক জন্তু নাশ প্রাপ্ত হয় তখন কোন মনুষ্য যদি এই পাঁচ বিষয়ে আসক্ত হয় তাহা হইলে তাহার নাশ কেন না হইবে?

শিষ্য :—হে গুরো! কোন্ কোন্ বিষয়ে আসক্ত হইয়া কোন্ কোন্ জন্তুর নাশ হয় তাহা আপনি আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু :—হে শিষ্য! শব্দ :—শব্দ বিষয়ে আসক্ত হইয়া বনের হরিণ কালগ্রাসে পতিত হয়। যখন ব্যাধ বনে আসিয়া বীণাধ্বনি করত মধুর স্বরে গান করিতে থাকে, তখন উহার শব্দ শুনিয়া মৃগ সকল নিকটবর্ত্তী হয়। এবং গানের শব্দ শুনিয়া এরূপ মোহিত হইয়া যায় যে তাহাদের আপন আপন শরীরের অণুমাত্রও ভান থাকে না। তখন মৃগগণকে নিকটবর্ত্তী ও শরীরজ্ঞান বিবর্জ্জিত দেখিয়া ব্যাধ উহাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলে। এই প্রকার শব্দ বিষয়ে আসক্ত মৃগগণ আসন্ন মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

নিবেদন।

শীতল সমীর বহে তাতে মোর প্রাণ দহে
কুল কুল করে হে আকুল।
সুধাময় সুধাকর যেন বিষের আকর
রম্য বস্তু সব চক্ষুঃশূল।
জপমালা তব নাম সদা করি গুণধাম
ভাসি আমি নয়নের নীরে।
অন্য ভাব নাহি ভাবি হ'য়ে থাকি তব ভাবী
ভাবি কবে পাইব তোমারে।
তুমি মম সার ধ্যান প্রণয়ের প্রস্রবণ
প্রাণ-ধন হৃদয়রঞ্জন।
তরুসনে যথা লতা সেইরূপ আছি গাঁথা
ভাবে মন তব শ্রীচরণ।
তব মূর্ত্তি করি ধ্যান মনে হয় অনুমান
বুঝি প্রাণ না রহে দেহেতে।
মম প্রাণ তব ঠাঁই যেতে সাধ করে তাই
মোর কাছে রবে কি সুখেতে।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

আবেগ।

কেন দেখা দিয়া দেখা দাও না?
আমি আকুল পরাণে কাঁদিয়া বেড়াই
বারেক ফিরিয়া চাও না!
তুমি মুচকি হাসিয়া লুকাও আড়ালে
এ কি নাথ তব ছলনা?
আর কিবা উপহারে তুষিব তোমারে
একবার তাই বল না!

নিয়ে তব সব অতি যতনে
দিই তোমারই ওরাঙ্গা চরণে
শুধু তোমারই প্রেমের ভিখারী, নাহিক
সরগ সুখের কামনা।
আছি হৃদয়মন্দিরে পাতিয়া আসন
রতি বাগে করি রচনা
সিচি অনুরাগ-বারি ধুইয়া ফেলেছি
বিষয়-সুখের বাসনা।
হৃদি আসনে হেরিব বলিয়া
চাহি আশা-পথদ্বার খুলিয়া
পথে ছড়ায়ে রেখেছি ভকতি কুসুম
পদে পাও পাছে বেদনা।
মোরে বালকের মত ভুলাইতে চাও
করে দিয়া মায়া খেলনা
মোর থামিবে রোদন, মাতিব খেলায়
ভুলিব বিরহ বেদনা।
কিন্তু আমিত রয়েছি জাগিয়া
কাঁদি সতত তোমার লাগিয়া
তুমি নিকটে থাকিয়া সাড়াটি না দাও
শুনেও শুনিতে পাও না।
তুমি দয়াময় তবু করমের দোষে
মোরে বুঝি দয়া হ'ল না
মোর যাতনায় যদি সুখ পাও তবে
যত মনে লাগে দাও না।
আমি সহিব যাতনা সহিব
তবু ডাকিব তোমায় ডাকিব
তুমি কাঁদাও কাঁদিব আবার ডাকিব
পূর্ণ হ'ক তব বাসনা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস ভক্তিবিনোদ বি, এ।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ—প্রারম্ভ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অবতরণিকা—পূর্ব্ব শ্লোকদ্বয়ে ক্ষেত্রের স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া এক্ষণে সেই ক্ষেত্রজ্ঞকে ক্ষেত্র হইতে ভিন্ন রূপে বিস্তারপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিবার জন্য সেই ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞানের যোগ্যতা দেখাইবার জন্য শ্রীভগবান্ প্রথমে অমানিত্যাদি বিংশতি সাধনকে পঞ্চশ্লোক দ্বারা কথন করিতেছেন।

১ ২ ৩ ৪ ৫

(মূঃ শ্লোঃ) অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।

৬ ৭ ৮ ৯

আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥৭॥

পদার্থ।—হে অর্জ্জুন। আত্মশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভহীনতা, অহিংসা, ক্ষান্তি, সরলতা, গুরু সেবা, অন্তর্ব্বহিঃ শুচিতা, স্থৈর্য্য এবং আত্মার নিগ্রহ এই সমস্ত জ্ঞানের সাধন হওয়াতে জ্ঞানরূপই জানিবে।

টীকা—যে গুণ আপনার আছে এবং যে গুণ আপনার নাই এইরূপ বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান গুণ দ্বারা যে আপনার স্তুতি তাহার নাম মানীপণা। সেই মানীপণা হইতে রহিত হওয়ার নাম অমানিত্ব। ১। আর লাভ পূজা খ্যাতির নিমিত্ত যে লোকের নিকট আপনার ধর্ম্ম প্রচার করা তাহার নাম দম্ভীপণা। সেই দম্ভীপণা হইতে রহিত হওয়ার নাম অদম্ভিত্ব। ২। আর শরীর মন বাক্য দ্বারা যে প্রাণীদিগের প্রতি পীড়ন তাহার নাম হিংসা। সেই হিংসা হইতে রহিত হওয়ার নাম অহিংসা। ৩। আর চিত্তের ক্রোধাদি বিকারের কারণরূপ যে দুষ্টপুরুষ কৃত অপরাধ সেই অপরাধ দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়াও যে নির্ব্বিকার চিত্তে সেই অপরাধ সহ্য করা তাহার নাম ক্ষান্তি। ৪। আর যেরূপ আপনার মনে হইবে সেই রূপই বাহ্য ব্যবহার করা এই প্রকার যে অকুটিল ভাব, তাহার নাম আর্জ্জব। অর্থাৎ অন্য প্রাণীদিগকে বঞ্চনা না করার নাম আর্জ্জব। ৫।

আর ব্রহ্মবিদ্যার উপদেষ্টা যে আচার্য্য সেই আচার্য্যকে যে শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা নমস্কারাদি দ্বারা সেবা করা তাহার নাম আচার্য্যোপাসন। ৬। আর শুদ্ধির নাম শৌচ। সেই শৌচ দুই প্রকার;—একতো বাহ্য শৌচ, দ্বিতীয় অন্তরশৌচ। তন্মধ্যে জল মৃত্তিকাদি দ্বারা শরীরেরময়লা প্রক্ষালনের নাম বাহ্যশৌচ। আর বিষয় বিষয়ে দোষ দর্শনরূপ বিরোধী বাসনা দ্বারা মনের রাগদ্বেষাদি মলের নিবৃত্তি করার নাম অন্তর শৌচ। ৭। আর মোক্ষের সাধনে প্রবৃত্ত পুরুষের নানা প্রকার বিঘ্ন ঘটিলেও তাহার উদ্যম পরিত্যাগ না করিয়া যে পুনঃপুনঃ প্রযত্নের অধিকতা তাহার নাম স্থৈর্য্য। ৮। আর দেহ ইন্দ্রিয়ের সংঘাতরূপ আত্মার মোক্ষ হইতে প্রতিকূল বিষয়ে স্বভাবতঃ প্রাপ্ত বৃত্তিকে নিরোধ করিয়া যে মোক্ষের সাধন বিষয়েই ব্যবস্থাপন্ন তাহার নাম আত্মবিনিগ্রহ। ৯। এই অমানিত্বাদি সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞানের সাধন হওয়াতে জ্ঞানরূপই বলা যায়। এই প্রকারে এই শ্লোকের এবং বক্ষ্যমাণ একাদশ শ্লোকের ("এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তম্") এই বচনের সহিত অন্বয় করিবে। ইতি। ৭॥ কিঞ্চ—

(মূঃ শ্লোঃ) ইন্দ্রিয়ার্থেষু[১] বৈরাগ্যম[২]নহঙ্কার[৪] এব চ[৩]।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্[৫]॥ ৮॥

পদার্থ।—হে অর্জ্জুন! শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি বিষয়বিষয়ে যে বৈরাগ্য এবং অহঙ্কাররাহিত্য, এবং জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষ এই সকলের যে পুনঃপুনঃ দর্শন। ৮।

টীকা—হে অর্জ্জুন! শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের শব্দাদি বিষয়বিষয়ে অথবা ইহ-লোকের এবং পরলোকের বিষয় ভোগ বিষয়ে অনুরাগের বিরোধী যে অস্পৃহা-রূপ চিত্তবৃত্তি বিশেষ তাহার নাম বৈরাগ্য। ১০। আর লোকে আপনার স্তুতি না করিলেও মনে "আমি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট" এই প্রকার গর্ব্বের নাম অহঙ্কার। সেই অহঙ্কারের অভাবের নাম অনহঙ্কার। ১১। আর মাতার উদরে দশ মাস অবস্থিতি করিয়া যোনিদ্বারা যে বহির্গমন তাহার নাম জন্ম। আর প্রাণের উৎ-ক্রমণকালে সর্ব্ব মর্ম্মস্থানের যে ছেদন তাহার নাম মৃত্যু। আর যে অবস্থায় বুদ্ধির মন্দতা এবং সর্ব্ব অঙ্গের শিথিলতা এবং স্বজনাদিকৃত পরিভব ইত্যাদি

দোষ প্রাপ্ত হয় সেই অবস্থার নাম জরা। আর জ্বর অতিসার আদি রোগের নাম ব্যাধি। আর অধ্যাত্ম, অধিভূত, অধিদৈব এই তিন উপদ্রব নিমিত্তক যে ইষ্ট বস্তুর বিয়োগজন্য এবং অনিষ্ট বস্তুর সংযোগজন্য চিত্তের পরিতাপ রূপ পরিণাম বিশেষ তাহার নাম দুঃখ। আর বাত পিত্ত শ্লেষ্মা মল মূত্র ইত্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়াতে যে এই শরীর বিষয়ে নিন্দিতপণা তাহার নাম দোষ। এরূপ জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ এবং দোষের যে অনুদর্শন অর্থাৎ পুনঃপুনঃ বিচার করিয়া দেখা। অথবা জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি এবং দুঃখ এই পঞ্চ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ দোষ দর্শন। অথবা জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি এই চারি বিষয়ে দুঃখ রূপ দোষের যে পুনঃ পুনঃ দর্শন। অথবা জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি এই চারি বিষয়ে যে পুনঃ পুনঃ দুঃখ দর্শন এবং দোষ দর্শন। এখানে জন্ম বিষয়ে তো মাতার উদরে দশ মাস পর্য্যন্ত অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া অবস্থিতি করা, এবং মাতার মলস্থিত কৃমি কীটাদি দ্বারা দংশিত হওয়া, এবং মাতার জঠরাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হওয়া এবং জরায়ু চর্ম্ম দ্বারা বেষ্টিত হওয়া, এবং জন্মকালে প্রসব বায়ু দ্বারা আকর্ষিত হওয়া, এবং অত্যন্ত অল্প সঙ্কীর্ণ যোনিযন্ত্র হইতে বহিস্কৃত হওয়া, এবং মলমূত্রাদি দুর্গন্ধে স্থিত হওয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার দুঃখ এবং দোষ জন্ম বিষয়ে লক্ষিত হয়। আর মৃত্যু বিষয়ে তো সর্ব্ব নাড়ী দ্বারা আকর্ষিত হওয়া এবং মর্ম্মস্থান সকল ছেদন হওয়া, এবং প্রাণবায়ুর আকুঞ্চন হওয়া, এবং ঊর্দ্ধ শ্বাসযুক্ত হওয়া, এবং অত্যন্ত ক্লেশ-পূর্ব্বক মলমূত্রাদি বহির্গত হওয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার দুঃখ এবং দোষ মৃত্যু বিষয়ে লক্ষিত হয়। আর জরা অবস্থায় তো সর্ব্ব অঙ্গের শিথিলতা হওয়া এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের মন্দতা হওয়া এবং শরীর সদা কম্পিত হওয়া, এবং কাশশ্বাস রোগগ্রস্ত হওয়া, এবং আপনার স্বজনবর্গ দ্বারা নিরাকৃত হওয়া, এবং শরীর দ্বার হইতে সর্ব্বদা মলমূত্র লালা নিঃসরণ হওয়া, ইত্যাদি অনেক প্রকার দুঃখ এবং দোষ জরা অবস্থায় ঘটিয়া থাকে। আর জ্বরাদি ব্যাধি বিষয়ে তো শরীরের দুর্ব্বলতা হওয়া, এবং শীত জ্বরাদি বেগবশতঃ সন্তপ্ত হওয়া, এবং অত্যন্ত কটু কষায় ঔষধাদি পান করা, এবং দেহে অত্যন্ত অসহ্য দুর্গন্ধ হওয়া, এবং স্বেদাদি নির্গমন হওয়া ইত্যাদি নানাপ্রকার দুঃখ এবং দোষ ব্যাধি অবস্থায় হইয়া থাকে। এই প্রকার দুঃখ দোষ দর্শন বিষয় বৈরাগ্যের কারণ হওয়াতে আত্মজ্ঞান বিষয়ে অত্যন্ত উপযোগী। এজন্য এস্থলে সংক্ষেপপূর্ব্বক বর্ণন করা গেল। সুতরাং অধিকারী জন সেই দুঃখ দোষ দর্শন নিঃসন্দেহ সম্পাদন করিবেন। ১২ ॥ ৮ ॥

২ ৩ ১

কিঞ্চ (মূঃ শ্লোঃ) অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।

৬ ৪ ৭ ৫

নিত্যঞ্চ সম চিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥৯॥

১ ২

পদার্থ।—হে অর্জ্জুন! পুত্র স্ত্রী গৃহাদি পদার্থে শক্তি রহিত হওয়া এবং

৩ ৪ ৫ ৬ ৭

অভিষঙ্গ রহিত হওয়া এবং ইষ্টানিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সমচিত্ত থাকা।৯॥

হে অর্জ্জুন! এই পদার্থ "আমার" এই অভিমানবশতঃ যে সেই পদার্থে প্রীতি তাহার নাম শক্তি। সেই শক্তি রহিতের নাম অশক্তি। ১৩। আর এই পদার্থ "আমিই হই" এই প্রকার অভেদ ভাবনা দ্বারা যে সেই পদার্থে প্রীতির অতিশয়তা অর্থাৎ সেই পদার্থের সুখে ও দুঃখে আমিও সুখী দুঃখী হইব এই প্রকার যে অত্যন্ত অভিনিবেশ তাহার নাম অভিষঙ্গ; সেই অভিষঙ্গ রহিত হওয়ার নাম অনভিষঙ্গ। ১৪। শঙ্কা। হে ভগবন্! শক্তি অভিষঙ্গ এই দুই কোন্ বস্তুতে পরিত্যাগ করা উচিত? এরূপ অর্জ্জুনের শঙ্কা হওয়াতে শ্রীভগবান্ কহিতেছেন ("পুত্রদারগৃহাদিষু") হে অর্জ্জুন! পুত্র এবং স্ত্রী এবং গৃহে সেই সক্তি এবং অভিষঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত। অর্থাৎ তাহাদের প্রতি অহংতা মমতা ত্যাগ করিবে। এখানে ("পুত্রদারগৃহাদিষু") এই বচনে যে আদি শব্দ আছে সেই আদি শব্দ দ্বারা এতদ্ভিন্ন অন্য যত প্রকার স্নেহের বিষয় ধন ভৃত্য প্রভৃতি পদার্থ আছে সেই সর্ব্ব পদার্থ গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ স্নেহের বিষয় সর্ব্ব পদার্থ সক্তি এবং অভিষঙ্গ রহিত হইবে। আর ইষ্ট অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা সমচিত্ত বিশিষ্ট হইবে। অর্থাৎ প্রিয় পদার্থ প্রাপ্তিতে তো হর্ষ করিবে না এবং অপ্রিয় পদার্থ প্রাপ্তিতে বিষাদ করিবে না; ইহারই নাম সমচিত্তত্ব। ২৫ ॥ ৯ ॥

৩ ৫ ১ ৪ ২

কিঞ্চ (মূঃ শ্লোঃ) ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।

বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥১০ ॥

পদার্থ।—হে অর্জ্জুন! অনন্য যোগ দ্বারা অব্যভিচারিণী যে আমি পরমেশ্বরে
৪ ৫ ৬ ৭ ৮
ভক্তি এবং একান্ত দেশে যে অবস্থিতি এবং বিষয়ী জন সমাজে বিরাগ বা অপ্রীতি।

টীকা—হে অর্জ্জুন! আমি যে ভগবান্ বাসুদেব পরমেশ্বর আমাতে যে ভক্তি অর্থাৎ এই পরমেশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এইপ্রকার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতা জ্ঞানপূর্ব্বক যে আমার বিষয়ে নিরতিশয় প্রীতি; সেই ভক্তি কিরূপ? অনন্যযোগ দ্বারা অব্যভিচারিণী। এখানে 'এই ভগবান্ বাসুদেব অপেক্ষা অন্য কেহ নাই, সুতরাং সেই ভগবান্ বাসুদেবই আমার একমাত্র গতি" এই প্রকার যে নিশ্চয় তাহার নাম অনন্য-যোগ। এরূপ অনন্য-যোগপূর্ব্বক যে ভক্তি অব্যভিচারিণী অর্থাৎ কোনও প্রতিকূল হেতু যাহাকে নিবৃত্ত করিতে অসমর্থ, এরূপ ভক্তি ও জ্ঞানেরই হেতু। এই বার্ত্তা অন্য শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে। যথা—"প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ।"

অর্থ।—এই অধিকারী পুরুষের যে পর্য্যন্ত ভগবান্ বাসুদেব যে আমি, আমার প্রতি নিরতিশয় ভক্তি না হয় সে পর্য্যন্ত এই অধিকারী পুরুষ দেহ সম্বন্ধ রহিত হইবে না ইতি। ১৬। আর বিবিক্তদেশসেবিত্ব অর্থাৎ যে দেশ স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ অথবা সংস্কারপূর্ব্বক বিশুদ্ধ করা যায় অথবা অশুচি সর্প ব্যাঘ্রাদি পরিশূন্য এবং চিত্তবৃত্তি প্রফুল্লিত করিতে সমর্থ সেই দেশের নাম বিবিক্ত দেশ। নদীতীর পর্ব্বতগুহা প্রভৃতি নিভৃত স্থান এইরূপ। এরূপ বিবিক্ত দেশ সেবনের যে স্বভাব তাহার নাম বিবিক্তদেশসেবিত্ব। ১৭। আর আত্মজ্ঞানবিমুখ ও বিষয়ভোগ লম্পটতা উপদেশপটু যে বিষয়ী বহির্মুখ জন, সেই বিষয়ী জনের যে সভা যাহা তত্ত্বজ্ঞানের অত্যন্ত প্রতিকূল সেই বিষয়ী পুরুষের সভাতে যে অরতি অর্থাৎ তাহাতে প্রীতি না থাকা। ১৮। আর তত্ত্বজ্ঞানের অনুকূল এরূপ যে মহাত্মজনের সভা, সেই সভাতে তো এই অধিকারী জন অবশ্যই প্রীতি করিবেন। এই বার্ত্তা অন্য শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে।

শ্লোক। "সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ঃ স চেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্"।

অর্থ। এই অধিকারী জন সর্ব্ব প্রকার সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। আর যদি কদাচিৎ সর্ব্ব প্রকারে সেই সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে না পারেন, তাহা

হইলেও এই অধিকারী জন বিষয়ী বহির্মুখ পুরুষের সঙ্গ কখনই করিবেন না ; কিন্তু মহাত্মা জনের সহিত সদা সঙ্গ করিবেন। যেহেতু সেই মহাত্মা জনের সঙ্গ এই সংসাররূপ রোগের নিবৃত্তির ঔষধ ইতি। ১০।

১　　　　২

কিঞ্চ।—(মূঃ শ্লোঃ) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।

৩　৪　৫　৬　১০　৯　৭　৮

এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১ ॥

পদার্থ।—হে অর্জ্জুন! অধ্যাত্মজ্ঞানে যে নিষ্ঠা অর্থাৎ অধ্যাত্মজ্ঞানপরায়ণতা এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজনের যে দর্শন অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের ফল যে মোক্ষ তাহার দর্শন—এই অমানিত্বাদি বিংশতি সংখ্যককে জ্ঞান এই নামে বর্ণন করা যায়। আর যাহা ইহা হইতে অন্য প্রকার অর্থাৎ ইহার বিপরীত যে মানিত্বাদি ধর্ম্ম, তাহারা সমস্ত অজ্ঞানরূপ। ১১।

টীকা—হে অর্জ্জুন! আত্মাকে আশ্রয় করিয়া যে আত্ম অনাত্ম বিবেকজ্ঞান প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহার নাম অধ্যাত্মজ্ঞান, সেই অধ্যাত্মজ্ঞান বিষয়ে যে অত্যন্ত নিষ্ঠা তাহার নাম অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্ব। যেহেতু সেই বিবেক বিষয়ে নিষ্ঠাবান্ পুরুষই মহাবাক্যার্থ জ্ঞানে সমর্থ হন, সেই হেতু এই অধিকারী পুরুষ সেই অধ্যাত্ম জ্ঞানে নিষ্ঠা অবশ্য সম্পাদন করিবেন। ১৯। আর তত্ত্বজ্ঞানের অর্থের যে দর্শন অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য যাহার কারণ এবং অমানিত্বাদি সর্ব্বসাধনের পরিপাকের ফলরূপ যে "আমি ব্রহ্মরূপ হই" এই প্রকার সাক্ষাৎকারের নাম তত্ত্বজ্ঞান। এরূপ তত্ত্বজ্ঞানের যে অর্থ অর্থাৎ অবিদ্যাদি সর্ব্ব অনর্থ নিবৃত্তিরূপ এবং পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ যে মোক্ষরূপ প্রয়োজন সেই তত্ত্বজ্ঞানের মোক্ষরূপ অর্থের যে দর্শন অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ বিচারপূর্ব্বক দেখা তাহার নাম তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন। ২০॥ এরূপ তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শনও এই অধিকারী পুরুষ অবশ্য করিবেন। কারণ সেই তত্ত্বজ্ঞানের ফল দর্শন হইবার পরই লোকে তাহার সাধন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ফলের জ্ঞান বিনা কেহ তাহার সাধনে প্রবৃত্ত হন না। এই প্রকার অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন পর্য্যন্ত কথিত যে বিংশতি সাধন, তাহা আত্মজ্ঞানপ্রাপ্তির হেতু হওয়াতে, জ্ঞান এই নামে কথিত হইয়াছে। এই অমানিত্বাদি সাধনের বিপরীত যে মানিত্ব, দম্ভিত্ব, হিংসা, অক্ষান্তি, অনার্জব, ইত্যাদি আত্মজ্ঞানের বিরোধী হওয়াতে অজ্ঞান এই নামে উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এই অধিকারী পুরুষ সেই অজ্ঞাননামা মানিত্ব দম্ভিত্বাদি

পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই জ্ঞাননামা অমানিত্ব অদম্ভিত্বাদি বিংশতি সাধন অবশ্য সম্পাদন করিবেন, এই কথা মুণ্ডক উপনিষদে অঙ্গিরস ঋষি তাঁহার শিষ্য শৌনক ঋষিকে বলিয়াছিলেন। যথা—হে শৌনক! যেরূপ ইহ লোকে কোন শূর বীর পুরুষ আপনার ধনুক হইতে বাণ চালাইয়া কোন লক্ষ্য বস্তু ভেদ করে, সেইরূপ ধৈর্য্যযুক্ত, আত্মার বিবেকযুক্ত কামক্রোধাদি শত্রুদিগকে সর্ব্বদা ভয়প্রদানকারী, অমানিত্বাদি গুণসম্পন্ন অধিকারী পুরুষ মুণ্ডক উপনিষদোক্ত অক্ষর ব্রহ্মকে লক্ষ্যরূপ করিয়া ভেদ করিবেন। হে শৌনক! যে ওঁকাররূপ প্রণব মন্ত্রের উদরে মহাবাক্যরূপ বেদান্ত বিদ্যমান আছে, সেই প্রণব মন্ত্র তো ধনুস্বরূপ, আর "আমি ব্রহ্ম" এই প্রকার যে মহাবাক্যের অর্থ চিন্তন, তাহা সেই প্রণবরূপ ধনুসের আকর্ষণ রূপ, আর ধ্যানকর্ত্তা পুরুষের যে শোধিত কূটস্থ আত্মা তাহা বাণরূপ, আর শুদ্ধ ব্রহ্ম লক্ষ্যস্বরূপ; যে শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য মধ্যে এই কূটস্থ আত্মা রূপ বাণ বিদ্ধ হইয়া সেই লক্ষ্য স্বরূপই হইয়া যায়। ইতি। ১১॥

ক্রমশঃ।

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র

সনাতন স্তোত্র।

জয় হে মহেশ অস্থি-বিভূষিত
শঙ্কর-শূল-পানি হে।
জয় হে ত্রৈলোক্য জটা-বিনিন্দিত
শিরে মা জাহ্নবী গঙ্গে
গলে হলাহল ব্যাঘ্রদৃতাবৃত
হস্তে কমণ্ডলু রাজে
জয় আশুতোষ তারিণী চণ্ডাক
বিষধর অঙ্গমাঝে
জয় ভোলানাথ বিদথ আরাধ্য
অনিমা চরচিত হে
হে নন্দিবর্দ্ধন সত্য-সনাতন
নমামি চরণ-যুগে।

শ্রীজীবনধন চক্রবর্ত্তী।